আশাপূর্ণাদেবীর রচনা সম্ভার

দ্বিতীয় খণ্ড

আশাপূর্ণা দেবী

জি. ভরদ্বাজ অ্যাণ্ড কোং
২২-এ, কলেজ রো
কলিকাতা-৯
১৩৬৩

সূচীপত্র

ভূমিকা

॥ ১ ॥

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে শ্রীযুক্ত গজেন্দ্রকুমার মিত্র যে ভূমিকা লিখেছেন তাতে লেখিকার শিল্প-কুশলতা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হয়েছে। সেই আলোচনা থেকে পাঠক-পাঠিকারা লেখিকার সাহিত্যকৃতি সম্বন্ধে অনেক তথ্যই অবগত হবেন। অবশ্য একথা ঠিক, পিঠার মিষ্টত্ব যেমন স্বাদে, তেমনি কথা-সাহিত্যের রসাস্বাদও পাঠে। এক ডজন সমালোচনা ও বিশ্লেষণ পড়ে গল্প-উপন্যাস সম্পর্কে যে ধারণা জন্মায়, তার চেয়ে অনেক বেশী সাহিত্যবোধ জন্মে—যদি পাঠক নিজের গরজেই গল্প-উপন্যাস পড়ে ফেলেন। সাধারণ পাঠক আদার ব্যাপারী; তার সমালোচনারূপ জাহাজের খোঁজে দরকার-ই বা কী? সুতরাং শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর ঔপন্যাসিক প্রতিভার যথার্থ স্বরূপ জানতে গেলে তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাস পড়াই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। সেই জন্য পাঠক-পাঠিকাকে অনুরোধ করব, তাঁরা নিজেরাই লেখিকার গল্প-উপন্যাস পড়ে তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে নিজেদের অভিমত তৈরি করুন। তবু ভূমিকায় দু-চার কথা বলতে চাই। অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে পাণ্ডিত্য প্রকাশ বা গুরুমশাইগিরির জন্য নয়। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর বই পড়ে যে আনন্দ ভোগ করি, পাঠকদের মনে তারই যৎকিঞ্চিৎ বণ্টন করে দেওয়ার জন্যই এখানে এই প্রসঙ্গে দু-চার কথা বলতে হল।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় আমার বাল্য-কৈশোর থেকে। অবশ্য সে পরিচয় চাক্ষুষ নয়, তাঁর লেখার মারফতেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা সঞ্চারিত হয়েছিল। আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন ছেলেদের মাসিকপত্রে তাঁর লেখা দু-একটি গল্প পড়ে তাঁর প্রতি প্রথম কৌতূহলী হই। গল্পগুলি সবই কৌতুকরসের। চমকপ্রদ চাঁছাছোলা ভাষায় ছেলেদের মনের উপযোগী করে অসঙ্গতিজনিত হাস্যকৌতুক পরিবেশন করা খুবই দুরূহ। কিন্তু লেখিকার সেই গল্পগুলিতে কৌতুকের যে ঝিকিমিকি ফুটে উঠেছিল, তার অন্তরালে একটা পুরুষালি ঢং আমাকে বেশী মুগ্ধ করেছিল। গল্পটার নাম যতদূর মনে পড়ছে—'একটুর জন্যে'। এই ঋজু ধরণের কৌতুকরস লীলা মজুমদারের ছোটদের গল্পে কিছু কিছু পেতাম। মাঝে মাঝে সন্দেহ হত, আশাপূর্ণা দেবী যথার্থ কোন মহিলা-লেখিকা, না কোন পুরুষ-লেখকের ছদ্মবেশ? কেন না, এদেশে অনিলা দেবী, নীহারিকা দেবী, অমলা দেবী—অনেক 'দেবী'ই আদৌ দেবী নন, নিতান্ত পুরুষজাতীয় জীব—তা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে জেনেছিলাম। আমাদের বাংলা সাহিত্যে মহিলা-লেখিকারা প্রায় অধিকাংশ স্থলেই হয় গীতিকবিতা, আর না হয় সরল, স্নিগ্ধ, করুণ, কোমল গল্প লিখতেই অভ্যস্ত। আমাদের কেমন একটা ধারণা জন্মে গেছে, লেখিকা হলেই এই ঘরোয়া ধরণের অতিপরিচিত

জীবনচিত্র তাঁর লেখনীমুখে আবির্ভূত হবে। তার ব্যতিক্রম ঘটলে সন্দেহ হয়—'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—কোন্ দেবতাকে হবিঃ দান করব ?

এক সময়ে বাংলাদেশের কোন কোন কবিযশঃপ্রার্থী পুরুষ-লেখক স্ত্রীলোকের ছদ্মনামের আড়ালে কাব্য-কবিতা লিখতেন (যেমন—'ভুবনমোহিনী প্রতিভা'র লেখক)। একালে নীহারিকা দেবীর ছদ্মনামের আড়ালে বসে কোনো-এক পুরুষ-লেখক বিখ্যাত মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। তার অনেক আগে উনিশ শতকের চতুর্থ-পঞ্চম দশকের দিকে ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদপত্রে ('সংবাদ প্রভাকর') স্ত্রীলোকের নামে গুটিকতক পদ্য মুদ্রিত হয়েছিল, যাকে কোনক্রমেই কবিতা বলা যায় না। সেগুলি যথার্থই কোন নারীর রচনা কিনা তাতে সন্দেহ জাগে। অতঃপর বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় হিন্দুসমাজে স্ত্রীশিক্ষা যৎকিঞ্চিৎ অগ্রসর হল। মিশনারীদের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হল "জেনানা মিশন"। ভারতবর্ষীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও কেশবচন্দ্রের 'নববিধানের' দ্বারাও বাঙালী হিন্দুসমাজে ধীরে ধীরে স্ত্রীশিক্ষা অগ্রসর হল। উনিশ শতকের অষ্টম দশকের দিকে বাঙালী কুলবধূরা কেউ কেউ ভীরু কুণ্ঠিত চরণে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তাঁর পরে অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী বাংলা কথাসাহিত্যের প্রাঙ্গণে যথাযোগ্য স্থান করে নিলেন; অবশ্য এঁদের কারও কারও রচনায় ইচ্ছাকৃতভাবে পুরুষালি ঢংটা এত প্রকট হয়ে উঠেছে যে, এঁদের নারী স্বভাবের যথার্থ স্বরূপ অনেক সময়ে বাধা পেয়েছে। সে যাই হোক, বিশ শতকের গোড়ার দিকে বোঝা গেল যে, সাহিত্য, বিশেষতঃ কথাসাহিত্যে ও গীতিকবিতায় লেখিকারা অত্যন্ত স্বচ্ছন্দভাবে পদচারণা করতে আরম্ভ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বাংলাদেশের মহিলা সাহিত্যিকেরা এখনও হৃদয়ারণ্যের মধ্যেই ঘোরাঘুরি করছেন, পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে মননের ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করতে যেন কিছু দ্বিধান্বিত।

॥ ২ ॥

একালের উপন্যাসের ক্ষেত্রে পুরুষ ঔপন্যাসিকের মতো সর্বপ্রথম খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন অনুরূপা দেবী। তাঁর উপন্যাসে কাহিনীগত ঘনত্ব ও চরিত্রগত বৈচিত্র্য বড়োই গতানুগতিক। এর কারণ, জীবন সম্বন্ধে তাঁর কতকগুলো বিশেষ ধরণের ধরাবাঁধা চিন্তা আছে, যা প্রায়ই কৃত্রিম নীতিমার্গকে সমাজজীবন পরিমাপের একমাত্র গজকাঠি বলে মনে করে। বঙ্কিমী-সূর্যোত্তাপে আতপ্ত সাহিত্য-সম্রাজ্ঞী অনুরূপা দেবী উপন্যাসে যাদের বরমাল্য দিয়েছেন, তারা স্বতই বৃহৎ, মহৎ, আদর্শবান্ এবং আত্মত্যাগের দ্বারা সুমহান; কিন্তু জীবনের গলিঘুঁজিতে যে বক্রতা রয়েছে, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের মধ্যে নিত্যই যে বিষাক্ত আবিলতা ফেনিয়ে উঠছে, সেই সমস্ত কঠোর কর্কশ আদিম বর্বরতাকে তিনি সশঙ্কচিত্তে পাশ কাটিয়ে গেছেন এবং যা নেই, কিন্তু হওয়া উচিত, যার দ্বারা ধূলিম্লান

জীবনকে জ্যোতির্ময় লোকে তুলে ধরা যায়—অনুরূপা দেবী তাঁর অধিকাংশ চরিত্রকে সেই সমস্ত আদর্শায়িত কল্পলোকে উত্তীর্ণ করে দিয়েছেন। অবশ্য তার মূলটা মৃত্তিকাতলেই প্রোথিত। কিন্তু পঙ্কজকে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তিনি পঙ্ককুণ্ড ঘুলিয়ে তুলবার প্রয়োজন বোধ করেননি। বলাই বাহুল্য, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'ভারতী'-গোষ্ঠী ও 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর প্রবল প্রাধান্যের দিনেও অনুরূপা দেবীর ভক্ত পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা যথেষ্টই ছিল। অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমরা যতই প্রগতি, আধুনিকতা, রুশ-দেশীয় সমাজবাদ এবং ফ্রয়েড ও উত্তর-ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন তত্ত্বের গরম মশলা মিশিয়ে বাঙালী উপন্যাস-পাঠককে উত্তেজিত করতে চাই না কেন, যতই নিষিদ্ধ পল্লীর গণ-নায়িকাদের কথা লিখি না কেন, বাংলার পুরাতন সমাজব্যবস্থা ও পারিবারিক জীবন, যা বঙ্কিমযুগকে লালন-পালন করেছিল, তা বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকেও প্রায় অটুট ছিল—অন্তত: গ্রামবাংলায়।

বাংলাদেশে তো মাত্র একটাই শহর, যার নাম কলকাতা। অবিভক্ত বাংলার পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে দু-চারটি ছোটখাট শহর থাকলেও যথার্থ নাগরিকতা-বোধ কলকাতাতেই গড়ে উঠেছে এবং এখনও সেই ধারাই বর্তমান। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে ঢাকা শহরকে অতি-প্রাধান্য দেবার চেষ্টা হয়েছিল রাজনৈতিক অভিসন্ধিবশতঃ। কিন্তু বিপুল অর্থব্যয় সত্ত্বেও বিদেশী শাসন ঢাকাকে কলকাতার প্রতিদ্বন্দ্বী করে গড়ে তুলতে পারেনি—যদিও সেখানে স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, ধর্মাধিকরণ, সভাসমিতি, খেলাধূলা, নৃত্যগীত-অভিনয়—সবই ছিল। যাকে urbanity বলে, অর্থাৎ মনের সেই ঈষৎ কৃত্রিম বক্রতা, যার সঙ্গে আত্মসচেতন যৌক্তিকতা অনুস্যূত হয়ে থাকে—কলকাতাই হচ্ছে তার প্রাণকেন্দ্র। অবশ্য আমরা রক্তস্নাত আধুনিক ঢাকা নগরীর কথা বলছি না, আমাদের দৃষ্টি ইংরেজ আমলের দিকেই প্রসারিত।

একালে একদিকে কলকাতা হয়ে উঠল রম্যা নগরী, সারা ভারতের প্রাণকেন্দ্র, ভাবগত ভূকম্পনের epicentre; অপরদিকে অবহেলা, অনাদর, রোগে-শোকে বাংলার, বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার গ্রামজীবন দুঃসহ অভিশাপে মৃতবৎ হয়ে পড়ল। শরৎচন্দ্র আবেগবহুল বর্ণনার রসে গ্রামবাংলার এই করুণ চিত্রটি বড়ো বেদনাময় করে এঁকেছেন। এই গ্রাম্য জীবন ও সমাজের বুকে মানুষের দুঃখবেদনার রেখাচিত্রটি তাঁকে কতকগুলি উৎকট প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করিয়ে দিল; এই সমস্ত অনাচার-অত্যাচারের জন্য দায়ী হচ্ছে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালী সমাজ। শরৎচন্দ্র সেই অশরীরী দানবটাকে যেন অগ্নিবাণে বিদ্ধ করতে চাইলেন। মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-শাসিত সমাজ তখন আর ছিল না, ছিল শুধু তার কঙ্কালমূর্তি। তারই ওপর শরৎচন্দ্র আঘাত হানলেন। অবশ্য সমাজ সংস্কার বা সমাজের পুনর্গঠন—এ-সমস্ত শরৎচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল না। সাহিত্যের দ্বারা সমাজসেবা বা সমাজের পুনর্গঠন, এ-সব ব্যাপারে শরৎচন্দ্রের বিশেষ কোনও আগ্রহ ছিল না। সাহিত্যের এই

ধরণের মাপাজোখা উদ্দেশ্যমূলকতায় তাঁর আন্তরিক কোনও আকর্ষণ না থাকাই স্বাভাবিক। মানুষের ব্যর্থতা ও বেদনাকেই তিনি চোখের জলে আর্দ্র করে পাঠকের দরবারে পেশ করেছেন। অনুরূপা দেবী ভিন্ন পথ ধরেছিলেন। বিকৃতিকে অস্বাভাবিক ও ক্ষণস্থায়ী মনে ক'রে পুরাতন নীতি-সংহিতাশ্রয়ী হিন্দুর পারিবারিক আদর্শকে তিনি ব্যক্তির জীবনে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। এর ফলে শরৎচন্দ্রের পাঁচাপাঁচি কাহিনীগুলিও অনুভূতি-প্রবণ ও আবেগব্যাকুল পাঠককে করুণার্দ্র কান্নায় ভরিয়ে তোলে। অনুরূপা দেবীর উপন্যাসে গুরুভার চরিত্র ও ঘোরালো কাহিনীতে ঠিক সেই নিরাবরণ প্রাণের অকুণ্ঠিত প্রকাশটি যেন বাধা পায়। তিনি তাঁর উপন্যাসে মানুষের অসংযত প্রবৃত্তি-তুরঙ্গের মুখে বল্‌গা জুড়ে দিয়ে তাকে বশে আনতে চেয়েছেন। এই ধরণের মনোভাব তিন-চার দশক আগে গ্রামীণ সমাজে যথেষ্ট ছিল, নাগরিক শিক্ষিত সমাজেও নীতিঘেঁষা সাহিত্যাদর্শ সম্বন্ধে অনেকের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। গল্প-উপন্যাস শুধু ভালো লাগার জন্যই নয়, চরিত্র গঠনের কাজেও লাগে—এই ধরণের সৎ ও সাধুবিশ্বাস কিছুকাল আগেও বাঙালী পাঠক সমাজে যথেষ্ট ছিল, এখনও কি তা একেবারে লুপ্ত হয়ে গেছে? রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস একটি বিশাল জ্যোতির্ময় বিচিত্র শিল্পকর্ম হলেও অর্ধ শতাব্দী পূর্বে তার পাঠকসংখ্যা ছিল সীমাবদ্ধ। কারণ যুধিষ্ঠিরের রথের মতো তাঁর উপন্যাসের ঘটনা, কাহিনী, চরিত্র, পরিবেশ, সংলাপ—সবই যেন মাটির কিছু ওপর দিয়ে চলে, কর্ণের রথের মতো ভূমিকে বিদীর্ণ করে গভীর ক্ষতচিহ্ন সৃষ্টি করে না।

॥ ৩ ॥

বাংলা উপন্যাস ও ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আশাপূর্ণা দেবীর স্থান চিন্তা করতে গিয়েই মনে হল, তাঁর লেখা আমার অত্যন্ত প্রিয় এবং বাংলাদেশের অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার মতো আমিও তাঁর বই পেলে একাসনেই পড়ে ফেলবার তাগিদ অনুভব করি। বক্ষ্যমাণ দ্বিতীয় খণ্ডে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র পূর্বার্ধ এবং কয়েকটি পূর্ব-প্রকাশিত গল্প সঙ্কলিত হয়েছে। উপন্যাসটি লেখিকার এ-যাবৎ-কালের মধ্যে রচিত যে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা এবং একালের অন্যান্য খ্যাতিমান লেখকের উপন্যাসের মধ্যেও যে একক প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে উপন্যাসখানি সর্বশ্রেণীর পাঠক-সমাজে অতিশয় জনপ্রিয় হয়েছে এবং রসিক সমালোচকেরা বলতে শুরু করেছেন, বাংলা সাহিত্যে এ উপন্যাস ভবিষ্যতেও এমনই জনবল্লভ হয়ে থাকবে। আমার মতে এটি তাঁর সবচেয়ে পরিণত এবং পরিপক্ক রচনা। কাহিনী-গ্রন্থন, চরিত্রবিন্যাস ও মনোবিশ্লেষণ, পরিবেশ রচনা এবং জীবন সম্বন্ধে বলিষ্ঠ, আশাবাদী ও বিদ্রোহী ইঙ্গিত 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র পূর্বার্ধকে স্মরণীয় করে রাখবে।

রোমাঁ রোলাঁ একটি নবজাত বালককে নিয়ে 'জাঁ ক্রিস্তফ' শুরু করেছিলেন, বিভূতি-ভূষণও বালক অপুকে ঘটনার কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে 'পথের পাঁচালী'তে সরল গ্রাম্য জীবনের ছবি এঁকেছেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রূপকথার রহস্য, সাধারণ মানুষের অসাধারণ রোমান্স—যা উদ্বেলিত করে না, ক্ষুব্ধ করে না, বিষণ্ণ করে না, প্রতিদিনের জীবনের ওপর একটি শ্যামল কল্পনার আস্তরণ বিছিয়ে দেয়। আশাপূর্ণা দেবী আট বছর বয়সী পাকা গিন্নী সত্যবতীকে পল্লীবাংলার একান্নবর্তী পরিবারের মাঝখানে এনে কাহিনী আরম্ভ করেছেন। কিন্তু কাহিনীর মূল আরও দূরে সম্প্রসারিত।

তখন বাংলাদেশের মুসলমান শাসনে যবনিকা পড়ছে। রামকালী চাটুজ্যে অল্প বয়সে রাগ করে বাড়ী ছেড়ে মুকুন্দাবাদ উপনীত হন এবং এক কবিরাজের কাছে আয়ুর্বেদ ভালো করে আয়ত্ত করে যৌবনে দেশে ফিরে আসেন। ব্রাহ্মণের ছেলের ভিষগ্‌বৃত্তি সেকালের সমাজ প্রথমটা মেনে নিতে না পারলেও কালে তিনি গ্রামসমাজে খ্যাতিমান কবিরাজরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁরই একটু বেশী বয়সের একমাত্রসন্তান কন্যা সত্যবতী। রামকালী প্রথম থেকে স্পষ্টবাদী, যা সত্য বলে মনে করেন তা জীবনে গ্রহণ করার অমিত শক্তি তাঁর আছে। গ্রাম্য সমাজের অসার ভর্ৎসনাকে লঘু করার দুঃসাহসও তাঁর যথেষ্ট। বিশাল একান্নবর্তী পরিবারের তিনি কুলপতি।

ইতিহাসের সনতারিখ ধরলে মনে হবে, ঘটনার পটোত্তলন ঘটেছে উনিশ শতকের তিন-চার দশকের দিকে। তখন সমাজ ও পরিবারে এতটা ঘুণ ধরেনি। তখন পরিবার নামক বৃহৎ বটবৃক্ষ ছোটবড়ো সকলকেই আশ্রয় দিত, ছায়া দিত, বিধবাদের পুষত, অকর্মণ্য নিরুদ্যম পুরুষকেও গ্রহণ করত। সেই গ্রাম্য পরিবার নিত্যই হাস্যরহস্যে মুখর ছিল, কলহ-কলরবে অতি সহজেই মত্ত হয়ে উঠত। বৃদ্ধা বিধবা, বহু পুত্রের জননী ঘরণীগৃহিণী, উপার্জনক্ষম একজন এবং উপার্জনবিমুখ বহুজন—এই পরিবেশে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু। সেই বিশাল পরিবারের মানদণ্ড ধারণ করে আছেন রামকালী চাটুজ্যে। অন্যায়কে তিনি সহ্য করেন না, উচিত কথা বলতে সঙ্কুচিত হন না, রোগহর তিক্ততাকে গ্রহণ করাই তাঁর বৃত্তি। প্রয়োজনে পড়লে তিনি ছোটখাটো মানসিক দুর্বলতার ওপর উঠতে পারেন, অপরিণামদর্শী গুরুজনকেও রূঢ় কথা শোনানো তিনি কর্তব্য বলে মনে করেন। তাঁর চরিত্র খাপখোলা তরবারির মতো ঋজু ও শাণিত। যে-বয়সে এবং যে-যুগে তিনি বাড়ী ছেড়ে অকূলে ভেসেছিলেন এবং ভাগ্যক্রমে মুকুন্দাবাদের বিখ্যাত কবিরাজ গোবিন্দ গুপ্তের সান্নিধ্যে এসে নিজেও প্রথিতযশা কবিরাজ হয়েছিলেন, সে বয়সে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এই যে প্রায় দেড় শতাব্দীর আগেকার একটি তরুণ যুবক, যিনি আচার ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারেন, বহুকালের পুরাতন রীতিনীতিকে ভেঙে চুরে বেরিয়ে যেতে পারেন, তার স্বাভাবিকতা নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে, কোন কোন জাতকের জন্মলগ্নেই তার কপালে বোধ হয় বিধাতাপুরুষ অভাবনীয়ত্বের

জয়টিকা দিয়ে জগৎ-সংসার ছেড়ে দেন। সে তখন আর পাঁচজনের মতো হতে চায় না, সকলকে ছাড়িয়ে অন্যভাবে বেড়ে উঠতে চায়। তা নইলে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, যখন গ্রাম তো দূরের কথা, কলকাতা শহরই মধ্যযুগের অন্ধকার ভালো করে পার হয়নি, তখন বীরসিংহ নামে একটি ছোট গ্রামে ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্মা নামে একটি অগ্নিগর্ভ বালকের জন্ম হল কি করে? পুরাতন বাংলায় লালিত হয়ে পুরাতন সংস্কৃত বিদ্যা আয়ত্ত করে টুলো পণ্ডিত না হয়ে তিনি সংস্কারদ্রোহী মহাসত্ত্বাবান বিশাল পুরুষ হলেনই বা কি করে? কারো কারো মধ্যে এই ধরণের অসাধারণত্ব আসে। কুলপ্রথা, পৈতৃক ঋক্থ, পরিবেশ, না প্রতিভা— কোন্‌টি মানুষকে অধিকতর বেগ দান করে তা বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। কাজেই রামকালীর মধ্যে যে বিদ্রোহ ও অন্যায়কে অস্বীকার করার মতো মানসিক বলিষ্ঠতা রয়েছে—তা অদ্ভুত হলেও অস্বাভাবিক নয়। লেখিকা আদর্শের প্রতি আনুগত্য দেখাতে গিয়ে বাস্তব পরিপ্রেক্ষিতকে অস্বীকার করেছেন, এই চরিত্র প্রসঙ্গে এ কথা বলাও ঠিক হবে না।

'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র প্রথম দিকের কেন্দ্রপুরুষ রামকালী চাটুজ্যে, দ্বিতীয়াংশে প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কন্যা সত্যবতী। উত্তরার্ধে (যা এইখণ্ডে সঙ্কলিত হয়নি) সত্যবতীরই প্রাধান্য। খুড়ি, জেঠি, পিসী, ঠানদিদি শাসিত একান্নবর্তী পরিবারের বৃহৎ পরিবেশে সত্যবতীর বাল্য-কৈশোর অতিবাহিত হয়েছে। সেই পরিবারের অসংখ্য চরিত্রের সে একটি। কিন্তু অসংখ্যের মধ্যেও তার একটি বিশেষ সংখ্যা আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে পিতার কাছ থেকে সে কয়েকটি বিশেষ গুণ আয়ত্ত করেছে। তা হ'ল উচিতবোধে স্পষ্ট কথা বলার স্বাভাবিক সাহস এবং যে-কোনও কাজে অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল। আট বছর বয়স থেকেই বালিকাসুলভ খেলাধুলা ও সখা-সখীদের সাহচর্যে তার চরিত্রের এই দিকটি ফুটে উঠেছে। পিতা ও পুত্রীর চরিত্রগত এই সাদৃশ্যের জন্যই বালিকা সত্যবতী পিতার দু-একটি অযৌক্তিক আচরণের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করতে পিছপাও হয় না। তার কথাবার্তায় বালিকা-সুলভ ছেলেমানুষীর সঙ্গে হয়তো একটু বেশী গিন্নীপনা আছে যাকে, অকালপক্কতা বলা যেতে পারে। কিন্তু তার বাক্‌ভঙ্গিমার বক্রতায় যে কৌতুক ঝরে পড়েছে, তাতেই পাকা পাকা কথার অশোভনতা অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। সেই বালিকা সত্যবতীর বিবাহ হল সেই বয়সে, যে বয়সে এখনকার মেয়েরা পুতুল খেলে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তাকে শ্বশুর বাড়ী যেতে হল। শ্বশুর, শাশুড়ী এবং স্বামী নবকুমারের প্রতি তার ব্যবহার ও আচারে-আচরণে পাঠকের মনে খটকা লাগলে বুঝতে হবে, তাকে লেখিকা নেড়ু বা পুণ্যির মতো করে আঁকতে চাননি।

বালিকা সত্যবতীর বড়ো ভয়-ডর নেই. রাত্রিতে বাগানে গিয়ে পেঁচার চোখ গুণতে তার অসীম উৎসাহ। কোনও বিষয়েই সে হার মানতে রাজী নয়। অন্যায় দেখলে তার বালিকা মন উত্তেজিত হয়ে ওঠে, রসনা হয়ে ওঠে খরতর। এই দস্যি দামাল মেয়ের নিতান্ত বালিকা বয়সে বিয়ে হয়ে গেল, কারণ রামকালী কোন কোন দিক থেকে সমাজ ও পরিবারের

হিতকর পুরাতন পন্থাও অনুমোদন করেছেন। পুরুষের একাধিক বিবাহ তাঁর কাছে খুবই স্বাভাবিক। কন্যার আপদগ্রস্ত পিতাকে কন্যাদায় থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি বিবাহিত ভ্রাতুষ্পুত্রের সেই কন্যার সঙ্গে বিয়ে দিলেন। নিজের পুত্র থাকলে তিনি একই কাজ করতেন। একজন বিপন্ন কন্যাদায়গ্রস্ত ভদ্র গৃহস্থের জাতি রক্ষা করবার জন্য প্রয়োজন হলে ব্যক্তিগত সুখসুবিধাও তুচ্ছ করতে হয়, এই হচ্ছে তাঁর মোটামুটি পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য সম্বন্ধে ধারণা।

অতিশয় দৃঢ়ধরণের আদর্শবাদী হবার জন্য অনেক সময়ে রামকালীর মানবিক সত্তা কিছু ম্লান হয়ে গেছে এবং এই রকম হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ আদর্শবাদীরা মানবিক দুর্বলতার চেয়ে আদর্শকেই বড়ো বলে মানেন এবং প্রাণের স্পর্শ যতই ম্লান হয়ে আসে, ততোই তাঁরা আদর্শকে স্বধর্ম বলে আঁকড়ে ধরতে চান। একমাত্র জামাতা দারুণ ব্যাধিতে মরণাপন্ন হলেও তিনি জামাতার বাড়ী গিয়ে চিকিৎসা করতে পারলেন না, কারণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন। এখানে দেখা যাচ্ছে নীতি-নিয়ম পালন করতে গিয়ে তিনি কন্যা জামাতার প্রতি মানবিক দুর্বলতা দমন করলেন। তাঁর চরিত্রে শুধু একটি ছিদ্র আছে। তা হল, নীতিধর্মে ও মানবধর্মে বিরোধ বাধলে তিনি কর্তব্যের খাতিরে স্বচ্ছন্দে মানবিক স্নেহ ভালোবাসার দাবি উপেক্ষা করতে পারতেন। এর ফলে তাঁর চরিত্রে মাঝে মাঝে এমন একটা অনমনীয়তা সঞ্চারিত হয়ে যাকে বাকে নির্মমতা বলে ভুল হতে পারে।

কন্যা সত্যবতী কিশোরী থেকে যুবতী এবং পরিশেষে সন্তানের জননী হল। সে পিতার মতো উচিত কথা, স্পষ্ট কথা, সত্য কথা বলতে পারে। প্রয়োজন হলে পিতার অযৌক্তিক কাজের সমালোচনা পিতার সামনেই করতে পারে। গুরুজনের মূঢ়তাকে ব্যঙ্গ করতে তার বাধে না। রাত বেড়ানো শ্বশুরকে সে শ্রদ্ধা করে না, এবং শ্বশুরের প্রতি অশ্রদ্ধা সে গোপনও করে না। যে প্রবীণ ব্রাহ্মণসন্তান রাত্রিতে ব্রাহ্মণেতর স্ত্রীলোকের সান্নিধ্যে থাকেন, তিনি শ্বশুর হলেও তাঁকে সে ঘৃণাই করে। দজ্জাল শাশুড়ীর নীচতাকে সে নির্মমভাবে বিদ্ধ করতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না, তাঁর বর্বরতাকে সে ঘৃণাভরে উপেক্ষা করে। ব্যক্তিত্ব-বর্জিত স্বামীর ভীরুতাপূর্ণ ভালোমানুষীকে সে সদাসর্বদা খোঁচা দিয়ে তার মধ্যে শক্ত ভাব জাগাতে চায়। আবার সেই স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়লে তার রোগ নিরাময়ের জন্য সে অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দেয়। দেখা যাচ্ছে, হিন্দু নারীর স্বামীভক্তিরূপ একটা আইডিয়াকে সে শ্রদ্ধা করে, পালন করে। স্বামী তার ভক্তির যোগ্য হতে পারছে না বলেই তার ক্ষোভ।

পিতা রামকালীর সঙ্গে সত্যবতীর চরিত্রের দিক থেকে গভীর সাদৃশ্য থাকলেও একদিকে একটা বড়ো রকমের পার্থক্য আছে। সত্যবতী মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতাকে ঘৃণা করে না, স্নেহভালোবাসাকে কর্তব্যের বাটখারা দিয়ে মাপজোখ করে না। তাই তার মধ্যে মান-অভিমান প্রবল, কিন্তু অকারণে নয়। আভিজাত্যবোধ কিছুটা অহঙ্কারের ধার ঘেঁষে গেলেও ব্যক্তিগত মর্যাদা সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন। তার দুঃসাহসের অন্ত নেই এবং সে দুঃসাহসের উৎস হচ্ছে কর্তব্যবোধ এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়। সেই প্রত্যয়ের

বশেই সে স্থির করল, এবার আর কলহকণ্টকিত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্য জীবন নয়, গলিত পরিবেশ নয়, হাজার বছরের পুরাতন জীর্ণ সংস্কার নয়, এবার গন্তব্যস্থল হবে কল্লোলিনী কলকাতা, নতুন সভ্যতার নতুন রাজধানী। সেখানে গেলে, সন্তানদের আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা দিলে, তবে তারা মানুষ হবে, দশজনের একজন হবে। স্বামী নবকুমার বাল্যে-কৈশোরে জননীকে ভয় করত বাঘিনীর মতো, যৌবনে সত্যবতীকেও সেই একই ভীরুচকিতভাবে দেখত। সে হয়েছে স্ত্রীর ইচ্ছাপূরণের ছায়ামাত্র। অনিচ্ছা ও আশঙ্কা সত্ত্বেও সত্যবতীর ইচ্ছার কাছে তাকে নত হতে হয়, কলকাতায় আসবার সম্মতি দিতে হয়। ইংরেজী জানা নবকুমারের কলকাতার সরকারী অফিসে একটা মাঝারি ধরণের চাকুরিও জুটে যায়।

কলকাতায় যাত্রা করার পূর্বে সত্যবতী পিতৃগৃহ থেকে বিদায় নিয়ে এল। পুরাতন নানা স্নেহস্মৃতিজড়িত জীবনের অবসান, এবার নতুন জীবন—সামনে অকূল সমুদ্র, অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। রামকালীর কাছ থেকে সে বিদায নিয়ে এল। তার পিতৃগৃহেও পরিবেশ বদলাতে চলেছে, জননী আগেই গতায়ু। বৃদ্ধার দল চলে গেছেন, দু-একজন পারঘাটায় শেষযাত্রার জন্য অপেক্ষা করছেন। পিছনে পড়ে রইল এই পরিচিত অভ্যস্ত জীবন, সম্মুখে দুর্জ্ঞেয় রহস্যভরা কলকাতার জীবন। রামকালী ম্লানভাবে কন্যা-জামাতাকে বিদায় দিলেন। তিনিও জীবনযুদ্ধে শ্রান্ত ক্লান্ত, ভগ্নপক্ষ মৈনাকের মতো সমুদ্রতলশায়ী। কন্যা সত্যবতী তরুণ গরুড়ের মতো নতুন আকাশের সীমাসন্ধানী।

এইখানে লেখিকা 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'-র পূর্বার্ধের যবনিকা টেনেছেন। অপরার্ধে নতুন খাতে সত্যবতীর জীবন যে বিচিত্র সম্ভাবনার দিকে বইতে শুরু করবে তার জন্য নিশ্চয়ই পাঠক-পাঠিকা কৌতূহলী হয়ে থাকবেন। সেই অদ্ভুত জেদ, তেজী মনোবল এবং নিষ্ঠুর সত্যকথা বলার নির্মম সাহস পরবর্তী পর্বে কী আকার ধারণ করল, পাঠক-পাঠিকা এর পরবর্তী খণ্ড থেকে তা জানতে পারবেন।

আমি পূর্বেই বলেছি, 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' আশাপূর্ণা দেবীর শ্রেষ্ঠ বচনা, এর পূর্বার্ধ থেকে তা সম্পূর্ণ বোঝা যাবে। সওয়া শতাব্দীর পূর্বেকার গ্রামবাংলার পারিবারিক চিত্র এবং তার সঙ্গে বিচিত্র চরিত্রের মিছিল এঁকে যাওয়া কঠিন কাজ। লেখিকা সেই কঠিন কাজ আশ্চর্য সরল ও সহজভাবে সমাধা করেছেন। দু-একটি টানে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলা, দু-একটি ইঙ্গিতে মনের প্রচ্ছন্ন ছায়াছবির প্রতি পাঠকের কৌতূহলী দৃষ্টি আকর্ষণ করা—বিশেষতঃ অন্তঃপুরের এমন সজীব পরিচয় আমরা অতি অল্প উপন্যাসেই পেয়েছি। তিনি পুরুষ চরিত্রের চেয়ে নারী চরিত্রাঙ্কনে অধিকতর দক্ষতা দেখিয়েছেন। এক শ দেড় শ বছর আগেকার অন্তঃপুরচারিণী নারীকুলের চরিত্র অতিশয় বাস্তবনিষ্ঠ ও জীবন্ত হয়েছে। তাদের ছোট ছোট জীবন, অদ্ভুত সংস্কার, আশাহীন আনন্দহীন ব্যর্থ জীবনের ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি পাঠকের মনকেও বিষণ্ণ করে তোলে। হারিয়ে-যাওয়া অতীত জীবনকে এতটা জীবন্তভাবে একালের প্রকাশ্য সভাস্থলে উপস্থাপিত করা রূপদক্ষ শিল্পীর দ্বারাই সম্ভব। স্ত্রীসমাজের এ-

ছবি বোধ হয় খুব কম লেখকই এ-ভাবে আঁকতে পেরেছেন অবশ্য জেন অস্টেন স্ত্রী-সমাজের-ছবি এঁকেছেন সাবলীল ভঙ্গীতে, কিন্তু পুরুষদের পারস্পরিক আলাপাদি ঠিক জীবন্ত করতে পারেননি, কারণ সেকালের ইংলণ্ডে পুরুষ তার পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে কীভাবে কথা বলত, মেলামেশা করত, তা স্ত্রী-ঔপন্যাসিক জেন অস্টেনের পক্ষে সেকালে জানা সম্ভব ছিল না। আশাপূর্ণা দেবী সে বিষয়ে কোনও খেদ রাখেননি, পুরুষ চরিত্রগুলিকেও যথেষ্ট ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন। রোমাঁ রোলাঁর মতো দার্শনিক গভীরতা ও বিভূতিভূষণের মতো প্রকৃতি-তন্ময়তা তিনি দাবি করবেন না, কিন্তু বিস্মৃত ধূসর অতীতকে একটি বালিকা চরিত্রের বিকাশ-স্তরপরম্পরার মধ্য দিয়ে জাগিয়ে তোলা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য।

॥ ৪ ॥

আশাপূর্ণা দেবীর রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে বেশ কয়েকটি ছোট গল্প সঙ্কলিত হয়েছে যার কিছু কিছু পাঠক-পাঠিকারা ইতিপূর্বেই পড়ে থাকবেন। গল্পগুলির অধিকাংশই বড়ো বিষণ্ণ, বড়ো নৈরাশ্যবোধে বেদনাদায়ক। আমাদের পরিচিত পরিবারকে কেন্দ্র করেও তার মধ্যে গভীরতর বিস্ময় ও বেদনার অনুভূতি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় লেখিকা অসাধারণ কুশলতা অর্জন করেছেন। ছোট গল্প শুধু বর্ণনাধর্মী গল্পমাত্র নয়, এ হচ্ছে একটা বিশেষ রকমের শিল্পপ্রকরণ বা craft—একটি নাটকীয় মুহূর্ত অকস্মাৎ হাজির হয়ে যখন পাঠকের মনের তারে কাঁপন ধরিয়ে দেয়, অথবা একটি অশরীরী আবেগ যখন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়, তখন পাঠক ভাবতে বসে, এ কী হল। সে তো এদিক থেকে ভাবেনি। স্বল্পতম পরিসরের মধ্য দিয়ে গল্পলেখক যতটুকু পরিবেশন করেন, পাঠক তার মধ্য দিয়ে আরও অনেক দূর দেখতে পায়। এ যেন গবাক্ষ দিয়ে বিশ্বদর্শন। ছোট গল্পের মাপাজোখা রীতিপদ্ধতি মুঠোর মধ্যে না এলে অনেক ভালো উপাদানও আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। আশাপূর্ণা দেবী সার্থক ছোট গল্প লিখিয়ে। যতদূর মনে পড়ছে, বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল ছোট গল্প নিয়ে। সে যুগের পূজাবার্ষিক সংখ্যায় তাঁর অনেক গল্প প্রকাশিত হয়েছিল যার কিছু কিছু এই খণ্ডে সঙ্কলিত দেখে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

এই সঙ্কলনের কয়েকটি গল্প আমাদের চেতনাকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। সরযূ, রাজু, জগদীশ. মমতা—প্রত্যেকটি চরিত্রই নাটকীয় মুহূর্তে পরম বিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে তাদের ব্যর্থতা, অর্থহীনতা, নৈরাশ্য। 'সামান্য ক্ষতি' বড়ো গল্পটি এদিক থেকে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে পরিসর একটু বড়ো হলেও বেদনার চিত্রটি অতি গভীর। 'তাসের ঘর' গল্পটি কর্তব্যপরায়ণা নারীর নিদারুণ স্বপ্নভঙ্গের চিত্রটি অনেকটা ইবসেনের নায়িকার কথা মনে করিয়ে দেয়। ছোট গল্পের সংজ্ঞা নিয়ে বহু বাদ-প্রতিবাদ হয়েছে, এর ধরণ-ধারণ নিয়ে অনেক পরীক্ষা চলেছে। সাম্প্রতিক গল্প থেকে গল্প বিদায় নিয়েছে। এ যুগের

গল্পে সূক্ষ্মতম আভাস, অশরীরী রহস্য, বাক্যহত বিস্ময় এবং চিত্ততলবর্তী চেতনাপ্রবাহের তরঙ্গকণা নতুন শিল্পরূপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে। কোথাও গীতকবিতার মূর্ছনা, কোথাও আকস্মিক নাটকীয় চমৎকারিত্ব, কোথাও চরিত্রের অন্তর্লীন প্রায়-অদৃশ্য ইঙ্গিত, কোথাও-বা লেখকের কোন-এক মুহূর্তের impression ছোটগল্পকে অসাধারণ ও অভাবনীয় বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। অবশ্য আশাপূর্ণা দেবীর গল্প ঠিক সাম্প্রতিক গল্পের মতো গল্পহীনতার পরীক্ষা নয়। তাতে যথার্থ গল্পরস আছে, কাহিনীর একটি নিটোল রূপ আছে, একটি বা দুটি চরিত্রের দুঃখ বেদনার গভীর ইঙ্গিত আছে। অবশ্য নিছক গল্প বা যাকে tale বলে, তাও তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। তাঁর প্রায় গল্পেই একটা অদৃষ্টপূর্ব নিয়তি ধীরে ধীরে ফাঁস কষে ধরে, সর্বশেষে একটি নাটকীয় মুহূর্তে পাঠক গল্পের পরিণতি স্মরণ করে চমকে ওঠে। এ-বিষয়ে তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না। উপন্যাসে তিনি বিশাল প্রাঙ্গণকে বেছে নিয়েছেন, ছোট গল্পে একটি কক্ষকে আশ্রয় করেছেন। আকাশ এবং নীড়—দুই প্রান্তেই তাঁর সমান পরিক্রমা।

পাঠকসমাজে তিনি অতিশয় জনপ্রিয়। তাঁরা এইখণ্ডে তাঁদের প্রিয় লেখিকার পুরাতন গল্প ও উপন্যাসকে নতুন করে পড়ার সুযোগ পাবেন।

শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আশাপূর্ণা দেবী

প্রথম প্রতিশ্রুতি

সত্যবতীর গল্প আমার লেখা নয়। এ গল্প বকুলের খাতা থেকে নেওয়া। বকুল বলেছিল, "একে গল্প বলতে চাও গল্প, সত্যি বলতে চাও সত্যি।"

বকুলকে আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি। এখনও দেখছি। বরাবরই বলি, "বকুল, তোমাকে নিয়ে গল্প লেখা যায়।" বকুল হাসে। অবিশ্বাস আর কৌতুকের হাসি। না, বকুল নিজে কোনদিন ভাবে না তাকে নিয়েও গল্প লেখা যায়। নিজের সম্বন্ধে কোন মূল্যবোধ নেই বকুলের, কোন চেতনাই নেই।

বকুলও যে সত্যিই পৃথিবীর একজন, এ কথা যেন মানতেই পারে না বকুল। সে শুধু জানে, সে কিছুই নয়, কেউই নয়। অতি সাধারণের একজন, একেবারে সাধারণ। যাদের নিয়ে গল্প লিখতে গেলে কিছুই লেখবার থাকে না।

বকুলের এ ধারণা গড়ে ওঠার মূলে হয়তো ওর জীবনের বনেদের তুচ্ছতা। হয়তো এখন অনেক পেয়েও শৈশবের সেই অনেক কিছু না-পাওয়ার ক্ষোভটা আজও রয়ে গেছে তার মনে। সেই ক্ষোভই স্তিমিত করে রেখেছে তার মনকে। কুণ্ঠিত করে রেখেছে তার সত্তাকে।

বকুল সুবর্ণলতার অনেকগুলো ছেলেমেয়ের মধ্যে এক জন। সুবর্ণলতার শেষ দিকের মেয়ে।

সুবর্ণলতার সংসারে বকুলের ভূমিকা ছিল অপরাধীর।

অজানা কোন এক অপরাধে সব সময় সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হবে বকুলকে, এ যেন বিধি-নির্দেশিত বিধান।

বকুলের শৈশব-মন গঠিত হয়েছিল তাই অদ্ভুত এক আলোছায়ার পরিমণ্ডলে। যার কতকাংশ শুধু ভয় সন্দেহ আতঙ্ক ঘৃণা, আর কতকাংশ জ্যোতির্ময় রহস্যপুরীর-উজ্জ্বল চেতনায় উদ্ভাসিত। তবু মানুষকে ভাল না বেসে পারে না বকুল। মানুষকে ভালবাসে বলেই তো—

কিন্তু থাক, এটা তো বকুলের গল্প নয়। বকুল বলেছে, "আমার গল্প যদি লিখতেই হয় তো সে আজ নয়। পরে।" জীবনের দীর্ঘপথ পার হয়ে এসে বুঝতে শিখেছে বকুল, পিতামহী প্রপিতামহীর ঋণশোধ না করে নিজের কথা বলতে নেই।

নিভৃত গ্রামের ছায়ান্ধকার পুষ্করিণীই ভরা বর্ষায় উপচে উঠে নদীতে গিয়ে মিশে স্রোত হয়ে ছোটে। সেই ধারাই ছুটে ছুটে একদিন সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সেই ছায়ান্ধকারের প্রথম ধারাকে স্বীকৃতি দিতে হবে বৈকি।

আজকের বাংলাদেশের অজস্র বকুল পারুলদের পিছনে রয়েছে অনেক বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। বকুল-পারুলদের মা দিদিমা,পিতামহী আর প্রপিতামহীদের সংগ্রামের ইতিহাস। তারা সংখ্যায় অজস্র ছিল না, তারা অনেকের মধ্যে মাত্র এক এক জন। তারা একলা এগিয়েছে। এগিয়েছে খানা ডোবা ডিঙিয়ে, পাথর ভেঙে, কাঁটাঝোপ উপড়ে। পথ

কাটতে কাটতে হয়তো দিশেহারা হয়েছে, বসে পড়েছে নিজের-কাটা-পথের পথ জুড়ে। আবার এসেছে আর এক জন; তার আরব্ধ কর্মভার তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। এমনি করেই তে তৈরী হল রাস্তা। যেখান দিয়ে আজ বকুল-পারুলরা এগিয়ে চলেছে। বকুলরাও খাটছে বৈকি। না খাটলে চলবে কেন? শুধু তো পায়ে-চলার পথ হলেই কাজ শেষ হল না।

রথ চলবার পথ চাই যে!

সে পথ কে কাটবে কে জানে? সে রথ কারা চালাবে কে জানে?

যারা চালাবে তারা হয়তো অলস কৌতূহলে অতীত ইতিহাসের পাতা উল্‌টে দেখতে দেখতে সত্যবতীকে দেখে হেসে উঠবে।

নাকে নোলক, আর পায়ে মল-পরা আট বছরের সত্যবতীকে।

বকুলও একসময় হাসত।

এখন হাসে না। অনেকটা পথ পার হয়ে এসে বকুল পথের মর্মকথা বুঝতে শিখেছে। তাই যে-সত্যবতীকে বকুল কোনদিন চোখেও দেখে নি, তাকে দেখতে পেয়েছে স্বপ্নে আর কল্পনায়। মমতায় আর শ্রদ্ধায়।

তাই তো বকুলের খাতায় সত্যবতীর এমন স্পষ্ট চেহারা আঁকা রয়েছে।

নাকে নোলক, কানে 'সার' মাকড়ি, পায়ে ঝাঁজর মল, বৃন্দাবনী-ছাপের আটহাতি শাড়ী-পরা আট বছরের সত্যবতী। বিয়ে হয়ে গেছে বছর খানেক আগে—এখনও ঘরবসত হয় নি। অপ্রতিহত প্রতাপে পাড়াসুদ্ধ ছেলেমেয়ের দলনেত্রী হয়ে যথেচ্ছ খেলে বেড়ায়। সত্যবতীর মা ঠাকুমা জেঠী পিসি এঁটে উঠতে পারে না ওকে।

পারে না হয়তো সত্যবতীর যথেচ্ছাচারের ওপর ওর বাপের কিছু প্রশ্রয় আছে বলে।

সত্যবতীর বাপ রামকালী চাটুয্যে, চাটুয্যে বামুনের ঘরের ছেলে হলেও ব্রাহ্মণজনোচিত পেশা তাঁর নয়। অন্য শাস্ত্রপালা বেদ-বেদান্ত বাদ দিয়ে তিনি বেছে নিয়েছেন আয়ুর্বেদ। ব্রাহ্মণের ছেলে হয়েও কবিরাজি করেন রামকালী। তাই গ্রামে ওঁর নাম 'নাড়ি-টেপা বামুন'। ওঁর বাড়ির নাম 'নাড়ি-টেপার বাড়ি।'

রামকালীর প্রথম জীবনটা ওঁর অন্য সব ভাই আর অন্যান্য জ্ঞাতি-গোত্রদের চাইতে ভিন্ন। কিছুটা হয়তো বিচিত্রও। নইলে ওই আধাবয়সী লোকটার ওইটুকু মেয়ে কেন? সত্যবতী তো রামকালীর প্রথম সন্তান। সে যুগের হিসেবে বিয়ের বয়স একেবারে পার করে ফেলে, তবে বিয়ে করেছিলেন রামকালী। সত্যবতী সেই পার-হয়ে-যাওয়া বয়সের ফল।

শোনা যায় নিতান্ত কিশোর বয়সে বাপের ওপর অভিমান করে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন রামকালী। কারণটা যদিও খুব একটা ঘোরালো নয়, কিন্তু কিশোর রামকালীর মনে বোধ করি সেটাই বেশ জোরালো ছাপ মেরেছিল।

কি একটা অসুবিধেয় পড়ে রামকালীর বাবা এক দিনের জন্যে সদ্য উপবীতধারী পুত্র

রামকালীর উপর ভার দিয়েছিলেন, গৃহদেবতা জনার্দনের পূজা-আরতির। মহোৎসাহে সে ভার নিয়েছিল রামকালী। তার আরতির ঘণ্টাধ্বনিতে সেদিন বাড়িসুদ্ধ লোক 'ত্রাহি জনার্দন্' ডাক ছেড়েছিল। কিন্তু উৎসাহের চোটে ভয়ঙ্কর একটা ভুল ঘটে গেল। মারাত্মক ভুল।

রামকালীর পিসি-ঠাকুমা ঠাকুরঘর মার্জনা করতে এসে টের পেলেন সে ভুল। টের পেয়ে ন্যাড়া মাথার উপর কদমছাঁট চুল সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে উঠল তাঁর। ছুটে গিয়ে ভাইপোর অর্থাৎ রামকালীর বাবা জয়কালীর কাছে প্রায় আছড়ে পড়লেন।

"সর্বনাশ হয়েছে জয়!"

জয়কালী চমকে উঠলেন, "কি হয়েছে পিসি?"

"ছেলেপুলেকে দিয়ে ঠাকুরসেবা করালে যা হয় তাই হয়েছে। সেবা-অপরাধ ঘটেছে। রেমো জনার্দনকে ফল-বাতাসা দিয়েছে, জল দেয় নি।"

চড়াৎ করে সমস্ত শরীরের রক্ত মাথায় গিয়ে উঠল জয়কালীর। "অ্যাঁ" করে একটা আর্তনাদ-ধ্বনি তুললেন তিনি।

পিসী একটা হতাশ নিশ্বাস ফেলে সেই সুরেই সুর মিলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ! জানি না, এখন কার কি অদৃষ্টে আছে। ফুল তুলসীর ভুল নয়, একেবারে তেষ্টার জল।"

সহসা জয়কালী পায়ের খড়মটা খুলে হাতে নিয়ে চিৎকার করে উঠলেন "রেমো! রেমো।"

চিৎকারে রামকালী প্রথমটায় বিশেষ আশঙ্কিত হয়নি, কারণ পুত্র-পরিজনদের প্রতি স্নেহ-সম্ভাষণও জয়কালীর এর চাইতে খুব বেশী নিম্নগ্রামের নয়। অতএব সে বেলের আঠার হাতটা মাথায় মুছতে মুছতে পিতৃসকাশে এসে দাঁড়াল।

কিন্তু এ কী! জয়কালীর হাতে খড়ম!

রামকালীর চোখের সামনে কতকগুলো হলুদ রঙের ফুল ভিড় করে দাঁড়াল।

"ভগবানকে স্মরণ কর রেমো," জয়কালী ভীষণ মুখে বললেন, "তোর কপালে আজ মৃত্যু আছে।"

রামকালীর চোখের সামনে থেকে হলুদ রঙের ফুলগুলোও লুপ্ত হয়ে গেল, রইল শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার! সেই অন্ধকার হাতড়ে একবার খুঁজতে চেষ্টা করল রামকালী, কোন্ অপরাধে বিধাতা আজ তার কপালে মৃত্যুদণ্ড লিখেছেন। খুঁজে পেল না, খোঁজবার সামর্থ্যও রইল না। সেই অন্ধকারটা ক্রমশঃ রামকালীর চৈতন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

"জনার্দনের ঘরে আজ পুজো করেছিলি তুই না?"

রামকালী নীরব।

পুজোর ঘরেই তা হলে কোন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু কই? কি? যথারীতি হাত পা ধুয়ে তার পৈতের পাওয়া চেলির জোড়টা পরেই তো ঘরে ঢুকেছিল রামকালী। তারপর? আসন! তারপর? আচমন! তারপর? আরতি! তারপর—ঠাঁই করে

মাথায় একটা ধাক্কা লাগল।

"জল দিয়েছিলি ভোগের সময়?"

এই প্রশ্নটি পুত্রকে করছেন জয়কালী খড়মের মাধ্যমে।

দিশেহারা রামকালী আরও দু-দশটা ধাক্কার ভয়ে বলে বসল—"হ্যাঁ। দিয়েছি তো।"

"দিয়েছিলি? জল দিয়েছিলি?" জয়কালীর পিসী যশোদা একেবারে নামের বিপরীত ভঙ্গীতে বলে উঠলেন, "দিয়েছিলি তো সে জল গেল কোথায় রে হতভাগা? গেলাস একেবারে শুকনো!"

প্রশ্নকর্ত্রী ঠাকুমা।

বুকের গুরুগুরু ভাবটা কিঞ্চিৎ হালকা মনে হল, রামকালী ক্ষীণ স্বরে বলে বসল, "ঠাকুর খেয়ে নিয়েছে বোধ হয়।"

"কী? কী বললি?" আর একবার ঠক করে একটা শব্দ, আর চোখে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার আরও গভীরতম অনুভূতি।

"লক্ষ্মীছাড়া, শুয়োর, বন্‌বরা। ঠাকুর জল খেয়ে নিয়েছে? শুধু ভূত হও নি তুমি, শয়তানও হয়েছ। ভয় নেই প্রাণে তোমার? ঠাকুরের নামে মিছে কথা?"

অর্থাৎ মিথ্যা কথাটা যত না অপরাধ হোক, ঠাকুরের নামের সঙ্গে জড়িত হয়ে ভীষণ অপরাধে পরিণত হয়েছে। রামকালী ভয়ের বশে আবারও মিছে কথা বলে বসে, "হ্যাঁ, সত্যি বলছি! ঠাকুরের নামে দিব্যি। দিয়েছিলাম জল।"

"বটে রে হারামজাদা! বামুনের ঘরের চাঁড়াল! ঠাকুরের নামে দিব্যি? জল দিয়েছিস তুই? ঠাকুর খেয়ে ফেলেছে? ঠাকুর খায় জল?"

মাথার মধ্যে জ্বলছে!

রামকালী মাথার জ্বালায় অস্থির হয়ে সমস্ত ভয়-ডর ভুলে বলে বসল, "খায় না জানো তো দাও কেন?"

"ও, আবার মুখে মুখে চোপা!" জয়কালী আর এক বার শেষবেশ খড়মটার সদ্ব্যবহার করলেন। করে বললেন, "যা দূর হ, বামুনের ঘরের গরু! দূর হয়ে যা আমার সমুখ থেকে।"

এই!

এর বেশী আর কিছুই করেন নি জয়কালী। আর এরকম ব্যবহার তো তিনি সর্বদাই সকলের সঙ্গে করে থাকেন। কিন্তু কিসে যে কি হয়!

রামকালীর চোখের সামনে থেকে যেন একটা পর্দা খসে গেল।

চিরদিন জেনে আসছে জনার্দন বেশ একটি দয়ালু ব্যক্তি, কারণ কারণে-অকারণে উঠতে-বসতে বাড়ির সকলেই বলে 'জনার্দন, দয়া করো।' কিন্তু কোথায় সেই দয়ার কণিকামাত্র?

রামকালী যে মনে মনে প্রাণ ফাটিয়ে চীৎকার করে প্রার্থনা করল, "ঠাকুর, এই

অবিশ্বাসীদের সামনে একবার নিজমূর্তি প্রকাশ করো, একবার অলক্ষ্য থেকে দৈববাণী করো, "ওরে জয়কালী, বৃথা ওকে উৎপীড়ন করছিস। জল আমি সত্যিই খেয়ে ফেলেছি। এক মুঠো বাতাসা খেয়ে ফেলে বড্ড তেষ্টা পেয়ে গিয়েছিল!"

নাঃ। দৈববাণীর ছায়ামাত্র নেই।

সেই মুহূর্তে আবিষ্কার করল রামকালী, ঠাকুর মিথ্যে, দেবতা মিথ্যে, পুজো পাঠ প্রার্থনা—সবই মিথ্যে, অমোঘ সত্য শুধু খড়ম।

পৈতের সময় তারও একজোড়া খড়ম হয়েছে। তার উপযুক্ত ব্যবহার কবে করতে পারবে রামকালী কে জানে।

অথচ এই দণ্ডে সমস্ত পৃথিবীর উপরই সেই ব্যবহারটা করতে ইচ্ছে করছে।

"পৃথিবীতে আর থাকব না আমি!"

প্রথমে সংকল্প করল রামকালী।

তার পর ক্রমশঃ পৃথিবীটা ছেড়ে চলে যাবার কোন উপায় আবিষ্কার করতে না পেরে মনের সঙ্গে রফা করল।

পৃথিবীটা আপাততঃ হাতে থাক্, ওটা তো যখন ইচ্ছেই ছাড়া যাবে। ছাড়বার মত আরও একটা জিনিস রয়েছে, পৃথিবীরই প্রতীক যেটা।

বাড়ি!

বাড়িই ছাড়বে রামকালী।

জন্মে আর কখনও জনার্দনের পুজো যাতে না করতে হয়।

তখনও 'নাড়ি-টেপার বাড়ি' নাম হয় নি, আদি ও অকৃত্রিম 'চাটুয্যেবাড়ি'ই ছিল। সকলের শ্রদ্ধা-সমীহেরও আধার ছিল। কাজেই বেশ কিছুদিন গ্রামে সাড়া পড়ে রইল, চাটুয্যেদের ছেলে হারিয়ে যাওয়া নিয়ে।

গ্রামের সমস্ত পুকুরে জাল ফেলা হল। গ্রামের সকল দেবদেবীর কাছে মানসিক মানা হল। রামকালীর মা রোজ নিয়ম করে ছেলের নামে ঘাটে প্রদীপ ভাসাতে লাগল, জয়কালী নিয়ম করে জনার্দনের ঘরে তুলসী চড়াতে লাগলেন, কিন্তু কিছুই হল না।

ক্রমশঃ সকলে প্রায় যখন ভুলেই গেল চাটুয্যেদের রামকালী বলে একটা ছেলে ছিল, তখন গ্রামের কোন একটি যুবক একদিন ঘোষণা করল, 'রামকালী আছে।' সে মুকশুদাবাদে গিয়েছিল, সেখানে নিজের চোখে দেখে এসেছে রামকালী নবাব-বাড়ির কবরেজ গোবিন্দ গুপ্তর বাড়িতে রয়েছে, তার সাকরেদি করে কবরেজি শিখছে।

শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন জয়কালী। ছেলের বেঁচে থাকার খবর, আর ছেলের জাত যাওয়ার খবর, যুগপৎ উল্টোপাল্টা দুটো খবরে তিনি ভুলে গেলেন, আনন্দে হৈহৈকার করতে হবে, কি শোকে হাহাকার করতে হবে!

ছেলে বদ্যিবাড়ির ভাত খাচ্ছে, বদ্যিবাড়ির আশ্রয় গ্রহণ করেছে, এ তো মৃত্যু-সংবাদেরই সামিল।

অথচ রামকালী এযাবৎ মরে নি, একথা জেনে প্রাণের মধ্যে কী যেন ঠেলে ঠেলে উঠছে। কী সে? আনন্দ? আবেগ? অনুতাপের যন্ত্রণামুক্তির সুখ?

গ্রামের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন জয়কালী। অবশেষে রায় বেরোল, জয়কালীর নিজের এক বার যাওয়া দরকার। সরেজমিনে তদন্ত করে দেখে আসুন প্রকৃত অবস্থাটা কি। তা ছাড়া—সে লোক প্রকৃতই রামকালী কি না—তাই বা কে জানে! যে দেখেছে সে তো নিকট আত্মীয় নয়, চোখের ভ্রম হতে কতক্ষণ?

কিন্তু পরামর্শ শুনে জয়কালী আকাশ থেকে পড়লেন, "আমি যাব? আমি কি করে যাব? জনার্দনের সেবা ফেলে আমার কি নড়বার জো আছে?"

রামকালীর মা, জয়কালীর দ্বিতীয় পক্ষ দীনতারিণী শুনে কেঁদে ভাসাল। মুখে এসেছিল বলে, "জনার্দনই তোমার এত বড় হল?"

বলতে পারল না সাহস করে, শুধু চোখের জল ফেলতে লাগল।

অবশেষে অনেক পরিকল্পনান্তে স্থির হল, জয়কালীর এক ভাগ্নে যাবে, বয়স্থ ভাগ্নে। তার সঙ্গে জয়কালীর প্রথম পক্ষের বড় ছেলে কুঞ্জকালী যাবে।

কিন্তু এই গণ্ডগ্রাম থেকে মুকশুদাবাদে যাওয়া তো সোজা নয়। গরুর গাড়ি করে গঙ্গায় গিয়ে খোঁজ নিতে হবে কবে নৌকা যাবে মুকশুদাবাদে। তার পর আবার চাল চিঁড়ে বেঁধে নিয়ে গরুর গাড়িতে তিন ক্রোশ রাস্তা ভেঙে নৌকোর কিনারে গিয়ে ধর্না পাড়া।

খরচও কম নয়।

জয়কালী ভাবলেন, খরচের খাতায় বসানো সংখ্যা আবার জমার খাতায় বসাতে গেলে ঝঞ্ঝাট বড় কম নয়। এত ঝঞ্ঝাটের দরকারই বা কি ছিল? রাগ হল সেই ফাজিল ছোকরাটার ওপর, যে এসে খবর দিয়েছে। যে এত ঝঞ্ঝাট বাধানোর নায়ক।

রামকালী তো খরচ হয়েই গিয়েছিল। ওই ফাজিলটা এসে খবর না দিলে আর—

কিন্তু দরকার ছিল রামকালীর মার দিক থেকে, তাই সব ঝঞ্ঝাট পুইয়ে ভাগ্নেকে আর ছেলেকে পাঠালেন জয়কালী। আর কদ্দিন পরে তারা এসে জানাল, খবর ঠিক। রামকালী নিঃসন্তান গোবিন্দ বদ্যির পুষ্যি হয়ে রাজার হালে আছে, এর পর নাকি পাটনা যাবে। এদের কাছে বলেছে একেবারে রাজবদ্যি হয়ে, টাকার মোট নিয়ে দেশে যাবে, তার আগে নয়।

শুনে যাদের বেশী ঈর্ষা হল, তারা বলল "এমন কুলাঙ্গার ছেলের মুখদর্শন করতে নেই। তা ছাড়া, ও তো জাতিচ্যুত।"

যাদের একটু কম ঈর্ষা হল, তারা বলল, "তবু বলতে হবে উদ্যোগী পুরুষ! আর

জাতিচ্যুতই বা হবে কেন ? কুঞ্জ তো বলছে নাকি জেনে এসেছে গোবিন্দ গুপ্ত রামকালী চাটুয্যের জন্যে কোন এক বামুনবাড়িতে ভাতের ব্যবস্থা করে রেখেছে !"

গ্রামে আবার কিছুদিন এই নিয়ে খুব আলোচনা চলল এবং যখন এ সব আলোচনা ঝিমিয়ে গিয়ে ক্রমশঃ আবার সবাই রামকালীর নাম ভুলতে বসল, তখন একদিন রামকালী সশরীরে এসে হাজির হল টাকার বস্তা নিয়ে !

গোবিন্দ গুপ্ত পরামর্শ দিয়েছেন, "তোমার আর রাজবদ্যি হয়ে কাজ নেই বাপু, রাজ্যে এখন ভেতরে ভেতরে ঘুণ ধরতে বসেছে, নবাবের নবাবী তো শিকেয় উঠেছে। আমার এই দীর্ঘকালের সঞ্চিত অর্থরাশি নিয়ে দেশে পালিয়ে গিয়ে নিজে নবাবি করো গে ! আমরা স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে কাশীবাসে মনঃস্থির করেছি।"

অগত্যা চলে এসেছে রামকালী।

গঞ্জের ঘাট থেকে নিজের পাল্‌কি করে।

গোবিন্দ গুপ্তর পাল্‌কিটাও পেয়েছে রামকালী, নৌকোয় চাপিয়ে নিয়ে এসেছে।

কিন্তু তখন জয়কালী মারা গেছেন এই এক মস্ত আপসোস।

বাবাকে একবার দেখাতে পারল না রামকালী, সেই তাড়িয়ে দেওয়া ছেলেটা মানুষ হয়ে ফিরল।

দুই

গঞ্জের মেলায় যেমন লোকে দল বেঁধে 'পাঁচপেয়ে গরু' দেখতে ছোটে, তেমনি করে দেশের সমস্ত লোক আসতে লাগল রামকালীকে দেখতে। রামকালী মনে মনে বিব্রত হলেও সকলকে যথোচিত মান্য করল, এবং বয়োজ্যেষ্ঠ সকলকে একজোড়া করে ধুতি ও নগদ দু টাকা দিয়ে প্রণাম করল।

ঘরে ঘরে সবাই বলাবলি করতে লাগল, 'উঃ, কী উঁচু নজরটাই হয়ে এসেছে !' অনেকে নিজের নিজের চিরদিন-বাড়ি-বসে-থাকা ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলল !

তবু কিছুদিন একটু জাতে-ঠেলা জাতে-ঠেলা হয়ে থাকতে হয়েছিল বৈ কি রামকালীকে ! বারবাড়িতে শুত খেত, বাড়ির ছোট ছেলেপুলে দৈবাৎ কেউ রামকালীকে ছুঁয়ে ফেললে তাকে কাপড় ছাড়ানো হত। কিন্তু রামকালীই একদিন গ্রামকর্তাদের ডেকে সালিশ মানল।

এটা কেন হবে ?

একটি দিনের জন্যে সে বৈদ্যের অন্ন গ্রহণ করে নি, এক দিনের জন্য কোন অনাচার করে নি ! শুধু শুধু পতিত হয়ে থাকতে হবে কেন তাকে ?

গ্রামকর্তারা মাথা চুলকে হেঁ হেঁ করতে লাগলেন, স্পষ্ট কিছু বলতে পারলেন না। কারণ ছোঁড়াটা নাকি রাজবদ্যি গোবিন্দ গুপ্তর সমস্ত বিদ্যে আর সমস্ত টাকা হাতিয়ে নিয়ে এসেছে!

তা ছাড়া ছোঁড়ার হাতটাও দরাজ।

শোনা যাচ্ছে শীগগিরই পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠা করবে।

কর্তাদের হেঁ হেঁ করার অবসরে রামকালী নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করল, "দেখুন আমার গুরুর ওষুধ ডেকে কথা কয়। আমি তাঁর কিছু কিঞ্চিৎ আশীর্বাদও তো পেয়েছি? সে বিদ্যে, আমার জন্মভূমির, আমার পাড়াপড়শীর; আমার জ্ঞাতিগোত্তরের কাজে লাগুক এই আমি চাই। তবে যদি আপনারা তা না চান, তা হলে আবার আমাকে গ্রামের বাস উঠিয়ে চলে যেতে হবে।"

এবার গ্রামকর্তারা হাঁ হাঁ করে উঠলেন। সত্যিই তো, কথাটা তো উড়িয়ে দেবার নয়! সকলেরই একদিন না একদিন 'নিদেনকাল' আছে।

ওদের 'হাঁ-হাঁ'র অবসরে রামকালী বললে, "এই যে একটি পুকুর কাটাবার ইচ্ছে হয়েছে, সেই উপলক্ষ্যে একদিন 'গ্রাম-ভোজন' দেব আশা করে বসে আছি, সে আশা তা হ'লে পূরণ হবে না?"

এঁরা এবার দ্বিধাশূন্য হয়ে 'সে কি? সে কি?' করে উঠলেন।

আর ইত্যবসরে ফেলু বাঁড়ুয্যে এক চাল চেলে বসলেন। কি এক সংস্কৃত শ্লোক আউড়ে বললেন হেসে হেসে, "জানো তো, উপযুক্ত বয়সে বিবাহ-সংস্কার না হলে কন্যা যেমন অরক্ষণীয়া হয়, পুরুষও তেমনি পতিত হয়।"

রামকালী মাথা নীচু করে বলল, "বয়স প্রায় ত্রিশ পার হতে চলল, এ বয়সে কে আমাকে কন্যাদান করবে?"

ফেলু বাঁড়ুয্যে বীরদর্পে বলে উঠলেন, "আমি করব! এতে আমার ভায়ারা আমাকে জাতে ঠেলেন তো ঠেলুন।"

ফেলু বাঁড়ুয্যেকে জাতে ঠেলা!

জাতের যিনি মাথা!

'হাঁ-হাঁ'র স্রোত বইতে লাগল সভায়।

আর ফেলুর চালাকি দেখে মনে মনে সবাই নিজেদের গালে মুখে চড়াতে লাগল। মেয়ে আর কার ঘরে নেই?

এরই কিছুদিন পরে ফেলু বাঁড়ুয্যের ন বছরের মেয়ে 'ভুবি' বা ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল রামকালীর।

বহুদিন এত ঘটার বিয়ে হয় নি গ্রামে।

কারণ রামকালী নাকি নিজে পাঁচ-পাঁচ শ টাকা লুকিয়ে ওর মা দীনতারিণীর হাতে

গুঁজে দিয়েছিল ঘটা করতে।

এই বেহায়ামিটা যথেষ্ট নিন্দনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘটায় 'মাছ ধোওয়া'গুলো অনিন্দনীয় ছিল।

অতএব রামকালী পুনশ্চ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুমতি পেল বাড়ির মধ্যে গিয়ে খাবার শোবার।

যাক, তার পরও তো কাটল কতকাল।

সেই 'ভুবি' বড় হল, ঘর-বসত হল, পনেরো ষোলো বছরের 'ভরা-নদী' হল। তার পর তো সত্যবতী ?

বুড়ো বয়সের প্রথম সন্তান বলেই হয়তো বাপের কাছে কিছু প্রশ্রয় আছে সত্যবতীর।

তিন

দীনতারিণী নিরামিষ ঘরে রান্না করছিলেন, সত্যবতী দাওয়ার নিচেয় 'ছাঁচতলা'য় এসে দাঁড়াল। উঁচু পোতার ঘর। দাওয়ার কিনারাটা সত্যবতীর নাকের কাছাকাছি, পায়ের বুড়ো আঙুলের ওপর সমস্ত দেহভারটা দিয়ে ডিঙি মেরে গলা বাড়িয়ে সত্যবতী তার স্বভাবসিদ্ধ মাজাগলায় ডাক দিল, "অ ঠাকুমা, ঠাকুমা !"

নিরিমিষ হেঁসেলের দাওয়ায় ওঠবার অধিকার সত্যবতীর কেন, বাড়ির কারোরই নেই, কেবলমাত্র যাঁরা নিরামিষে অধিকারী তাঁদেরই আছে! মেটে দাওয়ার একপেশে কোণটা থেকে খাঁজ কেটে কেটে সিঁড়ি বানানো হয়েছে, আর সে সিঁড়ি থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া পথ হয়েছে একেবারে 'ঘাট' বরাবর। দীনতারিণী, দীনতারিণীর সেজ জা শিবজায়া, দীনতারিণীর দুই ননদ কাশীশ্বরী আর মোক্ষদা, মাত্র এঁরাই এই পথে পদক্ষেপের অধিকারিণী। ঘড়া নিয়ে ঘাটে যান, এবং স্নান সেরে ঘড়া ভরে ভিজে কাপড়ে পায়ে পায়ে এসে একেবারে ওই সিঁড়ি কটি দিয়ে স্বর্গে উঠে পড়েন। ওই রান্নাঘরের দেওয়ালেই তাঁদের কাচাকাপড় শুকোয়, কারণ রাত্রে তো আর এ ঘরে রান্নার পাট নেই। ঘর নিকোনোর কাজেও কিছু আর অচ্ছুৎরা কেউ এসে ঢুকবে না। সে কাজ মোক্ষদার। এঁটোসকড়ির ব্যাপারে মোক্ষদা বোধ করি স্বয়ং ভগবানকেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেন না। কাজেই সেকাজ নিজের হাতে রাখেন। তা ছাড়া মোক্ষদাই বয়সে সবচেয়ে ছোট, অন্যান্যরা সকলেই তাঁর গুরুজন, অতএব সকলের খাওয়ার শেষে তাঁরই 'ডিউটি'।

রান্নার দায়িত্ব দীনতারিণীর, মোক্ষদার উপর সে রান্নার বিশুদ্ধতা রক্ষার দায়িত্ব। বাকী দু'জন 'যোগাড়ে'। তা অবিশ্যি যোগাড়ের কাজটাও কম না। প্রয়োজনটা চার জনের হলেও আয়োজনটা অন্ততঃ দশ জনের মত হয়।

কিন্তু ওসব কথা থাক।

আসলে ছেলেপুলের এ উঠোনে পা দেবারও হুকুম নেই, কিন্তু সত্যবতীকে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। ও যখন-তখন এই দাওয়ার নিচে থেকে নাক বাড়িয়ে হাঁক পাড়ে, "অ ঠাকুমা!", অথবা "অ পিসঠাকুমা।"

দীনতারিণী ওর গলা পেয়েই নিজের গলাটা বাড়িয়ে দরজা দিয়ে উঁকি মেরে বলেন, "এই মলো যা, এ ছুঁড়ি কী দস্যি গো! আবার এসেছিস? বেরো বেরো, ছোট ঠাকুরঝি দেখতে পেলে আর রক্ষে রাখবে না।"

সত্যবতী ঠোঁট উল্টে বলে, "ছোট ঠাকুমার কথা বাদ দাও। তুমি শোন না একটু।"

সত্যবতী দীনতারিণীর 'উপায়ী' ছেলের মেয়ে। তা'ছাড়া সত্যর বিয়ে হয়ে গেছে, কাজেই খুব 'দুর-ছাইটা' ওর কপালে জোটে না। তাই ওর আবদারে অগত্যাই দীনতারিণী একটু ডিঙি মেরে দাওয়ায় এসে দাঁড়ালেন। ইশারায় বললেন, "কি চাই?"

সত্যবতী পিঠের দিকে গোটানো হাতটা ঘুরিয়ে একখানা ছোট মাপের কচি মানপাতা মেলে ধরে চুপিচুপি বলে, "একটা জিনিস দাও না।"

"এই মরেছে, এখন আবার জিনিস কিরে? এখন কি কিছু রান্না হয়েছে? আর হলেও তোর সেজঠাকুমার 'গোপালে'র ভোগের আগ্ আগে দিয়েছি, টের পেলে কুলুক্ষেত্তর করবে না?"

"আগ্ চাই নি, আগ্ চাই নি, ভাল মন্দ রেঁধে নিজেরাই খেয়ো বাবা, আমাকে এক মুঠো পান্তাভাত দাও দিকি।"

"পান্তাভাত!"

দীনতারিণী আকাশ থেকে পড়লেন। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন পাতাল ফুঁড়ে উঠলেন মোক্ষদা। পরনে সপসপে ভিজে থান, কাঁখে ভরন্ত কলসী।

এইটা বোধকরি মোক্ষদার তৃতীয় দফা স্নান।

যে কোন কারণেই হোক, চাল ধুতে কি শাক ধুতে ঘাটে গেলেই মোক্ষদা একবার সবস্ত্র স্নান সেরে নেন। দাওয়ার পৈঠে দিয়ে কখন যে উঠে এসেছেন, ঠাকুমা নাতনী কারো চোখে পড়ে নি, চোখ পড়লো একেবারে সশরীরিণীর উপর।

দীনতারিণী অপ্রতিভের একশেষ, সত্যব্রতী বিরক্ত।

আর মোক্ষদা?

তিনি হাতেনাতে চোর ধরে ফেলা ডিটেকটিভের মতই উল্লসিত।

"আবার তুই এখেনে?" খনখনে গলায় প্রশ্ন করেন মোক্ষদা।

সত্যবতী ঈষৎ আমতা আমতা করে বলে, "বাঃ রে, আমি কি তোমাদের দাওয়ায় উঠেছি?"

"দাওয়ায় উঠিস নি, বলি ছত্রিশ জাতের রাস্তা মাড়িয়ে এসে সেই পায়ে ওই উঠোনে তো পা দিয়েছিস? তুলসী গাছে জল দিতে উঠোনে নামতে হবে না আমাদের?"

সত্যবতী গোঁজ গোঁজ করে বলে, "নাববার সময় তো দশঘড়া জল না ঢেলে নাবো না, তবে আবার অত কি ?"

"মুখে মুখে চোপা করিসনে সত্য, অব্যেস ভাল কয়," মোক্ষদা ঘড়াটাকে ছুম্ করে চৌকাঠের ওপিঠে বসিয়ে আঁচল নিংড়ে নিংড়ে পায়ের কাদা ধুতে ধুতে বলেন, "বাপের সোহাগে সোহাগে যে একেবারে ধিঙ্গী পদ পেয়ে বসে আছিস, বলি শ্বশুরঘর করতে হবে না ? পরের বাড়ি যেতে হবে না ? আর ক'দিন ধিঙ্গী নাচ নেচে বেড়াবি ? মেরে কেটে আর ছুটো-চারটে বছর, তা'পর গলায় রশুড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে না ? তখন করবি কি ?"

প্রতিকথায় এই 'পরের ঘরে' যাওয়ার বিভীষিকা দেখিয়ে দেখিয়ে জব্দ করার চেষ্টাটা দু-চক্ষের বিষ সত্যবতীর। বরং তাকে ওরা ধরে দু ঘা মারুক, সহ্য হবে। কিন্তু ওই পরের ঘরের খোঁটা সয় না। অথচ ওইটিই যেন এদের প্রধান ব্রহ্মাস্ত্র। সত্যবতী তাই বিরক্তভাবে বলে, "করবো আবার কি !"

"কি আর করবি ? উঠতে বসতে শাউড়ীর ঠোনা খাবি। ওই পটলা ঘোষালের ভাইপো-বৌটার মতন ঠোনা খেতে খেতে গালে কালসিটে পড়ে যাবে।"

সত্যবতী বয়েস-ছাড়া ভঙ্গীতে ঝঙ্কার দিয়ে বলে ওঠে, "ছিষ্টি সংসারের লোক তো আর পটলকাকার ভেজের মতন দজ্জাল নয় !"

"ওমা ওমা, শোন কথা মেয়ের", মোক্ষদা হস্তেলের রং নিটোল টাইট হাত দু'খানা নেড়ে বললে, "তা বলবি বৈকি। বো'র দোষ হলো না, দোষ হলো শাউড়ীর ! অবাধ্য চোপাবাজ বৌকে কি করবে শুনি ? টাটে বসিয়ে ফুল-চন্নন দিয়ে পুজো করবে ?"

"আহা, পুজো করা ছাড়া আর কথা নেই যেন। একটু ভাল চোখে চাইতে পারে না ? দুটো মিষ্টি কথা বলতে পারে না ?"

"ও মাগো।" মোক্ষদা খনখনে গলায় হেসে উঠে বলেন, "ভেতরে ভেতরে মেয়ে পাকার ধাড়ি হয়েছেন ! দেখবো লো দেখবো তোর শাউড়ী কি মধু ঢালা কথা কইবে ! কত সোনার চক্ষে দেখবে !···সে যাক, বলি পান্তাভাতের কথা কি বলছিলি ?"

এতক্ষণ চুপ ছিলেন, এবারে দীনতারিণী হাসেন।

হেসে ফেলে বলেন, "ও আমার কাছে এসেছে পান্তাভাত চাইতে।"

"পান্তাভাত চাইতে এসেছে।" মোক্ষদা সহসা যেন ফেটে পড়েন, "আমাদের হেঁসেলে পান্তো চাইছে, আর তুমি সেই শুনে গা পাতলা করে হাসছ নতুন মেজবৌ ? আর কত আহ্লাদ দেবে নাতনীকে ? পরকাল যে ঝরঝরে হয়ে যাচ্ছে। বলি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে যদি বিধবার হেঁসেল থেকে দুটো পান্তো চেয়ে বসে, তারা বলবে কি ? একথা ভাববে না যে, আমরা বুঝি গপ্‌ গপ্‌ করে বাসিহাঁড়ির ভাতগুলো গিলি ? বলো বলবে কি না !"

"তাই কখনো কেউ বলে ছোটঠাকুরঝি ?" দীনতারিণী কথাটা হাল্কা করতে একটু কাষ্ঠ হাসি হেসে বলেন, "ছেলে-বুদ্ধি অজ্ঞানে কী না বলে !"

"ছেলে-বুদ্ধি! ও মা লো! সোয়ামীর ঘর করতে পাঠালে ও এখন ছেলের মা হতে পারে, বুঝলে নতুন মেজবৌ!" মোক্ষদা কাঁধ থেকে গামছাখানা নিয়ে জোরে জোরে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, "মেয়ের বাক্যি-বুলি শোন না তো কান দিয়ে! সোহাগেই অন্ধ। এই তোকে সাবধান করে দিচ্ছি সত্য, খবরদার পাঁচজনের সামনে এমনি বেফাঁস কথা বলে বসবি না। পাড়াপড়শী উহুনমুখীরা তো মজা দেখতেই আছে, এমন কথাটা শুনলে ঠিক বলবে আমরা বাসি হাঁড়িতে খাই।"

হঠাৎ হি-হি করে হেসে ওঠে সত্যবতী, হেসে বলে, "লোকে বললেই বা! বললে কি তোমার গায়ে ফোস্কা পড়বে?"

মোক্ষদা নেহাৎ মেয়েটাকে ছুঁতে পারবেন না, তাই নিজের গালেই একটা চড় মেরে বলেন, "শুনলে? শুনলে নতুন মেজবৌ, তোমার নাতনীর আসপদ্দার কথা! বলে কি না 'লোকে বললেই বা!' ডাক্ শাস্তরের কথা, 'যাকে বললো ছি, তার রইলো কি?' আর বলে কি না—"

সেরেছে!

দীনতারিণী ভাবেন মোক্ষদা একবার মুখ ধরলে তো আর রক্ষে নেই! দুর্দান্ত স্বাস্থ্য মোক্ষদার, দুরন্ত ক্ষিদে-তেষ্টা, সেই খিদে-তেষ্টা চেপে রেখে তিন পহর বেলায় জল খায়, বেলা গড়িয়ে অপরাহ্ণ বেলায় ভাত, সকালের দিকে শরীরের মধ্যে ওর খাঁ খাঁ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। তাই কথার চোটে থরহরি করে ছাড়ে সবাইকে।

প্রসঙ্গটা তাই তাড়াতাড়ি পরিবর্তন করেন দীনতারিণী, "হ্যা লা সত্য, সকাল বেলা জলপান খাস নি? অসময়ে এখন পান্তাভাতের খোঁজ?"

"আহা কী বুদ্ধির ছিরি!" সত্য ঝেঁজে ওঠে, "আমিই যেন খাবো। কেঁচো আর পান্তাভাত দিয়ে টোপ্ ফেলবো।"

"কী করবি?" দীনতারিণীর আগেই মোক্ষদা দুই চোখ কপালে তোলেন, "কী করবি?"

"টোপ ফেলবো, টোপ। মাছের টোপ। পেয়েছ শুনতে? নেড়ু আমায় কঞ্চি চেঁচে খু—ব ভাল্যে একটা ছিপ্ করে দিয়েছে, খিড়কির পুকুরে মাছ ধরবো।"

"সত্য!" মোক্ষদা যেন ছিটপিটিয়ে ওঠেন, "ছিপ ফেলে মাছ ধরবি তুই? খুব নয় বাপসোহাগী আছিস, তাই বলে কি সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? মেয়েমানুষ ছিপ ফেলে মাছ ধরবি?"

সত্য ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা ঝাঁকিয়ে বলে, "আহা! ছোটঠাকুরমার কী বাক্যির ছিরি! মেয়েমানুষ মাছ ধরে না? রাঙা খুড়িমারা ধরে না? ও বাড়ীর পিসিরা ধরে না?"

"আ মরণ মুখপোড়া মেয়ে! ওরা ছিপ ফেলে মাছ ধরে? ওরা তো গামছা ছাঁকা দিয়ে চুনোপুঁটি তোলে।"

"তাতে কি!" সত্য হাতের মানপাতাখানা দাওয়ার গায়ে আছড়াতে আছড়াতে বলে,

"গামছা দিয়ে ধরলে দোষ হয় না, ছিপ দিয়ে ধরলেই দোষ ? চুনোপুটি ধরলে দোষ হয় না, বড় মাছ ধরলেই দোষ ? তোমাদের এসব দোষের শাস্তর কে লিখেছে গা !"

"সত্য !" দীনতারিণী কড়াস্বরে বলেন, "এক ফোঁটা মেয়ে অত বাক্যি কেন লা ? ঠিকই বলেছে ছোট্ ঠাকুরঝি, পরের ঘরে গিয়ে হাড়ির হাল হবে এর পর।"

"বাবা ! বাবা ! ছুটো পান্তো চাইতে এসে কী খোয়ার ! যাচ্ছি আমি আঁশ হেঁসেলের ওদের কাছে। যাবো কি ! সেখানে তো আবার বড় জেঠি ! গুলি ভাঁটার মতন চাউনি। খেঁদিদের বাড়ি থেকে নিলেই হত তার চেয়ে।"

"কী বললি। খেঁদিদের বাড়ি থেকে ভাত। কায়েত-বাড়ির ভাত নিয়ে ঘাঁটবি তুই ?"

"ঘেঁটেছি নাকি ? বাবাঃ বাবাঃ! ফি হাত তোমাদের খালি দোষ, আর দোষ। আচ্ছা, যাচ্ছি আমি ও হেঁসেলেই। কিন্তু যখন ইয়াবড় মাছ ধরবো, তখন দেখো।"

বলে সত্য আছড়ানোর চোটে চিরে চিরে যাওয়া মানপাতাটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায় দাওয়ার কোণ-বরাবর ধরে ও মহলে।

সেখানে বিরাট এক কর্মযজ্ঞের কাণ্ড চলছে অহরহ। দিনে দু বেলায় দুশো আড়াইশো পাত পড়ে।

সেখানেও এমনিই উঁচু পোতার রান্নাঘর, তবে দাওয়ায় উঠতে তেমন বাধা নেই। বেপরোয়া উঠে গেল সত্য। আর এদিক ওদিক তাকিয়ে দাওয়ার কোণ থেকে একখানা খালি নারকেলের মালা কুড়িয়ে নিয়ে রন্ধনশালার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে সাহসে ভর করে ডাকল, "বড় জ্যেঠি।"

চার

সারাদিন গুমোটের পর হঠাৎ এক চিলতে ঠাণ্ডা হাওয়া উঠল। গা জুড়িয়ে এল, কিন্তু প্রাণে জাগছে আতঙ্ক। সময়টা খারাপ, চৈত্রের শেষ। ঈশানকোণে মেঘ জমেছে, তার কালো ছায়া আধখানা আকাশকে যেন ঘোমটা পরিয়ে দিল। যেন একটা দুরন্ত দৈত্য হঠাৎ পৃথিবীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার আগের মুহূর্তে পাঁয়তাড়া কষছে।

মাঠে ঘাটে পথে পুকুরে যে যেখানে বাইরে ছিল, তারা ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে হাতের কাজ চটপট সারতে শুরু করল।

আর বাতাসে বাতাসে তরঙ্গ তুলে গ্রামের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছড়িয়ে পড়ল একটানা একটা সানুনাসিক স্বরের ধুয়ো। সে স্বর ধাপে ধাপে চড়ছে, মাঝে মাঝে খাদে নামছে। তার ভাবটা এই—"বুধী আঁ—য় ! সুন্দরী আঁ—য় ! মুংলী আঁ—য়। নন্দী আঁ—য়।"

ঝড়ের আশঙ্কায় গৃহপালিত অবোলা জীবগুলিকে গোচারণ ভূমি থেকে গোহালে ফেরবার আহ্বান জানানো হচ্ছে।

সত্যবতী জানে না ঝড়ের আগের মুহূর্তে কিংবা সন্ধ্যার আগে গরুগুলোকে যখন ডাক দেওয়া হয়, অমন নাকি নাকি সুরে ডাকা হয় কেন। ও জানে এই নিয়ম। অবিশ্যি যারা ডাকে, তারা নিজেরাই বা আট বছরের সত্যবতীর চাইতে বেশী কী জানে? তারাও জ্ঞানাবধি দেখে আসছে গরুকে সাঁঝ-সন্ধ্যায় ঘরে ফিরিয়ে আনবার সময় আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যে আহ্বানটা জানানো হয়, সেটার স্বর সানুনাসিক। কে জানে কোনকালে কোন 'বরপ্রাপ্ত' গরু মানুষের ভাষা শিখে ফেলে, মানুষের কাছে তার পছন্দ-অপছন্দর নমুনাটা জানিয়েছে কিনা। বলেছে কিনা "এই সানুনাসিক স্বরটাই আমার রুচিকর।"

আপাততঃ দেখা যাচ্ছে ওই অবোলা জীবগুলি এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত থেকে ধুয়োতে সচকিত হয়ে দ্রুতগতিতে গোহালমুখী হচ্ছে। তারাও গলা তুলে আকাশটাকে দেখে নিচ্ছে একবার একবার।

সত্যবতী একটা সংবাদ বহন করে দ্রুতগতিতে বাঁড়ুয্যে-পাড়া থেকে বাড়ির দিকে আসছিল, তবু আশেপাশে ধুয়ো শুনে অভ্যাস বশে গলার স্বর চড়িয়ে হাঁক পাড়ল, "শামলী আ—য়! ধবলী আঁ—য়।"

আমবাগানের ওদিক দিয়ে রামকালী ফিরছিলেন রায়পাড়া থেকে পায়ে হেঁটে।

পাল্‌কিটি ধার দিয়ে আসতে হয়েছে রায়পাড়ায়।

গ্রাম-বৃদ্ধ রায়মশায়ের অবস্থা খারাপ, খবর পেয়ে নাড়ী দেখতে গিয়েছিলেন রামকালী। নাড়ীর অবস্থা দেখে গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা দিলেন, আর ব্যবস্থা দিয়েই পড়লেন বিপাকে।

রায়মশায়ের ছেলেরা দু জনেই গত হয়েছে, আছে তিন নাতি, কিন্তু তাদের এমন সঙ্গতি নেই যে পাল্‌কিভাড়া দিয়ে, আর চারটে বেহারাকে মজুরি জলপানি দিয়ে ঠাকুরদার গঙ্গাযাত্রা করাবে। অথচ অমন নিষ্ঠাবান সদাচারী প্রাচীন মানুষটা ঘরে পড়ে মরবে? এটাই বা চোখে দেখে সহ্য করা যায় কি করে? আর গেলে ত্রিবেণীর গঙ্গাই উত্তম। 'গঙ্গাযাত্রা'র ঘোষণা শুনেই রায়মশাইয়ের নাতিরা যেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, সঙ্গে সঙ্গেই বল্‌তে হল রামকালীকে, "পাল্‌কির জন্যে চিন্তা ক'রো না, আমার পাল্‌কিতেই যাবেন রায় কাকা।"

নাতিরা অস্ফুটে একবার বলল, "আপনাকে রোগী দেখতে দূরে দূরে যেতে হয়, পাল্‌কিটা দিলে—"

রামকালী গম্ভীর হাস্যে বললেন, "তবে নয় ঠাকুরদাকে কাঁধে করেই নিয়ে যাও। তিন নাতি রয়েছ উপযুক্ত।"

বয়োজ্যেষ্ঠের পরিহাস বাক্যে হেসে ফেলবে এমন বেয়াদবির কথা অবশ্য ভাবাই যায় না, কাজে কাজেই তিন জনে ঘাড় চুলকোতে লাগল। আর ওরই মধ্যে যে বড়, সে সাহসে ভর করে বলল, "ভাবছিলাম গো-গাড়ি করে—"

"ভাবাটা খুব উচিত হয় নি বাপু!" রামকালী বলেন, "গো-গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে গেলে ওই বিরেনব্বই বছরের জীর্ণ খাঁচাখানা কি আর প্রাণপাখি-সমেত গঙ্গা পর্যন্ত পৌঁছবে?

পাখি খাঁচাছাড়া হয়ে উড়ে যাবে। আমিও ওঁর সন্তানতুল্য বাপু, তোমাদের সঙ্কোচ করবার কিছু নেই। তা ছাড়া চটপট ব্যবস্থার দরকার, কখন কি হয় বলা যায় না।"

রায়মশাইয়ের ঘোলাটে চোখ দুটো থেকে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি শিরাবহুল শীর্ণ ডান হাতখানা আশীর্বাদের ভঙ্গীতে তুলে বললেন, "জয়স্তু।"

বাইরে এসে রামকালী পাল্কিবেহারা কটাকে নির্দেশ দিলেন, "পাল্কিটা আর মিথ্যে বয়ে নিয়ে যাবি কেন, ওটা এখানেই থাক, তোরা বাড়ি গিয়ে খেয়েদেয়ে নে গে। শেষরাতে উঠে চলে আসবি। আর দেখ্, বাড়ি থেকে কালকের সারাদিনের মতন জলপান নিয়ে আসবি বুঝলি? আব শোন্ তোরা, এখন এখানে কিছু কাজ-কর্মের প্রয়োজন আছে কি না দেখ্। আমি বাড়ি ফিরছি।"

জোর পায়েই ফিরছিলেন রামকালী, কারণ বেরিয়েই দেখেছিলেন ঈশান কোণে মেঘ। পাল্কি চড়ে রুগী দেখতে যান বলে যে রামকালী হাঁটতে অনভ্যস্ত, তা নয়। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে, প্রাতঃকৃত্য সেরে ক্রোশ দুই হেঁটে আসা তাঁর নিত্য-কর্মের প্রথম কর্ম। তবে হ্যাঁ, রোগীর বাড়ি যাওয়ার কথা আলাদা, সেখানে মান-মর্যাদার প্রশ্ন।

পথ সংক্ষেপের জন্য বাগানের পথ ধরেছিলেন, কিন্তু আমবাগানের কাছ বরাবর আসতেই ঝরাপাতা আর ধুলোর ঝড উঠল। রামকালী তাড়াতাড়ি বাগানের মাঝামাঝি থেকে বেরিয়ে কিনারায এলেন, আব আসতে না আসতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। গলা কার?

সত্যর না?

হ্যাঁ, সত্যরই তো মনে হচ্ছে।

যদিও ঝড়েব সোঁ সোঁ শব্দের বিপরীতে শব্দটা হওয়ায় বুঝতে সামান্য সময় লেগেছিল, কিন্তু সে সামান্যই। তা ছাড়া গরু দুটোর নামও পরিচিত। শ্যামলী ধবলী রামকালীর বাড়িরই গরু। গরু অবিশ্যি চাটুয্যেদের এক-গোহাল আছে, কিন্তু এই গরু দুটি বিশেষ সুলক্ষণ-যুক্ত বলে রামকালীর বড়ই প্রিয়। সময় পেলেই রামকালী নিজে হাতে ওদের মুখে ঘাস ধরে দেন, গায়ে হাত বুলোন। বাড়ির কুমারী মেয়েরা শ্যামলী ধবলীকে নিয়েই "গোকাল ব্রত" করে,আর মোক্ষদা ওদের কাছ থেকে সংগৃহীত গোময় দ্বারাই সম্যক বিশুদ্ধতা রক্ষা করে চলেন।

কান খাড়া করে ধ্বনির মূল উৎসের দিকটা অনুমান করে নিলেন রামকালী, তার পর দ্রুতপায়ে গিয়ে ধরে ফেললেন কন্যাকে। সত্যবতী তখন ধুলোর আচোট থেকে চোখ রক্ষা করতে আঁচলের কোণটা দু হাতে মুখের সামনে তুলে ধরে ছুটছিল।

"যাচ্ছিস কোথায়?"

জলদগম্ভীর স্বরে হাঁক পাড়লেন রামকালী।

সত্যবতী চমকে মুখের ঢাকা খুলে থ।

যদিও সকলেই সত্যবতীকে 'বাপ-সোহাগী' আখ্যা দেয় এবং সত্যিই সত্যবতী রামকালীর বিশেষ আদরিণী,—তা ছাড়া পয়মন্ত মেয়ে বলে রামকালী মনে মনে বেশ একটু সমীহও

করেন তাকে, তাই বলে সামনাসামনি যে কোন আদর-আদিখ্যেতার পাট আছে তা নয়। কাজেই বাবার গলা শুনেই সত্যবতীর 'হয়ে গেছে।'

রামকালী আর এক বার প্রশ্ন করেন, "এমন সময় একা গিয়েছিলি কোথায়?"

সত্যবতী ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, "সেজপিসীর বাড়ি।"

সত্যবতী যাকে সেজপিসী আখ্যা দিল, তিনি হচ্ছেন রামকালীর খুড়তুতো বোন, এ গ্রামেই শ্বশুরবাড়ি। এ গ্রামেই বাস।

রামকালী ভুরু কুঁচকে বলেন, "অত দূরে আবার একা একা যাবার দরকার কি? সঙ্গে কেউ নেই কেন?"

এই, এই জন্যেই সত্যবতীর 'বাপসোহাগী' আখ্যা।

চড় নয়, চাপড় নয়, নিদেন একটা কানমলাও নয়। শুধু একটু কৈফিয়ত তলব।

সত্যবতী এবার সাহস পেয়ে বলে, "না একা কেন, পুণ্যিপিসী আর নেড়ু ছিল সঙ্গে। তারপর আমি এই তোমাকে ডাকতে ছুটতে ছুটতে আসছি।"

"আমাকে ডাকতে ছুটতে ছুটতে আসছিস?" রামকালী ভুরু কুঁচকে বলেন, "কেন? আমায় কি দরকার?"

সত্যবতী এবার পূর্ণ সাহসে ভর করে সোৎসাহে বলে, "জটাদার বৌ যে মর-মর। নাড়ী ছেড়ে গেছে। তাই সেজপিসী কেঁদে বলল, 'যা সত্য একবার মেজদাকে ডেকে নিয়ে আয়, যেখানে পাস।' তা আমি রায়পাড়া গিয়ে শুনলাম তুমি এইমাত্তর চলে এসেছ।"

"আবার রায়পাড়াও গিছলি? নাঃ বিপদ করলে দেখছি। জটার বৌয়ের আবার হঠাৎ কি হল যে নাড়ী ছেড়ে যাচ্ছে?"

"যাচ্ছে কি বাবা", সত্য আরও উৎসাহ সহকারে বলে, "গেছে। সেজপিসী চেঁচাচ্ছে, বুক চাপড়াচ্ছে, আর বালিশ বিছানা সরিয়ে নিচ্ছে।"

"আঃ, কী যে বলে! চল দেখি গে।" রামকালী বলেন, "ঝড় উঠে পড়ল, এখুনি বিষ্টি আসবে, কী মুস্কিল। হয়েছিল কি?"

"কিছু নয়। সেজপিসী বললে, রান্নাবান্না সেরে যেই খেতে বসেছে জটাদার বৌ, আর অমনি জটাদা পান চেয়েছে। জটাদার বৌ বলেছে 'পান ফুরিয়ে গেছে,' ব্যস, বাবু মহারাজের রাগ হয়ে গেছে। দিয়েছেন ধাঁই ধাঁই করে পিঠের ওপর লাথি। আর অমনি জটা বৌঠান কাঁসিতে মুখ থুবড়ে—" হঠাৎ খুক খুক করে হেসে ওঠে সত্যবতী।

"হাসছিস যে?"

ধমকে উঠলেন রামকালী। বিরক্তও হলেন। কী অসভ্য হচ্ছে মেয়েটা! হাসির কি সময় অসময় নেই? বললেন, "মানুষ মরছে দেখে হাসতে হয়? এই শিক্ষা-দীক্ষা হচ্ছে?"

সত্যবতী নিতান্তই হেসে ফেলেছিল, এখন বাপের ধমকে সামলে নিয়ে মুখটা ম্লান করবার চেষ্টা করে বলে, "সেজপিসী বলছিল, যেই না ধাক্কা খাওয়া অমনি কুমড়ো

গড়াগড়ি হয়ে দাওয়া থেকে উঠোনে পড়ে গেল।" কষ্টে হাসি চেপে প্রশ্ন করে সত্যবতী, "জটাদার বৌ অনেক ভাত খায়, না বাবা? তাই অত মোটা!"

"আঃ!" বলে বিরক্তি প্রকাশ করে তাড়াতাড়ি এগোতে থাকেন রামকালী।

সত্যবতীও হাঁটায় কিছু কম দড় নয়। বাপের সঙ্গে সমানেই এগোতে থাকে।

রামকালীর জটার বৌয়ের জন্য সহানুভূতিতে যতটা না হোক, জটার ব্যবহারে মনে মনে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করেন। হতভাগা বামুনের ঘরের গরু, পেটে 'ক' অক্ষরের আঁচড় নেই, গাঁজা-গুলি সবেতেই ওস্তাদ। আবার বংশছাড়া বিয়ে হয়েছে, বৌ-ঠেঙানো! 'জটা' 'ফটা'র বাপ তো অমন ছিল না! বরং রামকালীর গুণবতী বোনই লোকটাকে সারাজীবন জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে খেয়েছেন।

কে জানে কী ভাবে বেটক্করে লেগেছে, সত্যিই যদি মরে-টরে যায়, দস্তুরমত ফ্যাসাদে পড়তে হবে।

সত্যবতীর কথা ভুলে গিয়ে আরও জোরে পা চালান রামকালী। সত্যবতী এবার দৌড়তে শুরু করে। হেরে যাবে না সে।

চোখ কপালে উঠে স্থির হয়ে গেছে, মুখে ফেনা ভেঙে সে ফেনা শুকিয়ে উঠেছে। হাত পা ঠাণ্ডা পাথর।

সন্দেহ আর নেই, সমস্ত লক্ষণই স্পষ্ট। তুলসীতলায় শুইয়ে দেওয়া হয়েছে ইতিমধ্যেই। অবশ্য কষ্ট করে আর ঘর থেকে বয়ে আনতে হয় নি, লাথি খেয়ে গড়িয়ে তো উঠোনেই পড়েছিল তুলসীতলার কাছ বরাবর। দণ্ড খানেকের মধ্যেই বেতারবার্তায় সারা পাড়ায় সংবাদ রটে গেছে, এবং পাড়া ঝেঁটিয়ে মহিলাবৃন্দ এসে জড়ো হয়েছেন, আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কা তুচ্ছ করে।

ব্যাপারটা তো কম রংদার নয়, দৈনন্দিন বৈচিত্র্যশূন্য জীবননাট্যের মধ্যে এমন একটা জোরালো দৃশ্য দর্শনের সৌভাগ্য জীবনে কবার আসে?

প্রথমে সমস্ত জনতার মধ্যে উঠল একটা চাপা উত্তেজনার আলোড়ন, "জটা নাকি বৌটাকে একেবারে শেষ করে ফেলেছে?" তার পর 'হায় হায়'! জটা সম্পর্কে মন্তব্য-গুলিও এখন আর জটার মার কান বাঁচিয়ে হচ্ছে না। কারণ স্পষ্ট কথা বলে নেবার মত এ-হেন সুযোগই বা কার জীবনে কবার আসে?

"সত্যি শেষ হয়ে গেছে? ছি ছি ছি, কি খুনে দস্যি ছেলে গো!"···"ধন্যি সন্তান পেটে ধরেছিল মাগী! আচ্ছা জটাটাই বা এত গোঁয়ার হল কোথা থেকে? ওদের বাপ তো মহা ভালমানুষ ছিল।"···"হল কোথেকে! তুমি আর জ্বালিও না ঠাকুরঝি, বলি গর্ভধারিণীটি কেমন? এ হচ্ছে খোলের গুণ!"···"আহা হাবা-গোবা নিপাট ভালমানুষ বৌটা, মা-

বাপের বাছা, বেঘোরে প্রাণটা গেল !" এমনি নানাবিধ আলোচনা চলতে থাকে। একটা মেয়েমানুষের জন্যে এর চাইতে আর কত বেশী দরদ আশা করা যায় ?

প্রতিবেশিনীদের আক্ষেপোক্তিগুলো নীরবে হজম করতে বাধ্য হচ্ছিলেন জটার মা, কারণ আজ তিনি বড়ই বেকায়দায় পড়ে গেছেন। তাই সমস্ত মন্তব্য চাপা পড়ে যায় এমন সুরে মড়াকান্নাটা জুড়ে দেন তিনি। বুক চাপড়ে চাপড়ে মর্মভেদী হৃদয়বিদারক ভাষায় ইনিয়ে বিনিয়ে।

বাড়ির কাছাকাছি আসতে না আসতেই শুনতে পেলেন রামকালী খুড়তুতো ছোট-বোনের সেই পাঁজরভাঙা শোকগাথা, "ওরে আমার ঘরের লক্ষ্মী ঘর ছেড়ে আজ কোথায় গেল রে! ওরে সোনার পিতিমেকে বিসজ্জন দিয়ে আমি কোন্ প্রাণে ফের সংসার করব রে! ওরে জটা, তোর যে নগরে না উঠতেই বাজারে আগুন লাগিল রে!"

সত্যবতী বলে উঠল, "যাঃ, সর্ব্বনাশ হয়ে গেল!"

দ্রুত পদক্ষেপটা হঠাৎ স্তিমিত হল, ভুরুটা একবার কুঁচকোলেন রামকালী। যাক, তা হলে হয়েই গেছে! তবে আর তিনি গিয়ে কি করবেন! এখন জটা হতভাগার কপালে কত দুর্গতি আছে কে জানে!

হঠাৎ ভয়ানক রকমের একটা চীৎকার উঠল, বোধ করি ফিনিশিং টাচ্। "ওরে বাবারে, আমার কী সর্বনাশ হল রে! কী রাঙের-রাধা বৌ এনেছিলাম রে!"

রামকালী পায়ে পায়ে এগোতে এগোতে সহসা দরজার কাছাকাছি এসেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "যাক, সত্যিই শেষ হয়ে গেছে তা হলে। সত্য, তুই বাড়ি যা।"

সত্যবতী কাঠ।

"বাড়ী! একলা ?"

"কেন একলা কেন, নেড়ু আর পুণ্যি এসেছিল বললি না ?"

সত্যবতী ভয়ে ভয়ে বলে, "এসেছিল তো, আর কি এখন যাবে তারা ?"

"যাবে না ? যাবে না মানে ? ওদের ঘাড় যাবে। দেখ কোথায় আছে। আমাকে তো আবার এদের এদিক দেখতে হবে।"

কৈফিয়ত দিয়ে কথা রামকালী কদাচ কাউকে বলেন না, কিন্তু সত্যর কাছে সামান্য একটু সহজ রামকালী।

সত্যবতী গুটি গুটি এগিয়ে এক বার পিসীর উঠোনের ভিতর গিয়ে দাঁড়ায়, এদিক ওদিক তাকিয়ে নেড়ু পুণ্যি কারও দেখা না পেয়ে ফিরে এসে ম্লান মুখে বলে, "ওদের কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।"

"কেন, গেল কোথায় সব ?"

"কি জানি।" সত্য আস্তে আস্তে সাহসে ভর করে প্রাণের কথাটা বলে ফেলে।

"বাবা, তুমি তো মরা বাঁচাতে পার ?"

"মরা বাঁচাতে ? দূর পাগলী !"

সত্য ম্রিয়মাণ ভাবে বলে, "তবে যে লোকে বলে !"

"লোকে বলে ? কি বলে ?" অন্যমনস্ক ভাবে মেয়ের কথার জবাব দিয়ে রামকালী এদিক ওদিক তাকাতে থাকেন যদি একটা বেটাছেলের মুখ চোখে পড়ে। এসে যখন পড়েছেন তিনি, দায়িত্ব এড়িয়ে চলে যেতে তো পারেন না। জটাদের তেমন বাঁশঝাড় না থাকে, রামকালীর বাগান থেকেই বাঁশ কেটে আনতে হুকুম দেবেন। কিন্তু কই ? কে কোথায় ? বাড়ির ভিতর থেকে সুর উঠছে নানা রকম, বাইরেটা শূন্য স্তব্ধ !

তালর মধ্যে আকাশটা হঠাৎ মেঘ উড়ে গিয়ে দিব্যি পরিষ্কার হয়ে উঠেছে, আর বোঝা যাচ্ছে সন্ধ্যার এখনও দেরি আছে।

হঠাৎ সত্যবতী একটা অসমসাহসিক কাণ্ড করে বসে, বাপের একখানা হাত দু হাতে চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে ওঠে, "বলে যে কবরেজ মশাই মরা বাঁচাতে পারেন। দাও না বাবা একটুখানি ওষুধ জটাদার বৌকে।"

রামকালী এই অবোধ বিশ্বাসের সামনে থতমত খেয়ে সহসা কেমন অসহায়তা অনুভব করেন। তাই ধমকে ওঠার পরিবর্তে মাথা নেড়ে বলেন, "ভুল বলে মা! কিছুই পারি নে। মিথ্যে অহঙ্কারে কতকগুলো শেকড়-বাকড় নিয়ে নাড়ি, আর লোক ঠকাই।"

সত্যবতী এ কথার সুর ধরতে পারল না, পারার কথাও নয়, বুঝল এ হচ্ছে বাবার রাগের কথা। কিন্তু আপাতত সে মরীয়া। যা থাকে কপালে, বাবার হাতে যদি ঠেঙানি খাওয়া থাকে তাই খাবে সত্য; কিন্তু সত্যবতীর চেষ্টায় জটাদার বৌটা যদি বাঁচে! তাই চোখ-কান বুজে সে বাবার গায়ের চাদরের খুঁটটা টেনে বলে ফেলে, "তোমার পায়ে পড়ি বাবা, জন্মের শোধ একটু ওষুধ দাও না! আহা বিনি চিকিচ্ছেয় মারা যাবে জটাদার বৌ ?"

মরার পর যে আর চিকিচ্ছে চলে না একথা আর মেয়ের কাছে ব্যাখ্যা করতে পারলেন না রামকালী। শুধু একটা নিশ্বাস ফেলে ফের ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, "চল দেখি।"

•

জমজমাট নাটকের মধ্যিখানে যেন হঠাৎ আসরের চাঁদোয়া ছিঁড়ে পড়ল। কবরেজ মশাইয়ের গলা-খাঁকারি না ?

হ্যাঁ, তাই বটে। বিশালকায় সুকান্তি পুরুষ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সত্যর শানানো গলা বেজে উঠেছে, "বাবা বলছেন ভিড় ছাড়তে হবে।"

পাড়ার মহিলারা মাথার কাপড় টেনে চুপ করে গেলেন। শুধু জটা-জননী ডুকরে উঠলেন, "ও মেজদা গো, আমার জটা আজ লক্ষ্মীছাড়া হল গে !"

"থাম্!" যেন একটা বাঘ হুঙ্কার দিল, "তোর জটা আবার লক্ষ্মীছাড়া না ছিল কবে ? একেবারে শেষ করে ফেলেছে তো ?"

ভিড় সরে গেছে, কবরেজ মশাই ভাগ্নে বৌয়ের কাছে গিয়েও যতটা সম্ভব ছোঁওয়া বাঁচিয়ে হেঁট হয়ে দু আঙুলে নাড়িটা টিপে ধরেন, আর মুহূর্তকাল পরেই চমকে ওঠেন।

যাক্, সব রং তামাশা ফক্কিকার!

শুধু নাটকের একটা দৃশ্যই জখম নয়, আগাগোড়া নাটকটাই খতম! 'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র এহেন উদাহরণ আর কখনও কেউ দেখেছে না শুনেছে? জটার বৌয়ের এই আচরণটা যেন ধাষ্টামোর চরম, ক্ষমার অযোগ্য। ছি ছি, মেয়েমানুষের প্রাণ বলে কি এমনই কাঠ-পরমায়ু হতে হয় গা? তবে এ মেয়েমানুষের কপালে যে অশেষ দুঃখ তোলা আছে, তাতে আর কারও মতভেদ থাকে না। মরে গিয়ে তুলসীতলায় শুয়ে আবার চার দণ্ড পরে ঘরে উঠে শোয়, ঢক ঢক করে এক বাটি গরম দুধ গেলে, এমন মেয়েমানুষের খবর এর আগে এঁরা অন্তত কেউ পান নি।

"ছি ছি, কী ঘেন্না! পুরুষের প্রাণ হলে আর ওই স্বর্ণসিঁদুরটুকু জিভে ঠেকিয়েই চোখ খুলতে হত না!"…"যাই বল জটার বৌ খুব খেল্ দেখালো বটে!"…"এই বার শাশুড়ী মাগীর হাতে যা খোয়ার হবে টের পাচ্ছি, মাগীর যা অপমান্যি হয়েছে আজ!"…"কিন্তু যাই বলো তুলসীতলা থেকে অমন হুট্ করে ঘরে তোলাটা ঠিক হয় নি, একটা অঙ্গ প্রাচিত্তির-টাচিত্তির করা কোর্তব্য ছিল।"…"কে জানে বাবা, সত্যি বেঁচে ছিল, না কোন অপদেবতায় ভর করল! আমার তো কেমন সন্দ হচ্ছে।"…"থাম সেজ বৌ, সাঁঝ সন্ধ্যেয় একা ঘাটে পথে যাই, ভাবলে গা ছম্ ছম্ করবে। কিন্তু চাউনিটা একটু কেমন কেমনই লাগল।"… "না না, ও সব কিছু না, কবরেজ মশাই তো বললেনই, আচমকা ধাক্কা খেয়ে ভির্মি গেছল।"

"নে বাবা চল চল, ছিষ্টি সংসারের কাজ পড়ে, নাহক পাঁচ দণ্ড সময় বৃথা নষ্ট হল।"… "জটার মার আদিখ্যেতাটা দেখলি? যেন বৌ মরে বুক একেবারে ফেটে যাচ্ছিল।"… …"দেখেছি! দেখেত আর বাকী কিছু নেই। বুক যদি ফেটেছে তো বৌ জীইয়ে ওঠায়! বড় আশায় ছাই পড়ল। ভাবছিল তো বেটা তার 'ভাগ্যিমান' হল! আবার এখুনি তার বে দিয়ে, দানসামিগ্রী গয়নাপত্তর ঘরে তুলবে!"

বাক্যের স্রোত আর থামে না।

ঘাটে পথে, আপন আপন বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বাক্যের বৃন্দাবন বসে যায়। এত বড় একটা ঘটনাকে এত সহজে জুড়িয়ে ফেলতে ইচ্ছে কারুরই হচ্ছে না। জটার মাকে 'পেড়ে ফেলবার' এত বড় স্বর্ণ-সুযোগটাও মাঠে মারা গেল। জটার বৌয়ের উপর কিছুতেই আর প্রসন্ন হতে পারছেন না কেউ, বৌটা যেন সবাইকে বড় রকমের একটা ঠকিয়েছে। জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ী খবর পেয়েই আঁচলের তলায় লুকিয়ে আলতা পাতা আর সিঁদুর গোলা এনেছিলেন, যাতে প্রথম সিঁদুর দেওয়ার বাহাদুরিটা তাঁরই হয়। সেগুলো এখন ঘাটে ভাসিয়ে এলেন। যতই হোক, মড়ার জন্যে আনা তো! তা রাগটা তাঁরই বেশী হচ্ছে জটার বৌয়ের ওপর।

না, নাম কেউ জানে না, জানবার চেষ্টাও করে না—'জটার বৌ' এই তার একমাত্র পরিচয়, এরপর শেষ পরিচয় হবে, 'অমুকের মা।' তবে আর নামে দরকার কি? নামে দরকার নেই কিন্তু তার কথায় সকলেরই দরকার আছে। সেই দরকারী কথাগুলোর মধ্যে হঠাৎ জ্ঞাতি খুড়শাশুড়ী বলে উঠলেন, "আমাদের বাপের বাড়ির দেশ হলে ও বৌকে আর ঘরে উঠতে হত না, ওই গোয়ালে কি ঢেঁকশেলে জীবন কাটাতে হত।"

দু-এক জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করলেন, 'জীবন' নিয়ে বিচারটা কেন?

খুড়শাশুড়ী ফের রায় দেন, "একে তো তুলসীতলায় বার করা, তা'পর আবার কত বড় অনাচার ভাব, মামাশ্বশুরের ছোঁয়াচ খাওয়া! কবরেজ মশাই যখন নির্ভরসায় নাড়ি টিপে ধরলেন, তখনই তো আমি 'হাঁ'! অবিশ্যি উনি ভেবেছিলেন মরেই গেছে। আর মরে গেলে সৎকারের আগে দেহশুদ্ধু তো একটা করতেই হত। কিন্তু এ যে একেবারে জলজ্যান্ত জীইয়ে উঠল। প্রাচিত্তির না করলে কি করে চলবে?"

বহু গবেষণান্তে স্থির হল মামাশ্বশুর স্পর্শের পাতকস্বরূপ একটা প্রায়শ্চিত্ত জটার বৌকে করতেই হবে, তা ছাড়া মরে বাঁচার পাতকে আর একটা। নইলে জটার মাকে 'পতিত' থাকতে হবে।

বেচারা অপরাধিনী তো অচৈতন্য। জটার মাও জটাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন, কাজেই একতরফা ডিক্রী হয়ে যায়।

কিন্তু সত্যবতী এসবের কিছুই জানে না। ও এক অদ্ভুত গৌরবের আনন্দে ছলছল করতে করতে বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি ফেরে।

উঃ, রাগ করে বাবা কী উল্টো কথাই বলছিলেন। বলছিলেন কি না "চিকিচ্ছে-টিকিচ্ছে কিচ্ছু জানি না—"সাধে কি আর সত্য অত দুঃসাহস করে বাবাকে হাতে ধরে বলেছিল, একটু ওষুধ দিতে, তাই না বেচারী বৌটা বাঁচল! আহা সত্য যখন শ্বশুরবাড়ি যাবে, তখন যদি সত্যর বর (মুখে অলক্ষ্যে একটু হাসি ফুটে ওঠে) অমনি মেরে সত্যকে মেরে ফেলে বেশ হয়। বাবা খবর পেয়ে গিয়ে একটি মাত্রা স্বর্ণসিঁদুর মধু দিয়ে মেড়ে খাইয়ে দেবেন, আর একটু পরেই সত্য চোখ খুলে সবাইকে দেখে তাড়াতাড়ি মাথায় ঘোমটা টেনে ফেলবে।

উঃ, কী মজাই হবে তা হলে!

দেশসুদ্ধু লোকের তাক্ লেগে যাবে সত্যর বাবা রামকালী কবরেজের গুণের মহিমায়। বাপ রে বাপ, সোজা বাবা তার? গাঁয়ের আর কোন্ মেয়েটার এমন বাপ আছে?

-হাসির কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সশব্দে হেসে ফেলা সত্যর বরাবরের রোগ।

রামকালী চমকে প্রশ্ন করলেন, "কী হল? হাসলি যে?"

সত্য কষ্টে সামলে নিয়ে ঢোক্ গিলে বলল, "এমনি!"

"তোর ওই 'এমনি' হাসিটা একটু কমা দিকি," প্রায় সহাস্যেই বলেন রামকালী,

"নইলে এর পর শ্বশুরবাড়ি গিয়ে ওই জটার বৌয়ের দশা হবে তোর।"

মনটা বড় প্রসন্ন রয়েছে, এই সামনে রাত, না হক্ কতগুলো ঝঞ্ঝাট-ঝামেলায় পড়তে হত, জটার বৌ তার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। বাপের মনের প্রসন্নতার কারণটা অনুমান করতে না পারলেও প্রসন্নতাটুকু অনুধাবন করতে পারে সত্যবতী, এবং তারই সাহসে প্রায় উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে, "ওই জন্যেই হাসলাম। আমি মরে গেলে তুমি বেশ গিয়ে বাঁচিয়ে দেবে।"

"হুঁ, বটে!" স্বল্পভাষী রামকালী।

রামকালী নিঃশব্দে হন হন করে খানিকটা অগ্রসর হয়ে যান, এবং সত্যবতী বাপের সঙ্গে তাল রাখতে প্রায় ছুটতেই থাকে।

হঠাৎ এক সময় থেমে রামকালী বলেন, "মরে গেলে স্বয়ং ভগবান এসেও কিছু করতে পারেন না বুঝলি? জটার বৌ মরে নি।"

"মরে নি!" সত্য একটু আনমনা হয়ে যায়, মরাটা তা হলে আর কোন রকম? হঠাৎ চিন্তার গতি বদলায়, সত্য সোৎসুকে বলে, "কিন্তু বাবা, তুমি গিয়ে নাড়ি দেখে স্বর্ণ-সিঁদুর না কি না খাওয়ালে, ওই রকম মরা-মরা হয়েই তো থাকত জটাদার বৌ? আর সবাই মিলে বাঁশ বেঁধে নিয়ে গিয়ে পাকুড়তলার শ্মশানে পুড়িয়ে দিয়ে আসত।"

রামকালী একটু চমকালেন!

আশ্চর্য! এতটুকু মেয়ে, এত তলিয়ে ভাবে কি করে? আহা মেয়েমানুষ, তাই সবই বৃথা। এ মগজটা যদি নেড়ুটার হত! তা হল না—আট বছরের হাতী এখনও 'অ আ ই' তে দাগা বুলোচ্ছে। নেড়ু রামকালীর দাদা কুঞ্জর শেষ কুড়োন্তি। তেরোটা ছেলেমেয়ে মানুষ করার পরে চৌদ্দটার বেলায় রাশ একেবারে শিথিল হয়ে গেছে কুঞ্জ আর তার পরিবারের। ছেলেটা বামুনের গরু হবে আর কি!

কিন্তু মেয়ে-সন্তানের বোধকরি এত বেশী তলিয়ে ভাবতে শেখাও ভাল নয়, তাই রামকালী ঈষৎ ধমকের সুরে বলেন, "থাম, থাম, মেলা বকিস নি, পা চালিয়ে চল। গহীন্ অন্ধকার হয়ে গেছে দেখছিস?"

"অন্ধকার! হুঁ!" সত্যবতী স-তাচ্ছিল্যে বলে, "অন্ধকারকে আমি ভয় করি নাকি? এর চাইতে আরও অনেক অনেক অন্ধকারে বাগানে গিয়ে পেঁচার চোখ গুনি না?"

"অন্ধকারে কী করিস?"

চমকে ওঠেন রামকালী।

সত্য থতমত খেয়ে বলে, "ইয়ে—আমি একলা নয়, নেড়ু আর পুণ্যিপিসীও থাকে। পেঁচার চোখ গুনি।"

হঠাৎ রামকালী হা হা করে হেসে ওঠেন।

অনেকক্ষণ ধরে দরাজ গলায়। এই মেয়েকে আবার ধমকাবেন কি, শাসন করবেন কি!

নির্জন পথে অন্ধকারের গায়ে সেই গম্ভীর গলায় দরাজ হাসি যেন স্তরে স্তরে ধ্বনিত হতে থাকে।

বাঁডুয্যেদের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন দু-একটি গ্রাম্য প্রৌঢ়।

"বন্দি চাটুয্যের গলা না ?"

"হ্যাঁ তাই তো মনে হচ্ছে।"

"একলা এমন অন্ধকারে হাসি কেন ?"

"একলা কি আর ? নিশ্চয় ধিঙ্গী মেয়েটা সঙ্গে আছে। নইলে আর—"

"ওই এক মেয়ে তৈরি করছেন রামকালী। ও মেয়ে নিয়ে কপালে দুঃখু আছে।"

"আর দুঃখু! টাকার ছালা ঘরে, ওর আবার দুঃখু। শুনছি নাকি বর্ধমানের রাজার কাছ থেকে লোক এসেছিল কাল, রাজার সভা-কবরেজ হবার জন্যে সাধতে।"

"তাই না কি ? কই শুনি নি তো ? তা হলে গাঁয়ের মায়া কাটাল এবার চাটুয্যে ?"

"না না, শুনছি যাবে না।"

"বটে ? তবু ভাল। তোমায় বললে কে ?"

"কুঞ্জর বড ছেলেটা বলছিল।"

"হুঁ ভালই, এ বয়সে আবার বিদেশে গিয়ে রাজদরবারে চাকরি। তবে রামকালীর মতিগতি বড বেয়াড়া, অত বড় ধিঙ্গী মেয়েকে এতটা বাড বাডতে দেওয়া উচিত হয় না, পাডার ছেলেগুলো হচ্ছে ওর খেলুড়ি।"

'হ্যাঁ, গাছে চডতে, সাঁতার কাটতে, মাছ ধরতে বেটা ছেলের দশগুণ ওপরে যায়।'

"এটা একটা গৌরবের কথা নয় খুড়ো। যতই হোক মেয়েছেলে, তায় আবার একটা মান্যিমান ঘরের বৌ হয়েছে। তারা টের পেলে ও বৌকে ঘরে নিতে বেঁকে বসবে না ?"

"একটা কলঙ্ক রটিয়ে দিতেই বা কতক্ষণ ?"

বন্দি চাটুয্যের ও তার ধিঙ্গী মেয়ের আলোচনায় চণ্ডীমণ্ডপ ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যাকে সামনে সমীহ করতে বাধ্য হতে হয়, তাকে আড়ালে নিন্দে করতে না পেলে বাঁচবে কেমন করে মানুষ ?

এইসব সমালোচনার প্রধানা পাত্রী তখন বাবার পিছন পিছন ছুটছে আর মনে মনে আকুল প্রার্থনা করছে, 'হেই ভগবান, আমার পাটা বাবার মতন লম্বা করে দাও না গো, তাহলে বাবার মতন হাঁটি। হেরে যাই না।'

হেরে যেতে একান্ত আপত্তি সত্যবতীর।

কোন ক্ষেত্রে কোথাও হার মানবে না এই পণ।

"এই পুণ্যি, ছড়া বাঁধতে পারিস ?"

চিলেকোঠায় ছাতের ওপর সত্যবতীর 'খেলাঘর।' প্রধানা খেলুড়ি রামকালীর জ্ঞাতি খুড়োর মেয়ে পুণ্যবতী। সত্য তাকে পাঁচ জনের সামনে সভ্যতা করে 'পুণ্যি পিসী' বললেও নিজের এলাকায় পুণ্যিই বলে।

"বাবুই পাখীর বাসা আনতে পারিস?" অথবা "কাঁচপোকা ধরতে পারিস?" কিংবা "সাঁতরে তিন বার বড় দিঘী পারাপার হতে পারিস?" এ ধরনের পরীক্ষা-মূলক প্রশ্ন প্রায়ই করে সত্য, কিন্তু ছড়া বাঁধতে পারিস কিনা, এহেন প্রশ্ন একেবারে আনকোরা নতুন।

পুণ্যি বিমূঢভাবে বলে, "ছড়া? কিসের ছড়া?"

"জটাদার নামে ছড়া। বুঝলি? ছড়া বেঁধে গাঁ সুদ্ধ সব ছেলেমেয়েকে শিখিয়ে দেব, জটাদাকে দেখলেই তারা হাততালি দিয়ে ছড়া কাটবে।"

"হি হি হি।"

জটাধরের দুর্দশার চিত্র কল্পনা করে দু জনে দুলে দুলে হাসতে থাকে।

অতঃপর পুণ্যবতী একটি পাল্টা প্রশ্ন করে, "খুব তো বললি, বলি মেয়েমানুষকে আবার ছড়া বাঁধতে আছে না কি?"

"বাঁধতে নেই?" সহসা অগ্নিমূর্তি ধ'রে বসে সত্য, "কে বলেছে তোকে নেই? মেয়ে মানুষ। মেয়েমানুষ। মেয়েমানুষ যেন মায়ের পেটে জন্মায় না, বানের জলে ভেসে আসে। অত যদি মেয়েমানুষ মেয়েমানুষ করবি তো আমার সঙ্গে খেলতে আসিস নে।"

পুণ্যি মুচকি হেসে বলে, "আহা মশাই রে। আর তোর বর যখন বলবে?"

"কি বলবে?'

"ওই মেয়েমানুষ।"

"ইস। বলবে বৈকি। দেখিয়ে দেব না? আমি ওই জটাদার বৌয়ের মত হব ভেবেছিস? কক্ষনো না। দেখ্ না, ছড়া বেঁধে জটাদাকে কী উৎখাত করি।"

পুণ্যি ঈষৎ সমীহ ভাবে বলে, "কিন্তু কি করে বাঁধবি?"

"কি করে আবার? কথক ঠাকুর যেমন আখর দেন তেমনি করে। একটুখানি তো বেঁধেছি, শুনবি?"

"বেঁধেছিস? অ্যাঁ। বল না ভাই, বল না।"

সত্য আত্মস্থ ভাবে চেখে চেখে তেঁতুল খাওয়ার ভঙ্গীতে বলে—

"জটাদাদা, পা গোদা,
যেন ভোঁদা-হাতী,
বৌ-ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারুক লাথি।"

"ওরে সত্য।' পুণ্যি সহসা ডুকরে উঠে সত্যকে জড়িয়ে ধরে, "তুই কী রে? এর পর তো তুই পয়ার বাঁধতে শিখবি রে।"

সেটাও যেন সত্যর কাছে কিছু নয় এমন ভাবে বলে, "সে যখন শিখব তখন শিখব, এখন এটা যে-যেখানে আছে সব্বাইকে শিখোতে হবে বুঝলি? আর জটাদাকে দেখলেই— হি হি হি হি।"

পাঁচ

রোদে পিঠটা চিন্‌চিন্ করছে অনেকক্ষণ থেকে, হঠাৎ যেন হু-হু করে জ্বলে উঠল। ওঃ, বকুল গাছের ছায়াটা দাওয়া থেকে সরে গেছে। বেলা তা হলে কম হয় নি। বিপদে পড়লেন মোক্ষদা, দু হাত জোড়া অথচ পিঠের কাপড়টা সরে গিয়ে সরাসরি রোদটা পিঠের চামড়ায় লাগছে। নিজে দেখতে পাচ্ছেন না মোক্ষদা, আর কেউ কাছে থাকলে দেখতে পেত মোক্ষদার হস্তেলরঙা পিঠটার কতকাংশ ফোস্কাপড়ার মত লাল হয়ে উঠেছে।

নাঃ, তসর থানখানা না পরে ভিজে থানখানা পরে আমতেল মাখতে বসলেই হত। ভিজে কাপড়ে যেন দেহের দাহ অনেকটা নিবারণ হয়। কানাউঁচু ভারী ভারী পাথরের খোরা দুখানা খানিকটা টেনে নিয়ে সরে গিয়ে দাওয়ার খুঁটির ছায়াটুকুতে পৃষ্ঠরক্ষা করতে গেলেন মোক্ষদা।

সমুদ্রে তৃণখণ্ড। তাছাড়া রোদ এখন দৌড়চ্ছে, এখুনি খুঁটির ছায়া সরবে।

হঠাৎ মোক্ষদা একটা সত্য আবিষ্কার করে বসলেন। সারা বছরটাই রোদে পুড়ে পুড়ে মলেন তিনি। এই তো কচি আমের আমতেল, এর পরই বাখড়া বাঁধা আমের গুড় আম, মসলা আম, তার পরই পড়ে যাবে আমসত্বর মরশুম। আর সে মরশুমকে সামলে তোলা তো সোজা নয়। আমসত্বর পালা চুকতে চুকতেই অবশ্য বর্ষা নামে, সেই দু-তিনটে মাসই শুধু রোদে পোড়ার ছুটি, বর্ষা শেষ হতেই দুর্গোৎসবের সুর ওঠে। দুর্গোৎসবের আগে সারা ভাঁড়ারটাতেই তো ঝাড়া বাছা রোদে দেওয়ার ধুম চলে, তার পর পড়ে তিলের নাড়ুর ধুম।

বড়িত চাটুয্যের বাড়ির দুর্গোৎসবের তিলের নাড়ু একটা বিখ্যাত ব্যাপার। হাতে বাগিয়ে ধরে কামড় দিতে পারা যায় না এত বড় নাড়ু। পক্কান্ন, আনন্দনাড়ু, মুড়কির মোয়া, সবই কবরেজ বাড়ির বিখ্যাত, কিন্তু সে সব তো তবু পাঁচ হাতের ব্যাপার। নিতান্ত প্রতিমার ভোগের উপযুক্ত সেরকতক জিনিস গঙ্গাজলে ভোগের ঘরে তৈরি হলেও বাকী বিরাট অংশটায় অনেকে হাত লাগায়। কিন্তু তিলের নাড়ুটি সম্পূর্ণ মোক্ষদার ডিপার্টমেন্ট। কারণ তিলের নাড়ুর অমন হাত নাকি—শুধু এ গ্রামে কেন—এ তল্লাটে নেই। তা সেই নাম কি আর অমনি হয়েছে, আগাগোড়া নিজের হাতে রাখেন বলেই না এদিক ওদিক হতে পার না! বস্তা বস্তা তিল তো এসে হাজির হল, তার পর? সেই তিল ঝাড়া-বাছা, নিখুঁত করে ধুয়ে নিপাট করে রোদে শুকিয়ে ঝুনো করা, ঢেঁকিতে কোটা, প্রকাণ্ড পেতলের সরা চড়িয়ে গুড় জ্বাল দিয়ে দিয়ে নিটুট নিশ্ছিদ্দির ধাসায় সেই তিলচুর মেখে মেখে তাড়াতাড়ি গরম থাকতে থাকতে নাড়ু পাকিয়ে ফেলা, এর কোনটা নিজের হাতে না করলে চলে? এক বার বুঝি তিলটা কুটেছিল সেজ বৌতে আর বড় বৌমাতে, সে বার তো নাড়ু 'দয়ে' মজ্‌ল। আগাগোড়া খোসায় ভর্তি। রঙও হল তেমনি কেলে-কিষ্টি। রামকালী নাড়ু দেখে হেসেছিলেন, প্রশ্ন করেছিলেন, 'এ নাড়ু কার তৈরি?'

সেই থেকে সাবধান হয়ে গেছেন মোক্ষদা। ঢেঁকির গডের কাছে কাউকে একটু বসানো ছাড়া আর সব একা করেন।

দুর্গাপুজোয় রোদে পোড়ার কারণ তো শুধুই তিলের নাড়ু নয়, বাড়ি বাড়ি নেমন্তন্নর কথা বলতে যাওয়া, গুরু পুরুতের বাড়ি সিধে দিতে যাওয়া, সে সবও তো মোক্ষদার ডিউটির মধ্যেই। কারণ তিনি ঝিউড়ি মেয়ে। কাশীশ্বরীও কতকটা করেছেন আগে আগে কিন্তু ইদানীং তিনি রোগে কেমন জবুথবু হয়ে গেছেন। মাঠ ঘাট ভেঙে রোদে রোদে ঘুরে কাজ উদ্ধার করার সামর্থ্য নেই। মোক্ষদাই সব করেন, আর দিনে অন্তত বার চোদ্দ-পনেরো স্নান করেন।

কেন কে জানে, আজ রোদের কথাটাই বার বার মনে পডছে মোক্ষদার। মনে হল পুজোর ঝঞ্ঝাট কাটতে না কাটতেই তো বড়ির মরশুম। বছরে বারো-চোদ্দ মন বডি লাগে। আঁশ নিরিমিষ দু দিকের প্রয়োজনের দায়টা পোহানো হয় এই দিকেই, কারণ বড়িও তো আম-কাসুন্দির মতই শুদ্ধাচারের বস্তু। আর শুদ্ধাচারেব ব্যাপারে কাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত হবেন মোক্ষদা নিজেকে ছাড়া?

বড়ি দিতে দিতে মোক্ষদার হত্তেল রঙ কালসিটে মেরে যায়। তবে জিনিস যা হয় দেখে তাক্ লাগবার মত। ডাকসাইটে হাত। সাবধানীও খুব মোক্ষদা, কাউকে ছুঁতেই দেন না সাধ্যপক্ষে, বড় বড় তিজেলে ভরে সরাচাপা দিয়ে 'সাঙা'য় তুলে রাখেন, সময়মত বার করে দেন। কত তার স্বাদ! কুমড়ো বড়ি, খাস্তা বড়ি, পোস্ত বডি, তিলের বড়ি, জিরের বড়ি, ঝালমশলার বড়ি, টকে সুক্তয় দিতে মটর খেসারির বড়ি, বাহাব অনেক।

ওরই মধ্যে মূলোর বড়িটা আবার আলাদা রাখতে হয়, মাঘ মাসে পাছে ভুলে খাওয়া হয়ে যায়। মাঘ মাসে মূলো খাওয়া আর গোমাংস খাওয়ায় তো তফাৎ কিছু নেই। ··খুঁটির রোদটা সরে গেছে, পিঠটা আবার চিনচিন করছে। মনটাও যেন চিনচিন করছে।

বড়িপর্ব সারা হতেই আসে কুল, আসে তেঁতুল।

কবে তবে রোদে পোড়ার ছুটি?

সারা বছর ধরে এই রোদে পোড়ার দায়িত্ব মোক্ষদাকে দিয়েছে কে, একথা কে বলবে? তবে মোক্ষদা জানেন এটা তাঁরই দায়িত্ব।

আমতেল মাখা একটা সময়সাপেক্ষ কাজ। চটকে চটকে তেলে আমে মিশোতে হবে তো? সেটা হয়েছে এতক্ষণে, এবার রাইসরষের মিহিগুঁড়ো ছড়িয়ে দিয়ে ক্রমাগত রোদ খাওয়ানো।

কোমরটা টান করে উঠে পড়লেন মোক্ষদা, পিঠের জ্বালা-করা জায়গাটা নড়াচড়া পেয়ে আর একবার হু-হু করে উঠল। কিন্তু কী আশ্চর্য, সরষে গুঁড়োবার জন্যে রান্নাঘরে এসে ঢুকতেই মনটা 'হু-হু' করে উঠল কেন?

ঘরে ঢুকেই হঠাৎ কেমন বোকার মত দাঁড়িয়ে পড়লেন মোক্ষদা। ঘরটা আজ এত বড় দেখাচ্ছে কেন? কই এমন তো কোন দিন দেখায় না। বরং ভাত বাড়ার সময় পরস্পরের গা বাঁচিয়ে ব্যবধান রেখে ঠাঁই করতে তো জায়গার অকুলানই লাগে।

ঘরের মধ্যে তো রোদ নেই, তবু এই ছায়াশীতল প্রকাণ্ড লম্বা ঘরখানা যেন ওই রোদে খাঁ খাঁ প্রকাণ্ড উঠোনটার মতই খাঁ খাঁ খাঁ খাঁ করছে। আর সেই খাঁ খাঁ করা ঘরের এক প্রান্তে বড় বড় ছুটো উনুন তাদের মাজাঘষা নিকোনো চুকোনো চেহারা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বহু অকথিত শূন্যতার প্রতীকের মত।

উনুন ছুটোকে আজ আর আগুনের দাহ সহ্য করতে হবে না। ওরা হয়তো এই নিরালা ঘরে স্তব্ধ হয়ে বসে নিজেদের শূন্যতার পরিমাপ করবার অবকাশ পাবে।

আজ ওদের ছুটি। আজ এদের একাদশী।

মোক্ষদার ছুটি নেই কেন?

ঘরের নর্দমার কাছ বরাবর একটা জলভর্তি ঘড়া বসানো থাকে—নেহাৎ সময় অসময়ের জন্যে। মোক্ষদাই শেষবারের স্নানের পর এনে রেখে দেন।

তেল-তেল হাতটা ঘড়া কাৎ করে ধুয়ে মোক্ষদা হঠাৎ আছড়া আছড়া জল নিয়ে সজোরে ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন পিঠের রোদে চিন্‌চিনে জায়গাটায়। জলুনি একটু ঠাণ্ডা হোক। দূর ছাই, হাত ধুতে পুকুরে গেলেই হত, তবু একবার গা মাথা ভিজিয়ে আসা যেত। গায়ের চামড়াটা খানিক ভিজলেও যেন ভেতরের তেষ্টাটা খানিক কমে।

একাদশীর দিন 'তেষ্টা' কথাটা মনে আনাও পাপ। এ কি আর জানেন না মোক্ষদা? তায় আবার তাঁর মত বয়স-ভাঁটিয়ে-যাওয়া শক্তপোক্ত মজবুত বিধবার। কিন্তু 'মনে করব না' বললেও মনে যদি এসে যায়, সে পাপকে তাড়ানো যায় কোন্ অস্ত্রে?

রোদ লাগলে বোশেখ-জষ্টির ছুপুরে তেষ্টাটা জানান দেয় বেশী, কিন্তু উপায় কি? আজকেই যে যত রাজ্যের বাড়তি কাজ করবার পরম দিন। আজকের মত এমন অখণ্ড অবসর আর ক'দিন জোটে?

রাইসরষের সন্ধানে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখা রঙিন ফুলকাটা ছোট ছোট ছোবা-হাঁড়ির একটা পাড়লেন মোক্ষদা। সব হাঁড়িতে একেবারে সম্বৎসরের মশলা ঝেড়ে বেছে তুলে রাখা হয়, আর নিত্য প্রয়োজনে ছুটি ছুটি বার করে কাচা ন্যাকড়ার কোণে কোণে পুঁটুলি বেঁধে রাখা হয়। শুধু এরকম অ-নিত্য-প্রয়োজনেই মূল ভাঁড়ারে হাত পড়ে।

একটা পাথর বাটিতে আন্দাজ মত সরষে ঢেলে নিয়ে শিল পেতে বসতে যাচ্ছিলেন মোক্ষদা, হঠাৎ দরজার কাছে শিবজায়ার গলা বেজে উঠল, "কালে কালে কি হল গো, এ যে কলির চারপো পূরল দেখছি। আমাদের ধিঙ্গী অবতার মেয়ের আস্‌পদ্দার কথাটা শুনেছ ছোট্‌ঠাকুরঝি?"

ধিঙ্গী অবতার মেয়ের আস্‌পদ্দার ইতিহাস শোনার আগেই ভাজের আসপদ্দায় রে রে ক'রে ওঠেন মোক্ষদা, "উঠোনের পায়ে তুমি দাওয়ায় উঠলে সেজবৌ? আর ওইখানেই

আমার আচারের খোরা! বলি তোমরা সুদ্ধ যদি এ রকম যবন হও—"

শিবজায়া ঈষৎ রুষ্টভাবে বলেন, "তোমার এক কথা ছোট্‌ঠাকুরঝি, উঠোনের পায়ে দাওয়ায় উঠে আসব আমি অমনি অমনি? এই দেখ পায়ে হাতে গোবর লেগে। হাতে করে এক নাদ এনে পৈঠের নীচেয় ফেলে সেই গোবর দু পায়ে মাড়িয়ে তবেই না উঠেছি!"

নিতান্ত পক্ষে পুকুরে নেমে পা ধুয়ে আসা যদি অসম্ভব হয়, তা হলে অনুকল্প হিসেবে এই ব্যবস্থা দিয়ে রেখেছেন মোক্ষদা। তবু সেজবৌয়ের আশ্বাসবাণীতে তেমন নিশ্চিন্ত হলেন না। সন্দিগ্ধ স্বরে বললেন, "বলি গোবরটা নিজেদের তো? না কি আর কারুদের ঘরের এঁটোকাটা খাওয়া গরুর?"

"শোন কথা—" জেরা থামানোর চেষ্টায় বলে ওঠেন শিবজায়া, "আমাদের উঠোনে আবার অপরের গরুর গোবর আসবে কোথ্‌থেকে?"

কিন্তু থামাতে চাইলেই কি সব জিনিস থামে? মোক্ষদার জেরাও থামল না। তিনি একটু কটুহাস্যে বলে উঠলেন, "ও মা লো! আমাদের উঠোনে অন্যের গরুর গোবর আসবে কোথ্‌থেকে! তোমার কথা শুনে মাঝে মাঝে মনে হয় সেজবৌ, তুমি যেন এই মাত্তর মায়ের পেট থেকে পড়লে!"

শিবজায়া ননদকে খুব ভয় করলেও, তবু ছোট ননদ। তাই বিরক্ত স্বরে বলে ফেলেন, "নাও বাবা, তোমার কাছে আসাই দেখছি ঝকমারি। গোবিন্দ-বাড়ি থেকে ফিরতে পথে আমাদের কীত্তিমান মেয়ের কীত্তির কথা শুনে হাঁ হয়ে গেলাম তাই, থাক গে—"

মোক্ষদা এতক্ষণে একটু নরম হন। প্রায় সন্ধির স্বরেই বলেন, "কেন, কী আবার করল কে? সত্য বুঝি?"

"তবে আবার কে!" শিবজায়া ঔদাসীন্য ত্যাগ করে মহোৎসাহে পুরনো সুর ধরেন, "সত্য ছাড়া আর কার এত বুকের পাটা হবে? হারামজাদী নাকি জটার নামে ছড়া বেঁধে পাড়ার গুষ্টিসুদ্ধ ছেলেমেয়েকে শিখিয়ে দিয়েছে, আর গাঁ সুদ্ধ ছেলে-পিলে জটাকে কি জটার মাকে দেখলেই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে শুনিয়ে শুনিয়ে তাই আওড়াচ্ছে। জটার মা তো রেগে গাল দিয়ে শাপশাপান্ত করে একাকার।"

শেষ পর্যন্ত সবটুকু শোনবার জন্যে ধৈর্য ধরে চুপ করে তাকিয়েছিলেন মোক্ষদা, এবার ভুরু কুঁচকে তীক্ষ্মস্বরে বলে ওঠেন, "ছড়া বেঁধেছে মানে কি?"

"মানে কি, তাই কি ছাই আমিই আগে বুঝতে পেরেছিলাম? মেয়েমানুষ যে আবার ছড়া বাঁধে বাপের জন্মেও শুনি নি। তা'পর পথে আসতে আসতে দেখি এক পাল ছোঁড়া হি হি করে হাসতে হাসতে বলছে 'জটা মোটা পা গোদা—', ভেংচি কেটে আরও সব কত কি পয়ার ছন্দ বলতে বলতে যাচ্ছে।"

মোক্ষদা আরও ভুরু কুঁচকে বলেন, "ছড়া বেঁধেছে সত্য?"

"তবে আর বলছি কি?"

"ওই মেয়ে হতেই এ বংশের মুখে চুনকালি পড়বে"—মোক্ষদা এবার শিলটা পাততে পাততে বলেন, "রামকালী চন্দর এখন বুঝছেন না, এর পর টের পাবেন, যখন শ্বশুরঘর থেকে ফেরত দিয়ে যাবে। ভেঙ্‌চি কাটা ছড়া বোধ হয় জটা বৌ ঠেঙিয়েছিল বলে ?"

"তবে না তো কি ? বলি পরিবারকে আবার না মারে কোন্ মদ্দ ? চলানি বৌ অমনি তিসকে. তাল করে, দাঁতকপাটি লাগিয়ে পাড়ার লোক জানাজানি করে ছাড়লেন। জটার মা বলছে ছোঁড়াগুলোর জ্বালায় নাকি জটা বেচারা ঘরের বার হতে পারছে না। কি গেরো বল দেখি ?"

মোক্ষদা ঘস ঘস করে শিলে সরষে রগড়াতে রগড়াতে বলেন, "হাতের কাজটা মিটিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমি বৌমার কাছে। ভাল করে সমঝে দিয়ে আসছি। মায়ের আশকারা না থাকলে মেয়ে কখনও এতবড় বেয়াড়া হয় ? পাড়ার ছোঁড়াদের সঙ্গেই বা রাতদিন এত মস্করা কিসের ? একটা কলঙ্ক রটে গেলে তখন রামকালীর মুখটা থাকবে কোথায় ? পয়সাওলা বলে তো আর সমাজ রেয়াৎ করবে না।"

শিবজায়ার কাজ কিছুটা সিদ্ধ হল।

বড়জায়ের নাতনীর বিরুদ্ধে ছোট ননদকে কিছুটা তাতাতে পেরেছেন। শেষবেশ বলেন, "তুমি যাই আছ ছোট্‌ঠাকুরঝি, তাই এখনও সংসারে একটা হক্ কথা হয়, নইলে আমরা তো ভয়ে কাঁটা।"

"ভয় আবার কিসের।"

মোক্ষদা দুম্ করে শিলটা তুলে ফেলে বলেন, "ভয় আবার কিসের ? ভয় করব ভূতকে, ভয় করব ভগবানকে। মানুষকে ভয় করতে যাব কেন ? বিধবা পিসীকে ভাত দিয়ে পুষছে বলে যে হক কথা শুনতে হবে না রামকালীকে, এ তুমি ভেবো না সেজবৌ। সে যাক, জটার বৌ'র প্রাচিত্তিরের কিছু ব্যবস্থা হয়েছে ?"

"ওমা, তুমি শোন নি সে কথা ? প্রাচিত্তির তো করবে না।"

"করবে না।"

"না। রামকালী নাকি ভটচায্‌কে শাসিয়েছে প্রাচিত্তিরের বিধেন দিলে তাকে গাঁ ছাড়া করবে।"

"তার মানে ?" আকাশ থেকে পড়লেন মোক্ষদা।

"মানে বোঝ। অহমিকা আর কি। আমি গাঁয়ের মাথা, আমি যা খুশি তাই করব।"

"হুঁ।"

মোক্ষদা সরষে-গুঁড়ো ছড়ানো আচারের খোরা দুটো দুম দুম করে ঘরে তুলে, ঘরের কপাটটা টেনে শেকল তুলে দিয়ে বলেন, "যাচ্ছি। দেখছি পয়সার বাড় কত বেড়েছে রামকালীর। সত্য আছে বাড়ি ?"

"বাড়ি ?' দুপুরবেলা বাড়ি থাকবারই মেয়ে বটে সে ! কোথায় আগানে-বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বে'ওলা মেয়ের এত বুকের পাটা, এতখানি বয়সে দেখি নি কখনও।"

তসরখানা গুছিয়ে পরে উঠোন পার হয়ে থর থর পায়ে বেড়ার দরজা খুলে পথে পড়লেন মোক্ষদা। ফিরে তো স্নান করতেই হবে, এক বার কেন, কত বার, কিন্তু এ সবের একটা হেস্তনেস্ত দরকার।

জগতের কোথাও কোন অনাচার ঘটবে, এ মোক্ষদা বরদাস্ত করতে পারবেন না।

কিন্তু ও কী !

একটু এগোতেই থমকে দাঁড়াতে হল।

বজ্রাহতের মতই থমকানি।

দেখলেন একখানা তেপেড়ে শাড়িতে গাছকোমর বেঁধে, একরাশ রুক্ষ চুল উড়িয়ে, এক হাঁটু-ধুলো মেখে একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে আমবাগানের মাঝখান দিয়ে চলেছে সত্য হি হি করতে করতে, আর সমস্বরে কি যেন একটা ছড়ার মতই আওড়াতে আওড়াতে।

দাঁতে দাঁত চেপে আরও একটু এগিয়ে গেলেন মোক্ষদা, দলের পিছন দিকে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে সবটা শুনতে চেষ্টা করলেন। হি হি হাসির চোটে সব কি শোনাই যায় ছাই ? তবু বালকণ্ঠের শানানো স্বর, আর বার বার উচ্চারণ করছে, কাজেই ক্রমশঃ সবটাই কর্ণগোচর থেকে মর্মগোচর হয়ে যায়।

শুনতে পেলেন খাঁজে খাঁজে হাসি ছড়ানো সেই ছড়া—

"জটাদাদা পা গোদা
যেন ভোঁদা হাতী,
বৌ-ঠেঙানো দাদার পিঠে
ব্যাঙে মারে লাথি।
জটা জটা পেট মোটা—
ভাত মারবার ধাড়ী,
দেখবে মজা, কেমন সাজা
যাও না শ্বশুরবাড়ি।"

বলতে বলতে চলে গেল ওরা।

মোক্ষদা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

না, ভাইপোর মেয়ের কবিত্বশক্তির পরিচয়ে অভিভূত হয়ে নয়, স্তম্ভিত হলেন এ মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। একে তিনি শাসন করতে এসেছেন ! এর পরে আর একে শাসন করে শায়েস্তা করবার সাধ তাঁর নেই। শুধু এইটে মনে মনে অনুধাবন করলেন—একে নিয়ে চিরকাল জ্বলে-পুড়ে মরতে হবে তাঁদেরই, কারণ শ্বশুরবাড়ি থেকে তো মারতে মারতে খেদিয়ে দেবেই।

কাগজের চিলতেয় মোড়া গোটাকতক ওষুধের বড়ি আঁচলের গিঁঠ থেকে খুলতে খুলতে সত্য তার শানানো গলাটাকে কিঞ্চিৎ নামিয়ে বলল, "এই নাও বৌ, কি যেন বটিকা। বাবা বলে দিলেন সকাল সন্ধ্যে একটা করে বটিকা পানের রস দিয়ে খেতে। গায়ে বল পাবে।"

আর গায়ে বল!

মনের বল তো সমুদ্রের তলায়। ভয়ে বুক কেঁপে থর-থর। জটার বৌ কাতর করুণ কণ্ঠে ফিস্‌ফিস্ করে বলে, "হেই ঠাকুরঝি, তোমার পায়ে ধরি, ওষুধ তুমি নিয়ে যাও। ওষুধ খাচ্ছি দেখলে ঠাকরুন আর আমাকে আস্ত রাখবেন না।"

সত্য গিন্নীর মত গালে হাত দিয়ে বলে, "ওমা! শোনো বিত্তান্ত! দেহ দুব্বল হয়েছে, মিনি মাগ্‌নায় ওষুধ পাচ্ছ, খেলে শাউড়ী তোমায় মেরে ফেলবে? তুমি যে তাজ্জব করলে গা!"

"দোহাই গো ঠাকুরঝি,. একটু আস্তে—" প্রায় কাঁদো কাঁদো মুখে বলে জটার বৌ, "তোমার দুটি পায়ে পড়ছি, ঠাকরুনের কানে গেলে পুকুরে ডুবে মরা ছাড়া আর গতি থাকবে না আমার।"

সত্য এবার একটু গুছিয়ে বসে, বসে অবাক গলায় আস্তে আস্তে বলে, "কী শুনলে গো?"

"ওই যে মেরে ফেলার কথা বললে। জানো তো ভাই সমস্ত? মামাঠাকুর ওষুধ পাঠিয়ে দিয়েছেন, আর সেই ওষুধ আমি খাচ্ছি! ওরে বাপরে! এই দেখ ঠাকুরঝি আমার বুকের ভেতর কেমনতর ঢেঁকির পাড় পড়ছে।"

জটার বৌয়ের এই ব্যাধের তাড়া খাওয়া হরিণের চোখের মত চোখ আর ঘুঁটের ছাইয়ের মত পাঁশুটে-রঙা মুখের দিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন চিন্তাশীল দেখায় সত্যবতীকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ওষুধগুলো ফের আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে বলে, "আচ্ছা, তা হলে ফেরত নে যাই।"

ফেরত!

মামাঠাকুরের কাছে!

আর এক ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে জটার বৌয়ের। আর এবার আর কাঁদো কাঁদো নয়, ভ্যাঁক্ করে কেঁদেই ফেলে।—"ও সত্য ঠাকুরঝি, তোমার পা-ধোওয়া জল খাই, তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকি, ও বড়ি মামাঠাকুরকে ফেরত দিতে যেও না।"

ফেরত দিতে যেও না!

হঠাৎ সত্য তার নিজের স্বভাবসিদ্ধ হাসি হেসে ওঠে, "এই সেরেছে! ব্যায়রামে পড়ে দেখছি তোমার ভিমরতি ধরেছে বৌ! শাউড়ীর ভয়ে ওষুধ খাবেও না আবার ফেরতও দেবে না, তবে বড়িগুলো কি আমি খেয়ে নেব? দাও, তা হলে একখোরা পানের রস করে দাও, সবগুলো একসঙ্গে গুলে গিলে ফেলি।"

জটার বৌ এবার মনের কথা খুলে বলে। শাশুড়ীর অসাক্ষাতে ওষুধ খাবার সাহস তার নেই, বলে কয়ে সাক্ষাতে খাবার তো আরোই নেই, অতএব—

অতএব পুকুরের জলে।

"পুকুরে ?"

সত্যর চোখে আগুন জলে ওঠে। "বাবার দেওয়া বড়ি স্বয়ং ধন্বন্তরী, তা জান ? এ বড়ির অপমান করলে, ধন্বন্তরীর অপমান তা জান ?"

"তবে আমি কী করি ?"

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে জটার বৌ।

সত্য ওর অবস্থা দেখে কাতর না হয়ে পারে না, একটু ভেবেচিন্তে বলে, "তা হলে নয় এক কাজ করি, পিসীকেই দিয়ে যাই, বলি বাবা পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাবা অবিশ্যি বলেছিলেন পিসীকে দিস নি, তা হলে খেতে দেবে না, ফেলে দেবে। তুতিয়ে পাতিয়ে কাকুতি মিনুতি করে বলে যাই।"

উঠে দাঁড়ায় সত্য, আর সঙ্গে সঙ্গে ওর কাপড়ের একটা খুঁট ধরে হুমড়ে প্রায় ওর পায়ে পড়ে জটার বৌ, "ও ঠাকুরঝি, তার চাইতে তুমি আমার গলায় পা দিয়ে মেরে রেখে যাও, আঁশবটি দে' কেটে রেখে যাও আমায়।"

সত্য আবার বসে পড়ে।

একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, "আচ্ছা বৌ, তোমাদের এত ভয় কিসের বলতে পার ?"

ছয়

হুম্ হুম্ হুম্!

শুধু হাঁটু পর্যন্ত আটফাটা পাগুলোই নয়, জিভে মুখেও ধুলো বেটে যাচ্ছে বেহারাগুলোর। জ্যৈষ্ঠের দুপুর আর দুরন্ত মেঠো রাস্তা। খানিক খানিক পথ তো একেবারে ধূ-ধূ-প্রান্তর, গাছ নেই ছায়া নেই। পথ সংক্ষেপের জন্য মাঝে মাঝে মাঠ ভাঙতে হচ্ছে বলেই লোকগুলো যেন আরো একেবারে জেরবার হয়ে যাচ্ছে। চারটে লোক পালা করে কাঁধ বদলে বদলে ছুটছে, তবু থেকে থেকে ঝিমিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু রামকালীরও তো আর এখন পাল্কি-বেহারাগুলোর ওপর দরদ দেখাবার উপায় নেই। আজ চার দিন গাঁ ছাড়া, "তো-ধর মো-ধর" না হলেও হাতে কটা রুগী ছিল, কে জানে কেমন আছে সে কটা।

গিয়েছিলেন জীরেটের জমিদারবাড়িতে রুগী দেখতে। শুধু তো এক আধখানা গাঁয়ে নয়, দশখানা গাঁ অবধি নামডাক্ বদ্যি চাটুয্যের।

রাজার আদরে রেখেছিল ওরা, আর পায়ে ধরে সাধছিল আরও দুটো দিন থেকে যাবার

জন্যে। রাজী হন নি রামকালী। বলে এসেছেন, "প্রয়োজন নেই, যে ওষুধ দিয়ে গেলাম এতেই রুগী তিন দিনে উঠে বসবে। তবে পথ্যাপথ্যের যা ব্যবস্থা দিয়ে যাচ্ছি সেটি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা চাই।"

কবিরাজ মশাই পথে খাবেন বলে ওরা এক ঝুড়ি "কলমের আম" ওঁর পাল্‌কির মধ্যে তুলে দিয়েছে, আপত্তি শোনে নি। পা ছড়াতে অনবরত ঝুড়িটা পায়ে ঠেকছে আর বিরক্তি বোধ করছেন রামকালী। এই এক আপদ! পথে তিনি কিছু খান না, একথা ওরা মানতেই চাইল না। স্বয়ং জমিদার মশাই দাঁড়িয়ে তুলিয়ে দিলেন। তবু মুখ কাটা ডাব গোটা-চারেক পাল্‌কিতে তুলতে দেন নি রামকালী, বলেছিলেন, "ব্যায়রাগুলো তা হলে আপনার বাগানের ওই ফলটলগুলোই বয়ে নিয়ে যাক রায়মশাই, আমি পদব্রজেই যাই।"

সম্পূর্ণ তৈরী আম, জ্যৈষ্ঠের দুপুরের ঝলসানি হাওয়ায় একেবারে শেষ তৈরি হয়ে উঠে, থেকে থেকে মিষ্ট সুবাস ছড়াচ্ছিল। রামকালী বিরক্ত হচ্ছিলেন, আর বেহারাগুলো যেন অন্তর দিয়ে সেই সুবাসটুকুই লেহন করছিল। আর ভাবছিল ডাব-চারটে পাল্‌কির বাঁকে বেঁধে নিলেই বা ক্ষতি কি ছিল? তবু তো "কেষ্টর জীবে"র ভোগে লাগত!

অন্যমনস্ক হয়ে বোধ হয় একটু ঝিমিয়ে এসেছিল তারা। হঠাৎ চমকে উঠল কর্তার হাঁকে।

পাল্‌কি থেকে মুখ বাড়িয়ে রামকালী হাঁকছেন, "ওরে বাবা সকল, ঘুমিয়ে পড়িস নে, একটু পা চালা।"

কথাটা শেষ করেই হঠাৎ স্বর-ফের্তা ধরলেন কববেজ। "এই দাঁড়া দাঁড়া, আস্তে কর, পেছনে হঠাৎ যেন আর একটা পাল্‌কির শব্দ পাচ্ছি।"

চার বেহারার আটখানা পা থমকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, শব্দ একটা আসছে বটে পিছন থেকে। হঠাৎই আসছে। হুম্‌ হুম্‌ আওয়াজটা ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে।

প্রধান বেহারা গদাই ভুঁইমালী পাল্‌কির বাঁক থেকে ঘাড় সরিয়ে পিছন সড়কের দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল কণ্ঠে বলে ওঠে, "আজ্ঞে কর্তামশাই, নিয্যস বলেছেন বটে! পালকিই একটা আসছে, মনে নিচ্ছে কোন বিয়ের বর আসছে।"

বিয়ের বর!

রামকালী পাল্‌কি থেকে গলাটা আরও একটু বাড়িয়ে এবং সে গলার স্বরটাকে অনেকখানি বাড়িয়ে বলেন, "বিয়ের বর এ খবরটা আবার চট্‌ করে কে দিয়ে গেল তোকে?"

গদাই ভুঁইমালী মাথা চুলকে বলে, "পাল্‌কির কপাটে হলুদ ছোপানো ন্যাকড়া ঝুলছে দেখতে পাচ্ছি কর্তা, ব্যায়রাগুলোর পরনে লালছোপ্‌ খেঁটে!"

'খেঁটে'টা হচ্ছে ধুতির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আরও অনেক শ্রমজীবীদের মত পালকি বেহারাদেরও পুরো ধুতি পরা চলে না। জোটেই বা কই? ছালার মত মোটা সাতহাতি

খেঁটেই তাদের জাতীয় পোশাক। লোকের বাড়ি কাজে-কর্মে বিয়ে-পৈতেয় লাল রঙে ছোপানো ওই ধুতি মাঝে মাঝে তাদের জোটে। এতে সুবিধেটা খুব। মাস তিন-চার 'ক্ষার' না কেচে চালানো যায়।

লাল হলুদ রঙটাই শুধু নয়, ক্রমশ মানুষগুলোও স্পষ্ট হচ্ছে। গদাই আরও একটা উৎফুল্ল আবিষ্কার করে, "পশ্চাতে গো-গাড়িও আসছে কত্তা, বলদের গলার ঘন্টি শুনতে পাচ্ছি। এ আর বরযাত্রীর না হয়ে যায় না। ইদিকেই কোথাও বে। .উই পাশের গাঁর সড়ক দিয়ে বেরিয়েছে।

"পাল্‌কি নামা।"

গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম করেন রামকালী।

দেখা দরকার প্রকৃত ঘটনা গদাইয়ের আন্দাজ অনুযায়ীই কিনা। আর এও জানা দরকার যদি সত্যিই তাই হয়, কে এমন দুর্বিনীত আছে তাঁর গ্রামে, যে ব্যক্তি মেয়ের বিয়ে দিতে বসেছে, অথচ রামকালীকে জানায় নি। আর এ গ্রামেব যদি নাও হয়, খোঁজ নেওয়াও চাই, গ্রামের ওপর দিয়ে বর-বরযাত্রী নিয়ে যাচ্ছে কোথায়।

রামকালীর মনে যাই থাক, বেহারাগুলো একটুখানির জন্যেও বাঁচল। একটা পাকুড গাছ-তলায় পাল্‌কি নামিয়ে, খানিক তফাতে গিয়ে কাঁধের গামছা ঘুরিয়ে বাতাস খেতে লাগল।

কত্তামশায়ের চোখের সামনে তো আর বাতাস খাওয়া চলে না।

কিছুক্ষণ পরেই দূরবর্তী পাল্‌কি অদূরবর্তী, এবং ক্রমশঃ নিকটবর্তী হল।

রামকালী বেরিয়ে পড়ে কাঁধের মটকার চাদরখানা গুছিয়ে কাঁধে ফেলে রাজোচিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে হাঁক দিলেন, "কে যায় ?"

পাল্‌কি থামল। না থেমে এগিয়ে যাবার সাধ্য কার আছে, এই কণ্ঠকে উপেক্ষা করে ?

পাল্‌কি থামল।

বর আর বরকর্তা এতে সমাসীন। বরকর্তার সঙ্গে সঙ্গে কিশোর বরটিও সভয়ে একটু মুখ বাড়াল।

ওই দীর্ঘকায় গৌরকান্তি পুরুষ মাটিতে নেমে দাঁড়িয়ে, অতএব কে পালকি চডে বসে থাকতে পারে তাঁর সামনে ?

সে পাল্‌কি থেকেও নামলেন বরকর্তা।

করজোড়ে বললেন, "আপনি আজ্ঞে ?"

রামকালীর কিন্তু তখন ভুরু কুঁচকেছে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টির শরসন্ধান চলছে পালকির মধ্যে। তবু অভ্যাসবশতঃই দুই হাত তুলে প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে বললেন, "আমি রামকালী চাটুয্যে।"

"রামকালী চাটুয্যে !"

ভদ্রসন্তান বিহ্বল হয়ে—না আত্মগত, না প্রশ্নসূচক, কেমন যেন আল্‌গা ভাবে উচ্চারণ করলেন, "কবরেজ।"

"হ্যাঁ! ছেলেটির কপালে চন্দন দেখলাম মনে হল, বিবাহ না কি?"

সে ভদ্রলোক রামকালীর চাইতে বয়সে ছোট না হলেও বিনয়ে কীটানুকীটের মত ছোট হয়ে পায়ের ধুলো নিয়ে বলেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ। ওঃ, কী পরম ভাগ্য আমার যে এই শুভ-যাত্রায় আপনার দর্শন পেলাম।"

রামকালীর দৃষ্টির সেই শরসন্ধান বন্ধ হল না, তবু মৃদু হেসে বললেন, "চেনেন আমায়?"

"আহাহা! আপনাকে চেনে না এ তল্লাটে এমন অভাগা কে আছে? তবে নাকি চাক্ষুষ দর্শনের সৌভাগ্য ইতিপূর্বে হয় নি। রাজু, বেরিয়ে এসে পায়ের ধুলো নাও।"

"থাক্ থাক্, বিয়ের বর!" রামকালী স্বভাবসিদ্ধ গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলেন, "আপনার পুত্র?"

"আজ্ঞে না ভ্রাতুষ্পুত্র। পুত্র আমার কনিষ্ঠ সহোদরের। সে আছে পেছনে গো-যানে। আরও সব আত্মকুটুম্ব আসছেন তো।"

"হুঁ"। কন্যাটি কোথাকার?"

"আজ্ঞে এই যে 'পাটমহলের'। পাটমহলের লক্ষ্মীকান্ত বাড়ুয্যের পৌত্রী—"

"লক্ষ্মীকান্ত বাড়ুয্যের পৌত্রী?" রামকালী যেন সহসা সচেতন হলেন, "তাই নাকি? আপনারা কোথাকার? আপনার ঠাকুরের নাম?"

"আমরা বলাগড়ের। ঠাকুরের নাম ঈশ্বর গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়, পিতামহের নাম ঈশ্বর গুণধর মুখোপাধ্যায়, আমার নাম—"

"থাক্ আপনার নামে প্রয়োজন নেই। তা হলে আপনারা মুখুটি কুলীন? তা হাবভাব এমন যজমেনে ভট্‌চাযের মতন কেন? কিন্তু সে যাক্, দুটো কথা আছে আপনার সঙ্গে। বর নিয়ে বেরিয়েছেন কখন?"

'যজমেনে ভটচায' শব্দটায় ঈষৎ ক্ষুব্ধ হয়ে পাত্রের জ্যেঠা গম্ভীর ভাবে বলেন "আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধের পর।"

"সে তো বুঝলাম, কিন্তু সেটা কত বেলায়?"

"এই এক প্রহরটাক্ আগে হবে।"

"হুঁ! পাত্রের কপালের ওই চন্দনরেখা কি সেই তখনকারই না কি?"

চন্দনরেখা!

ও আবার কেমন প্রশ্ন?

পাত্রের জ্যেঠা নানাবিধ প্রশ্নের সম্মুখীন হবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিলেন, কিন্তু পাত্রের কপালের চন্দনরেখাঙ্কনের কালনির্ণয়ের মত এমন অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত ছিলেন না। তাই অবোধের মত বলেন, "কি বলছেন?"

"বলছি, ছেলের কপালে ওই যে চন্দন পরানো হয়েছে, ওটা কি সেই যাত্রাকালেই ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই !" পাত্রের জ্যেঠা সোৎসাহে বলেন, "যাত্রাকালে মেয়েরা যেমন পরিয়ে দেয় তেমনিই দওয়া হয়েছে। আমাদের বাড়ির মেয়েদের বুঝলেন কি না, এসব ব্যাপারে খুব নামডাক আছে। পাড়া থেকে ডাকতে আসে পিঁড়ি আলপনা দিতে, শ্রী গড়তে, বরকনে সাজাতে—"

রামকালী ওই পালকির দিকে তাকাতে তাকাতে আবার কেমন অন্যমনা হয়ে পড়েছিলেন, ইত্যবসরে পশ্চাৎবর্তী গোরুর গাড়ি দুখানা এসে পড়েছে। পাল্‌কি নামানো এবং অপর এক পাল্‌কির আরোহীর সঙ্গে বাক্যবিন্যাসের ব্যাপার দেখে ঈষৎ ঘাবড়ে গিয়ে বরের বাপও নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন।

অন্যমনা রামকালী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে গাঢ় স্বরে বলেন, "আমি আপনাকে একটি অনুরোধ করছি মুখুয্যে মশাই, আপনি যাত্রা স্থগিত করুন।"

যাত্রা স্থগিত করুন !

বিবাহযাত্রা। হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন বরের জ্যেঠা আর বরের বাপ।

লোকটা পাগল না শয়তান ! না কনের বাড়ীর সঙ্গে গভীরতম কোন শত্রুতা আছে !

ওদিকে ঘাম ছুটে যাচ্ছে বেহারাদের, রোদ্দুরটা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। দু পাল্‌কির বেহারারা অদূরে দাঁড়িয়ে পরস্পর বাক্য বিনিময় করে ব্যাপারটা অনুধাবন করার চেষ্টা করতে ঘন ঘন এদিকে তাকাচ্ছে কখন পাল্‌কি তোলার ডাক পড়ে।

ব্যাপারটা যে একটা কিছু হচ্ছে এ অনুমান করে ইত্যবসরে গরুর গাড়ি থেকে এক ব্যক্তি লাফিয়ে নেমে পড়েছেন, যিনি হচ্ছেন বরের পিসে। গাড়ির ছইয়ের মধ্যে গলদঘর্ম হয়ে আসতে আসতে এমনিতেই মেজাজ তাঁর চড়ে উঠেছিল, নেমেই যাত্রা স্থগিতের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বললেন, "কে মশাই আপনি ? ভাঙ্‌চি দেবার আর জায়গা খুঁজে পান নি ? যাত্রা করে বর বেরিয়েছে, পথের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে ভাঙ্‌চি দিচ্ছেন ?"

মুখুয্যে ভ্রাতৃদ্বয় ভগ্নিপতির এ হেন দুর্বিনয়ে বিচলিত হয়ে তাড়াতাড়ি বলে ওঠেন, "আঃ গাঙ্গুলী মশাই, কাকে কি বলছেন ? ইনি কে তা জানেন ?"

"জানতে চাইনে মুখুয্যে, থামো তুমি। যে ব্যক্তি এ হেন অর্বাচীনের ন্যায় কথা কয়—"

"চোপ্‌রাও।" হঠাৎ যেন ঘুমন্ত বাঘ জেগে উঠে গর্জে উঠল, "চোপ্‌রাও বামুনের ঘরের কুষ্মাণ্ড !"

"মুখুয্যে !" চেঁচিয়ে উঠল বাঘের পর খেঁক্‌শিয়াল, "দাঁড়িয়ে অপমানিত হবার জন্যে

তোমার ছেলের বিয়ের বরযাত্তর আসি নি। ইটি বোধ হয় তোমার কোন বড় কুটুম্ব? তা এঁকে নিয়েই বিয়ে দেওয়াও গে, আমি চললাম।”

“আহাহা, করেন কি গাঙ্গুলী মশাই! ইনি হচ্ছেন আমাদের সাতখানা গাঁয়ের মাথা, কবিরাজ চাটুয্যে মশাই! অবশ্যই অনিবার্য কোন কারণে ইনি যাত্রা স্থগিতের আদেশ—”

“কবরেজ চাটুয্যে! অঁ্যা!”

গাঙ্গুলীর কাছার কাপড় আলগা হয়ে পড়ে, তিনি সহসা আধবিঘৎটাক জিভ বার করে, সে জিভ দাঁতে কেটে, দু হাতে দু কান মলে, বয়সের মর্যাদা ভুলে আভূমি প্রণাম করে বসে।

রামকালী প্রণামরতের প্রতি দৃক্‌পাত মাত্র না করে সমান স্থৈর্যের সঙ্গে বলেন, “হ্যাঁ, অনিবার্য কারণেই বলছি মুখুয্যে মশাই, যাত্রা স্থগিত রাখুন। নইলে অকারণ আপনাদের পুত্রের বিবাহযাত্রা স্থগিত রাখতে বলব, এমন অর্বাচীন সত্যিই আমি নই।”

বড় মুখুয্যে দু হাত কচলে বলেন, “আজ্ঞে তা আর বলতে! মানে ইয়ে লক্ষ্মীকান্ত বাবুর বংশে কোন দোষ—”

“আঃ মুখুয্যে মশাই অনুগ্রহ করে আমাকে অত ইতর ভাববেন না! আমি বলছি পুত্রের বিয়ে দিতে গিয়ে আপনি বিপদে পড়বেন। আপনার পুত্র অসুস্থ!”

পুত্র অসুস্থ! এ আবার কি প্যাঁচের কথা!

এ যে ঠিক সমুদ্রের দিক থেকে পাথর ছুটে আসা। এ পাথরের আশঙ্কা তো ছিল না।

কন্যাপক্ষে কোন গোলমাল আছে, এবং ইনি অবশ্যই কন্যাপক্ষের কোন ‘বিশেষ হিতৈষী’, এইটাই ভাবছিলেন মুখুয্যেরা। যেটা স্বাভাবিক। তা নয়, পথের মাঝখানে আটকে এ কী উল্টো চাপ!

“পুত্র অসুস্থ! বলেন কি কবিরাজ মশাই? এ যে একটা অসম্ভব কথা বলছেন। অমন সুস্থ সহজ পুত্র আমার। উপবাসে ও মধ্যাহ্ন কালের উত্তাপে বোধ করি ঈষৎ শুষ্ক দেখাচ্ছে।” ছোট মুখুয্যে কাতর ভাবে বলেন।

“না, শুষ্ক দেখাচ্ছে না।” রামকালী জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, “বরং বিপরীত। রীতিমত রসস্থই দেখাচ্ছে, লক্ষ্য করলেই টের পাবেন। আমি গোড়াতেই লক্ষ্য করে-ছিলাম, এবং আপনাকে নিবৃত্ত করবার সংকল্প নিয়েই আটকেছি। ছেলেটির চেহারায় আমি শিরঃশূলী-সান্নিপাতিকের লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি। বিবাহসভায় নিয়ে গিয়ে সঙ্কটে পড়বেন। বাড়ি ফিরে যান, কন্যার বাড়িতে সংবাদ দিন।”

বরের পিসে পূর্ব বিনয় ভুলে আবার সহসা রুখে ওঠেন, “ভ্যালা ঝামেলা করলে তো দেখছি। আজ বিবাহ, রাত্রির প্রথম প্রহরে লগ্ন, এখন ছেলেকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব, আর কন্যাপক্ষকে সংবাদ দেব পাত্র অসুস্থ? এ কি ছেলের হাতের মোয়া না কি? বুঝতে পাচ্ছি আপনি কন্যাপক্ষের একজন মস্ত হিতৈষী।”

রামকালীর গৌরমুখ রোদের তাতে এমনিতেই লাল টকটকে হয়ে উঠেছিল, এবার আগুনের মত গনগনে দেখাল।

তবু উত্তেজিত হলেন না।

সতাচ্ছিল্যে গাঙ্গুলীর প্রতি একটা কটাক্ষপাত করে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, বিশেষ হিতৈষী। লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে মশাই আমার মাতুলের সতীর্থ, পিতৃতুল্য। তাঁর পৌত্রীটি যে বিবাহরাত্রেই বিধবা হয় এটা আমার অভিপ্রেত হতে পারে না।"

নির্মল নির্মেঘ আকাশ থেকে যেন বজ্রপাত ঘটল।

এ কী সর্বনেশে অলক্ষণের কথা!

এ কী অভিশাপ, না অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের প্রলাপ? মুখুয্যেরা গলায় পৈতে হাতে 'হাঁ হাঁ' করে উঠলেন।

রামকালী নিবাত নিষ্কম্প দীপশিখা,—কঠিনহৃদয় বিচারক অপরাধীর প্রতি মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিয়েও যেমন স্থির থাকে, তেমনি অচল অটল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অভিশাপ দেওয়া হল না, পৈতে হাত থেকে ছেড়ে মুখুয্যেরা কেঁদে উঠলেন, "এ কী বলছেন কবরেজ মশাই?"

"কি করব বলুন, আমি মুখের উপর স্পষ্ট বলতে চাই নি, আপনারাই বলালেন। শুনুন, যদি হিত চান, এখনও পুত্রকে তার জননীর কাছে নিয়ে যান। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি স্বয়ং 'কাল' ওর শিয়রে দাঁড়িয়ে। আর বেশী বাক্যব্যয়ে সময়ের অপচয় করবেন না, তা ছাড়া আপনারা উচাটন হলে পুত্র বিহ্বল হবে।"

কিন্তু মুখুয্যেরাও তো রক্তমাংসের মানুষ। ওদেরও বিশ্বাস-অবিশ্বাস দিয়ে তৈরী মন। যে ছেলে পাল্‌কির মধ্যে দিব্যি বসে রয়েছে, মাঝে মাঝে মুখ বাড়িয়ে দেখেও নিচ্ছে কী হচ্ছে এখানে, যার কপালে এখনও চন্দনের রেখা জ্বল জ্বল করছে, আর গলার মালা থেকে সুগন্ধ বিকীরণ করছে, সামান্য একটা মানুষের কথায় বিশ্বাস করে বসবেন যে, সে ছেলের শিয়রে শমন দাঁড়িয়ে! আর সেই কথায় বিশ্বাস করে একটা নিরীহ ভদ্রলোককে মরণান্তক সর্বনাশের গহ্বরে নিক্ষেপ করে মূঢ়ের মত 'যাত্রা-করা' বর নিয়ে ফিরে যাবেন? বাঁড়ুয্যেদের হবে কি? কন্যা ভ্রষ্টলগ্না হওয়া মৃত্যুর চাইতে কি কিছু কম?

না এ অসম্ভব! নিশ্চয় এ কোন চক্রান্ত!

হয় এই চাটুয্যের সঙ্গে লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের ঘোরতর কোন শত্রুতা আছে, নচেৎ এই লোকটা আদৌ কবরেজ চাটুয্যেই নয়। কোন ক্ষ্যাপাটে বামুন! তবু এই ব্যক্তিত্বের প্রভাবের সামনে কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্ছে। আর সন্তানের সম্পর্কে অত বড় অভিশাপসদৃশ বাণী!

ছোট মুখুয্যে একবার অদূরবর্তী পাল্‌কির দিকে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাস-বক্ষে বলেন, "আমি তো রোগের কোন লক্ষণ দেখছি না কবরেজ মশাই!"

রামকালী একটু বিষাদব্যঞ্জক হাসি হাসেন, "তা দেখতে পেলে তো আমার সঙ্গে আপনার কোন প্রভেদই থাকত না মুখুয্যে মশাই! আসুন, এদিকে সরে আসুন। দেখছেন তাকিয়ে ছেলের ললাটে ওই চন্দনরেখা? সদ্য চন্দনের মত আর্দ্র। অথচ বলছেন এক প্রহরকাল আগে চন্দন পরানো হয়েছে! তা হলে সে চন্দন এতক্ষণে শুকিয়ে খড়ি হয়ে যাবার কথা। হয় নি। কারণ চোরা সান্নিপাতিকে সর্ব শরীর রসস্থ হয়ে উঠেছে—"

"এই কথা!" হঠাৎ পাত্রের জ্যেঠা হেসে ওঠেন, "কবিরাজ মশাই, খুব সম্ভব পথশ্রমে আপনি কিছু অধিক ক্লান্ত, তাই লক্ষণনির্ণয়ে ভুল করছেন। গ্রীষ্মকালে ঘর্ম-নির্গমের দরুণ চন্দন শুকিয়ে ওঠবার অবকাশ পায় নি, এই তো কথা! ওহে বেয়ারারা, চল চল। পালকি ওঠাও। শুভযাত্রায় এ কী বিপত্তি!"

লক্ষণনির্ণয়ে ভুল করেছেন রামকালী! রামকালীর নিজেরই মাথার শিরা ফেটে যাবে নাকি?

একবার নিজের পাল্‌কির দিকে অগ্রসর হতে উদ্যত হলেন রামকালী, কিন্তু আবার কি ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে আরও ভারী গলায় বললেন, "শুনুন মুখুয্যে মশাই, রামকালী চাটুয্যের লক্ষণনির্ণয়ে ভুল হয়েছে, এ কথা যদি অন্য কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণ করতেন, সে ঔদ্ধত্যের সমুচিত উত্তর পেতেন। কিন্তু এখন আপনার সঙ্কট সময়, ওদিকে বাঁড়ুয্যেরাও বিপন্ন, তাই মার্জনা পেয়ে গেলেন। লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের বাড়ি এখনই সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন, এবং সে কাজ আমাকেই করতে হবে। প্রয়োজন হলে পাল্‌কি ছেড়ে দিয়ে ঘোড়া নিতে হবে। তবে আপনাকে শেষ সাবধানের কথা জানিয়ে যাচ্ছি, ছেলেটির মাথার শিরা ছিঁড়ে ভিতরে রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে, চোখের শিরার রং এবং রগের শিরার স্ফীতির দিকে লক্ষ্য করলে আপনিও ধরতে পারবেন। মনে হচ্ছে খানিক বাদেই বিকার শুরু হবে। জানানো আমার কর্তব্য বলেই জানিয়ে দিলাম। বলেছিলেন না লক্ষণনির্ণয়ে ভুল? ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, রামকালী কবরেজের বিচারে যেন ভুলই হয়ে থাকে। রোদের ঘামকে 'কাল ঘাম' ভাবার ভ্রান্তিই তার হয়েছে, এই যেন হয়। আর কি বলব! আচ্ছা নমস্কার।...ওরে গদাই, তোল পাল্‌কি। পা চালিয়ে একবার বসিরের ওখানে চল দিকি, ঘোড়াটাকে নিতে হবে।"

পাল্‌কি চলতে শুরু করেছে হঠাৎ ছুটে এলেন ছোট মুখুয্যে, প্রায় ডুকরে কেঁদে চীৎকার করে উঠলেন, "কবরেজ মশাই, এতবড় সর্বনাশের কথা বললেন যদি তো একটু ওষুধ দিলেন না?"

রামকালী গম্ভীর বিষণ্ণ ভাবে হাতটা একটু নেড়ে সে হাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "দেবার হলে আপনাকে বলতে হত না, আমি নিজেই দিতাম। কিন্তু এখন আর স্বয়ং ধন্বন্তরীর বাবারও সাধ্য নেই।"

ও পাল্‌কিতে তখন বড় মুখুয্যে উঠে পড়ে বিরক্তভাবে বলে ওঠেন, "দুর্গা-দুর্গা, যত সব

বিঘ্ন ! যাত্রাকালে কার মুখ দেখে বেরোনো হয়েছিল ! কোথা থেকে এক উৎপাত জুটে—এই রাজু, অমন ঢুলছিস কেন ? গরমে কষ্ট হচ্ছে ?"

রাজু রক্তবর্ণ দুটি চোখ মেলে বলে, "না জ্যেঠামশাই, শুধু বড্ড শীত করছে।"

সাত

আঁচল ডুবিয়ে নাড়া দিয়ে দিয়ে তলার জল ওপরে আর ওপরের জল তলায় করছিল ওরা তপ্ত জল শেতল করতে। বেলা পড়ে এসেছে, তবু পুকুরের জল টগবগিয়ে ফুটছে। এ জলে নেমে ঝাঁপাই ঝুড়লে গা ঠাণ্ডা হবার বদলে দাহই হয়, তবু জলের আকর্ষণ বড় আকর্ষণ, তাই বেলা পড়তেই জলে পড়া চাই পাড়ার নবীনাকুলের।

চাটুয্যে-পুকুরের জল 'তোল মাটি ঘোল' করছিল পুণ্যি টেঁপি পুঁটি খেঁদি প্রমুখ নবী--নারা। সত্য কেন এখনো এসে হাজির হয় নি তাই ভাবছে ওরা, আর অনুপস্থিত সত্যর সন্তোষ বিধানের জন্যেই বোধ করি জল শেতল করার অভিযানটা এত জোর কদমে চালাচ্ছে। সত্য ওদের প্রাণপুতুল।

সত্য কি শুধুই তাদের দলনেত্রী ?

ভগবান জানেন কোন্ গুণে সত্য সকলের হৃদয়নেত্রীও। 'সত্য'-বিহীন খেলা ওদের শিবহীন দক্ষযজ্ঞেরই সামিল। পুকুরে ঝাঁপাই ঝোড়ার ব্যাপারে সত্যই রোজ অগ্রণী, তাই ওরা বার বার ফুটন্ত জলকে তলা-ওপর করতে করতে এ ওকে প্রশ্ন করছিল, "সত্যর কি হল রে ?" "ঘরে তো দেখলাম না ?" "বলেছিল তো ঠিক সময় দেখা হবে," "বাগানে কোথাও আছে না কি এখনো ?" "দূর, একা একা কি আর বাগানে ঘুরবে ? বে'ওলা মেয়ে, ভয় নেই পেরাণে ?" "ভয় ! সত্যর আবার ভয় ! দেখিস ও শ্বশুরবাড়ী গিয়ে শাউড়ী পিস্‌শাউড়ীকেও ভয় করবে না !" "তা আশ্চয্যি নেই, ও যা মেয়ে !"

সত্য যে তার সমস্ত সখী-সঙ্গিনীদের প্রাণের দেবতা, তার প্রধান কারণ বোধ হয় সত্যর এই নির্ভীকতা। নিজের মধ্যে যে গুণ নেই, যে সাহস নেই, সে-গুণ সে সাহস অন্যের মধ্যে দেখতে পেলে মোহিত হওয়া মানুষের স্বভাবধর্ম। নির্ভীকতা ব্যতীতও আরও কত গুণ আছে সত্যর। খেলাধুলোর ব্যাপারে সত্যর উদ্ভাবনী শক্তির জুড়ি নেই, বল আর কৌশল দুইই তার অন্যের চাইতে এক শ' গুণ। মোটাসোটা একটা গাছের কাটা গুঁড়িকে দড়ি বেঁধে একা টেনে আনা সত্যবতীর পক্ষে আদৌ অসম্ভব নয়, আবার সেই গাছের গুঁড়িকে গড়িয়ে পুকুরের জলে ফেলে ডিঙি বানানোও সত্যর কৌশলেই সম্ভব।

এর ওপর আবার 'পয়ার' বাঁধা !

পয়ার বাঁধার পর থেকে পাড়ার সমস্ত ছোট ছেলে-মেয়েই তো সত্যর পায়ে বাঁধা পড়েছে। সেই সত্যর জন্য জল শেতল করছে ওরা এ আর বেশী কথা কি। কিন্তু সত্যর এত দেরি

কেন ? এদিকে যে এদের মেয়াদ ফুরিয়ে আসছে। ঠাকুমা-পিসীরা এক বার চৈতন্য পেয়ে খোঁজ করলেই তো 'হয়ে' গেল !

নেহাৎ না কি ঠিক এই সময়টুকুই অভিভাবিকাদলের কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রার সময়, তাই এদের এই অবাধ স্বাধীনতা। হ্যাঁ, এই পড়ন্ত বেলাতেই গিন্নীরা একটু গড়িয়ে পড়েন। সারা বছর তো নয়, (মেয়েমানুষের দিবানিদ্রার মত অলুক্ষুণে ব্যাপার আর কি আছে সংসারে ?) নেহাৎ এই আমের সময়টা।

আমের যে একটা 'নেশা' আছে।

গিন্নীরা বলেন, 'আমের মদ'।

আম খাও বা না খাও, এ সময়ে শরীর টিস্ টিস্ করবেই। অবশ্য না খাওয়ার প্রশ্ন ওঠেই না। আম-কাঁটাল আবার কে না খায় ? হরু ভট্চাযের মার মত কে আর আম-হেন বস্তুকে জগন্নাথের নামে উৎসর্গ করতে পারে ? হরু ভট্চায্যের মা সেবার শ্রীক্ষেত্তর গিয়ে ওই কাণ্ড করে এসেছেন, 'ক্ষেত্তর করার' পর জগন্নাথকে ফল দিতে হয় বলে আম ফলটি দিয়ে এসেছেন। মনের আক্ষেপে সেবার হরু ভট্চায্ আমবাগান বেচে দিতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন, "মার ভোগেই যদি না লাগল তো, আমবাগানে আমার দরকার ?" তা ভট্চায্যের মা ছেলেকে হাতে ধরে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করেছিলেন, বলেছিলেন "বাবা আজন্মকাল তো খেয়ে এলাম, তবু খাওয়ার লালস ঘোচে না, তাই বলি যে দব্যিতে এত আসক্তি, সেই দব্যিই জগন্নাথকে উচ্ছুগ্যু করব। তাই বলে তুই বাগান নষ্ট করবি ? ছেলেপুলে খাবে না ?"

ছেলেপুলে বুড়ো-যুবো আমের ভক্ত সবাই। আমের মরশুমে দিনে এক কুড়ি দেড় কুড়ি আম খাওয়া তো কিছুই না।

অবশ্য সব আম সবাই খায় না।

অর্থাৎ পায় না।

সংসারে সদস্যদের শ্রেণীহিসেবেই আমের শ্রেণী হিসেব করে ভাগ হয়। কর্তাদের নৈবেদ্যে লাগে "জোড় কলম", গোলাপখাস, ক্ষীরসাপাতি, নবাব-পসন্দ, বাদশা ভোগ, চাউশ্, ফজলী ইত্যাদি, গিন্নীদের ভোগের জন্যে সরানো থাকে পেয়ারাফুলি, বেলসুবাসী, কাশীর চিনি, সিঁদুরেমেঘ।

আর বৌ ঝি ছেলেপুলের ভাগ্যে জোটে 'রাশি'র আম। তা রাশি রাশি না পেলে যাদের আশ মিটবে না তাদের জন্যে রাশির বরাদ্দ ছাড়া আর কি বরাদ্দ হতে পারে ? বাড়ির ঝুড়ি ঝুড়িতেই কি ওদের আশা মেটে ? দু বেলাই জলখাবারে ঝুড়ি ঝুড়ি তো পায়, কারণ গিন্নীরা প্রকৃতির এই দাক্ষিণ্যের সময় মুড়িভাজা পর্বটি থেকে কিঞ্চিৎ রেহাই নেন। কিন্তু হলে কি হবে, বাড়ি থেকে 'মধুকুলকুলি' আমের পাহাড় শেষ করেই ওরা তক্ষুনি ছোটে হয়তো বা "বৌ পালানে" কি "বাঁদর ভ্যাবাচ্যাকা" আমের বাগানে। বাঘা তেঁতুলের বাবা

জাতীয় সেই আমগুলি পার করার সহায় হচ্ছে মুঠো মুঠো নুন। অবিশ্যি তুচ্ছ হলেও বস্তুটা সংগ্রহ করতে বালকবাহিনীকে বিশেষ বেগ পেতে হয়, কারণ ওর আশ্রয়স্থল যে একেবারে রান্না-ভাঁড়ার। যেটা নাকি সম্পূর্ণ গিন্নীদের এলাকা। আর যে গিন্নীরা হচ্ছেন একেবারে সহানুভূতিহীনতার প্রতীক। ছেলেপুলেদের সব কিছুতেই তো তাঁরা খড়্গহস্ত। নুন একটু চাইতে গেলেই প্রথমটা একেবারে তেড়ে মারতে আসবেন জানা কথা! তবে নাকি ছেলেগুলোর খুব ভাগ্যের জোর যে, প্রায় সব সময়ই ওরা ওনাদের অস্পৃশ্য। কাজেই মারতে আসলেও মারতে পারেন না। তারপর বহুবিধ কাকুতি-মিনতির পর যদি বা দেবেন তো, সে একেবারে সোনার ওজনে। দেবেন আর সঙ্গে সঙ্গে বলবেন, "যাচ্ছিস তো আবার টক্ বিষ আমগুলো গিলতে? ঘরে এত খায় তবু আশ মেটে না গা! কী রাক্ষুসে পেট গো, কী লক্ষ্মীছাড়া দিশে! মরবি মরবি রক্ত-আমাশা হঁয়ে মরবি। সবগুলো একসঙ্গে 'মনসা তলা'য় যাবি। যতসব পাপগুলো একত্তর জুটেছে।"

গালমন্দ-বিহীন লবণ?

সে ওরা কল্পনাও করতে পারে না।

তবে সত্য আগে আগে চরণ মুদির দোকান থেকে বেশ খানিকটা সংগ্রহ করে আনতে পারত, কিন্তু ইদানীং অর্থাৎ বড় হয়ে ইস্তক মুদির দোকানে ভিক্ষে করতে ওর লজ্জা করে। বড় জোর দূরে দাড়িয়ে থেকে নিতান্ত একটা শিশুকে লেলিয়ে দেয়।

কবরেজের মেয়ে বলে সমাজে সত্যর কিছুটা প্রতিষ্ঠা আছে।

সে প্রতিষ্ঠার মর্যাদাটাও তো রাখতে হয়?

আজ দুপুরে আমবাগান পর্বে সত্য ছিল, তার পর কখন একসময়ে যেন বাড়ি চলে গিয়েছিল।

খেঁদি একটু কল্পনা-প্রবণ, তাই সে বলে, "সত্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে কেউ আসে নি তো?"

"দুর! শ্বশুরবাড়ি থেকে আবার শুধু শুধু কেউ আসবে কেন? আর আসেও যদি, সত্যর সঙ্গে কি? যে আসবে সে তো চণ্ডীমণ্ডপে বসবে।"

সহসা পুঁটি চেঁচিয়ে ওঠে, "আসছে, আসছে!"

"আসছে! বাবা, ধড়ে পেরাণ পাই।"

"এত দেরি কেন রে সত্য? আমরা সেই কখন থেকে জল ঠাণ্ডা করছি।"

সত্য বিনাবাক্যে গম্ভীর ভাবে ঘাটের পৈঠের ভাঙাচোরা বাঁচিয়ে জলে নামে।

"কিরে সত্য, মুখে কথা নেই যে? বাবা, আজ এত পায়া-ভারী কেন রে তোর?"

সত্য একমুখজল নিয়ে কুলকুচো করে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলে, "পায়া-ভারী আবার কি!

মনিষ্যির রীত-চরিত্তির দেখে ঘেন্না ধরে গেছে!"

"ওমা, কেন রে? কাকে দেখে? কার কথা বলছিস?"

সত্য জলন্ত স্বরে বলে, "বলছি আমাদের জটাদার বৌয়ের কথা! গলায় দড়ি! গলায় দড়ি! মেয়েজাতের কলঙ্ক!"

সত্যর বয়েস ন'বছর, অতএব সত্যর পক্ষে এ ধরনের বাক্যবিন্যাস অসম্ভব, এমন কথা ভাববার হেতু নেই। শুধু সত্য কেন—নেহাৎ হ্যাকাহাবা মেয়ে ছাড়া, সে আমলে আট ন বছরের মেয়েরা এ ধরনের বাক্যবিন্যাসে পোক্তই হত! না হবে কেন? চার বছর বয়স থেকেই যে তাকে পরের বাড়ি যাওয়ার তালিম দেওয়া হত, আর বয়স্থাদের মহলেই বিচরণের ক্ষেত্র নির্বাচন করা হত। সেই ক্ষেত্রে 'শিশু' বলে কোন কথাই বাদ দেওয়া হত না তাদের সামনে।

কাজেই সত্য যদি কারো উপর খাপ্পা হয়ে তাকে 'মেয়েজাতের কলঙ্ক' বলে অভিহিত করে থাকে, আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পুণ্যি তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করে ওঠে, "কেন রে, কি হয়েছে?"

"যম জানে!" বলে প্রথমটা খানিকক্ষণ যমের উপর ভার ফেলে রেখে, অতঃপর সত্য মুখ খোলে, "জন্মে আর ওর মুখ দেখছি না! ছি ছি! গেছলাম, বলি আহা, সোয়ামী শাউড়ীর ভয়ে রোগের ওষুধটুকু পর্যন্ত খেতে পায় না, যাই একবার দেখে আসি কেমন আছে। সেজপিসী তারকেশ্বর গেছে শুনেছি, মনটা তাতেই আরও খোলসা ছিল। ওমা, গিয়ে ঘেন্নায় মরে যাই, কী তুষ্‌পিবিত্তি, কী তুষ্‌পিবিত্তি!"

এরা শঙ্কিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, না-জানি কোন্ ভয়ঙ্কর কাহিনী উদ্‌ঘাটন করে বসে সত্য।

শুধু পুণ্যি ভয়ে ভয়ে বলে, "কি দেখলি রে?"

"কি দেখলাম? বললে পেত্যয় করবি? দেখি কি না ঘরে জটাদা বসে, আর বৌ কিনা তাকে পান সেজে দিচ্ছে, আর হাসি-মস্করা করছে।"

জটাদা!

খেঁদি পুঁটি টেঁপি সকলে একযোগে বলে ওঠে, "ও হরি! এতেই তোর এত রাগ! শাউড়ী বাড়ি নেই, তাতেই বুকের পাটাটা বেড়েছে আর কি?"

"বুকের পাটা বেড়েছে বলে পান সেজে খাওয়াবে? হাসি-মস্করা করবে?" সত্য যেন ফুলতে থাকে।

পুণ্যি আরও ভয়ে ভয়ে বলে, "তা পরপুরুষ তো আর নয়? নিজের সোয়ামী—"

"নিজের সোয়ামী!" সত্য ঝটপট বার দুই কুলকুচো করে বলে, "খ্যাংরা মারো অমন সোয়ামীর মুখে! যে সোয়ামী লাথি মেরে যমের দক্ষিণ দোরে পাঠায় তার সঙ্গে আবার হাসি-গপ্প? গলায় দিতে দড়ি জোটে না? আবার আমায় কি বলেছে জানিস? 'আমার

সোয়ামী আমায় মেরেছে, তোমায় তো মারতে যায় নি ঠাকুরঝি ? তোমার এত গায়ে জ্বালা কেন যে ছড়া বেঁধে গালমন্দ করতে আস ?' এর পর আবার আমি ওর মুখ দেখব ?"

আঁচলটাকে গা থেকে খুলে জোরে জোরে জলের ওপর আছড়াতে থাকে সত্য।

সখীবাহিনী কিঞ্চিৎ বিপদে পড়ে।

ওরা অভিযুক্ত আসামীনীকে খুব একটা দোষ দিতে পারে না, কারণ স্বামী একদা একদিন বেদম মেরেছে বলে যে জন্মে আর সে স্বামীকে পান সেজে খাওয়ানো চলবে না, এতটা কঠোর ক্ষমাহীন মনোভাব তাদের পক্ষে আয়ত্ত করা শক্ত। অথচ সত্যের কথার সমর্থন না করলে চলে না।

কিন্তু ওকি ! ওকি ! ও কিসের শব্দ !

হঠাৎ বুঝি ওদের বিপদে রক্ষা করলেন মধুসূদন ! পুকুর পাড়ের রাস্তায় তালগাছের সারির ওদিকে যেন অশ্বক্ষুরধ্বনি ধ্বনিত হল।

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ না ?

ঘোড়ায় চড়ে কে আসে ?

পুণ্যি তড়বড় করে ঘাটে উঠে এগিয়ে দেখে পড়ি তো মরি করে ছুটে আসে, "এই সত্য, মেজদা !"

মেজদা !

অর্থাৎ রামকালী !

সত্য অবিশ্বাসের হাসি হেসে মুখ ভেঙিয়ে বলে ওঠে, "স্বপ্ন দেখছিস্ না কি ? বাবা না জীরেটে গেছে ?"

"আহা, তা সেখেনে তো আর বাস করতে যায় নি ? আসবে না ?"

ইত্যবসরে ক্ষুরধ্বনি একবার কিছুটা নিকটবর্তী হয়েই, ক্রমশঃ দূরবর্তী হয়ে যায়।

সত্য গলা বাড়িয়ে এক বার দেখতে চেষ্টা করে, তার পর নির্লিপ্ত ভাবে বলে, "যেমন তোমার বুদ্ধি ! বাবা বুঝি ঘোড়ায় চড়ে জীরেটে গেছল ? না কি পালকিটা মাঝরাস্তায় ঘোড়া হয়ে গেল ?"

'পাল্কি ! তাও তো বটে।' পুণ্যি দ্বিধাযুক্ত স্বরে বলে, "আমি কিন্তু সত্য দেখলাম মেজদা, আর মেজদার ঘোড়াটা। বাড়ির দিকেই তো গেল।"

তা গেল বটে। তবে কি হঠাৎ জীরেটের সেই রুগীর 'নেয়-দেয়' অবস্থা ঘটেছে ? তাই হঠাৎই কোন মোক্ষম ওষুধের দরকার পড়েছে ? যার জন্যে পাল্কি রেখে ঘোড়ায় চড়ে ছুটে আসতে হয়েছে চিকিৎসক রামকালীকে।

খেঁদি বলে,"যাই হোক বাপু সত্য, তুই বাড়ি যা। কবরেজ-জ্যাঠা ভিন্ন এ গেরামে ঘোড়াতেই বা চড়বে কে ?"

এ কথাটাও খাঁটি।

ঘোড়া আর আছেই বা কার? এ অঞ্চলে কালেকস্মিনে বর্ধমান রাজ্যের কোন কর্মচারী কি কোম্পানির কোন লোক, ঘোড়ায় পিঠে চড়ে আসে, নইলে ঘোড়া কে কোথায় পাচ্ছে?

ঘাট থেকে উঠে পড়ে সত্য-বাহিনী।

এখন প্রথমটা সকলেরই সত্য-ভবনে অভিযান। কারণ ঘোড়া-রহস্য ভেদ না করে কে স্থির থাকতে পারবে?

ভিজে কাপড়ে জল সপ্‌সপিয়ে আর মলের গোছা বাজিয়ে ওরা রওনা হল, কিন্তু এ কী তাজ্জব! এ যে একেবারে রূপকথার গল্পর মত!

সত্যদের বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছতে না পৌঁছতে হাঁ হয়ে দেখে ওরা, রামকালী ফের ফিরে যাচ্ছেন ঘোড়া হাঁকিয়ে, শুধু এবারে বাড়তির মধ্যে তাঁর পিছনে পিঠ আঁকড়ে আর এক জন বসে!

সে জনটি হচ্ছে, সত্যর বড়দা।

রামকালী চাটুয্যের বৈমাত্র ভাই কুঞ্জবেহারির বড় ছেলে রাসবেহারী!

পুণ্যির কথাই সত্যি বটে। অশ্বারোহী ব্যক্তি রামকালীই। কিন্তু এ নিয়ে এখন আর বাহাদুরি ফলায় না পুণ্যি, শুধু হাঁ করে অনেকক্ষণ ঘোড়ার পায়ের দাপটে ঠিকরে ওঠা ধুলোর ঝড়ের দিকে তাকিয়ে থেকে নিশ্বাস ফেলে বলে, "ব্যাপার কি বল তো?"

"আমিও তো তাই ইন্‌তাম করছি।" সত্য অবাক ভাবে বলে, "ওষুধ নিতে আসবে যদি বাবা, তো বড়দাকে পিঠে বেঁধে নিয়ে যাবে কেন?"

"সেই তো কথা!"

প্রচণ্ড গরম, তবু জল সপ্‌সপে ভিজে কাপড়ের ওপর হাওয়ার ডানা বুলিয়ে যাওয়ার দরুণ গাটা কেমন সিরসির করে এল। সত্য এবার 'হাঁ-করা' ভাব ত্যাগ করে বিচক্ষণের সুরে বলে, "নে নে চল, দোরে দাঁড়িয়ে গুলতুনি করে আর কি হবে? বাড়ি গেলেই টের পাব, কি হয়েছে! তোরা যা, ভিজে কাপড় ছেড়ে আয়। আমি দেখি গিয়ে কি হয়েছে!"

কি হয়েছে!

যা হয়েছে তা একেবারে সত্যর হিসেবের বাইরে। শুধু সত্যর কেন, সকলেরই হিসেবের বাইরে। ঘোড়ায় চড়ে ঝড়ের বেগে এসে সমগ্র সংসারটার উপর যেন প্রকাণ্ড একখানা পাথর ছুঁড়ে মেরে ফের ফিরে গেছেন রামকালী। সেই পাথরের আঘাত সহজে কেউ সামলাতে পারছে না।

সত্য ভেতরবাড়ির উঠোনে ঢুকে দেখল, উঠোনের মাঝখানে বসানো মরাই ছুটোর

মাঝখানে যে সরু জমিটুকু, সেইখানে দাঁড়িয়ে আছে বড়জ্যেঠী, ঠিক যেন কাঠের পুতুলটি, আর দাওয়ার পৈঠের গালে হাত দিয়ে কাঠ হয়ে বসে তার ঠাকুমা এবং দাওয়ার ওপর জটলা বেঁধে বাড়ির আর সবাই।- শুধু যা পিসঠাকুমাই অনুপস্থিত।

অবশ্য সেটাই স্বাভাবিক, কারণ তিনি এই যবনাচারী দাওয়ায় কখনো পা ঠেকান না। এ দাওয়ায় রাস্তা-বেড়ানে ছেলেপুলে ওঠে, কর্তাদের খড়ম ওঠে।

পিস্ঠাকুমা না থাক্, আর সবাই তো জটলা করছে। কেন করছে? অথচ কারো মুখে বাক্যি নেই কেন? ফিস ফিস কথা, ঘোমটার ভেতর হাত-মুখ নাড়ানাড়ি। সত্য ঠাকুমার যতটা সম্ভব গা বাঁচিয়ে গা ঘেঁষে বসে পড়ে সাবধানে ইশারায় প্রশ্ন করে, "কি হয়েছে গো ঠাক্মা?"

দীনতারিণী নীরব।

অতঃপর সত্য সরব।

"ও ঠাক্মা, বাবা অমন করে ছুটে এসেই আবার কোথায় গেল?"

দীনতারিণী মৌন।

"কী গেরো! কথার উত্তুর দিচ্ছ না কেন গো? ও ঠাক্মা, বাবা জীরেট থেকে অমন হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোড়া ছুটিয়ে এলই বা কেন, আবার ছুটলই বা কেন? অ ঠাক্মা, বলি তোমাদের সব বাক্যি হরে গেল কেন?"

এবারও দীনতারিণীর ঠোঁট নড়ে না, তবে ঠোঁট নাড়েন তাঁর সেজ জা শিবজায়া। শুধু ঠোঁট নয়, সহসা পা মুখ সব নড়িয়ে তিনি বলে ওঠেন, "বাক্যি হরে যাবার মতন কাণ্ড ঘটলে আর হরবে না? তোর বাবা যা অভাবনী কাণ্ড করে গেল!"

"বাবা, বাবা, খুলেই বল না পষ্ট করে। বাবা জীরেট থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে এসেই তক্ষুনি আবার কোথায় গেল?"

"অ, তবে তো দেখেইছিস! তবে আর ন্যাকা সাজছিস কেন? রাসুকে নে গেল তোর বাবা বে দিতে।"

"বে দিতে! ধ্যেৎ!" সত্য পরিস্থিতির মর্যাদা ভুলে হি হি করে হেসে গড়িয়ে পড়ে, "আহা আমায় যেন ন্যাকা পেয়েছে সেজঠাকুমা, তাই পাগল বোঝাচ্ছে। বড়দার বুঝি বে হতে বাকি আছে? বলে ছেলের বাবাই হয়ে গেল বড়দা।"

"গেল তার কি?" এবার হঠাৎ দীনতারিণী মৌন ভঙ্গ করে নাতনীকে ধমকে ওঠেন, "বড্ড তো দেখছি ট্যাকটেঁকে কথা হয়েছে তোর? ছেলের বাবা হলে আর বে করতে নেই? মহাভারত অশুদ্ধু হয়ে যায়?"

সত্য উত্তর দেবার আগে শিবজায়াই সাংসারিক মাৎস্যন্যায় ভুলে ফস্ করে বড় জায়ের মুখের ওপর বলে বসেন, "মহাভারত অশুদ্ধুর কথা হচ্ছে না দিদি, তবে এও বলি রামকালী যে একেবারে কাউকে চোখে কানে দেখতে দিলে না, চিলের মত ছোঁ মেরে নে গেল ছেলেটাকে,

বালস-পোয়াতি বৌটা, যাত্রাকালে সোয়ামীকে একবার দূরে থেকে চোখের দেখাটুকু পর্যন্ত দেখতে পেল না, এটা কি ভাল হল ?"

কখন যে ইতিমধ্যে মোক্ষদা এসে দাঁড়িয়েছেন এপাশের বেড়ার দরজা দিয়ে, এবং আলোচনার শেষাংশটুকু শুনে নিয়েছেন, সে আর কেউ টের পায়নি। মোক্ষদার থান ধুতি গুটিয়ে হাঁটুর ওপর তোলা, কাঁধে গামছা, অর্থাৎ স্নানে যাচ্ছেন মোক্ষদা। অবিশ্যি স্নানে যাচ্ছেন বলেই যে এই 'ভেতরবাড়ির' অর্থাৎ শয়নবাড়ির উঠোনে তিনি পা দিতেন তা নয়, তবে আজকের কথা স্বতন্ত্র। আজকের উত্তেজনায় অত মরণ-বাঁচন জ্ঞান রাখলে চলে না, আজ নয় ঘাটে দু-দশটা ডুব দিয়ে ফের দীঘিতে ডুব দিতে যাবেন, তবু এদের মজলিশে যোগ দেওয়াটা দরকার।

মোক্ষদা সেজ ভাজের কথাটুকু শুনতে পেয়েছেন, এবং তাতেই সমগ্র নাটকটি অনুধাবন করে ফেলেছেন। তাই তিনি তিন আঙুলে হেঁটে খানিকটা এগিয়ে এসে গলা বাড়িয়ে বলে ওঠেন, "কী বললে সেজবৌ, কী বললে ? আর এক বার বল তো শুনি ?"

শিবজায়া অবশ্য আরও এক বার বললেন না, শুধু মাথার কাপড়টা অল্প টেনে মুখটা একটু ফেরালেন।

মোক্ষদা একটু বিষ-হাসি হেসে বলেন, "বলতে অবিশ্যি আর হবে না, কানে প্রেবেশ করেছে সবই। তবে ভাবছি সেজবৌ তুমি হঠাৎ এমন ভটচাযি্য হয়ে উঠলে কবে থেকে ? যাত্রাকালে রাম্বর আমাদের, পরিবারের সঙ্গে চোখোচোখি হয় নি এই আক্ষেপে মরে যাচ্ছ তুমি ? কলি আর কত পূন্ন হবে ? চারকাল হয়ে তো কলি এখন উপচোচ্ছে! শুভকাজে যাত্রাকালে লোক ঠাকুর-দেবতার পট দেখে বেরোয়, গুরুজনের চরণ দর্শন করে বেরোয় এই তো জানি, জেনে এসেছি এতকাল! পরিবারের বদন দর্শন না করে বেরোলে জাত যায়, এটা তুমিই প্রেথম্ শোনালে সেজ বৌ!"

শিবজায়া ননদকে ভয় করলেও এত জনের মাঝখানে হেরে যেতে রাজী হন না, তাই বলে ওঠেন, "রাম্বর কথা আমি বলি নি ছোট ঠাকুরঝি, বড় নাত-বৌয়ের কথা বলছি! আবাগী জানল না শুনল না, আচমকা মাথায় পাহাড় পড়ল, আপনার সোয়ামী একা আপনার থাকতে থাকতে এক বার শেষ দেখাও দেখতে পেল না ; সেই কথা হচ্ছে।"

মোক্ষদা সহসা খলখলিয়ে হেসে ওঠেন, "অ সেজবৌ, আর কেন ঘরে বসে আছ ? যাত্রার পালা বাঁধ না! সত্য পয়ার বেঁধেছে—তুমিই বা বাকী থাক কেন ? যা তোমাদের মতিগতি দেখছি, এ আর গেরস্ত-ঘরের যুগ্যি নয়। বুড়োমাগী তুমি, চারকাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে, লজ্জা এল না ও কথা মুখে আনতে ? সোয়ামী কি মণ্ডা মেঠাই, যে একলা আস্তটা না খেতে পেলে পেট ভরবে না, ভাগ হয়ে গেলে প্রাণ ফেটে যাবে ? ছি ছি! একটা ভদ্দরলোকের কত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার করতে ছুটল রামকালী, আর তার কাজের কিনা ব্যাখ্যানা বসেছে!"

বড়দের এই বাক্‌যুদ্ধের মাঝখানে সত্য হাঁ করে তাকিয়েছিল, মোক্ষদার কথা শেষ হতেই ঠাকুমার কোলের গোড়া থেকে উঠে সরে এসে বলে বসে, "সেজঠাকুমা তো ঠিকই বলেছে পিসঠাকুমা! নিয্যস বাবার অন্যাই হয়েছে!'

বাবার অন্যায়! সন্দেহযুক্ত নয়, একেবারে 'নিয্যস'!

উঠোনে কি বাজ পড়ল!

কলিকাল শেষ হয়ে কি প্রলয় এল?

আট

দুঃসংবাদের সঙ্গে সঙ্গেই অন্দরে কান্নার রোল উঠল। এ কী হরিষে বিষাদ! এ কী বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এমন দুর্ঘটনা আর কবে কার সংসারে ঘটেছে? এত বড় সর্বনাশের কল্পনা দুঃস্বপ্নেও কে কবে করেছে?

এই তো এইমাত্র মেয়ে কলাতলায় শিলে দাঁড়িয়ে স্নান করে 'আইবুড়ো মুচি' ভেঙে, গায়ে-হলুদের দরুন কোরা লালপাড় শাড়িটুকু পরে চুল বাঁধতে বসেছে, পাড়ার শিল্পী মহিলার ঝাঁক 'কনে'র কেশ-রচনায় কে কত নৈপুণ্য দেখাতে পারেন তারই আলোচনায় অন্দরের দালান মুখর করে তুলেছেন, হঠাৎ বাইরের মহল থেকে আগুনের হল্‌কার মত এই সংবাদ এসে ছড়িয়ে পড়ল।

পরিণামে? দাবানল!

অতি বড় অবিশ্বাস্য হলেও এ যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। কারণ সংবাদ এনেছেন আর কেউ নয়, স্বয়ং রামকালী! যাঁর সম্পর্কে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ পোষণ করা অসম্ভব। নচেৎ মিথ্যা দুঃসংবাদ রটনা করে বিয়ে ভণ্ডুল করে দিয়ে মজা দেখবে এমন আত্মীয়েরও অভাব নেই। কিন্তু ইনি হচ্ছেন রামকালী!

কাজেই সংবাদ মিথ্যা হতে পারে, এমন আশার কণিকামাত্রও নেই। নাঃ, কোন আশাই নেই। তা ছাড়া কবরেজ নিজের চোখে দেখে এসেছেন পাত্রের শিয়রে শমন।

অতএব কোরাশাড়ি জড়ানো বছর আষ্টেকের সেই হতভম্ব মেয়েটাকে ঘিরে প্রবল দাপটে কান্নার যা রোল উঠেছে তাতে ভয়ে মেয়েটার নাড়ি ছেড়ে যাবার যোগাড় হচ্ছে।

বিয়ের দিন যাত্রা-করা-বর মৃত্যুরোগ নিয়ে যাত্রা ভঙ্গ করে বাড়ি ফিরে গেলে এবং বিয়ের লগ্ন ভ্রষ্ট হলে, এমন কি সর্বনাশ সংগঠিত হতে পারে, সেটা বেচারার বুদ্ধির অগম্য। অনিষ্ট যদি কিছু হয় সে নয় তার ঠাকুর্দার হবে, তার কি?

কিন্তু তার কি, সে কথা সে নিজে কিছু না বুঝলেও মহিলার দল তাকে ধরে নাড়া দিয়ে দিয়েই তারস্বরে চেঁচিয়ে চলেছেন, "ওরে পটলী, তোর কপালে এমন ছাইপোরা ছিল, একথা তো কেউ কখনো চিন্তে করি নি রে! ওরে লগন-ভ্রষ্ট মেয়ে গলায় নিয়ে আমরা কী করব

রে! ওরে এর চাইতে তোকেই কেন শমনে ধরল না রে, সে যে এর থেকে ছিল ভাল!" ওঁরা লুটোপুটি করতে থাকেন, আর পটলী কাঠ হয়ে বসে থাকে। বসে বসে শুধু এইটুকু বিচার করতে পারে সে-যে এত সব কাণ্ডকারখানা কিছুই হত না, যদি পটলীই রাতারাতি ওলাউঠো হয়ে মরত!

ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে মাথায় হাত দিয়ে পাথরের পুতুলের মত বসে আছেন, আর সেই পুতুলের মস্তিষ্কের কোষে কোষে ধ্বনিত হচ্ছে, 'এ কী করলে ভগবান! এ কী করলে ভগবান!'

রামকালী চলে যাওয়ার পর থেকে লক্ষ্মীকান্ত আর একটিও কথা বলেন নি, অপর কেউও তাঁকে সম্বোধন করতে সাহস পায় নি। ওদিকে বড়ছেলে শ্যামকান্তও বিশুষ্ক মুখে ঘাটের ধারে শিবতলায় গিয়ে বসে আছে চুপচাপ, বাপের দিকে যাবার সাহস তার নেই। তার জামাই হচ্ছে বটে কিন্তু বয়সটা আর তার কি? এখনও তো তিরিশের নিচে। বাপকে সে যমের মত ভয় করে।

পটলীর মা বেহুলাও মুখ লুকিয়েছে ভাঁড়ার ঘরের কোণে। নিজেকেই তার সবচেয়ে অপরাধিনী মনে হচ্ছে। নিশ্চয়ই মহাপাপিষ্ঠা সে, নইলে তার মেয়ের বিয়ের ব্যাপারেই এত বড় দুর্লক্ষণ দুর্ঘটনা! সকলেই ফিসফাস বলাবলি করছে মেয়েটা নাকি তার আস্ত রাক্ষুসী, তাই বাসরে না উঠতেই সোয়ামীটার মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেল। থাকুক এখন বেহুলা চিরজন্ম ওই দ' পড়া সর্বনাশী মেয়েকে গলায় গেঁথে। জাত ধর্ম কুল মান সবই গেল, রইল শুধু আমরণ যম-যন্ত্রণা।...

হ্যাঁ, বিয়ের রাত্রে বর-বিভ্রাট কি আর হয় না? ছাঁদনাতলা থেকেও বর উঠে যেতে দেখেছে অনেকে, কিন্তু সে সব অন্য কারণে। হয়তো 'পণে'র টাকা ঠিক সময়ে হাজির করতে না পারার জন্যে বচসার ফলে, নয়তো বা কোন হিতৈষীর দ্বারা কোন পক্ষের 'কুলে'র ঘাটতির কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায়, অথবা কন্যাপক্ষের কনেকে বদলে ফেলে কালো কুশ্রী কনে গছিয়ে দেবার চেষ্টার ফলে, বচসা থেকে হাতাহাতি মারামারি হতে হতে বরপক্ষ রেগে-টেগে বর উঠিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তখুনি তার পারাপারও হয়ে যায়।

কারণ লগ্নভ্রষ্ট হয়ে গেলেই মেয়ে চিরকালের মত আধাবিধবা হয়ে বাপের ঘরে বসে থাকবে, এই আক্ষেপে পাড়ার কেউ না কেউ করুণাপরবশ হয়ে কোমর বেঁধে লেগে গিয়ে রাতারাতি অন্য পাত্তর যোগাড় করে আনেন। অতএব ভদ্রলোকের জাত মান রক্ষা পায়।

কিন্তু এ যে একেবারে বিপরীত কাণ্ড! এ যে সত্য রাক্ষসী-কন্যা।

এ হেন পতিঘাতিনী মেয়ের জন্যে আপনার ছেলেকে ধরে দেবে এমন মহানুভব ত্রিজগতে কে আছে?

না, বেহুলার এই মেয়ের জন্যে রাতারাতি পাত্রসংগ্রহ হওয়ার আশা দুরাশা। রামকালী

কবরেজ অবশ্য একটু নাকি আশ্বাস দিয়ে গেছেন "চেষ্টা দেখছি" বলে, কিন্তু বোঝাই তো যাচ্ছে সেটা সম্পূর্ণ স্তোকবাক্য! এত বড় দুঃসংবাদটা বাড়ি বয়ে এসে দিয়ে গেলেন, মুখটা একটু হেঁট হল তো, তাই একটা অলীক স্তোক দিয়ে পালিয়ে গেলেন!

বেহুলা বোকা হতে পারে, কিন্তু একটু বুদ্ধি ধরে।

হায় মা ভগবতী, পটলী যে এত বড় অপয়া মেয়ে এ কথা তো কোনদিন বুঝতে দাও নি? ফুলের মত দেখতে মেয়ে, বাড়ির প্রথম সন্তান, সকলের আদরের আদরিণী আগানে-বাগানে হেসে খেলে বেড়িয়েছে এতদিন, ইদানীং সম্প্রতি ডাগরটি হয়েছে বলেই যা বাড়ির মধ্যে আটক ছিল, তা যেমন সুন্দরী তেমনি হাস্যবদনী, কে বলতে পেরেছে এ মেয়ে সর্বনাশী রাক্ষসী?

শ্বশুরঠাকুর তো বলেন পটলীর না কি দেবগণ, তবে? দেবগণ কন্যে এমন রাক্ষসগণের কপাল পেল কি করে? আর শুধুই কি আজ? ও মেয়ে যদি ঘরে থাকে সংসার তো ছারেখারে যাবে।

মানদার পিসী তো স্পষ্টই বললেন সে কথা, "কে নেবে মা ও মেয়েকে? কার বাসনা হবে সংসারটা ছারে-গোল্লায় দিই? ও চিরটা কাল এই দ'পড়া হয়ে পড়ে থাকবে আর ঠাকুদ্দার সংসারটা চিবিয়ে চিবিয়ে খাবে, এই আর কি!"

বেহুলা ডুকরে কেঁদে ওঠে।

কাঁদতে কাঁদতে বলে, "হে মা ওলাই বিবি, হে মা শেতলা, পটলীকে তোমরা নাও, ওর যেন আর এ ভিটেতে তেরাত্তির না পোহায়।"

মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে বেহুলা।

কাঁদছে সবাই।

বাড়ির গিন্নী থেকে শুরু করে বিচুলি কাটুনী বাগদী মাগীটা পর্যন্ত। পরের দুঃখে কাঁদবার এত বড় সুযোগ জীবনে ক'বার আসে?

কাঁদছে না শুধু পটলী, যে হচ্ছে এই বিবাহবিভ্রাট নাটকের প্রধানা নায়িকা। সে শুধু অনেকক্ষণ কাঠ হয়ে বসে থেকে সবে এইমাত্র ভাবতে শুরু করেছে বিয়েটাই যদি না হয়, তা হলে এখনও পটলীকে উপুসী রেখেছে কেন এরা? কেন কেউ এক বারও বলছে না, "ওরে তোরা তবে এখন পটলীকে দুটো মতিচুর কি দেদোমণ্ডা দিয়ে জল খেতে দে।" পটলীর বুক থেকে পেট অবধি যেন মাঠের ধুলোর মতো শুকনো লাগছে।

কিন্তু পটলীর মুখে বুকে ধুলো বেটে যাচ্ছে, এই তুচ্ছ খবরটুকু ভাবতে বসবার সময় কার আছে? বরং পটলীর ওপর রাগে ঘৃণায় রি রি করছে সবাই!

শ্যামকান্ত বার দুই-তিন পুকুরপাড়ের দিক থেকে এসে উঁকি মেরে বাবাকে দেখে গেছে এবং যত বারই দেখেছে বাবা তামাক খাচ্ছেন না, বাবার হাতে হুঁকো নেই, তত বারই

তার প্রাণটা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সাহস করে তামাক সেজে এনে সামনে ধরে দেবে এত বুকের বল নেই, অপেক্ষা শুধু যদি পাড়ার কোন বিজ্ঞ ব্যক্তি এসে পড়েন। হয়তো তেমন কেউ এলে লক্ষ্মীকান্তের মৌনভঙ্গ হবে।

নিজের যত বড় বিপত্তিই হোক, মানীর মান অবশ্যই রাখবেন লক্ষ্মীকান্ত।

কিন্তু পাড়ার ভদ্রলোকেদের আর আসতে বাকী আছে কার? তাঁরা তো সবাই একে একে এসে গেছেন।

বেলা পড়ে এল।

অর্থাৎ সর্বনাশের সময় ঘনিয়ে এল।

এ হেন সময় শ্যামকান্তর প্রার্থনা পূর্ণ হল। এলেন রাখহরি ঘোষাল। রীতিমত বয়স্ক ব্যক্তি, অপেক্ষাকৃত দূরের পাল্লায় থাকেন, তাই এতক্ষণ এসে উঠতে পারেন নি। তিনি এসে নীরবে খড়ম খুলে ফরাসে উঠে বসলেন, ট্যাঁক থেকে শামুকের খোলের নস্যদানি বার করে দু'টিপ নিলেন, তারপর ধীরে সুস্থে বললেন, "ব্যাপার তো সবই শুনলাম লক্ষ্মীকান্ত, কিন্তু তুমি এভাবে মচ্ছিভঙ্গ হয়ে বসে থাকলে তো চলবে না।"

লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে বয়সের সম্মান রাখতে জানলেও ঘোষাল-ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলো তো আর নেবেন না, তাই মাথাটা একটু নিচু ভাব করে ক্লান্ত স্বরে নেপথ্যের দিকে গলা বাড়িয়ে বলেন, "ওরে কে আছিস, ঘোষাল মশাইকে তামাক দিয়ে যা।"

"থাক্ থাক্, ব্যস্ত হতে হবে না।" রাখহরি ঘোষাল বলেন, "সন্ধ্যা তো আগতপ্রায়, এখন কি করবে স্থির করলে?"

"স্থির আর আমি কি করব ঘোষাল মশাই," লক্ষ্মীকান্ত হতাশ ভাবে বলেন, "স্বয়ং যজ্ঞেশ্বরই যে যজ্ঞ পণ্ড করতে বসলেন—"

"তা বলে তো ভেঙে পড়লে চলবে না লক্ষ্মীকান্ত, কোমর বাঁধতে হবে। কন্যাকে নির্দিষ্ট লগ্নে পাত্রস্থ করতেই হবে। লগ্ন কখন?"

"মধ্যরাত্রের পর।"

"উত্তম কথা। সময় কিছু পাচ্ছ তুমি। আমি বলি কি তুমি আমার সঙ্গে একবার দয়ালের ওখানে চল—"

"দয়াল? দয়াল মুখুয্যে?"

"হ্যাঁ, দেখ যদি হাতেপায়ে ধরে রাজী করাতে পারো। এমনিতেই তো কালবিলম্ব হয়ে গেছে।"

লক্ষ্মীকান্ত বিস্মিত দৃষ্টি মেলে বলেন, "মুখুয্যে মশায়ের কাছে কার আশায় যাব ঠিক বুঝতে পারছি না ঘোষাল মশাই?"

"কার আশায় আবার লক্ষ্মীকান্ত, তুমি যে নেহাৎ শিশু সাজছ দেখছি। মুখুয্যের

আশাতেই যাবে। নইলে রাতারাতি আর তোমার স্বঘর পাত্র পাচ্ছ কোথায়?"

লক্ষ্মীকান্ত কাতর মুখে বলেন, "মুখুয্যে মশাইয়ের সঙ্গে পটলীর বিয়ে? পটলীকে আপনি দেখেছেন ঘোষাল মশাই?"

"দেখেছি বৈকি", রাখহরি একটু রসিকহাসি হাসেন, "নাতনীকে তোমার দেখলে, ওর নাম গিয়ে, মুনিরও মন টলে, 'ঘরে' মিললে আমিই এই বয়সে টোপর মাথায় দিতে চাইতাম। মুখুয্যেও তো তোমার গিয়ে বয়েস হলে কি হয়, রসিক ব্যক্তি। এই সেদিনও পথে পটলীকে দেখে বলছিল—"

রাখহরি একটু থামেন।

লক্ষ্মীকান্ত কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলেন, "কি বলছিলেন?"

"আহা তুচ্ছ কিছু নয়, তামাশা করে বলছিল, 'বাঁড়ুয্যের নাতনীটিকে দেখলে ইচ্ছে হয় আমার তৃতীয় পক্ষটিকে ত্যাগ করে ফেলে ফের ছাঁদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াই'।"

লক্ষ্মীকান্ত এবার ঘোরতর বিরক্তির স্বরে বলেন, "এ প্রসঙ্গ ত্যাগ করুন ঘোষাল মশাই।"

"বটে! ও!" রাখহরি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, "বুঝতে পারি নি! কলি পূর্ণ হতে এখনও কিছু বিলম্ব আছে ভেবেছিলাম। যাক শিক্ষা হয়ে গেল। আর যাই করি, কারুর হিত করবার চেষ্টা করব না।"

লক্ষ্মীকান্ত এবার ত্রস্ত কাতরতায় বলে ওঠেন, "আপনি অযথা কুপিত হবেন না ঘোষাল মশাই, আমার অবস্থাটা বিবেচনা করুন। মুখুয্যে মশাই আমার চাইতেও প্রায় চার-পাঁচ বৎসরের বয়োধিক, তা ছাড়া হাঁপানি-রোগগ্রস্ত।"

"হাঁপানিটা যমরোগ নয় লক্ষ্মীকান্ত", রাখহরি সতেজে বলেন, "আয়ুর্বেদ মতে ওটা হচ্ছে জীওজ ব্যাধি। তাছাড়া বয়সের কথা যা বলছ, ওটা কোন কথাই নয়, পুরুষের আবার বয়েস! বরং মুখুয্যের আর দুটি পত্নীর ভাগ্যপ্রভাবে তোমার ঐ অলক্ষণা পৌত্রীটির বৈধব্য-যোগ খণ্ডন হয়েও যেতে পারে।"

"কিন্তু ঘোষাল মশাই—"

"থাক্, 'কিন্তু'তে আর কাজ কি লক্ষ্মীকান্ত? তবে এটা জেনো, নিজেকে সমাজের শিরোমণি ভেবে যতই তুমি নির্ভয় থাক, এর পর অর্থাৎ তোমার ওই পৌত্রীকে নির্দিষ্ট লগ্নে পাত্রস্থ করতে না পারলে, সদ্‌ব্রাহ্মণরা তোমার গৃহে জলগ্রহণ করবেন কি না সন্দেহ! এই দুঃসময়ে অপোগণ্ড একটা ছুঁড়ির বুড়োবর-যুবোবরের ভাবনা তুমি ভাবতে বসছ, কুলমর্যাদা, ধর্ম-সংস্কার, জাতি-মান এসব বিস্মৃত হচ্ছ, এ একটা তাজ্জব বটে!"

"ঘোষাল মশাই, আপনি আমায় মার্জনা করুন, বরং পটলীকে নিয়ে আমি কাশীবাসী হব—"

"তা হবে বৈকি," রাখহরি একটু বিষহাসি হেসে বলেন, "বে-মালিক সুন্দরী যুবতীর পক্ষে কাশীর মত উপযুক্ত স্থান আর কোথায় আছে? নাতনী হতে কাশীবাসের সংস্থানটাও

তোমার হয়ে যাবে লক্ষ্মীকান্ত!"

"ঘোষাল মশাই! লক্ষ্মীকান্ত বিদ্যুৎবেগে দাঁড়িয়ে বলেন, "আপনি আমার গুরুজনতুল্য, তাই এ যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলেন। নচেৎ—"

"নচেৎ কি করতে লক্ষ্মীকান্ত," বিদ্রূপহাস্যে মুখ কুঁচকে রাখহরি বলে ওঠেন, "নচেৎ কি মারতে না কি?"

শোধ নেবার দিন এসেছে, শোধ নেবেন বৈকি ঘোষাল। ঘোষাল বামুনদের প্রতি লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের অন্তঃসলিলা তাচ্ছিল্য ভাবটা তো আর অবিদিত নেই রাখহরির! যতই বিনয়ের ভাব দেখাক বাঁড়ুয্যে, ওর চোখের দৃষ্টিতেই সেই উচ্চ-নীচ ভেদাভেদটা ধরা পড়ে যায়। আজ সেই প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে, ছাড়বেন কেন রাখহরি?

"ঘোষাল মশাই, আমাকে রেহাই দিন," দুই হাত জোড় করে লক্ষ্মীকান্ত বলেন, "ভগবান যদি আমার জাতিধর্ম রক্ষা করতে ইচ্ছুক থাকেন, লগ্নের আগেই উপযুক্ত পাত্র পেয়ে যাব, নচেৎ মনে করব—"

"লগ্নের আগেই উপযুক্ত পাত্র!" রাখহরি আর-একবার বিদ্রূপ-হাস্যে মুখ বাঁকিয়ে বলেন, "পাত্রটিকে বোধ হয় স্বয়ং তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে পাঠিয়ে দেবেন?"

লক্ষ্মীকান্ত কি একটা উত্তর দিতে উদ্যত হচ্ছিলেন, সহসা শ্যামকান্ত নিজের স্বভাববিরুদ্ধ উত্তেজনায় ছুটে এসে বলে,—"বাবা, কবরেজ চাটুয্যে মশাই আসছেন। ঘোড়ায় চেপে পিছনে কাকে যেন নিয়ে।"

"অ্যাঁ! নারায়ণ!"

লক্ষ্মীকান্ত উঠে দাঁড়াতে গিয়ে বসে পড়েন!

আসর-সাজানো বরাসনে বরের বসবার সময় আর ছিল না, হুড়মুড়িয়ে একেবারে কলাতলায় খেউরী করিয়ে স্নান করিয়ে নিয়ে সোজা নিয়ে যেতে হবে সম্প্রদানের পিঁড়িতে। সেই পিঁড়িতেই ধানদুর্বো আর আংটি দিয়ে 'পাকা দেখা' অনুষ্ঠানের প্রথাটা পালন করে নিতে হবে।

অবিশ্যি সারাদিনে অন্ততঃ বার পাঁচ-ছয় চর্বচোষ্য করে খেয়েছে রামু, কিন্তু কি আর করা যাবে! এরকম আকস্মিক ব্যাপারে ওসব মানার উপায় কোথায়? বলে কত মেয়েরই বিয়ে হয়ে যাচ্ছে 'ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে' করে। এই তো লক্ষ্মীকান্তরই এক জ্ঞাতি ভাইপোর মেয়ের বিয়ে হল সেবার ঘুমন্ত মেয়েটাকে মাঝ রাতে টেনে তুলে। গ্রামের আর কার বাড়িতে বর এসেছিল বিয়ে করতে, তার পর যা হয়! কোথা থেকে যেন উঠে পড়ল কন্যেপক্ষর কুলের খোঁটা, তা থেকে বচসা অপমান, পাত্র উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া।

যাক সে কথা, মূল কথা হচ্ছে, আকস্মিকের ক্ষেত্রে চর্বচোষ্য খেয়েও বিয়ের পিঁড়িতে

বসা যায়।

কথা হচ্ছে—এখন রাসুকে নিয়ে।

রাসুর অবস্থাটা কি?

সে কি এখন খুব একটা অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়িত হচ্ছে?

তীব্র একটা যন্ত্রণা, ভয়ঙ্কর একটা অনুতাপ, প্রবল একটা মানসিক বিদ্রোহের আলোড়ন কি রাসুকে ছিন্নভিন্ন করছিল? বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ এই চিলের মত ছোঁ মেরে উড়িয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এনে আরও একটা সাতপাকের বন্ধনে বন্দী করে ফেলবার চক্রান্তে কাকার ওপর কি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিল রাসু?

না, রাসুর মুখ দেখে তা মনে হচ্ছে না।

বলির পাঁঠার অবস্থা ঘটলেও ভয়ে বলির পাঁঠাব মত কাঁপছিলও না রাসু, শুধু কেমন একটা ভাবশূন্য ফ্যালফেলে মুখে নিজের নির্দেশিত ভূমিকা পালন করে চলছিল সে।

হঁ্যা, এই আকস্মিকতার আঘাতে বেচারা রাসুর শুধু মুখটাই নয়, মনটাও কেমন ভাব-শূন্য ফ্যালফেলে হয়ে গিয়েছে। সেখানে সুখ-দু:খ ভাল-মন্দ দ্বিধাদ্বন্দ্ব কোন কিছুরই সাড় নেই।

সে মনে ধাক্কা লাগল স্ত্রী-আচারের সময়। সে ধাক্কায় খানিকটা সাড ফিরল।

সেই সাড়ে মনের মধ্যে একটা ভয়ানক কষ্ট বোধ করতে থাকল রাসু।

সাত এয়োতে মিলে যখন মাথায় করে শ্রী, কুলো, বরণডালা, আইহাঁড়ি, চিতের কাঠি, ধুতরো ফলের প্রদীপ সাজানো থালা, ইত্যাদি নিয়ে বরকনেকে প্রদক্ষিণ করছিল, ধাক্কাটা লাগল ঠিক তখন।

এয়োদের অবশ্য একগলা করে ঘোমটা, কিন্তু তার মধ্যেও 'আদল' বলে একটা কথা আছে। যে বৌটির মাথায় বরণডালা, তার আদলটা ঠিক সারদার মতন। যদিও দিনের বেলা হঠাৎ সারদার মুখটা দেখলে রাসু ঠিক চিনতে পারবে কিনা সন্দেহ, তবু আদলটা চেনে। ওই রকম বেগ্‌নী রঙের জমকালো একখানা চেলিও যেন সারদাকে মাঝে মাঝে পরতে দেখেছে রাসু। পাড়ার কারুর বিয়েটিয়েতে, কি সিংহবাহিনীর অঞ্জলি দেবার সময়।

দেখেছে অবিশ্যি নিতান্ত দূর থেকে, আর ভাল করে তাকাবার সাহসও হয় নি। কারণ রাত দুপুরের আগে, সমস্ত বাড়ি নিশুতি না হওয়া পর্যন্ত কাছাকাছি আসবার উপায় কোথা? আর তখন তো সারদা সাজসজ্জা গহনাগাঁটির ভার মুক্ত। তা ছাড়া সারদা ঘরে ঢুকেই ঘরের কোণের প্রদীপটা দেয় নিভিয়ে। বলে, "কে কমনে থেকে দেখে ফেলে যদি।"

অবিশ্যি দেখবার পথ বলতে কিছুই নেই। রামকালী চাটুয্যের বাড়ির দরজা-কপাট তো আর পাড়ার পাঁচজনদের মত আমকাঠের নয় যে, ফাটাফুটো থাকবে, মজবুত কাঁটাল

কাঠের লোহার পাতমারা দরজা। দরজার কড়াছেকলগুলোই বোধ করি ওজনে দু-পাঁচ সের। আর জানলা? সে তো জানলা নয়, গবাক্ষ। মানুষের মাথা ছাড়ানো উঁচুতে ছোট্ট ছোট্ট খুপরি জানলা, সেখানে আর কে চোখ ফেলবে? তবু সাবধানের মার নেই।

গ্রীষ্মকালে অবশ্য পুরুষরা এ রকম চাপা ঘরে শুতে পারেন না, তাঁদের জন্যে চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা ছাতে শেতলপাটি বিছিয়ে রাখা হয় ভিজে গামছা দিয়ে মুছে মুছে। সেখানে তাকিয়া যায়, হাতপাখা যায়, গাড়ুগামছা যায়। 'বয়ে' নিয়ে যায় রাখাল ছেলেটা কি মুনিষটা। কর্তাদের অসুবিধে নেই।

প্রাণ যায় বাড়ির মহিলাদের, আর নববিবাহিত যুবকদের। তারা প্রাণ ধরে বার-বাড়িতে শুতে যেতে পারে না, অথচ ভেতর বাড়ির ঘরের ভিতরের গুমোটও প্রাণান্তকর।

তবে সারদার মত বৌ হলে আলাদা। সারদা এই গ্রীষ্মকালে সারারাত্তির পাখা ভিজিয়ে বাতাস করে রামুকে।

প্রাণের ভেতরটা হঠাৎ কেমন মোচড় দিয়ে উঠল রামুর। গতকাল রাত্রেও সারদা সেই পতিসেবার ব্যতিক্রম করে নি। রামু মায়া করে বারবার বারণ করছিল বলে, কচি ছেলেটার গরমের ছুতো করে পাখা নেড়েছে সারদা। আর সবচেয়ে মারাত্মক কথা, যেটা মনে করে হঠাৎ বুকটা এমন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে রামুর, মাত্র কাল রাত্তিরেই সারদা ভয়ানক একটা সত্যবদ্ধ করিয়ে নিয়েছিল।

বাতাস দিতে বারণ করার কথায় চুপি চুপি হেসে বলেছিল সারদা, "এত তো মায়া, এ মায়ার পরিচয় প্রেকাশ করতে পারবে চেরকাল?"

রামু ঠিক বুঝতে পারে নি, একটু অবাক হাসি হেসে বলেছিল, "চিরকাল কি গরম থাকবে?"

"আহা তা বলছি নে। বলছি—", রামুর বুকের একেবারে কাছে সরে এসে সারদা বলেছিল, "সতীনজ্বালার কথা বলছি। তখন কি আর মায়া করবে? বলবে কি 'আহা ওর সতীনে বড় ভয়'!"

রামু যতটা নিঃশব্দে সম্ভব হেসে উঠেছিল, হেসে উঠে বলেছিল, "হঠাৎ দিবা-স্বপ্ন দেখছ না কি? সতীনজ্বালা আবার কে দিলে তোমায়?"

"দেয় নি, দিতে কতক্ষণ?"

"অনেকক্ষণ! আমার অমন দু-চারটে বৌ ভাল লাগে না। দরকারও নেই!"

সারদা তবু জেদা ছাড়ে নি, "আর আমি বুড়ো হয়ে গেলে? তখন তো দরকার হবে?"

রামু ভারি কৌতুক অনুভব করেছিল, আবার হেসে ফেলে বলেছিল, "এ যে দেখি 'হাওয়ার সঙ্গে মনান্তর।' তুমি বুড়ো হয়ে যাবে, আর আমি বুঝি জোয়ান থাকব?"

"আহা, পুরুষ ছেলে কি আর সহজে বুড়ো হয়? তা ছাড়া ঠাকুরের তুমি জ্যেষ্ঠ ছেলে,

দেখতে সোন্দর। এত পয়সাওলা মানুষ তোমরা, কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসবে তোমার, তখন কি আর আমার কথা—"

হঠাৎ আবেগে কেঁদে ফেলেছিল সারদা!

অগত্যাই নিবিড় করে কাছে টেনে নিয়ে বৌকে আদর সোহাগ করে ভোলাতে হয়েছে রাসুকে। বলতে হয়েছে, "সাধে কি আর বলছি, হাওয়ার সঙ্গে মনান্তর! কোথায় সতীন তার ঠিক নেই, কাঁদতে বসলো। ওসব ভয় ক'রো না।"

আরও অনেক বাক্য বিনিময়ের পর পতিব্রতা সারদা স্বামীকে আশ্বাস দিয়েছিল, "তা বলে তোমাকে আমি এমন সত্যিবন্দী করে রাখছি নে যে, আমি মরে গেলেও ফের বে' করতে পারবে না। আমি মলে তুমি একটা কেন একশটা বে' করো, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে নয়।"

"নয়, নয়, নয়! হল তো?" তিন সত্যি করেছিল রাসু।

মাত্র গত রাত্রে।

আর আজ সেই রাসু এই টোপর চেলি পরে কলাতলায় দাঁড়িয়ে আছে, এই মাত্তর যে গিন্নী মানুষটা বরণ করছিল, সে বলে উঠেছে, "কড়ি দিয়ে কিনলাম, দড়ি দিয়ে বাঁধলাম, হাতে দিলাম মাকু, একবার 'ভ্যা' করতো বাপু।"

একটা মানুষকে কতবার কেনা যায়?

বাঁধা জিনিসটাকে আবার কি ভাবে বাঁধা যায়?

হায় ভাগবান, রাসুকে এমন বিড়ম্বনায় ফেলে কী সুখ হল তোমার?

আহা, রাসু যদি ঠিক আজকেই গাঁয়ে না থাকত! রুগী দিদিমাকে দেখতে এমন তো মাঝে মাঝে গাঁ ছেড়ে ভিন্ গাঁয় যায় রাসু। আজই যদি তাই হত! যদি দিদিমা বুড়ি টেঁসে গিয়ে ওখানেই আজ আটকে ফেলত রাসুকে!

যদি ঠিক এই সময় জ্ঞাতিগোত্তর কেউ মরে গিয়ে অশৌচ ঘটিয়ে রাখত রাসুদের! যদি রাসুরও এদের সেই বরটার মতন আচমকা একটা শক্ত অসুখ করে বসত!

তেমন কোন কিছু ঘটলে তো আর বিয়ে হতে পারত না!

কন্যাদায়গ্রস্ত বিপন্ন ভদ্রলোকের বিপদের কথা মনের কোণেও আসে না রাসুর, মরুক চুলোয় যাক ওরা, রাসুর এ কী বিপদ হল!

এ যদি কাকা রামকালী না হয়ে বাবা কুঞ্জবেহারী হত! বাবা যদি বলত "ভদ্রলোকের বিপদ উপস্থিত রাসু, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় আর নেই, চল ওঠ্।" তা হলেও হয়ত বা রাসু খানিক মাথা চুলকোতে বসত!

কিন্তু এ হচ্ছে যার নাম মেজকাকা! যার হুকুমের ওপর আর কথা চলে না।

অনেক 'যদি'র শেষে অবশেষে হতাশচিত্ত রাসু একথাও ভাবল, "আর কিছুও না হোক,

যদি গতরাত্রে রাসু গ্রীষ্মের কারণে 'বারবাড়িতে' শুতে যেতে! তা হলে তো ওই সত্যবন্দীর দায়ে পড়তে হত না তাকে।

এর পর কি আর জন্মে কোন দিন কোন ব্যাপারে রাসুকে বিশ্বাস করতে পারবে সারদা? বিশ্বাস করতে পারবে এক্ষেত্রে রাসু বেচারাও সারদার মতই নিরুপায়? কোন হাত ছিল না তার। নাঃ, বিশ্বাস করবে না সারদা, বলবে "বোঝা গেছে, বোঝা গেছে! বেটাছেলেদের আবার মন মায়া! বেটাছেলের আবার তিন সত্যি!"

কিন্তু কথাই কি আর কখনো কইবে সারদা? হয়তো জীবনে আর কথা কইবে না রাসুর সঙ্গে, নয় তো দুঃখে অভিমানে মনের ঘেন্নায়—হঠাৎ রাসুর মনশ্চক্ষে বিশালকায় "চাটুয্যেপুকুরের" কাকচক্ষু জলটার দৃশ্য ভেসে ওঠে

মনের ঘেন্নায় আজ রাত্তিরেই সারদা কিছু একটা করে বসছে না তো?

বুকের ভেতরটা কে যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে চিরে চিরে নুন দিচ্ছে। রাসু বুঝি আর চুপ করে থাকতে পারবে না, বুঝি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠবে।

না, চেঁচিয়ে ওঠে নি রাসু, তবে মুখের চেহারা দেখে কন্যাপক্ষের কে একজন বলে উঠল, "বাবাজীর কি শরীর অসুস্থবোধ হচ্ছে?"

আবার বিয়ের বরের শরীর অসুস্থ!

লক্ষ্মীকান্ত একবার এই হিতৈষী-সাজা দুর্মুখটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তার পর গম্ভীর কণ্ঠে আদেশ দিলেন, "ওরে কে আছিস্, আর একখানা হাতপাখা নিয়ে আয় দিকি, নতুন নাতজামাইয়ের মাথার দিকে বাতাসটা একটু জোরে জোরে দে।"

জোর জোর বাতাসে মুখের চেহারাটা রাসুর সত্যি একটু ভাল দেখাল। আর না দেখালেই বা কি, ততক্ষণে তো বিয়ে সাঙ্গ হয়ে গেছে, বরকনেকে "লক্ষ্মীর ঘরে" প্রণাম করিয়ে বাসরে বসাতে নিয়ে যাচ্ছে সবাই ধরে ধরে, পায়ের গোড়ায় ঘটি ঘটি জল ঢালতে ঢালতে।

সেখানে আবারও তো সেই সেবারের মত উপদ্রব হবে? সারদার বাপের বাড়ির সেই সব মেয়েমানুষদের বাক্যি আর বাচালতা মনে করলে রাসুর এখনো হৃৎকম্প হয়।

আবার তেমনি ভয়ঙ্কর একটা অবস্থায় মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এখন রাসুকে!

সম্পূর্ণ অসহায়, সম্পূর্ণ নিরস্ত্র।

হঠাৎ রাসু দার্শনিকের মত নিজের ব্যক্তিগত দুঃখজালা ভুলে একটা বিরাট দর্শনের সত্য আবিষ্কার করে বসে।

মানুষ কি অদ্ভুত নির্বোধ জীব!

এই কুশ্রী কদর্যতাকে ইচ্ছে করে জীবনে বারবার সেধে নিয়ে আসে। বার বার নিজেকে কানাকড়িতে বিকোয়!

নয়

পরদিন সকালে এখানে 'বৌছত্র' আঁকা হচ্ছিল।

ইচ্ছে-শখের বিয়ের মত নিখুঁত করে বাহার করে না হোক, নিয়মপালাটা তো বজায় রাখতে হবে?

আর এত বড় উঠোনটায় যেমন তেমন করে একটু আলপনা ঠেকাতেও এক সের পাঁচপো চাল না ভিজোলে চলবে না।

তা' সেই পাঁচপো চালই ভিজিয়ে দিয়েছিলেন রামকালীর খুড়ী নন্দরাণী। রামকালীর নিজের খুড়ী নয়, জ্যেঠতুতো খুড়ী। সংসারের যত কিছু নিয়ম লক্ষণ নিতকিতের কাজের ভার নন্দরাণী আর কুঞ্জর বৌয়ের উপর। কারণ ওরাই দুজন হচ্ছে একেবারে 'অখণ্ডপোয়াতি'। কুঞ্জর বৌয়ের তো সাতটি ছেলেমেয়েই ষেঠের কোলে খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে টিঁকে আছে।

নন্দরাণীর অবশ্য মাত্র দু তিনটিই।

সে যাক, বিয়ের ব্যাপারে নিয়মপালার কাজের সব কিছুই যখন নন্দরাণীর দখলে— তখন এক্ষেত্রেই বা তার ব্যতিক্রম হবে কেন? কাজেই রাসুর এই বিয়েটাকে মনে মনে যতই অসমর্থন করুন নন্দরাণী, পুরো পাঁচ পো আতপ চালই ভিজিয়ে দিয়েছিলেন তিনি উঠোনে 'বৌছত্তর' আঁকতে। দুধে-আলতার প্রকাণ্ড পাথর বসিয়ে তাকে কেন্দ্র করে আর ঘিরে ঘিরে দ্রুতহস্তে ফুল লতা শাঁখ পদ্ম এঁকে চলেছিলেন নন্দরাণী। সাঙ্গ হতে কিছু-কিঞ্চিৎ দেরি আছে এখনও, সহসা রাখাল ছোঁড়া ঘর্মাক্ত কলেবরে ছুটতে ছুটতে এসে উঠোনের দরজায় দাঁড়িয়ে আকর্ণবিস্তৃত হাস্যে জানান দিল, "বরকনে এয়েলো গো! আমি উই-ই দীঘির পাড় থেকে দেখতে পেয়েই ছুটে ছুটে বলতে এনু।"

"তা তো এলো—" নন্দরাণী বিপন্নমুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠেন, "দিদি, অ দিদি, বরকনে এসে পড়ল শুনছি—"

বরকনে! এসে পড়ল!

দীনতারিণী কুটনো ফেলে ছুটে এলেন, "এখুনি এসে পড়ল? রামকালীর কি এতেও তাড়াহুড়ো!"

"বারবেলা পড়বার আগেই বোধ করি নিয়ে এসেছেন রামকালী।"

যদিচ ভাসুরপো, তথাপি ধনে মানে এবং সর্বোপরি বয়সে বড়। কাজেই নন্দরাণী রামকালী সম্পর্কে 'ছেন' দিয়েই বাক্য বিন্যাস করেন। এখনো করলেন।

দীনতারিণী 'বারবেলা' শব্দটায় মনকে স্থির করে নিয়ে বললেন, "তা হবে। তা তোমাদের 'নেমকম্মর' সব প্রস্তুত?"

নন্দরাণী আরও ব্যস্ত হাতে হাতের কাজ সারতে সারতে বলেন, "প্রস্তুত তো একরকম সবই, কিন্তু দুধটা যে ওথলাতে হবে! সেটা আবার এখন কে করবে?"

দুধ! তাইতো!

ওথলানোর দরকার বটে।

বৌ এসে সন্ত উথলে-পড়া দুধ দেখলে, সংসার নাকি ধনে ধান্যে উথলে ওঠে।

দীনতারিণী উদ্বিগ্ন মুখে প্রশ্ন করলেন, "বড় বৌমা কোথায় গেলেন?"

"বড় বৌমা? সে তো রান্নাশালে। তাড়াহুড়ো করে এক ঘর রেঁধে রাখতে হবে তো? বৌ এসে দৃষ্টি দেবে।"

বড় বৌমা অর্থে রাসুর মা। তাকে তাই বলেন নন্দরাণী।

কারণ নন্দরাণী বয়সে রাসুর মার সমবয়সী হলেও মান্যে বড়, সম্পর্কে খুড়শাশুড়ী, কাজেই 'বৌমা'!

যাই হোক, কুঞ্জর বৌ রান্নাশালে!

অতএব দুধ ওথলাতে আর কাউকে দরকার। ওদিকে বরকনে আগতপ্রায়।

দীনতারিণী মনশ্চক্ষে চারিদিকে তাকিয়ে নেন, আর কে আছে? অথণ্ডপোয়াতি, সোয়ামীর প্রথম পক্ষ।

দ্বিতীয় তৃতীয় পক্ষ দিয়ে তো আর পুণ্যকর্ম হবে না?

কে আছে?

ওমা, ভাববার কি আছে?

সারদাই তো আছে।

তাকেই ডাক্ দেওয়া হোক তবে। একা ঘরের কোণে বসে রয়েছে মনমরা হয়ে, কাজে কর্মে ডাকলে তবু মনটা অন্যমনস্ক হবে, তা ছাড়া নতুন লোক নির্বাচনের সময়ই বা কোথা?

সত্য উঠোন পার হচ্ছিল তীর বেগে, দীনতারিণী তাকেই ডাক দিলেন, "এই সত্য, ধিঙ্গী অবতার! যা দিকিন, বড় নাতবৌমাকে ডেকে আন দিকিন শীগগির, বরকনে এসে পড়ল পেরায়, দুধ ওথলাতে হবে।"

"বৌকে? বড়দার বৌকে ডেকে দেব?" সত্য দুই হাত উল্‌টে বলে, "বৌ কি আর বৌতে আছে? ভোর থেকে মাটিতে পড়ে কেঁদে কেঁদে মরছে!"

"কেঁদে কেঁদে মরছে?" দীনতারিণী বিরক্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "একেবারে মরছেন, কেন এত মরবার কি হল? ওমা, শুভদিনে ইকি অলক্ষুণে কাণ্ড! যা শীগগির ডেকে আন।"

সত্য এদিক ওদিক তাকিয়ে বলে, "কে বাবা ডাকতে যায়। তুমি তো বললে কাঁদবার কি হয়েছে? বলি নিজের যদি হত? সতীন আসছে কাঁদবে না, আহ্লাদে উর্ধ্ববাহু হয়ে নাচবে মানুষ? হুঁঃ! কই কোথায় কি আছে তোমাদের? আমিই দিচ্ছি দুধ জ্বাল দিয়ে।"

"তুই? তুই দিবি দুধ জ্বাল?"

"কেন, দিলেই বা?" সত্য সোৎসাহে বলে, "পিসঠাকুমা যে সেবার খুন্তির দিদির বিয়েতে বলল, সত্যর বছর ঘুরে গেছে, এখন এয়োডালায় হাত দিতে পারে!"

বছর ঘুরে অর্থাৎ বিয়ের বছর ঘুরে।

সেটা আর স্পষ্টাস্পষ্টি উচ্চারণ করল না সত্য।

দীনতারিণী সন্দিগ্ধ সুরে বলেন, "বছর ঘুরলেই বুঝি হল? ঘরবসত না হলে—"

"জানি নে বাবা! রাখো তোমাদের সন্দ! আমি এই হাত দিলাম।"

বলেই সত্য দাওয়ার পাশে দুখানা ইঁট পাতা উনুনের উপর আলে বসানো ছোট্ট সরা চাপা মাটির হাঁড়িটার নিচে ফুঁ দিতে শুরু করে।

ঘুঁটের আগুন জলছে ধিকি ধিকি, ফুঁ পেড়ে দু-চারখানা নারকেল পাতা ঠেলে দিলেই জলে উঠবে দাউ দাউ করে। তা গোছালো মেয়ে নন্দরাণী নারকেল পাতার গোছাও এনে রেখেছেন পাশে।

সত্যর সকল কাজই উদ্দাম।

তার ফুঁয়ের দাপটে বরকনে আসার আগেই দুধ ওথলাতে শুরু করল। উথলে ধোঁয়া ছড়িয়ে ভেসে গেল গড়িয়ে পড়ে!

দীনতারিণী হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "ওরে একটু রয়ে বসে, নতুন বৌ ঢোকা মাত্তর যেন দেখতে পায়।"

কথা শেষ হবার আগে বাইরের উঠোনে শাঁখ বেজে উঠল।

অর্থাৎ শুভাগমন ঘটেছে নতুন বৌয়ের।

মোক্ষদা শাঁখ হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন বাইরে। আজ পূর্ণিমা, বিধবাদের ঘরে রান্নার ঝামেলা নেই, কোন এক সময় আম কাঁঠাল ফলমিষ্টি খেলেই হবে। কাজেই আজ ছুটি মোক্ষদাদের।

ছুটিই যদি, তবে ছুটোছুটি না করবেন কেন মোক্ষদা? স্নান তো করতেই হবে জল খাবার আগে?

তাই মোক্ষদাই অগ্রণী হয়ে বারবাড়ীর উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। আছেন শাঁখ হাতে নিয়ে।

শুভকর্মে বিধবারা সমস্ত কর্মে অনধিকারী হলেও, এই একটি কর্মে তাদের অধিকার আছে, সমাজ অথবা সমাজপতিরা বোধ করি এটুকু আর কেড়ে নেন নি, ক্ষ্যামা-ঘেন্না করে ছেড়ে দিয়েছেন। শাঁখ আর উলু।

অতএব সেই অধিকারটুকুর সম্যক সদ্ব্যবহার করতে থাকেন মোক্ষদা রামুর দ্বিতীয় অভিযানান্তে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে।

দীনতারিণী উদগ্রীব হয়ে এগিয়ে যেতে যেতে চমকে উঠে বলেন, "অমন করে হাতে ফুঁ দিচ্ছিস যে সত্য? পোড়ালি বুঝি?"

সত্য তাড়াতাড়ি সত্য গোপন করে ফেলে বলে, "পোড়াবো কেন, হুঁঃ!"

"তবে হাতে ফুঁ পাড়ছিস কেন?"

"এমনি।"

"থাক এবার উনুনে ফুঁ পাড়, ঢোকার সময় যেন আর এক বার দুধটা কেঁপে ওঠে। তা উঠেছে, বৌ পয়মন্ত হবে। সেবারে বরং—"

কথা শেষ হবার আগেই রামকালীর গম্ভীর কণ্ঠনিনাদ ধ্বনিত হল, "তোমাদের ওই সব বরণ টরণ তাড়াতাড়ি সেরে ফেলো ছোটপিসী, বারবেলা পড়তে আর বেশী দেরি নেই।"

মুহুর্মুহু শঙ্খনিনাদে রামকালীর কণ্ঠনিনাদও ম্লান হয়ে গেল।

বরকনে ঢুকল ভিতর বাড়ির উঠোনে। পিছনে পিছনে পাড়া ঝেঁটিয়ে অবগুণ্ঠনবতীর দল।

বিয়েটা যে ভাবে আর যে অবস্থাতেই ঘটে থাকুক, বৌভাতের যজ্ঞি একটা করতেই হবে। আমোদ-আহ্লাদের প্রয়োজনে নয়, 'সমাজ-জানিত' করবার প্রয়োজনে। খামকা এক দিন 'হুট' করে লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের পৌত্রী এসে চাটুয্যেবাড়ির অন্দরে সামিল হল, কাকে-পক্ষীতে টের পেল না, এটা তো আর কাজের কথা নয়। তার প্রবেশটা যে বৈধ, এ খবরটুকুর একটা পাকা দলিল তো থাকা চাই।

দলিল আর কি? লিখিত্ পড়িত্ তো কিছু নয়, সই-সাবুদও নয়, মানুষের স্মরণ-সাক্ষ্যই দলিল। তা সেই স্মরণ-সাক্ষ্য আদায় করতে হলে, গ্রাম সমাজকে এক দিন গলবস্ত্রে ডেকে এনে উত্তম ফলার খাইয়ে দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় কি?

তা ছাড়া বাঁড়ুয্যেদের মেয়ে যে চাটুয্যে-পরিবার-ভুক্ত হল, তার স্বীকৃতিটাও তো দিতে হবে? 'বৌভাতে'র যজ্ঞিতে নতুন বৌয়ের হাত দিয়ে ভাত পরিবেশন করিয়ে জ্ঞাতিকুটুমের কাছ থেকে সেই স্বীকৃতি নেওয়া।

অতএব বিয়েতে যজ্ঞির আয়োজন না করলেই নয়। আগে থেকে বিলিবন্দেজ নেই, হুটকারি করে বিয়ে, তাই ভোজের আয়োজনেও হুড়োহুড়ি লেগে গেছে। অনুগত জনের অভাব নেই রামকালীর, দিকে দিকে লোক ছুটিয়ে দিয়েছেন। জনাইতে মনোহরার বায়না গেছে, বর্ধমানে মিহিদানার। ভুট্টু গয়লাকে ভার দেওয়া হয়েছে দৈএর, আর ভীমে জেলেকে ডেকে পাঠিয়েছেন মাছের ব্যবস্থা করতে। কোন্ পুকুরে জাল ফেলবে, ক-মণ তোলা হবে, এই সব নির্দেশ দিচ্ছিলেন রামকালী, সহসা সেই আসরে এসে উপস্থিত হলেন মোক্ষদা।

এ তল্লাটে রামকালীকে ভয় করে না এমন কেউ নেই, বাদে মোক্ষদা। রামকালীর মুখের ওপর হক কথা শুনিয়ে দেবার ক্ষমতা একা মোক্ষদাই রাখে। নইলে দীনতারিণী পর্যন্ত তো ছেলেকে সমীহ করে চলেন।

অবিশ্যি ভাবা যেতে পারে, রামকালীকে হক কথা শুনিয়ে দেবার সুযোগটা আসে কখন? যে মানুষ কর্তব্যপালনে প্রায় ত্রুটিহীন, তাকে দু কথা শুনিয়ে দেবার কথা উঠছে কি করে?

কিন্তু ওঠে।

মোক্ষদা ওঠান। কারণ মোক্ষদার বিচার নিজের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। রামকালীর মতে যেটা নিশ্চিত কর্তব্য, প্রায়শই মোক্ষদার মতে সেটা অনর্থক বাড়াবাড়ি।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই—'হক কথা'র মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায় সত্যবতী। হবে না-ই বা কেন? রামকালী যদি এমন মেয়ে গড়ে তোলেন যেমন মেয়ে ভূ-ভারতে নেই, তা হলে আর কথা শোনানোর মোক্ষদার দোষটা কি? সৃষ্টিছাড়া ওই মেয়েটাকে তাই যখন তখন তার বাপের সামনে হাজির করে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করতেই হয় মোক্ষদাকে।

আজও তাই রামকালীর দরবারে একা আসেন নি মোক্ষদা, এসেছেন সত্যবতীকে সঙ্গে করে। সত্যবতীও এসেছে বিনা প্রতিবাদেই। অবশ্য প্রতিবাদে লাভ নেই বলেই হয় তো এই অপ্রতিবাদ। অথবা হয়তো এটা তার নির্ভীকতা।

ভীমে জেলের উপস্থিতির কালটুকু অবশ্য নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন মোক্ষদা, কথার শেষে ভীমে রামকালীকে 'দণ্ডবৎ হয়ে প্রেণাম' করে চলে যাবার পরক্ষণেই মোক্ষদা যেন ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

"এই ন্যাও রামকালী, তোমার গুণের অবতার কন্যের হাতের চিকিচ্ছে করো এবার। আর চেরটাকালই করতে হবে তোমাকে, এ মেয়েকে তো আর শ্বশুরঘর থেকে নেবে না।" একটু দম নিলেন মোক্ষদা।

মোক্ষদার দম নেবার অবকাশে রামকালী মৃদু হেসে বলেন, "কি? কি হল আবার?"

"হয়েই তো আছে সমস্তক্ষণ", মোক্ষদা দুই হাত নেড়ে বলেন, 'উঠতে বসতেই তো হচ্ছে। কাটছে ছিঁড়ছে ছড়ছে। এই আজ দেখ মেয়ের হাতের অবস্থা। পুড়িয়ে ঝুড়িয়ে এতখানি এক ফোস্কা। আবাব বলে কি, 'বলতে হবে না বাবাকে, এমনি সেরে যাবে।' দেখ তুমি, নিজের চক্ষে।"

ইত্যবসরে রামকালী মেয়ের হাতখানা তুলে ধরে শিহরিত হয়েছেন।

"কী ব্যাপার? এ কি করে হল?"

"কি করে হয়েছে, শুধোও, ওকেই শুধোও। মেয়ের গুণের কথা এত বলি, কথা কানে করো না তো? তবে তোমাকে এই বলে রাখছি রামকালী, এই মেয়ে হতেই তোমার ললাটে অশেষ দুঃখু আছে।"

কথাটা নতুন নয়, বহু ব্যবহৃত। কাজেই রামকালী যে বিশেষ বিচলিত হন এমন নয়। তবে বাইরে গুরুজনকে সমীহ করবার শিক্ষা রামকালীর আছে, তাই বিচলিত ভাবটা দেখান।

"নাঃ, মেয়েটাকে নিয়ে—! আবার কি করলি? এত বড় ফোস্কা পড়ল কিসে?"

"দুধ ওথলানো হচ্ছিল গো! কালকে যখন রেসো বৌ নিয়ে এসে ঢুকল, উনি গেলেন পাতা জ্বেলে দুধ ওথলাতে! আর এও বলি, এত বড় বুড়ো ধিঙ্গী মেয়ে এটুকু করতে হাতই বা পোড়ালি কি বলে?"

রামকালী মেয়ের হাতের অবস্থাটা নিরীক্ষণ করে ঈষৎ গম্ভীর হয়ে মেয়ের উদ্দেশেই বলেন, "আগুনের কাজ তুমি করতে গেলে কেন? বাড়িতে আর লোক ছিল না?"

সত্য ঘাড় নিচু করে বলে, "বেশী জ্বালা করছে না বাবা!"

"জ্বালা কথার কথা হচ্ছে না, করলেও সে জ্বালা নিবারণের ওষুধ অনেক আছে। জিজ্ঞেস করছি তুমি আগুনে হাত দিতে গেলে কেন?"

সত্য এবার ঘাড় তোলে। তুলে সহসা নিজস্ব ভঙ্গীতে তড়বড় করে বলে ওঠে, "আমি কি আর সাধে আগুনে হাত দিয়েছি বাবা, বড় বৌয়ের মুখ চেয়েই দিয়েছি। আহা বেচারী, একেই তার সতীন কাঁটার জ্বালা, তার ওপর আবার দুধ ওথলাবার হুকুম! মানুষের প্রাণ তো!"

সত্যর এই পরিষ্কার উত্তর প্রদানে একা রামকালীই নয়, মোক্ষদাও তাজ্জব বনে যান। এ কী সর্বনেশে মেয়ে গো। ওই হোমরা-চোমরা বাপের মুখের ওপর এই চোটপাট উত্তর! গালে হাত দিয়ে নির্বাক হয়ে যান মোক্ষদা। কথা বলেন রামকালীই। দুই ভ্রূ কুঁচকে ঝাঁজালো গলায় বলেন, "সতীন কাঁটার জ্বালাটা কী জিনিস?"

"কি জিনিস সে কথা তুমি তোমার মেয়ের কাছেই এবার শেখো রামকালী," মোক্ষদা সত্যবতীর আগেই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের স্বরে বলেন, "আমরা এতখানি বয়সে যা কথা না শিখেছি, এই পুঁচকে ছুঁড়ী তা শিখেছে। কথার ধুকড়ি!"

সত্য এইসব উলটোপালটা কথাগুলো দু চক্ষের বিষ দেখে। কেন যে বাপু, যখন যা সুবিধে তখন তাই বলবি কেন? এই এক্ষুনি সত্যকে বলা হলো 'বুড়ো ধিঙ্গী', আবার এখন বলা হচ্ছে 'পুঁচকে ছুঁড়ী'! সবই যেন ইচ্ছে খুশি।

রামকালী পিসীর দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে জলদগম্ভীর স্বরে কন্যাকে পুনঃ প্রশ্ন করেন, "কই আমার কথার জবাব দিলে না? বললে না সতীন কাঁটা কি জিনিস, আর তার জ্বালাটাই বা কী বস্তু?"

কি বস্তু সে কথা কি ছাই সত্যই জানে? তবে বস্তুটা যে খুব একটা মর্মবিদারী দুঃখজনক, সেটা বোধ করি জন্মাবার আগে থাকতেই জানে। তাই মুখটা যথাসম্ভব করুণ করে তুলে বলে, "সতীন মানেই তো কাঁটা বাবা! আর কাঁটা থাকলেই তার জ্বালা আছে। বড় বৌএর প্রাণে তো এখন তুমি সেই জ্বালা ধরিয়ে দিলে—"

"থামো!" হঠাৎ ধমকে উঠলেন রামকালী। বিচলিত হয়েছেন তিনি, বাস্তবিকই বিচলিত হয়েছেন এতক্ষণে। বিচলিত হয়েছেন মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে নয়, সহসা মেয়ের অন্তরের মলিনতার পরিচয় পেয়ে।

এ কী!

এ রকম তো ধারণা ছিল না তাঁর, ছিল না হিসেবের মধ্যে। এটা হল কোন ফাঁকে? সত্যবতীর বহুবিধ নিন্দাবাদ তাঁর কানে এসে ঢোকে, সে সব তিনি কখনোই বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। করেন না শুধু মেয়ের স্বভাবে প্রকৃতিতে একটা নির্মল তেজের প্রকাশ লক্ষ্য করে। সত্যর হৃদয়ে হিংসা-দ্বেষের ছায়ামাত্র নেই, এইটাই জমা ছিল হিসেবের খাতায়,

এহেন নীচ হিংসুটে কথাবার্তা শিখে ফেলল সে কখন? কিন্তু বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়, শাসনের দরকার।

তাই আরো বাঘ-গর্জনে বলে ওঠেন, "কেন সতীন কিসে এত ভয়ঙ্করী হল? সে এসে ধরে মারছে তোমাদের বড়বৌকে?"

বাবার বাঘা-হুমকিতে সত্যবতীর চোখে জল উপচে এসে পড়েছিল, কিন্তু সহজে হার মানে না সে। আর কাঁদার দৈন্যটা প্রকাশ হয়ে পড়বার ভয়ে কষ্টে ঘাড় নিচু করে ধরা গলায় বলে, "হাতে না মারুক ভাতে মারছে তো? বড়বৌ একলা একেশ্বরী ছিল, নতুন বৌ হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসল—"

"আ ছি ছি ছি!"

রামকালী শিউরে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। মুখ দেখে মনে হল, সত্যবতী যেন সহসা তাঁর যত্নে আঁকা একখানি ছবিকে মুচড়ে দুমড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

এই ফাঁকে মোক্ষদা আবার এক হাত নেন, "ওই শোনো! শোনো মেয়ের কথার ভঙ্গিমে! সাধে বলি কথার ভশ্চায্যি। বুড়ো মাগীদের মতন কথা, আর ছেলেপেলের মতন দস্যিচাল্লি। হরঘড়ি অবাক করে দিচ্ছে কথার জ্বালায়।"

রামকালী পিসীর আক্ষেপে কান না দিয়ে তিক্তবিরক্ত স্বরে বলেন, "এমন ইতর কথা বার্তা কোথা থেকে শিখেছ? ছি ছি ছি! লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার। উড়ে এসে জুড়ে বসা মানে কি? এক বাড়িতে দুটি বোন থাকে না? সতীনকে 'কাঁটা' না ভেবে বোন বলে ভাবা যায় না?"

বাবা এত ঘেন্না দেওয়ার পর অবশ্য সত্যবতীর সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। একসঙ্গে অগুনতি ফোঁটা ঝর ঝর করে ঝরে পড়ে চোখ থেকে গালে, গাল থেকে মাটিতে। পড়তেই থাকে, হাত তুলে মোছে না সত্য।

রামকালী চাটুয্যে আর এক বার বিচলিত হন। সত্যবতীর চোখে জল! এটা যেন একটা অদৃষ্টপূর্ব দৃশ্য মনে হচ্ছে। মনে হল ঘেন্নাটা বোধ করি একটু বেশী দেওয়া হয়ে গেছে।

ঔষধে মাত্রাধিক্য, রামকালীর পক্ষে শোচনীয় অপরাধ। মনে পড়ল, মেয়েটার হাতের ফোস্কাটাও কম জ্বালাদায়ক নয়। এখুনি প্রতিকার করা দরকার। তাই ঈষৎ নরম গলায় বলেন, "এ রকম নীচ কথা আর ব'লো না বুঝলে? মনেও এনো না। সংসারে যেমন ভাই-বোন ননদ দেওর জা ভাসুর সব থাকে, তেমনি সতীনও থাকে, বুঝলে? কই দেখি হাতটা।"

হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে সত্যবতী নিজের উদ্বেল হৃদয়ভারকে সামলাতে চেষ্টা করে দাঁতে ঠোঁট চেপে।

মোক্ষদা বোঝেন মেঘ উড়ে গেল। হয়ে গেল রামকালীর মেয়ে শাসন করা! ছি ছি ছি! আর দাঁড়াতে ইচ্ছে হল না, বললেন, "যাক গে, শাস্তি শাসন হয়ে গেছে তো?

এবার মেয়েকে সোহাগ করো বসে বসে। তুমিই দেখালে বটে বাবা!"

রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নেন মোক্ষদা।

রামকালী আশু প্রতিকার হিসাবে একটি প্রলেপ মেয়ের ফোস্কা ঘায়ে লাগাতে লাগাতে সহসা আবার বলেন, "আজকের কথা মনে থাকবে তো? আর কোন দিন এ রকম কথা ব'লো না, বুঝলে? মানুষ তো বনের জানোয়ার নয় যে খালি হিংসেহিংসি কামড়াকামড়ি করবে? সকলের সঙ্গে মিলেমিশে, সবাইকে ভালবেসে পৃথিবীতে থাকতে হয়।"

বাবার গলায় আপসের সুর।

অতএব ফের একটু সাহস সঞ্চয় হয় সত্যবতীর। তা ছাড়া প্রাণটা তো ফেটে যাচ্ছে বাবার ধিক্কারে। কিন্তু তারই বা দোষ কোথায় বুঝে উঠতে পারে না সত্যবতী। সবাইকে ভালবেসে থাকাই যদি এত ধম্মো হয়, তা হলে 'সেঁজুতি' বত্তটি করতে হয় কেন?

মনের চিন্তা মুখে প্রকাশ হয়ে পড়ে সত্যর, "তাই যদি, তা হলে সেঁজুতি বত্ত করতে হয় কেন বাবা? পিসঠাকুমা তো এ বছর থেকে আমাকে, ফেন্তুকে আর পুণ্যিকে ধরিয়েছে।"

রামকালী এবার বিরক্তির বদলে বিস্মিত হন। 'সেঁজুতি বত্ত' সম্পর্কে অবশ্য তিনি সম্যক অবহিত নন, কিন্তু যাই হোক, কোনও একটি ব্রত যে মানবতাবোধ-বিরোধী হওয়া সম্ভব, সেটা ঠিক ধারণা করতে পারেন না। তাই প্রলেপের হাতটা ঘরের কোণে রক্ষিত মাটির জালার জলে ধুতে ধুতে বলেন, "ব্রতের সঙ্গে কি?"

"কি নয় তাই ব'লো না কেন বাবা?" চোখের জল শুকোবার আগেই সত্যর গলার স্বর শুকনো খটখটে হয়ে ওঠে, "সেঁজুতি বত্তর যত মন্তর সব সতীন-কাঁটা উদ্ধারের জন্যে নয়?"

রামকালী একটুক্ষণ চুপ করে থাকেন।

কোথায় যেন একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন। হুঁ, এই রকমই একটা কিছু গোলমেলে ব্যাপার ঢুকে গিয়েছে মেয়ের মাথায়। নচেৎ সত্যর মুখে অমন কথা!

হাতে অনেক কাজ।

তবু রামকালী বিবেচনা করলেন, সদুপদেশের দ্বারা কন্যার হৃদয়-কানন হতে 'সতীন কণ্টকে'র মূলোৎপাটন করা কর্তব্য! তাই ভুরু কুঁচকেই বললেন, "তাই না কি? সে মন্তরটা কি?"

"মন্তর কি একটা বাবা?" সত্যবতী মহোৎসাহে বলে, "গাদা-গাদা মন্তর। সব কি ছাই মনেই আছে? ভেবে ভেবে বলছি রোসো। প্রেথমে তো আলপনা আঁকা। ফুল-লতার নক্‌শা কেটে তার ধারে-কোণে হাতা বেড়ি হাঁড়িকুঁড়ি এস্তক করে ঘর-সংসারির প্রেত্যেকটি জিনিস এঁকে নেওয়া। তা পর একোটা একোটা ধরে ধরে মন্তর পড়তে হয়। হাতায় হাত দিলাম, বললাম—

'হাতা হাতা হাতা,
খা সতীনের মাথা।'

খোরায় হাত দিয়ে—

'খোরা খোরা খোরা,
সতীনের মাকে ধরে নিয়ে যাক
তিন মিনসে গোরা।

তা'পর—
বেড়ি বেড়ি বেড়ি
সতীন মাগী চেড়ী।
বঁটি বঁটি বঁটি
সতীনের ছেরাদ্দর কুটনো কুটি।
হাঁড়ি হাঁড়ি হাঁড়ি,
আমি যেন হই জন্ম-এয়োস্ত্রী,
সতীন কড়ে রাঁড়ী।' "

"চুপ চুপ!"

রামকালী জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, "এই সব তোমাদের ব্রতের মন্তর?"

এইসব যে ব্রতের মন্ত্র হওয়ার উপযুক্ত নয়, সেই সত্যটা যেন সত্যর বোধের জগতে সহসা এই মুহূর্তে একটা চকিতে আলোক ফেলে যায়। সে উৎসাহের বদলে মৃদুস্বরে বলে, "আরও তো কত আছে—"

"আরও আছে? বটে! আচ্ছা বলো তো শুনি আরও কি কি আছে। দেখি কি ভাবে তোমাদের মাথাগুলো চিবোনো হচ্ছে। জানো আরও?"

"হ্যাঁ।" সত্য বড় করে ঘাড় কাৎ করে বলে, "আর হচ্ছে—

'ঢেঁকি ঢেঁকি ঢেঁকি,
সতীন মরে নিচের আমি উপুর থেকে দেখি!'

তা' পর গে-–'অশ্বথ্ কেটে বসত্ করি,
সতীন কেটে আলতা পরি।'
ময়না ময়না ময়না,
সতীন যেন হয় না।'

তা' পর এক মুঠো দুব্বো ঘাস নিয়ে বলতে হয়, 'ঘাস মুঠি ঘাস মুঠি, সতীন হোক কানা কুষ্ঠি।' গয়না এঁকেও ছুঁয়ে ছুঁয়ে মন্তর আছে—

'বাজু বন্দ পৈঁছে খাড়ু।
সতীনের মুখে সাত ঝাড়ু!'

পান এঁকে বলতে হয়—

'ছাচি পান এলাচি গুয়ো—
আমি সোহাগী, সতীন দুয়ো—' "

"আচ্ছা থাক্ হয়েছে। আর বলতে হবে না।"

রামকালী হাত নেড়ে নিবৃত্ত করেন, "এসব গালমন্দকে তোমরা পুজোর মন্তর বল ?"

"আমরা বলি কি গো বাবা ?" সত্যবতী তার পণ্ডিত বাপের এহেন অজ্ঞতায় আকাশ থেকে পড়ে চোখ গোল গোল করে বলে, "জগৎ সুদ্ধু সবাই বলে যে ! সতীন যদি বোনের মতন হবে, তবে এত মন্তরের প্রেজন হবে কেন ? বোনের খোয়ারের জন্যে কি কেউ বত্ত করে ? আসল কথা বেটা-ছেলেরা তো আর সতীনের মর্ম বোঝে না, তাই—" একটা ঢোঁক গিলে নেয় সত্য, কারণ বেটাছেলে সম্পর্কে পরবর্তী যে বাক্যটি জিভের আগায় এসে যাচ্ছিল, সেটা বাবার প্রতি প্রয়োগ করা সমীচীন কিনা বুঝতে না পেরে দ্বিধা এল।

রামকালী গম্ভীর মুখে বলেন, "তা হোক এ ব্রত তোমরা আর ক'রো না।"

ক'রো না।

ব্রত ক'রো না।

মাথায় বজ্রপাত হল সত্যর।

এ কী আদেশ। এখন উপায় ?

একদিকে পিতৃআজ্ঞে, অপর দিকে 'ব্রেতোপতিত'। ব্রেতোপতিত হলে তো জলজ্যান্তে নরক, আর পিতৃআজ্ঞে পালন না করার পাতকটা ঠিক কত দূর গর্হিত না জানা থাকলেও, সেই পাতকের পাতকীকেও যে নরকের কাছাকাছি পৌঁছতে হবে এ বিষয়ে সত্য নিঃসন্দেহ।

অনেকক্ষণ দু' জনেই স্তব্ধ।

তার পর আস্তে আস্তে কথাটা তোলে সত্য, "ধরা বত্ত উজ্জাপন না করে ছেড়ে দিলে যে নরকগামিন হতে হবে বাবা।"

"না হবে না। এসব ব্রত করলেই নরকগামী হতে হয়।"

"পিসঠাকুমাকে তা হলে তাই বলব ?"

"কি বলবে ?"

"এই ইয়ে—সেঁজুতি করতে তুমি মানা করেছ।"

"আচ্ছা থাক্, এখুনি তাড়াতাড়ি তোমার কিছু বলবার দরকার নেই। যা বলবার আমিই বলব এখন। তুমি যাও এখন। হাতটা সাবধান, কোথাও ঘসটে ফেলো না।"

সত্যবতীর অবস্থাটা দাঁড়ায় অনেকটা ন যযৌ, ন তস্থৌ।

বাবার হুকুম চলে যাওয়ার, অথচ মনের মধ্যে প্রশ্নের সমুদ্র। সে সমুদ্রের ঢেউ আর কার পায়ের কাছে আছড়ে পড়লে সুরাহা হবে—বাবা ছাড়া ?

"বাবা।"

"কি ? আবার কি ?"

"বত্তটা যদি অন্যাই, সতীন যদি ভাল বস্তু, তা হলে বড় বৌয়ের অত কষ্ট হচ্ছে কেন ?"

"বড় বৌ ? রাসুর বৌ ? কষ্ট হচ্ছে ? সে-তোমাকে বলেছে তার কষ্ট হচ্ছে ?"

রামকালীর কণ্ঠে ফের ধমকের সুর ছায়া ফেলে।

কিন্তু সত্যবতী দমে না।

ধিক্কারে দমে বটে সত্য, কিন্তু ধমকে নয়। তাই বাক্‌ভঙ্গীতে সতেজতা এনে মোক্ষদার ভাষায় 'কথার ভশ্চায্যি'র মতই তড়বড় করে বলে, "বলতে যাবে কেন বাবা? সবই কি আর মুখ ফুটে বলতে হয়? চেহারা দেখে বোঝা যায় না? কেঁদে কেঁদে চোখ মুখ বসে গেছে, অমন যে সোনার বন্ন, যেন কালি মেড়ে দিয়েছে। পশু থেকে মুখে এক বিন্দু জল দেয় নি। নোকলজ্জায় বলছে বটে 'পেট ব্যথা করছে তাতেই খিদে নেই, তাতেই কাঁদছি', কিন্তু বুঝতে সবাই পারছে। কে আর ঘাসের ভাত খায় বল? মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা, তার ওপর আবার আজ নতুন বো'র হাতের সুতো খোলা! কেউ বলছে বড় বৌকে অন্য ঘরে দিয়ে ওই ঘরেই নেমকর্ম হবে, কেউ বলছে 'আহা থাক্।' বড় বৌ নাকি ও-বাড়ির সাবি পিসীকে বলেছে, 'অত ধন্দয় কাজ নেই, চাটুয্যে পুকুরে অনেক জায়গা আছে তাতেই আমার ঠাঁই হবে'।"

সর্বনাশ!

প্রমাদ গণেন রামকালী।

মেয়েমানুষের অসাধ্য কাজ নেই।

কে বলতে পারে মেয়েটা সত্যিই ওই রকম কোন দুর্মতি করে বসবে কি না। এও তো মহাজ্বালা! কোথায় ভদ্রলোকের জাতমান উদ্ধারের কথা ভেবে আনন্দ করবি, তা নয় এই সব প্যাঁচ।...কেন, ত্রিভুবনে আর কারো সতীন হয় না?

হয়েছে আর কি, ওই সব অখদ্যে ব্রত পার্বণ করিয়ে শিশুকাল থেকে মেয়েগুলোর পরকাল ঝরঝরে করে রাখা হয়েছে কি না!

মেয়েমানুষ জাতই কুয়ের গোড়া।

'ঘরের লক্ষ্মী' বলে সৌজন্য দেখালে কি হবে, এক একটি মহা অলক্ষ্মী!

নইলে রাসোর ওই বৌটা, কী বা বয়স, তার কিনা এত বড় বড় কথা! জলে ডুবে মরবার সংকল্প!. ছি ছি!

"এই কথা বলেছেন বড় বৌমা?"

অন্ধকার-মুখে বলেন রামকালী।

"সাবি পিসী তো বলছিল।"

বাবার মুখ দেখে এবার যেন একটু ভয় ভয় করে সত্যর। কিন্তু ভয় করলে তো চলবে না। তারও যে কর্তব্য রয়েছে—বাবাকে চৈতন্য করাবার।

এত বোধবুদ্ধি বাবার, অথচ সোয়ামী আর একটা বিয়ে করে আনলে মেয়েমানুষের প্রাণ ফেটে যায় কি না সে জ্ঞান নেই! আর না যদি ফাটবে, তা হলে কৈকেয়ী কেন তিন যুগে হেয় হয়েও রামকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন? কথক ঠাকুরের কথাতেই তো শুনেছে সত্য।

রাজার রাণী তিনি, তাও মনে এত বিষ।

আর বড় বৌ বেচারী নিরীহ ভালমানুষ, শুধু মনের ঘেন্নায় নিজে মরতে চেয়েছে।

সত্যর প্রাণে এত দাগা লাগার আরও একটা কারণ, বড় বৌকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলবার মুখ তার নেই। নেই তার কারণ, এই মর্মান্তিক হৃদয়বিদারক নাটকের নায়ক হচ্ছেন স্বয়ং সত্যবতীরই বাবা। ইশারায় ইঙ্গিতে ঘরে-পরে সকলেই তো রামকালীকে দুষছে।

দুষবার কথাও। ছেলের মায়ের যে গৌরব আলাদা। বড় বৌ যদি ছেলের মা না হত তা হলেও বা কথা ছিল। কেঁদে কেঁদে ওর যদি বুকের দুধ শুকিয়ে যায়, ছেলে বাঁচবে কিসে?

এদিকে রামকালী ভাবছেন, বৌটাকে সায়েস্তা করার উপায় কি? গ্রাম সুদ্ধু লোক নেমন্তন্ন করেছেন, রাত পোহালেই যজ্ঞি, ও যদি সত্যিই কিছু একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে। অনেক ভেবে গলাটা ঝেড়ে বললেন, "ওসব হচ্ছে ছেলে-বুদ্ধির কথা। তুমি আমার হয়ে বৌমাকে গিয়ে বলো গে, ওসব ছেলেমানুষী বুদ্ধি ছেড়ে দিতে। বলো গে, 'বাবা বললেন, মন ভালো করব ভাবলেই মন ভাল করা যায়। বলো গে, উঠুন, কাজকর্ম করুন, ভাল করে খান-দান, মনের গলদ কেটে যাবে।"

সত্য আর একবার বাবার অজ্ঞতায় কাতর হয়। তবে শুধু কাতর হয়ে চুপ করেও থাকে না। একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলে, "তা যদি কেটে যেত, তা হলে তো মাটির প্রিথিবীটা সগ্‌গো হত বাবা। রুগীর চেহারা দেখে তুমি ওপর থেকে বলে দিতে পারো, তার শরীরের মধ্যে কোথায় কি হচ্ছে, আর মানুষের মুখ দেখে বুঝতে পারো না তার প্রাণের ভেতরটায় কি হচ্ছে? নিজের চোক্ষে প্রেত্যক্ষ এক বার দেখবে চল তা হলে।"

সহসা কেন কে জানে রামকালীর গায়ে কি রকম কাঁটা দিয়ে উঠল। চুপ করে গেলেন তিনি। তার অনেকক্ষণ পর হাত নেড়ে মেয়েকে ইশারা করলেন চলে যেতে।

এর পর আর চলে যাওয়া ছাড়া উপায় কি? সত্য মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে চলে যায়।

কিন্তু এবারের ডাকের পালা রামকালীরই। "আচ্ছা শোনো।"

সত্যবতী ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়।

"শোনো, বৌমাকে তোমার কিছু বলবার দরকার নেই, তুমি শুধু, মানে ইয়ে তোমাকে খালি একটা কাজ দিচ্ছি—"

রামকালী ইতস্তত: করছেন।

সত্যবতী অবাক হয়ে যায়।

নাঃ, আর যাই হোক বাবাকে কখনো এমন ইতস্তত: করতে দেখে নি সত্য।

কিন্তু এ হেন পরিস্থিতিতেই বা কবে পড়েছেন রামকালী?

সত্যিই কি সত্যবতী তাঁর চৈতন্য করিয়ে দিল নাকি? তাই রামকালী অমন বিব্রত,

বিচলিত!

"বাবা, কি করতে বলছিলে?"

"ও হ্যাঁ, বলছিলাম যে তুমি তোমাদের বড় বৌঞর একটু কাছে কাছে থাকো গে, যাতে তিনি ওই পুকুরের দিকে-টিকে যেতে না পারেন।"

সত্যবতী মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকে। বোধ করি বাপের আদেশের তাৎপর্যটা অনুধাবন করেই নম্রগলায় বলে, "বুঝেছি, বৌকে চোখে চোখে রেখে পাহারা দিতে বলছ।"

পাহারা!

রামকালী যেন মরমে মরে যান।

তাঁর আদেশের ব্যাখ্যা এই!

বিরক্তি দেখিয়ে বলেন রামকালী, "পাহারা মানে কি? কাছে কাছে থাকবে, খেলাধুলো করবে, যাতে তাঁর মনটা ভাল থাকে—"

সত্যবতী সনিঃশ্বাসে বলে, "ওই হল, একই কথা! কথায় বলে, 'যার নাম ভাজা চাল তার নাম মুড়ি, যার মাথায় পাকা চুল তারেই বলে বুড়ী।' কিন্তু বাবা, পাহারা নয় দিলাম, ক'দিন ক'রাত দেব বলো? কেউ যদি আত্মঘাতী হব বলে প্রিতিজ্ঞে করে, কারুর সাধ্যি আছে আটকাতে? শুধুই তো চাটুয্যে পুকুরের জল নয়, ধুতরো ফল আছে, কুঁচ ফল আছে, কলকে ফুলের বিচি আছে—"

"চুপ চুপ!"

রামকালী আতপ্ত নিশ্বাসের দাহ ছড়িয়ে বলে ওঠেন, "চুপ করো! তোমার সেজঠাকুমা দেখছি ঠিকই বলেন। এত কথা শিখলে কোথা থেকে তুমি? যাও, তোমাকে কিছু করতে হবে না। যাও।"

দশ

'যাও' বলে মানুষকে তাড়ানো যায়, চিন্তাকে তাড়ানো যায় না। তাড়ানো যায় না মানসিক দ্বন্দ্বকে। সত্যবতীকে 'যাও' বলে ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন রামকালী, কিন্তু মন থেকে সরাতে পারছেন না সহসা উদ্বেলিত হয়ে ওঠা এই চিন্তাটাকে, তাড়াতে পারছেন না এই দ্বন্দ্বটাকে।

তা হলে কি ঠিক করিনি?

তবে কি ভুল করলাম?

চিন্তার এই দ্বন্দ্ব রামকালীকেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ঘর থেকে চণ্ডীমণ্ডপে, চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বারবাড়ির উঠোনে, সেখান থেকে বাগান বরাবর কি জানি কেন একেবারে চাটুয্যে পুকুরের ধারে। পুকুরের ধারে ধারে পায়চারি করতে থাকেন রামকালী।

দীর্ঘায়ত শরীর সামনের দিকে ঈষৎ ঝোঁকা, দুই হাত পিঠের দিকে জোড় করা, চলনে মন্থরতা। রামকালীর এ ভঙ্গীটা লোকের প্রায় অপরিচিত। দৈবাৎ কখনো কোন জটিল রোগের রোগীর মরণ-বাঁচন অবস্থায় চিন্তিত রামকালী এইভাবে পায়চারি করেন। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পুঁথি নেড়ে ঔষধ নির্বাচন করেন না রামকালী, এইভাবে বেড়িয়ে বেড়িয়েই মনে-মনে করেন। হয়তো বা পুঁথির পৃষ্ঠাগুলো মুখস্থ বলেই সেগুলো আর না নাড়লেও চলে। শুধু ভেবে দেখলেই চলে।

কিন্তু সে তো দৈবাৎ।

ঔষধ-নির্বাচনের জন্য চিন্তার সময় বেশী নিতে হয় না কবরেজ চাটুয্যেকে, রোগীর চেহারা দেখলেই মুহূর্তে রোগ এবং তার নিরাকরণ ব্যবস্থা দুইই তাঁর অনুভূতির বাতায়নে এসে দাঁড়ায়। তাই চিন্তিত মূর্তিটা তাঁর কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। ঋজু দীর্ঘদেহ শালগাছের মত সোজা সতেজ, দুই হাত বুকের উপর আড়াআড়ি করে রাখা, প্রশস্ত কপাল, খড়্গনাসা, আর দৃঢ়নিবদ্ধ ওষ্ঠাধরের ঈষৎ বঙ্কিম রেখায় আত্মপ্রত্যয়ের সুস্পষ্ট ছাপ। এই চেহারাই রামকালীর পরিচিত চেহারা। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, আজ রামকালীর মুখের রেখায় আত্মজিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণতা।

তবে কি ভুল করলাম?

তবে কি ঠিক করি নি? তবে কি আরও বিবেচনা করা উচিত ছিল? কিন্তু সময় ছিল কোথা?

বার বার ভাবতে চেষ্টা করছেন রামকালী, তিনি কি বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছেন? তাই একটা অবোধ শিশুর এলোমেলো কথার উপর এতটা মূল্য আরোপ করে এতখানি বিচলিত হচ্ছেন? কি আছে এত বিচলিত হবার? সত্যিই তো, ত্রিভুবনে সতীন কি কারও হয় না? অসংখ্যই তো হচ্ছে। বরং নিঃসপত্ন স্বামিসুখ কটা মেয়ের ভাগ্যে জোটে, সেটাই আঙুল গুণে বলতে হয়। কিন্তু এ চিন্তা দাঁড়াচ্ছে না। চেষ্টা করে আনা যুক্তি ভেসে যাচ্ছে হৃদয়-তরঙ্গের ওঠাপড়ায়। কিছুতেই উড়িয়ে দিতে পারছেন না এক ফোঁটা একটা মেয়ের কথাগুলোকে।

বহুবিধ গুণের সমাবেশে উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য চরিত্র রামকালীর, পুরুষের আদর্শস্থল, তবু সে চরিত্রের গাঁথনিতে একটু বুঝি খুঁত আছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দেবার শিক্ষা আছে তাঁর, শিক্ষা আছে বয়োজ্যেষ্ঠকে সম্মান সমীহ করবার, কিন্তু সমগ্র 'মেয়েমানুষ' জাতটার প্রতি নেই তেমন সম্ভ্রমবোধ, নেই সম্যক মূল্যবোধ!

যে জাতটার ভূমিকা হচ্ছে শুধু ভাত-সেদ্ধ করবার, ছেলে ঠেঙাবার, পাড়া বেড়াবার, পরচর্চা করবার, কোঁদল করে অকথ্য অশ্রাব্য গালিগালাজ করবার, দুঃখে কেঁদে মাটি ভেজাবার আর শোকে উন্মাদ হয়ে বুক চাপড়াবার, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন একটা অবজ্ঞা ছাড়া আর কিছু আসে না রামকালীর। অবশ্য আচারে-আচরণে ধরা পড়ে না, ধরা পড়ে না হয়তো নিজের কাছেও—তবু অবজ্ঞাটা মিথ্যা নয়। কিন্তু সম্প্রতি ক্ষুদে একটা মেয়ে

যেন মাঝে মাঝে তাঁকে ভাবিয়ে তুলছে, চমকে দিচ্ছে, বিচলিত করছে, 'মেয়েমানুষ' সম্পর্কে আর একটু বিবেচনাশীল হওয়া উচিত কিনা এ প্রশ্নের সৃষ্টি করছে।

আকাশে সন্ধ্যা নামে নি, কিন্তু তাল-নারিকেলের সারিষেরা পুকুরের কোলে কোলে সন্ধ্যার ছায়া! এই প্রায়ান্ধকার পথটুকুতে পায়চারি করতে করতে সহসা রামকালীর চোখের দৃষ্টি ঈগলের মত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কে? ঘাটের পৈঠের একেবারে শেষ ধাপে অমন করে বসে ও কে? কই এতক্ষণ তো ছিল না, কখন এল? কোন পথ দিয়েই বা এল? আর কেনই বা এল এমন ভরা ভরা সন্ধ্যায় একা একা? এ সময় ঘাটে পথে এমন একা মেয়েরা কদাচিৎ আসে, অবশ্য মোক্ষদা বাদে! কিন্তু দূর থেকে কে তা ঠিক বুঝতে না পারলেও মোক্ষদা যে নয়, সেটা বুঝতে পারলেন রামকালী।

তবে কে?

অভূতপূর্ব একটা ভয়ের অনুভূতিতে বুকের ভেতরটা কেমন সিরসির করে উঠল। রামকালীর পক্ষে এ অনুভূতি নিতান্তই নতুন।

অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হয়ে আসছে, দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করেও ফল হচ্ছে না, অথচ এর চেয়ে কাছাকাছি গিয়ে ভাল করে নিরীক্ষণ করবার মত অসঙ্গত কাজও রামকালীর পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু একেবারে অগ্রাহ্য করাই বা চলে কি করে? সন্দেহ যে ঘনীভূত হচ্ছে। এ আর কেউ নয়, নির্ঘাৎ রাসুর বৌ।

কিন্তু সত্য কি করল? সত্যবতী? পাহারা দেওয়ার নির্দেশটা পালন করল কই?

দিব্যি বড়সড় একটা কলসী ওর সঙ্গে রয়েছে মনে হচ্ছে।

যারা সাঁতার জানে, তাদের পক্ষে জলে ডুবে মরতে কলসীটা নাকি সহায়-সহায়ক। আর ছেলেমানুষ একটা মেয়ে যদি ওই কলসীটা গলায় বেঁধে—

চিন্তার ধারা ওই একটা দুশ্চিন্তার শিলাপাথরকে ঘিরেই পাক খেতে থাকে। কিছুতেই মনে আসে না অসময়ে জলের প্রয়োজনেও কলসী নিয়ে পুকুরে আসতে পারে লোকে।

তবে এটা ঠিক, জল ভরবার তাগিদ কিছু দেখা যাচ্ছে না ওর ভঙ্গীতে। কলসীর কানাটা ধরে চুপচাপ বসে থাকাকে কি তাগিদ বলে? নাঃ জলের জন্যে অন্য কেউ নয়, এ নির্ঘাৎ রাসুর বৌ! মরবার সংকল্প নিয়ে ভরসন্ধ্যায় একা পুকুরে এসেছে, তবু চট করে বুঝি সব শেষ করে দিতে পারছে না, শেষবারের মত পৃথিবীর রূপ রস শব্দ স্পর্শের দিকে তাকিয়ে নিতে চাইছে।

শুধুই কি তাই?

তাকিয়ে নিয়ে নিঃশ্বাস ফেলে ভাবছে না কি, কার জন্যে তাকে এই শোভা-সম্পদ, এই সুখভোগ থেকে বঞ্চিত হতে হল— ?

হঠাৎ চোখ দুটো জ্বালা করে এল রামকালীর।

এই জ্বালা কন্যাকে রামকালী চেনেন না। এ অনুভূতি সম্পূর্ণ নতুন, সম্পূর্ণ আকস্মিক।

কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে তো চলবে না, এখুনি একটা বিহিত করতে হবে। নিবৃত্ত করতে হবে মেয়েটাকে। অথচ উপায়টা কি? রামকালী তো আর মেয়ে-ঘাটে নেমে হাত ধরে তুলে আনতে পারেন না? পারেন না ওকে সদুপদেশ দিয়ে এই সর্বনাশা সংকল্প থেকে ফেরাতে ডাকবেনই বা কি বলে? কোন্ নামে? রামকালী যে শ্বশুর।

অথচ এখান থেকে সরে গিয়ে কোনও মেয়েমানুষকে ডেকে নিয়ে আসবার চিন্তাটাও মনে সায় দিচ্ছে না। যদি ইত্যবসরে—?

আরে, আরে, স্থিরচিত্রটা চঞ্চল হয়ে উঠল যে।

কলসীটা জলে ডুবিয়ে জল কাটছে যে মেয়েটা। ঈগল-দৃষ্টি ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে, নিজের অজ্ঞাতসারেই মেয়ে-ঘাটের দিকে এগিয়ে যান রামকালী, এমন সংকট মুহূর্তে ন্যায়-অন্যায়, উচিত অনুচিত, নিয়ম-অনিয়ম মানা চলে না। আর একটু ইতস্তুতঃ করলেই বুঝি ঘটে যাবে সেই সাংঘাতিক কাণ্ডটা।

দ্রুতপদে একেবারে ঘাটের কাছে গিয়ে দাড়ালেন রামকালী, প্রায় আর্তনাদের মত চীৎকার করে উঠলেন, "কে ওখানে? সন্ধ্যেবেলা জলের ধারে কে?"

রামকালী আতঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলেন তাঁর চীৎকারের ফলটা কি দাঁড়াল। ওই যে সাদা কাপড়ের অংশটুকু দেখা যাচ্ছিল এতক্ষণ, সেটা কি এই আকস্মিক ডাকের আঘাতে সহসা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল? যেটুকু ইতস্তুতঃ ছিল সেটুক আর রইল না? ওই তো বসে রয়েছে জলের মধ্যে পায়ের পাতা ডুবিয়ে, জীবন আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান শুধু একটি লহমার, একটি ডুবের। তার পরই তো ওর সব দুঃখের অবসান, সব জ্বালার শান্তি। ওইখানেই তো ওর হাতে রয়েছে সব ভয় জয় করবার শক্তি, তবে আর রামকালীর শাসনকে ভয় করতে যাবে ও কোন্ দুঃখে?

সাদা কাপড়টা দেখা যাচ্ছে এখনও, একটু যেন নড়ছে, রুদ্ধশ্বাস বক্ষে অপেক্ষা করতে থাকেন রামকালী। অথচ এই বিমূঢ়ের ভূমিকা অভিনয় করা ছাড়া ঠিক এই মুহূর্তে আর কী করার আছে রামকালীর? যতক্ষণ না সত্যি মরণের প্রশ্ন আসছে, ততক্ষণ বাঁচানোর ভূমিকা আসবে কি করে? জলে পড়ার আগে জল থেকে তুলতে যাওয়ার উপায় কোথা?

যতই ভয় পেয়ে থাকুন রামকালী, এমন কাণ্ডজ্ঞান হারান নি যে শুধু ঘাটের ধারে বসে থাকা মেয়েটাকে হাত ধরে হিড হিড় করে টেনে নিয়ে আসবেন, মেয়েটা মরতে যাচ্ছে ভেবে।

কি করবেন তবে? সাদা রংটা এখনো নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি, এখনও কিছু করা যাবে।

সহসা আত্মস্থ হয়ে উঠলেন রামকালী, সহসাই যেন ফিরে পেলেন নিজেকে। কী আশ্চর্য! কেন বৃথা আতঙ্কিত হচ্ছেন তিনি? এখুনি তেমন হাঁক পাড়লেই তো এ অঞ্চলের দশ-বিশটা লোক ছুটে আসবে। তখন আর চিন্তাটা কি? নিজের ওপর আস্থা হারাচ্ছিলেন কেন?

অতএব হাঁক পাড়লেন।

তেমনি ধারাই হাঁক বটে। 'মৃত্যুপথবর্তিনীও' যাতে ভয়ে গুরগুরিয়ে ওঠে। জলদ গম্ভীরস্বরে অভ্যস্ত আদেশের ভঙ্গীতেই হাঁক পাড়লেন রামকালী, "যে হও, জল থেকে উঠে এসো। আমি বলছি উঠে এসো। ভয়ালক্ষ্যায় জলের ধারে থাকবার দরকার নেই।" 'আমি'টার ওপর বিশেষ একটু জোর দিলেন।

না, হিসাবের ভুল হয় নি রামকালীর।

কাজ হল। এই ভরাট ভারী আদেশের সুরে কাজ হল। কলসীটা ভরে নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে এল মেয়েটা একগলা ঘোমটা টেনে। সাদা রংটার গতিবিধি লক্ষ্য করে বুঝতে পারলেন রামকালী, ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে ও।

আর একবার চিন্তা করলেন রামকালী, পাশ কাটিয়ে চলে যাবেন? না কি নির্বুদ্ধি মেয়েটাকে একটু সদুপদেশ দিয়ে দেবেন?

সাধারণতঃ শ্বশুর-বৌ সম্পর্কে কথা কওয়ার কথা ভাবাই যায় না, কিন্তু চিকিৎসক হিসেবে রামকালীর কিছুটা ছাড়পত্র আছে। বাড়ির বৌ-ঝির অসুখ বিসুখ করলে মোক্ষদা কি দীনতারিণী রামকালীকে খবর দিয়ে ডেকে নিয়ে যান, এবং তাঁদের মাধ্যমে হলেও পরোক্ষে অনেক সময় রোগিণীকে উদ্দেশ করে কথা বলতে হয় রামকালীকে। যথা—ঠাণ্ডা না লাগানো বা কুপথ্য না করার নির্দেশ। তেমন বাড়াবাড়ি না হলে অবশ্য রোগী 'দেখা'র প্রশ্ন ওঠে না, লক্ষণ শুনেই ঔষধ নির্বাচন করে দেন। কিন্তু বাড়াবাড়ির ক্ষেত্রে বলতে হয় বৈ কি। অবশ্য যথাসাধ্য দূরত্ব ও সম্ভ্রম বজায় রেখেই বলেন। পুত্রবধূ অথবা ভ্রাতৃবধূ সম্পর্কীয়াদের 'আপনি' ভিন্ন তুমি বলেন না কখনও রামকালী। বলাই তো বিধি।

বিধি একেবারে লঙ্ঘন করলেন না রামকালী, তবু কিছুটা করলেন। পাশ কাটিয়ে চলে না গিয়ে একটা গলা খাঁকারি দিয়ে বলে উঠলেন, "এ সময় এরকম একা ঘাটে কেন? আর এ রকম আসবেন না। আমি নিষেধ করছি।" আর একবার 'আমি'টার ওপর জোর দিলেন রামকালী।

সম্মুখবর্তিনী অবশ্য কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ। রামকালীর সামনে দিয়ে হেঁটে চলে যাবে, এমন ক্ষমতা অবশ্য থাকবার কথাও নয়।

রামকালী কথা শেষ করলেন, "বাড়িতে শুভকাজ হচ্ছে, মন ভাল করতে হয়। এমন তো হয়েই থাকে।"

দ্রুতপদক্ষেপে এবার চলে গেলেন রামকালী।

রামকালী চলে গেলেও কাঠের পুতুলখানা আরও কিছুক্ষণ কাঠপাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে, কী ঘটনা ঘটে গেল যেন বুঝতেই পারে না। কি হল? এটা কি করে সম্ভব হল?

'এমন তো হয়েই থাকে' মানে কি?

উনি কি তা হলে সব জেনেছেন? জেনেও কথা কয়ে গেলেন? মাথা ঠাণ্ডা রেখে সদুপদেশ দিয়ে গেলেন মন ভাল করতে। সত্যিই কি তবে উনি দেবতা? দেবতা ভেবেও বুকের কাঁপুনি আর কমতে চায় না শঙ্করীর।

হ্যাঁ, শঙ্করী।

রাসুর বৌ সারদা নয়, কাশীশ্বরীর বিধবা নাতবৌ শঙ্করী। চিরদিন পিত্রালয়-বাসিনী কাশীশ্বরীর একটা মেয়ে সন্তান, তাও মরেছিল অকালে। মা-মরা দৌত্তুরটাকে বুকে করে এক বছরেরটি থেকে আঠারো বছরেরটি করে তুলে সাধ করে সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে দিয়েছিলেন কাশীশ্বরী, কিন্তু এমন রাক্ষসী বৌ যে বছর ঘুরল না, দ্বিরাগমন হল না। তা বাপের বাড়ীতেই ছিল এযাবৎ, কিন্তু এমনি মন্দ কপাল শঙ্করীর যে, মা-বাপকেও খেয়ে বসল। ছিল কাকা, সে এই সেদিন ভাইঝিকে ঘাড়ে করে বয়ে দিয়ে গেছে চাটুজ্যেদের এই সদাব্রতর সংসারে! না দিয়েই বা করবে কি? শুধুই তো ভাতকাপড় যোগানো নয়, নজরে রাখে কে? শ্বশুরকুলে থাকলে তবু সহজেই দাবে থাকবে। আর কপাল যার মন্দ, তার পক্ষে শ্বশুরবাড়ির উঠোন ঝাঁট দিয়েও একবেলা এক মুঠো ভাত খেয়ে পড়ে থাকা মাঙ্গের। বাপ-কাকার ভাত হল অপমান্যির ভাত!

এই সব বুঝিয়ে-বাঝিয়ে কাকা সেই যে ছেড়ে দিয়ে গেছে, ব্যস। বছর কাবার হতে চলল, উদ্দিশ নেই। অথচ এখানে শঙ্করীর উঠতে বসতে খোঁটা খেতে হচ্ছে 'চালচলনের' অভব্যতায়। উনিশ বছরের আগুনের খাপরা, এতখানি বয়স অবধি বাপের ঘরে কাটিয়েছে, তাকে বিশ্বাসই বা কি? বিধবার আচার-আচরণই তো শেখে নি ভাল করে। নইলে বামুনের বিধবা এটুকু জানে না যে, রাতে চালভাজার সঙ্গে শশা খেতে হলে আলাদা পাত্রে নিতে হয়, এক পাত্রে রাখলে ফলার হয়। এমন কি কামড়ে কামড়েও তো খেতে নেই, আলগোছে টুকরো করে মুখের মধ্যে ছুঁড়ে দিয়ে তবে চালভাজার সঙ্গে খাওয়া চলে। তা নয়, সুন্দরী দিব্যি করে এক দিন শশা কেটে চালভাজার পাশে নিয়ে খেতে বসেছেন। যা-ই ভাগ্যিস মোক্ষদার চোখে পড়ে গেল, তাই না জাত ধর্ম রক্ষে!

কিন্তু সেই একটাই নয়, পদে পদে অনাচার ধরা পড়ে শঙ্করীর, আর প্রতিপদে উপর মহলে সন্দেহ ঘনীভূত হয় এ মেয়ের রীত-চরিত্তির ভাল কিনা!

তা রামকালীর এত কথা জানবার কথা নয়। কবে কোনদিন কোন অনাথা অবীরা চাটুজ্যেদের সংসারে ভর্তি হচ্ছে, সে কথা মনে রাখার অবকাশ কোথায় তাঁর? কাজে কাজেই রাসুর বৌয়ের প্রশ্ন নিয়েই চিন্তাকে প্রবাহিত করেছেন। তা ছাড়া পুকুরের উঁচু পাড় থেকে ঠিক ঠাহরও হয় নি সাদা ওই বস্ত্রখণ্ডটুকুর কিনারায় একটু রঙের রেখা আছে কি নেই।

কিন্তু না, সারদা মরতে আসে নি। সত্যবতী পিতৃ-আদেশের সঙ্গে সঙ্গেই তাকে কড়া পাহারায় রাখতে শুরু করেছে। আর পাহারা না দিলেও মরা এত সোজা নয়। 'মরব'

বলেছে বলেই যে সত্যিই সন্ত আগত সতীনের হাতে স্বামিপুত্র দুই তুলে দিয়ে পুকুরের তলায় আশ্রয় খুঁজতে যাবে সে, তা নয়। জ্বালা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে তাকে, অন্যকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাবার ব্রত নিয়ে।

মরতে এসেছিল শঙ্করী।

মরতে এসেছিল তবু মরতে পারছিল না।

বসে বসে ভারছিল মরণের দশা যখন ঘটেছে তার, তখন মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। কিন্তু কোন্ মৃত্যুটা শ্রেয়? এই রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শ-সুধাময় পৃথিবী থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া, না সমাজ সংসার, সম্ভ্রম সভ্যতা, মান মর্যাদার রাজ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া।

শেষের মৃত্যুটা যেন প্রতিনিয়ত কী এক দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে শঙ্করীকে। কিন্তু শঙ্করী তো জানে সেখানে অনন্ত নরক। তাই না যে-পৃথিবী সকরুণ মিনতির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে ভোরের সূর্য আর সন্ধ্যার মাধুরীর মধ্যে, তার কাছ থেকেই বিদায় নিতে এসেছিল শঙ্করী।

কিন্তু পারল কই?

শুধুই কি মামাঠাকুরের দুর্লঙ্ঘ্য আদেশ? ঘাটের পৈঠেগুলোই কি তাকে দুর্লঙ্ঘ্য বাঁধনে বেঁধে রাখে নি?

তবে কি শঙ্করীর মৃত্যু বিধাতার অভিপ্রেত নয়? তাই দেবতার মূর্তিতে উনি এসে দাঁড়ালেন মৃত্যুর পথ রোধ করে?

হঠাৎ এমনও মনে হল শঙ্করীর, সত্যিই মামাঠাকুর তো? নাকি কোন দেবতার ছল? ঠাকুর-দেবতারা মানুষের ছদ্মবেশে এসে মানুষকে ভুল-ঠিক বুঝিয়ে দিয়ে যান, অভয় দিয়ে যান, এমন তো কত শোনা যায়।

বাড়ি ফিরে শঙ্করী যদি কোনপ্রকারে টের পায় রামকালী এখন কোথায় রয়েছেন, তা হলেই সন্দেহ ভঞ্জন হয়। ভাবতে ভাবতে ক্রমশঃ শঙ্করীর এমন ধারণাই গড়ে উঠতে থাকে, নিশ্চয় খোঁজ নিলে দেখা যাবে মামাঠাকুর এখন এ গ্রামেই নেই, রোগী দেখতে দূরান্তরে গেছেন। নিশ্চয় এ কোন দেবতার ছল। নইলে সত্যিই তো, মামাঠাকুর এমন ঘুলিঘুলি সন্ধ্যেয় মেয়েঘাটের কিনারায় ঘুরবেনই বা কেন?

আর সেই হাঁক পাড়াটা?

সেটাই কি ঠিক মামাঠাকুরের কণ্ঠস্বর? মাঝে মাঝে তো ভেতর বাড়িতে আসেন মামাঠাকুর, কথাবার্তাও কন মার সঙ্গে, খুড়ীর সঙ্গে, পিসীদের সঙ্গে, কই গলার শব্দে এতটা চড়া সুর শোনা যায় না তো? মৃদু গম্ভীর ভারী ভরাট গলা, আর কথাগুলিও দৃঢ় গম্ভীর।

এ মামাঠাকুরকে দেখলে পুণ্যি হয়।

বড় মামাঠাকুরের মতন নন ইনি। বড় মামাঠাকুরকে দেখলে ভক্তি ছেদ্দা ছুটে পালায়। কিন্তু কথা হচ্ছে দেবতার ছদ্মবেশ সম্বন্ধে একেবারে নিঃসংশয় হবার উপায়টা কি? কোথায়

মেয়েমহল আর কোথায় পুরুষমহল। চাটুয্যেদের এই শতখানেক সমস্ত সম্বলিত সংসারে স্ত্রীরাই সহজে স্বামীদের তত্ত্ব পান না, তা আর কেউ। অবিশ্যি পুরুষের তত্ত্ববার্তা নেবার প্রয়োজনটাই বা কি মেয়েদের? দুজনের জীবনযাত্রার ধারা তো সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী। পুরুষের কর্মধারার চেহারা যেমন মেয়েদের অজানা, সেদিকে উঁকি মারবার সাহস মেয়েদের নেই, তেমনি পুরুষের নেই অবকাশ মেয়েদের কর্মকাণ্ডের দিকে অবহেলার দৃষ্টিটুকুও নিক্ষেপ করবার।

একই ভিটেয় বাস করলেও উভয়ে ভিন্ন আকাশের তারা।

তবু মনে হতে লাগল শঙ্করীর, কোন উপায়ে একবার খোঁজ করা যায় না মামাঠাকুর বাড়িতে আছেন কিনা, থাকলে কি অবস্থায় আছেন? এইমাত্র ফিরলেন না অনেকক্ষণ থেকে বসে আছেন?

আহা, মামাঠাকুরের সঙ্গে যদি কথা কইতে পারা যেত। তা হলে বোধ করি ভগবানকে দেখতে পাওয়ার আশাটা মিটত শঙ্করীর। তা ওঁকে ভগবানের সঙ্গে তুলনা করবে না তো করবে কি শঙ্করী? এত ক্ষমা আর কোন্ মানুষের মধ্যে সম্ভব? এত করুণা আর কার প্রাণে আছে? শঙ্করীর মর্মকথা জানতে না পারলে ত্রিজগতের কেউ কি অমন দয়া, অমন সহানুভূতি দিয়ে কথা বলতে পারত? নাঃ। তারা মাথা মুড়িয়ে মাথায় ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দিত শঙ্করীকে। আর পিছনে ঘৃণার হাততালি দিতে দিতে বলত, "ছি ছি ছি, গলায় দড়ি! তুই না হিন্দুর মেয়ে। তুই না বামুনের ঘরের বিধবা।"

আচ্ছা, কিন্তু—হঠাৎ যেন সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে শঙ্করীর, মামাঠাকুর টের পেলেন কি করে? কে বলবে? কে জানে? তাও যদি বা কোন প্রকারে সন্ধান পেয়ে থাকেন, যদি সেই পরম শত্রুটাই এসে কোন ছলে ভয়ে ভয়ে ফাঁস করে দিয়ে গিয়ে থাকে, শঙ্করী যে আজ এই সন্ধ্যায় ডুবে মরবার সংকল্প নিয়ে ঘাটে এসেছিল, একথা জানতে পারলেন কি করে তিনি?

মাত্র আজই তো দণ্ডকয়েক আগে সংকল্পটা স্থির করেছে শঙ্করী, অনেক ভেবে, অনেক নিঃশ্বাস ফেলে, অনেক চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে। বিয়ে-বাড়ি, শাশুড়ী-দিদিশাশুড়ীর দল বাড়তি কাজে ব্যস্ত, কে কোথায় কি করছে না করছে কেউ লক্ষ্য করবে না, আজই ঠিক উপযুক্ত সময়। তা ছাড়া আসছে কাল বাড়িতে যজ্ঞি, আত্মকুটুম্বর ভিড় লাগবে বাড়িতে। কে জানে কোন ছুতোয় কে শঙ্করীর রীতিনীতির ব্যাখ্যানা করবে, চালচলনের নিন্দে করবে, টি টি পড়ে যাবে বাড়িতে।

না না, মরতেই যদি হয়, আজকেই হচ্ছে তার শ্রেষ্ঠ সময়। এইসব সাত-সতেরো ভাবনার বোঝা মাথায় করে ঘাটে এসেছিল শঙ্করী, জীবনের সমস্ত বোঝা নামিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু—আবার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল শঙ্করীর, কিন্তু বিধাতা নিষেধ করলেন।

মরণের দরজা থেকে জীবনের রাজ্যে ফিরিয়ে আনলেন শঙ্করীকে।

তবে আর দ্বিধা কেন ?

শঙ্করী বিধবা হলেও ওর আনা জল নিরামিষ ঘরে চলে না। ও 'অনাচারে', ওর অদীক্ষিত' শরীর। জলের কলসীটাকে তাই মাঝের দালানে এনে বসায় শঙ্করী, ছেলে-পুলেদের খাওয়ার দরকারে লাগবে।

কলসী নামানোর শব্দে কোথা থেকে যেন এসে হাজির হল সত্যবতী। এসেই এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "সব্বনাশ করেছ 'কাটোয়ার বৌ', তোমার নামে ঢি-ঢি-কার পড়ে গেছে।" বাড়িতে অনেক বৌ, কাজেই আশপাশের বৌদের তাদের বাপের বাড়ির দেশের নাম ধরে 'অমুক বৌ, 'তমুক বৌ' বলতে হয়। তা ছাড়া শঙ্করী নবাগতা, ওর আর পর্যায়ক্রমে মেজসেজ দিয়ে নামকরণ হয় নি।

বুকটা ধড়াস করে উঠল শঙ্করীর।

কিসের সব্বনাশ।

তবে কি সব ধরা পড়ে গেছে ?

ঘরের কোণে রাখা মাটির প্রদীপের আলোয় মুখের রং গড়ন দেখা গেল না, শুধু গলার স্বরটা শোনা গেল কাঁপা কাঁপা ঝাপসা ঝাপসা।

"কিসের সব্বনাশ রাঙা ঠাকুরঝি ?"

"আজ না তোমার লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেবার 'পালা' ছিল ?" সত্যর কণ্ঠস্বরে বিস্ময় আর সহানুভূতি।

লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দেখানোর পালা।

ওঃ। শুধু এই।

বুকের পাথরটা নেমে গেল শঙ্করীর, হালকা হল বুক। হোক এটা ভয়ানক মারাত্মক একটা অপরাধ, আব তার জন্যে যত কঠিন শাস্তিই হোক, মাথা পেতে নেবে শঙ্করী।

অবশ্য এই দরদের ধিক্কারে চোখে জল এসে গিয়েছিল তার।

সত্য গলাটা আরও একটু খাটো করে বলে, "আর তাও বলি কাটোয়ার বৌ, এই ভর সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘাটে থাকার তোমার দরকারটাই বা কি ছিল ? সাপখোপ আছে, আনাচে আনাচে কুলোক আছে—"

শঙ্করী সাহসে বুক বেঁধে বলে, "দিদিমা খুব রাগ করছিলেন বুঝি ?"

"রাগ ? রাগ হলে তো কিছুই না। হচ্ছিল গিয়ে তোমার ব্যাখ্যানা !" সত্যবতী হাতমুখ নেড়ে বলে, "আর সত্যিও বলি কাটোয়ার বৌ, তোমারই বা এত বুকের পাটা কেন ? ভর-সন্ধ্যেবেলা একা ঘাটে গিয়ে যুগযুগান্তর কাটিয়ে আসা কেন ? আবার আজই সন্ধ্যে দেখানোর পালা। ঠাক্‌মারা তো তোমায় পাঁশ পেড়ে কাটতে চাইছিল।"

"ভাই কাটো না ভাই তোমরা আমায়—" শঙ্করী ব্যগ্র কণ্ঠে বলে, "তা হলে তোমরাও

বাঁচো, আমারও মনস্কামনা সিদ্ধি হয়।"

সত্য ভ্রূভঙ্গী করে গালে হাত দিয়ে বলে, "ওমা! তোমার আবার কিসের মনস্কামনা? তুমি আবার 'বড় বৌয়ের' মতন বোল ধরছ কেন? বড় বৌও যে এক্ষুণি আমায় বলছিল, আমার একটু বিষ এনে দাও ঠাকুরঝি, খাই। তোমার দাদার হাতের নুড়ো খোলার আগেই যেন আমার মরণ হয়, সে দিশু দেখতে না হয়।"

সত্যি বলতে কি, সারদার সঙ্গে শঙ্করীর এখনও তেমন ভাব হয় নি। প্রথম তো বয়সের ব্যবধান, তা ছাড়া সারদা ছিল স্বামী-সোহাগিনী নবপুত্রবতী, আর শঙ্করী ছাই-ফেলার ভাঙা কুলো। আরও একটা কথা—দু' জনের এলাকা আলাদা। শঙ্করীকে থাকতে হয় বিধবা-মহলে, তাঁদের হাতে হাতে মুখে মুখে ফাই-ফরমাশ খাটতে, সারদা সধবা-মহলের জীব। খাওয়া শোওয়া বসা সব কিছুর মধ্যেই আকাশ মাটির পার্থক্য।

কিন্তু আপাততঃ সারদা অনেকটা নেমে পড়েছে; এখন শঙ্করীও তাকে করুণা করতে পারে। তাই করে শঙ্করী। দরদের সুরে বলে, "তা বলতে পারে বটে আবাগী।"

"বলি সে নয় বলতে পারল, তোমার কি হল? তোমার অকস্মাৎ কিসের জ্বালা উথলে উঠল?"

"আমার পোড়া কপালে তো সব্বদাই জ্বালা ঠাকুরঝি!" শঙ্করী নিঃশ্বাস ফেলে।

সত্য হাত নেড়ে বলে, "আহা, কপাল তো আর তোমার আজ পোড়ে নি গো? ঠাক্মারা তো সেই কথাই বলছিল, সোয়ামীকে তো কোন্ জন্মে ভুলে মেরে দিয়েছ, তবে আবার তোমার সদাই মন উচাটন কিসের? কিসের চিন্তা করো রাতদিন?"

"মরণের।" শঙ্করী দালানের দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে পড়ে বলে, "ও ছাড়া আমার আর চিন্তা নেই।"

"তা ভাল।" সত্য আবার দুই হাত নেড়ে কথার সমাপ্তি টেনে মল বাজিয়ে চলে যায়, "সব মেয়েমানুষের মুখে দেখি এক বা, 'মরব' 'মরছি', 'মরণ হয় তো বাঁচি!' এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ।"

শঙ্করী আর এ কথার উত্তর দেয় না, বসে বসে হাঁপাতে থাকে। আসুক ঝড়, আসুক বজ্রাঘাত, এখানে বসে বসেই মাথা পেতে নেবে সে, উঠে-গিয়ে পায়ে হেঁটে ঝড়ের মুখে পড়বার শক্তি নেই।

তা একটু বসে থাকতে থাকতেই ঝড় এল।

কিংবা শুধু ঝড় নয়, বৃষ্টি বজ্রাঘাতও তার সঙ্গী হয়েছে।

শঙ্করী ফিরেছে শুনে খোঁজ করতে এসেছেন কাশীশ্বরী আর মোক্ষদা। পিছনে দর্শকের ভূমিকা নিয়ে ভুবনেশ্বরী, রামকালীর স্ত্রী।

এগারো

অপরাধটা হচ্ছে লক্ষ্মীর ঘরে ধূপধুনো প্রদীপ না দেওয়ার, কিন্তু শাস্তির আশঙ্কায় অকস্মাৎ শরীর কণ্টকিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করীর মনের পটে যে ছবি ভেসে উঠল, সেটা লক্ষ্মীর ঘট অথবা গৃহদেবতার পটগুলির নয়, নিজের যে অপরাধের শাস্তির আশঙ্কাটা সমস্ত দেহ মন শিথিল করে দিল শঙ্করীর, সে অপরাধের সঙ্গে এ বাড়ির, এমন কি এ গ্রামেরও কোন সম্পর্ক নেই।

অপরাধের জায়গাটা হচ্ছে শঙ্করীর বাপের বাড়ির আমবাগান। সময়টা গা ঝিমঝিমে ভরদুপুর।

নতুন ফাল্গুনের থেকে থেকে ঝিরিঝিরি আর থেকে থেকে দমকা বাতাস বইছে, আর নতুন 'গুটি বাঁধা' আমগাছগুলো সে বাতাসে যেন মাতলামির খেলা জুড়েছে। কিছু কিছু গাছ কিন্তু খানিকটা পিছিয়ে আছে, তাদের এখন বোল্ ঝরে আম ধরে নি। পাতার ফাঁকে ফাঁকে মঞ্জরীর সমারোহ।

নির্জন দুপুরে সেই বাগানে শঙ্করী আর নগেন।

নগেনের হাতের মধ্যে শঙ্করীর হাত।

আলগা করে এলিয়ে পড়ে থাকা নয়, হাতখানা বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেছে নগেন, পাছে শঙ্করী পালিয়ে যায়। যতক্ষণ না নগেনের বক্তব্যটা সম্পূর্ণ শেষ হবে, ততক্ষণ শঙ্করীর ছাড়ান নেই।

অনেক দিন ধরে, অনেক ছোটখাটো কথা, অনেক ইশারা ইঙ্গিতের দূত মারফত নিজের বক্তব্য জানিয়েছে নগেন শঙ্করীকে, অনেক করুণ দৃষ্টি, অনেক চোরা হাসির সওগাতে। আজ বোধ করি একেবারে হেস্তনেস্ত করতে চায় সে।

কিন্তু নগেন কি শঙ্করীকে গায়ের জোরে এই নির্জন আমবাগানে টেনে এনেছিল? মুখে কাপড় বেঁধে, পাঁজাকোলা করে?

তা তো নয়।

সহায়সম্বলহীন ছেলেটার এত সাহস কোথা? মাসীর বাড়ির অন্ন খেয়ে খেয়ে তো মানুষ।

শঙ্করীর কাকীই নগেনের মাসী।

মা-মরা বোনপোকে কাছে এনে মানুষ করেছেন কাকী নিজের ছেলেদের সঙ্গে। যে সংসারে শঙ্করীও বেড়ে উঠেছে।

মাঝখানে শুধু একটা বিয়ের ব্যাপার।

কিন্তু সে আর ক'দিনের? অষ্টমঙ্গলাতেই তো তার সমাপ্তি।

একই বাড়িতে বাস করেছে দু' জনে। ভাই-বোনের মত [illegible], মনোভাবটা কিছুতেই কেন ভাইবোনের মত তৈরী হল না?

ছেলেবেলা থেকে শঙ্করীর নিজের পুতুলখেলা রাজকন্যা শঙ্করীর চুলের মুঠি ধরেছে, কান থেকে চুল খসতে খিঁচিয়েছে, আর নগেন কেনই বা বরাবর সেই দুঃখ-যন্ত্রণায় মেয়ের প্রলেপ লাগিয়েছে, অত্যাচারীদের প্রতি কটুক্তি করেছে।

পুকুরপাড়ে কি ঘাটে, কি ঘরে শঙ্করীর বোঝেনি কখনও। মেয়েদের জগৎটা ওর সেইখানেই সীমাবদ্ধ। নইলে আঠারো বছরের বিধবা মেয়ের পক্ষে, তায় অন্তঃপুরে, আমবাগানে এমন একটা বেটাছেলের সঙ্গে কথা কওয়া যে কতদূর গর্হিত, সে বোধ থাকা উচিত ছিল বৈকি একটা আঠারো বছরের মেয়ের।

কিন্তু সত্যিই কি এটুকু বোধও ছিল না শঙ্করীর?

চব্বিশ ঘণ্টা কাকীর দাঁতের পিষুনিতে সে বোধ জন্মায় নি? বাগানে এসেছিল কি শঙ্করী নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে?

না, অবোধ হলেও এতটা অবোধ নয় শঙ্করী। এসেছিল বুকের মধ্যে ভয়ের বাসা নিয়েই। সকালে যখন নগেন এ আবেদন জানিয়েছে, তখন থেকেই বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ছে তার। সকল কাজে ভুলচুক হয়েছে। তবু এসেছে।

তবু কি ভাগ্যিস আজ আর রান্নাঘরের ভারটা ঘাড়ে নেই। কাল শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে, বলতে গেলে জন্মের শোধই চলে যাবে, এই মমতায় গৃহকর্ত্রী শঙ্করীকে হেঁসেলের দায়িত্ব থেকে ছুটি দিয়েছেন। আর যখন শঙ্করী নিতান্ত বিনীত মূর্তিতে, নিতান্ত কাঁচুমাচু মুখে আবেদন জানিয়েছে, 'বকুলফুলে'র বাড়ি একবার যাব কাকীমা?' তখনও 'না' করতে পারেন নি তিনি।

বাগানে এসেই প্রথম এই ছলনায় খবর শুনে হেসে উঠেছিল নগেন। বলেছিল, "তা গুরুজনের সঙ্গে মিছে কথা কয়েছিস ভেবে অত মনমরা হচ্ছিস কেন? ধরে নে না আমিও তোর আর একটা 'বকুল ফুল'?"

কিন্তু এখন আর নগেনের মুখে হাসি নেই, এখন নগেনের অন্ত ভাব। এখন কেমন রুক্ষ হিংস্র উদ্ভ্রান্ত গড়ন। এখন বজ্রমুষ্টিতে শঙ্করীর হাত ধরে, টেনে নিয়ে যেতে চায় ভিন্ন আর এক জগতে।

"পালিয়ে গিয়ে অনেক অনেক দূরের আর এক গাঁয়ে চলে যাই না? সেখানে কে চিনবে আমাদের? বলব আমরা স্বামী-স্ত্রী, আগুন লেগে ঘরবাড়ি ক্ষেত খামার সব পুড়ে গেছে, তাই মনের আক্ষেপে দেশ-ভুঁই ছেড়ে চলে এসেছি।"

"অমন পাপকথা বলতে যে জিভ খসে যাবে নগেনদাদা! মরলেও ঠাঁই হবে না আমাদের।" উচ্চারণ করে শঙ্করী, কিন্তু সে উচ্চারণে কোথাও কোন জোর প্রকাশ পায় না। পাপের আশঙ্কার আগে থেকেই কি জিভ শিথিল হয়ে এল শঙ্করীর?

"পাপ কিসের? তোর 'ওই বর' কী তোর কি সে? স্বামীর ঘর করেছিল তুই? জন্ম-জন্মান্তর থেকে তুই আর আমি পতি-পত্নী, বুঝলি? তাই ওই একটা উটকো স্বামী সইল

মা তোর। নইলে এত দিন তুই কোথায় থাকতিস, আর আমি কোথায় থাকতাম? তুই মন ঠিক কর শঙ্করী, দোহাই তোর।"

"এ কথা কানে শুনলেও যে অনন্ত নরক নগেনদাদা!"

"তাই যদি হয়", নগেন উগ্রমূর্তিতে বলে ওঠে, "নরকেই যদি যেতে হয়, তোকে তো একলা যেতে হবে না! আমাকেও যেতে হবে। তোর জন্যে সে ক্লেশও মেনে নিচ্ছি আমি। পৃথিবীর আর সব্বাই যাক না স্বর্গে, তুই আর আমি নয় নরকেই থাকব। এ জন্মটা তো-তবু ভাল যাবে?"

"এইটাই কি একটা নেয্য কথা হল? না নগেনদাদা, তোমার পায়ে ধরি আমায় ছেড়ে দাও, কেউ যদি এ অবস্থায় দেখে ফেলে, তা হলে আর আমার ঘরে ঠাঁই হবে না।"

"ভালই তো—" নগেন হাতটা ছেড়ে দেওয়ার পরিবর্তে আরও জোরে চেপে ধরেছিল, বুঝি বা একটু কাছেও টেনেছিল, বলেছিল, "ঘর থেকে দূর করে দিলে আমাদের সুরাহাই হবে। কলঙ্ক ছড়ালে শ্বশুরবাড়ি থেকেও নেবে না তোকে, তখন দুজনে চলে যাওয়া সোজা হবে। শাপে বর হবে আমাদের।"

"না না নগেনদাদা, হাত ছাড়। তোমার মনে এত 'কু' জানলে, কক্‌খনো এখানে আসতাম না আমি। তুমি বললে একটা কথা আছে—"

নগেন কখনো যা না করেছে তাই করল। অগ্নিমূর্তি হয়ে খিঁচিয়ে উঠল, "ন্যাকামি করিস নে। জানলে আসতাম না! তোর সঙ্গে আমার কী ভাগবত কথা থাকবে শুনি? আমি বলছি তুই আমার সঙ্গে পালিয়ে চল।"

সজ্ঞানে নয়, অসতর্কে মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল, "কোথায়?"

নগেন মহোৎসাহে বলে ওঠে, "যেখানে হোক। অনে—ক দূরের কোন গাঁয়ে। সেখানে শুধু তুই আর আমি, সুখে সংসার করব। ছোট্ট একখানা মাটির কুঁড়ে, একটু শাকপাতার বাগান, একটা একছিটে পুকুর, এর বেশী আর কি চাই আমাদের বল? তা সেটুকুর সংস্থান করতে পারব। পেটে তো একটু বিদ্যে করেছি, কিছু না পারি একখানা পাঠশালা খুলব। কারুর কোন ক্ষেতি নেই তাতে শঙ্করী!"

বুকের মধ্যেকার সেই ঢেঁকির পাড় পড়াটা বন্ধ হয়ে, কী এক কাঁপা-কাঁপা সুখে মনটা কি দুলে উঠল না শঙ্করীর? চোখ দুটো কি জলে ভরে এল না? নতুন ফাগুনের সেই থেকে-থেকে ঝিরিঝিরি, থেকে-থেকে দমকা বাতাসে শরীরটা কেমন অবশ অবশ হয়ে আসে নি কি? মনে কি হয় নি, সত্যিই তো—তাতে কার কি ক্ষতি? শ্বশুরবাড়ি সে চোখে দেখে নি, একদিনও ঘর করে নি। চেনে না তাদের, জানে না শঙ্করীকে না পেলে কার কি সুখদুঃখ, কার কি লাভ-লোকসান! কাকারা যদি খবর দেয়, শঙ্করী বলে যে একটা মেয়ে ছিল তাদের ঘরে—যে নাকি কবরেজ-বাড়ির ভাগ্নে বৌ ছিল—হঠাৎ ওলাউঠো হয়ে মরে গেছে সে, কত কাঁদবে কবরেজ-বাড়ির লোকেরা?

আর কাকা খুড়ী ?

মরে গেছে বলে ঘুঁটিয়ে দিলে সমাজের কাছে পার পাবে না ?

না, বেশীক্ষণ এ চিন্তা মনে স্থান পায় নি। বাতাসটা হঠাৎ বন্ধ হয়ে ভয়ানক যেন গুমোট হয়ে উঠল, চেতনা ফিরে পেল শঙ্করী। বলে উঠল, "হিঁদুর ঘরের বিধবাকে বেরিয়ে যাবার কুমন্তরণা দিতে লজ্জা করে না তোমার ? তুমি না আমার ভাইয়ের মতন ?"

"না, ককখনো না।" গর্জে ওঠে নগেন, "ককখনো ভাইয়ের মতন নয়। সে কথা তুইও ভাল জানিস, আমিও ভাল জানি। চিরকাল মনে মনে আমি তোকে পরিবারের মতন দেখে এসেছি। জেনেশুনে কেন মিছে থাকচাতুরি করছিস ? কথা দে, দুপুর রাতে তুই খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে এসে এখেনে দাঁড়াবি, আমি আগে থেকে দাঁড়িয়ে থাকব। তারপর জোর পায়ে হেঁটে গাঁ থেকে একবার বেরোতে পারলে কে ধরে ? খুঁজতে তো আর পারবে না মাসী-মেসো ? কিল খেয়ে কিল চুরি করে বসে থাকতে হবে।"

"ও নগেনদাদা, আমার বুকের ভেতরটা কেমন করছে, ছেড়ে দাও আমায়। আমি পারব না।"

"পারতেই হবে তোকে।" নগেন ব্যাকুল স্বরে বলে, "যতক্ষণ না তুই মত দিবি ছাড়ব না হাত। দেখুক পাঁচজনে, সেই আমি চাই।"

"নগেনদাদা, আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।" আলগা আলগা দুর্বলস্বরে বলে শঙ্করী, "বলব বাগানে একলা পেয়ে তুমি আমাকে—"

নগেন বেপরোয়া, বলে, "চেঁচা ! জড়ো কর লোক।"

"নগেনদাদা গো, আমাকে বরং মেরে ফেল।"

"আমি আর কি মারবো তোকে ? মেরেই তো ফেলেছে সবাই মিলে। বাপের বাড়িতেই লাথি-ঝাঁটা না খেয়ে একমুঠো ভাত জুটছিল না, মরার ওপর খাঁড়ার ঘা, এর পর আবার শ্বশুরবাড়ি ! সারা জন্মটা শুধু লাথি-ঝাঁটা সার। আমিই বরং তোকে বাঁচাতে চাই। আদর করে যত্ন করে মাথার মণি করে রাখতে চাই।"

"আমি চাই না তোমার আদর-যত্ন !" এবার একটু দৃঢ় শোনাল শঙ্করীর কণ্ঠস্বর, "লাথি-ঝাঁটাই আমার ভাল।"

"বটে ! লাথি-ঝাঁটাই তোর ভাল ?" নগেন সহসা মারমুখী হয়ে একটা ভয়ঙ্কর কাজ করে বসল।

আদর করে প্রেমালিঙ্গন নয়, মারমুখী হয়ে সহসা শঙ্করীকে সাপটে জড়িয়ে ধরল নগেন, ধরে বলে উঠল, "বেশ, সেটাই যাতে আরও ভাল করে খাস তার ব্যবস্থা করছি। এই দিচ্ছি দেগে, তারপর তোর শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গিয়ে রটাব, ও আমার সঙ্গে মন্দ—"

কি ভাবে যে নগেনের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিল শঙ্করী, কি ভাবে যে একেবারে ঘাটে ডুব দিয়ে বাড়ি গিয়ে বলেছিল, বকুলফুলের বাড়ি যাওয়া হল না, রাস্তায়

যেতে একখানা ছুতোহাঁড়ি পায়ে ঠেকে গেল বলে একেবারে নেয়ে বাড়ি ফিরতে হল, আর কি করে যে 'অসময়ে নেয়ে মাথাটা ভার হয়েছে' বলে দিনের বাকী সময়টা শুয়ে কাটাল, সে সব আর ভাল করে মনে পড়ে না শঙ্করীর।

শুধু মনে আছে তার প্রবল কান্নার ব্যাপার দেখে কাকা সুদ্ধ মমতা-মমতা গলায় সান্ত্বনা দিয়েছিল, "কেন অত কাঁদছিস মা, মেয়েমানুষকে তো শ্বশুরঘর করতেই হয়। সেই হচ্ছে চিরকালের জায়গা। তা ছাড়া কবরেজমশাই অতি সজ্জন বেক্তি, সংসারে খাওয়া-পরায় কোন দুঃখু নেই, ভাল থাকবি, সুখে থাকবি।"

তবু আরও আকুল হয়ে কেঁদেছিল শঙ্করী। অগত্যা খুড়ীকে পর্যন্ত বলতে হয়েছিল, "আবার আসবি, পালে পার্বণে আসবি, আমরা কি তোকে পর করে দিচ্ছি?"

বছর ঘুরে গেল, খুড়ীর প্রতিশ্রুতি খুড়ী রাখে নি। নিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, এক বার উদ্দিশ পর্যন্ত করে নি। সে গাঁয়ের এক কানাকড়া খবরও আর সেই অবধি পায় নি শঙ্করী। শুধু অবিরত কাঁটা হয়ে থেকেছে, ওই বুঝি কে বলে, 'নগেন বলে একটা ছেলে এসে গ্রামে কি রটিয়ে বেড়াচ্ছে শঙ্করীর নামে।'

ঘাটে পথে বেরিয়ে গাছের পাতা নড়ার শব্দে শিউরে ওঠে শঙ্করী, বাঁশের সরসরানি শুনলে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে।

কিন্তু?

সে ভয় কি শুধুই ভয়? নিছক ভয়?

তার সঙ্গে ভয়ানক একটা আশাও কি জড়ানো নেই?

সর্বদা কি মনে হয় না, হঠাৎ কোন একটা বাঁশবাগানের ধারে কি পুকুরঘাটের কাছে সেই সর্বনেশে লোকটাকে দেখতে পায় তো, আর বাড়ি ফেরে না।···

কাল শুনেছে, বিয়ে উপলক্ষে কাকার বাড়ি থেকে নাকি 'নেমন্তন্নি' আসবে। কাল থেকে তাই মরে আছে শঙ্করী।

কি জানি কি বলবে খুড়ো কি খুড়তুতো ভাইরা এসে!

নগেন কি সব বলে বেড়িয়েছে?

নগেন কি ওখানে আছে এখনও?

নগেন কি বেঁচে আছে?

হয়তো টের পেয়ে সবাই মেরে ফেলেছে।

সেদিন কেন আমবাগানে গিয়েছিল শঙ্করী? আর যে লোকটা তাকে মন্দ পথে টানবার চেষ্টা করছিল, কেন আজও শঙ্করীর মনকে লক্ষ দড়িদড়া দিয়ে টানছে সে?

মরতে গিয়েও কেন মরতে পারে না শঙ্করী?

পৃথিবীতে শঙ্করী বলে একটা মেয়েমানুষ যদি না থাকে কি এসে যাবে পৃথিবীর? কলঙ্কিত

মন নিয়ে ঠাকুরঘরের কাজ করছে সে, তুলসীতলায় প্রদীপ দিচ্ছে, এ মহাপাপের ফল—
চিন্তায় বাধা পড়ল।

কাশীশ্বরী এসে দাঁড়িয়েছেন, তীব্র কণ্ঠে ডাকছেন, "নাতবৌ।"

বারো

ভয় ভয়।

সত্যর মনের কাছে এত বড ভয়ের পরিচয় বোধকরি এই প্রথম।

'কাটোয়ার বৌয়ে'র খুব যে একটা খোয়ার হবে এটা আশঙ্কা করছিল সত্য, কিন্তু এ কী। তিরস্কারের এ কোন্ ভাষা? জীবনে অনেক কথা শুনেছে সত্য, অনেক কথা শিখেছে, কিন্তু এসব শব্দ তো কখনো শোনে নি।

'অসতী' মানে কি? 'উপপতি' কাকে বলে? 'কুল খাওয়া' বললতেই বা কি বোঝায়?

যে কুলের আচার তৈরি হয়, আর তেলে-নুনে জরিয়ে অপূর্ব আস্বাদন পাওয়া যায়, এটা যে ঠিক সে জাতীয় নয়, এইটুকুই শুধু বুঝতে পারে সত্য। কিন্তু তারপরই কেমন দিশেহারা হয়ে যায়। দূর থেকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে শঙ্করী আর কাশীশ্বরীর দলের দিকে।

না, আর কেউ কিছু বলছে না, সবাই নিথর, এমন কি মোক্ষদা পর্যন্ত কেমন যেন স্তব্ধ, একা কাশীশ্বরীই পালা চালিয়ে যাচ্ছেন, চাপা তীক্ষ্ণ গলায়।

শঙ্করীকে ধরে চিবিয়ে খেলেও বুঝি রাগ মিটবে না, এমনি তাঁর মুখভঙ্গী।

মোক্ষদা এক ধরনের, কাশীশ্বরী আর এক ধরনের। মোক্ষদার 'অটুট' গতর, অসীম ক্ষমতা, অনর্গল বাকপটুত্ব। কিন্তু কাশীশ্বরী তা নয়।. কাশীশ্বরী শোকে তাপে কিছুটা অথর্ব, তাছাড়া চিরদিনই তিনি টেঁপামুখী। শুধু তেমন মোক্ষম অবস্থা পড়লেই মুখ দিয়ে কথা বেরোয় তাঁর। চাপা তীক্ষ্ণ।

কিন্তু আজকের মত এমন সব কথা কবে বেরিয়েছে কাশীশ্বরীর মুখ দিয়ে? এমন ঘৃণা-জর্জরিত মুখই বা কবে দেখা গেছে তাঁর?

কে গিয়েছিল কাটোয়ায়?

কে কি শুনে এসেছে সেখান থেকে? বারবার শঙ্করীর বাপের বাড়ির কথাই বা উঠছে কেন? তারা নাকি কেউ ভোজবাড়িতে আসবে না, সম্পর্ক রাখতে চায় না শঙ্করীর সঙ্গে। নেহাৎ নাকি তারা শঙ্করীর মা-বাপ নয়, খুড়ো-খুড়ী, তাই অমন মেয়েকে টুকরো টুকরো করে কেটে কাটোয়ার গঙ্গায় ভাসিয়ে দেয় নি।

আরও কত কথা, তার সঙ্গে কত মুখভঙ্গী।

শঙ্করীকে গলায় দড়ি দিয়ে মরবার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। দেওয়া হচ্ছে ঘাটে ডুবে মরবার নির্দেশ। পাপিষ্ঠা শঙ্করীর পাপস্পর্শেই যে কাশীশ্বরীর একমাত্তর নাতিটা বিয়ের

বছর না ঘুরতেই মরেছে সে কথাও প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে আজকের বিচারের রায়ে।

অনেক শুনতে শুনতে, শেষ পর্যন্ত এইটুকু বুঝতে পারে সত্য, নাপিত-বৌ আর রাখু কাটোয়া গিয়েছিল যজ্ঞির জন্যে নেমন্তন্ন করতে। আর শঙ্করীর খুড়ী নাপিত-বৌয়ের কাছে শঙ্করীর নামে যাচ্ছেতাই করেছে।

সেখান থেকে খুব যে একটা গর্হিত কাজ করে চলে এসেছে শঙ্করী, সে বিষয়ে আর সন্দেহমাত্র নেই। লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যা দিতে দেরি হওয়া, অথবা সাঁঝ-সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘাটে বসে থাকার চাইতে যে অনেক বেশী গর্হিত তা বুঝতে পারা যাচ্ছে।

কিন্তু শঙ্করীর অপরাধের সঙ্গে তার খুড়ীর বোনপোর যোগ কোথায়? সে কেন শঙ্করীর জন্যে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দিশ হয়ে চলে গেছে?

এইখানেই সব গোলমাল লাগছে সত্যর।

সব যেন হেঁয়ালি!

এই অন্য জগতের অর্থবহ, জীবনে না-জানা শব্দগুলো সত্যর বুকটাকে কেমন হিম হিম করে দিচ্ছে! ভয় করছে। যে অনুভূতি জীবনে জানে না সত্য, আজ সেই অনুভূতি তার সমস্ত সাহসকে যেন বোবা করে দিয়েছে।

গিন্নীরা কাউকে শাসন করছেন, অথচ সত্য তার মধ্যে ফোড়ন কাটছে না, এমন ঘটনা বোধকরি সত্যর জ্ঞানে এই প্রথম। অপরাধীর পক্ষ নেওয়াই সত্যর স্বভাব। তা সে অপরাধী যে-শ্রেণীরই হোক।

একবার বাসন-মাজুনী বাগদী-বৌ সন্ধ্যে করে ঘাটে বাসন মাজতে গিয়ে পাঁজার বাসন থেকে একটা বাটি হারিয়ে ফেলেছিল। খুব সম্ভব বাটিটা জলেই ডুবে গিয়েছিল, কিন্তু বাগদী-বৌকে 'চোর' অপবাদ দিয়ে ন ভুতো ন ভবিষ্যতি করেছিলেন শিবজায়া আর দীন-তারিণী। এবং মোক্ষদা হুকুম দিয়েছিলেন, "না যদি নিয়েছিস তো সমস্ত রাত ওই পুকুর হাতড়ে বাটি খুঁজে বার কর।"

বাগদী-বৌ যত হাউ-মাউ কাঁদে, গৃহিণীকুল ততই চেপে ধরেন তাকে। চুরির উদ্দেশ্যেই যে সে বেলা গড়িয়ে বাসন মাজতে আসে, এ মন্তব্যও করতে ছাড়েন না তাঁরা। সে যাত্রা সত্যই তো রক্ষে করেছিল বাগদী-বৌকে।

বলেছিল, "চল্ বাগদী-বৌ, আমিও খুঁজি গে তোর সঙ্গে। আমি খুব সাঁতার জানি, সাঁতরে এপার-ওপার করে বাটি হাতড়াব।"

"তুই খুঁজবি মানে?"

ধমকে উঠেছিল সবাই। এবং সকলকে চমকে দিয়ে সত্য উদাসভাবে বলেছিল, "তা খুঁজতে হবে বৈকি। তোমাদের পাপের প্রাচিত্তির আমাকেই করতে হবে, ভগবান যখন আমাকে তোমাদের ঘরের মেয়ে করে পাঠিয়েছে! বাড়িতে যাদের পাঁচ সিন্দুক বাসন, তারা যদি তুচ্ছ একটা ভাল খাবার বাটির জন্যে একটা মানুষের প্রাণবধ করতে চায়, তবে একজনকে

তো তার প্রতিকার করতে হবে।"

'থ' হয়ে গিয়েছিল সবাই, আর বোধকরি তুচ্ছ একটা বাটির জন্য নিজেদের তুচ্ছতার বহরটা সেই প্রথম নজরে পড়েছিল তাঁদের।

"তবে আর কি, পাঁচ সিন্দুক বাসন আছে তো হরির লুট দিগে যা বাসনের! অনেক পয়সা আছে তোর বাপের!" বলে কেমন যেন শিথিল ভাবে রণে ভঙ্গ দিয়েছিলেন তাঁরা।

বাগদী-বৌ গলায় কাপড় দিয়ে সত্যকে প্রণাম করেছিল সেদিন।

তা এমন অনেককেই অনেক সময় বিপদ থেকে ত্রাণ করেছে সত্য। কিন্তু আজ আর সত্যর গলা দিয়ে শব্দ বেরোচ্ছে না।

একটা অন্ধকার অরণ্যের গা ছমছমে রহস্য মূক করে দিয়েছে সত্যকে।

কখন যে তিরস্কার-পর্ব শেষ হল, কখন যে গিন্নীরা আপন আপন কর্মে প্রস্থান করলেন, কাটোয়ার বৌ তারপর গেল কোথায়, এ সবের কোন খবরই আর রাখতে পারে নি সত্য, কখন এক সময় যেন আস্তে আস্তে চলে গিয়ে সারদার ঘরের মেজেয় পরনের চাঁদের-আলো-রঙা আটহাতি শাড়ীখানির আঁচলটুকু বিছিয়ে শুয়ে পড়েছিল। যেখানে সারদাও শুয়ে আছে সেই একই পদ্ধতিতে, কোলের ছেলেটুকুকে কোলের কাছে নিয়ে।

সারদা বলেছিল, "শুলে যে সত্য ঠাকুরঝি।"

"শুলাম।" বলে উত্তর এড়িয়েছিল সত্য।

সারদা আর একবার নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, "কাটোয়ার বৌ অত গাল খাচ্ছিল কেন ঠাকুরঝি?"

সত্য বলেছিল, "জানি না।"

সত্যর পক্ষে এমন সংক্ষিপ্ত স্বল্প ভাষণ প্রায় অভূতপূর্ব, কিন্তু সারদারও না কি মনে সুখের লেশ নেই—তাই আর বেশী কথা বাড়ায় নি। একসময় ছেলের সঙ্গে ঘুমিয়েও পড়েছিল।

কিন্তু সত্যর চোখে ঘুম আসতে চায় না।

ভয়ের সেই অনুভূতিটা কিছুতেই ছাড়তে চায় না তাঁকে।

থেকে থেকে বুকটা কেমন ঠাণ্ডা আর ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অজানা ওই শব্দগুলো না হয় চুলোয় যাক, কিন্তু আর একটা নতুন ভয় যে মনের মধ্যে বাসা বাঁধল এসে।

সত্যিই যদি কাটোয়ার বৌ···

গলায় দড়ি দেওয়ার পদ্ধতিটা কি, আর তার পরিণামই বা কি, ঠিক জানে না সত্য, কিন্তু অপরটার আশঙ্কায় বারবার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল তার। যদি তাই হয়?

যদি কাল 'যজ্ঞি'র প্রয়োজনে পুকুরে জাল ফেলতে গিয়ে জেলেরা মাছের সঙ্গে আরও একটা জিনিস ছেঁকে তোলে!

ভারী রুই পড়েছে ভেবে আহ্লাদে হেঁই হেঁই করে জাল টেনে তুলে যদি দেখে মাছ নয়—

বুকের মধ্যে ঢেঁকির পাড় পড়ার মত শব্দ হতে থাকে সত্যর।

ক'জনকে পাহারা দেবে সে ?

সারদার ব্যাপারেই তো ভয়ে আর বাপের হুকুমে তটস্থ হয়ে আছে, তার ওপর আবার কাটোয়ার বৌ চাপল মনের মধ্যে। কাকে রেখে কাকে দেখবে সত্য ?

গালাগালির সময় মুখটা কি রকম দেখাচ্ছিল কাটোয়ার বৌয়ের ?

সত্য কি তাকায় নি ?

বোধহয় তাকিয়েছিল, কিন্তু দালানের এক কোণায় মিটমিট করে একটা প্রদীপ জ্বলছিল, তার থেকে দাওয়ায় আর কত আলো এসে পড়বে ?

তাও আবার চাঁদের এখন আঁধারে কাল চলছে। 'শুক্লু' চললে তবু উঠোনে বাগানে হেঁটে চলে সুখ, মনিষ্যিকে দেখাও যায়। 'আঁধারে' তো সন্ধ্যে হলেই হয়ে গেল।

মানুষের সঙ্গে কথা কওয়া ওই মুখ-চোখ না দেখেই।

না, শঙ্করীর মুখ দেখতে পায় নি সত্য।

তাই বুঝতে পারছে না, ওই অদ্ভুত অদ্ভুত শব্দগুলোর মানে শঙ্করী ধরতে পেরেছে কি না।

আচ্ছা সারদাকে একবার চুপিচুপি জিগ্যেস করবে সত্য ? যতই হোক সারদা সত্যর দুগুণ বয়সী, ছেলের মা, কতদিন আগে বিয়ে হয়েছে সারদার, হয়তো বা ওই বিদঘুটে কথা-গুলোর মানে জানা থাকলেও থাকতে পারে।

কিন্তু বার বার বলি-বলি করেও বলতে পারল না শেষ অবধি। মুখের দরজায় কে যেন তালাচাবি দিয়ে দিয়েছে।

মানে বুঝতে না পারলেও কথাগুলো যে খারাপ কথা, সেটা বুঝতে পেরেছে সত্য।

কাটোয়ার বৌয়ের সঙ্গে খুব যে একটা যোগাযোগ ছিল সত্যর, তা নয়। একে তো মাত্র বছরখানেক হল এসেছে সে, নব আগন্তুক হয়ে, তাছাড়া সে তো নিরিমিষ দিকের। একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া নেই। তবে নাকি নেহাৎ দেখা-সাক্ষাৎ সূত্রে কথাবার্তা। তাও বিশেষ মিশুকে নয় শঙ্করী। সর্বদাই যেন আনমনা, কাজেই—

সত্য আজও যখন সন্ধ্যা গড়িয়ে যাওয়ার অপরাধে চুপিচুপি অবহিত করতে এসেছিল শঙ্করীকে, তখন নেহাৎ একটা জীবের প্রতি যতটুকু মমতা থাকা উচিত তার বেশী ছিল না। কিন্তু এখন যেন মায়ায় মন ভরে যাচ্ছে সত্যর। মনে হচ্ছে কত না জানি কাঁদছে বেচারা! জগতে এমন কেউ নেই ওর যে, সে কান্নায় একটু সান্ত্বনা দেয়!

বিধবা হওয়ার কী কষ্ট!

সত্যরও তো বিয়ে হয়েছে। একটা বরের সঙ্গেই নাকি হয়েছে। সেই বরটা যদি হঠাৎ মরে যায়, সত্যও তো তাহলে বিধবা হবে ?

তা যদি হয় সত্যকেও সবাই অমনি করে খোয়ার করবে ?

কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায় ?

পিস-ঠাকুমারাও তো বিধবা।

বিধবা আরো কতজনেই, তাদের ভয়েই তো সবাই তটস্থ হয়ে থাকে।

ওদের দেখে মনে হয় ওরাই যেন পৃথিবীর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

তবে ? ওরা বড় বলে ? কিন্তু তাই কি ? এরা বড় হলে ওরকম হতে পারে ?

না, এসব ঠিক বুঝতে পারে না সত্য।

শুধু যে বয়েস দিয়েই সব বিচার হয় তা তো নয়। এই যে তার বাবাকে দেশসুদ্ধ লোকে ভয় করে, জ্যেঠামশাইকে কি কেউ তা করে ? উল্টে জ্যেঠামশাই পর্যন্ত তো বাবার ভয়ে কাঁটা। শুধু কি জ্যেঠামশাই ? সেজঠাকুদ্দা ? ন-ঠাকুদ্দা ? কে নয় ? ওঁরা তো আর মেয়েমানুষ নয় ?

বয়েসটা কিছু নয়। ছোট বড় বলেও কিছুই নয়।

তাহলে ভয়ের বাসাটা কোথায় ?

ভাবতে ভাবতে থই পায় না সত্য। তবু ভাবে। কে যে ওকে ভয়ের বাসা খোঁজার চাকরি দিয়েছে কে জানে।

অনেক রাত্রে ভুবনেশ্বরী আসে ডাকতে।

"এই সত্য, না খেয়ে ঘুমিয়েছিস যে, ওঠ্।"

সত্য পাশ ফিরে ঘুমের ভান করে, জানায় তার খিদের অভাব।

ভুবনেশ্বরী বকে ওঠে, "খিদে নেই কেন ? ওঠ বা, রাত-উপুসী থাকতে নেই। কথায় বলে রাত-উপুসে হাতী কাবু। বড় বৌমা, তুমিও ওঠো দিকিন্ বাছা! সারাদিন উপুসে আছ, আর অমন করে পড়ে থেকো না। স্বামী-পুত্তুরের অকল্যেণ হয় ওতে।'

ভুবনেশ্বরীর গলা পেয়েই ধড়মড়িয়ে উঠে বসেছিল সারদা। পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার তীব্র ইচ্ছেয় ধরাশয্যা নিয়ে পড়ে থাকলেও, খুড়শাশুড়ীকে দেখে সমীহ করবে না, এমন কথা ভাবা যায় না। তাই ধড়মড়িয়ে উঠেছিল। স্বামী-পুত্তুরের অকল্যেণ শুনে এবার মনে মনে ধড়ফড়িয়ে উঠল।

ভুবনেশ্বরী ফের বলে, 'আমি তোমার ছেলে দেখছি, যাও ওঠো। সত্যকে ডেকে নিয়ে খেতে যাও গে। তোমার শাশুড়ী হেঁসেল আগলে বসে আছে। এ-বেলায় জাল ফেলিয়ে মস্ত একটা মাছ ধরানো হয়েছিল, "এসো জন বসো জন" যদি আসে বলে। খামি খামি দাগার মাছ আর আমের বাখড়া দিয়ে এমন খাসা টক রেঁধেছে দিদি, দেখ গে যাও খেয়ে।'

ভুবনেশ্বরী অনেকগুলো কথা বলে গেলেও সত্যর কানে তার শেষ অবধি পৌঁছয় নি। 'পুকুরে জাল ফেলে বড় মাছ ধরা হয়েছে' শুনেই তাঁর মনশ্চক্ষে ভেসে উঠেছে জালবদ্ধ আর একটা জীব! যাকে টেনে তুলে ধড়াস করে পুকুর পাড়ে ফেলা হয়েছে, আর যে মুখ চন্দ্র-সূর্যিতে দেখতে পাবার কথা নয়, সেই মুখ সহস্র লোকে দেখছে।

কিন্তু সেই মুখের উপর যে চোখ দুটো বসানো আছে, সে কি আর দেখছে? জীবনে কি আর দেখবে কোন কিছু?

উঠে বসে তাড়াতাড়ি বলে, "মা, কাটোয়ার বৌ কোথায়?"

"কোথায় আবার", ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে ভুবনেশ্বরী, "কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়েছে গিয়ে। তাকে তোর দরকার কি? খেতে যাচ্ছিস খেতে যা!"

"খাব না, খিদে নেই!" বলে ফের শুয়ে পড়ে সত্য।

কিন্তু ওদিকে 'দাগা দাগা রুই মাছ আর আমের বাখড়ার টক' অস্ত্র কাজ করেছে। একে ষোলো বছর বয়সের দুরন্ত স্বাস্থ্য, তার উপর সারাদিন ছেলেটা বুকের দুধ টেনে খাচ্ছে।

সতীন কাঁটার যন্ত্রণাটাও যেন কাবু হয়ে এসেছে।

তবু! একান্ত বাসনা সত্ত্বেও বাধা আসে মনে।

সারাদিন অভুক্ত পড়ে থেকেও সেই অভুক্ত চেহারাটায় স্বামীর সঙ্গে একবার দেখা হল না, কে জানে রাতে হতে পারে কিনা! আজ তো নতুন বৌয়ের 'কাল রাত্রি,' কাজেই আজ পুরনো বৌ প্রাধান্য পেলেও পেতে পারে। দিব্যি করে মাছের ঝাল দিয়ে এক পাথর ভাত সেঁটে এসে অভিমান জানাবে কোন্ মুখে? সারদা তাই চিঁ চিঁ করে বলে, "সবে পেটের ব্যথাটা একটু নরম পড়েছে —"

"তা হোক। ও খেলেই নরমে যাবে," নরম গলায় বলে ভুবনেশ্বরী, "তুমি ডেকেডুকে নিয়ে গেলে তবে যদি সত্য দুটো খায়।"

নিজের শাশুড়ীর সঙ্গে কথা চলে না। ঘোমটা দিতে হয় একগলা। কথা যা, তা এই খুড়শাশুড়ীর সঙ্গেই। তা খুড়শাশুড়ীর কণ্ঠের নরম সুরটুকুই চোখে জল এনে দিল সারদার। অগত্যাই আর রাসুর সামনে অভুক্ত মুখ দেখাবার ইচ্ছেটাকে টেনে রেখে দেওয়া গেল না, সারদা সত্যকে নাড়া দিয়ে বলল, "চল ঠাকুরঝি, যা পারবে খেয়ে নেবে।"

সত্য উঠে বসল।

হাই তুলে বিরক্ত হয়ে উঠে বলল, "বাবাঃ দু দণ্ড যদি একটু নিরিবিলিতে পড়ে থাকার জো আছে! নাও চল।"

সারদা চলে যেতেই ভুবনেশ্বরী একটা অসমসাহসিক কাজ করে বসল।

ঘুমন্ত ছেলেটাকে কাঁথা মুড়ে কোলে চেপে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চুপি চুপি রাখুর মাকে গিয়ে বলল, "রাখুর মা, বড় ছেলেকে এক বার ডেকে দে তো। বলবি জরুরী দরকার।'

বড় ছেলে অর্থে রাসু।

রাখুর মা এদিক ওদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, "দেখে এলাম চণ্ডীমণ্ডপে শুয়েছে।"

"তা হোক, তুই আমার নাম করে ডেকে নিয়ে আয়।"

ঘরের দরজায় কাছাকাছি গিয়েই মায়ের ডাকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল সত্যবতীকে, আর সারদার বুকটা কী এক আশায় আশঙ্কায় চমকে উঠেই শীতকালের পানাপুকুরের জলের মত ঠাণ্ডা নিথর হয়ে গেল।

অভ্যস্ত উচ্চারণে মেয়ের নাম ধরে ডাক দেন নি ভুবনেশ্বরী, ব্যস্ত অথচ চাপা গলায় বলে উঠেছে "এই, তুই ইদিকে আয়।"

'তুই' অর্থেই সত্য।

আর বিশেষ করে সত্যকেই হঠাৎ চাপা গলায় ডাক দিয়ে সরিয়ে নেবার অর্থ কি? অর্থ আছে, এ রকম ডাকের একটাই অর্থ হয়। আর সে অর্থ সত্যর কাছে ধরা না পড়লেও সারদার কাছে যেন ধরা পড়েছে। তাই না বুকটা হঠাৎ এমন নিথর হয়ে গেল। তাই না আশায় আশঙ্কায় চমকে উঠল সে বুক।

সারদা জানে, সারদার মনে আছে।

ছেলেবেলায় সারদা যখন নিঃশঙ্কচিত্তে তার সদ্য-বিবাহিতা কাকীমার কাছে শোবার বায়না নিয়ে তোড়জোড় করত, তখন ঠিক এমনি চাপা গলায় তার মাও ডাক দিতেন, "ইদিকে আয় বলছি।" তবু বায়না করত সারদা। এখন মনে পড়লে কী হাসিই পায়।

সত্যবতী থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, "বড়বৌ কি একলা শোবে না কি? তোমাদের আক্কেলটা তো ভাল।"

ভুবনেশ্বরী হাসি চেপে ভৎসনার স্বরে বলেন, "থাম, তোকে আর সকলের আক্কেল খুঁড়ে খুঁড়ে বেড়াতে হবে না। একলা কেন, অত বড় বেটা ঘরে রয়েছে বড় বৌমার, সে কি কম নাকি?"

"জানি না বাবা, তোমাদের একো সময় একো মতি। ওইটুকুনখানি কচি ছেলে, যার গলা টিপলে দুধ বেরোয়, সে আগলাবে মাকে।"

"তুই আসবি?"

"যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। তর সয় না একটু, সবাই যেন ঘোড়ায় জিন্ দিয়ে আছে। নাও চল। একটা মনোকষ্টওলা মানুষ এই আঁধার পুরীতে একলা পড়ে থাকবে, এই যখন তোমাদের বিচার তো তাই হোক। কোন্ মুখেই যে তোমরা ধম্মকথা কও, তাও জানি নে বাবা।"

আট হাত শাড়ীখানার হাত তিনেক অংশ মাত্র কাজে লাগিয়ে, আর বাকী হাত পাঁচেক বিঁড়ে পাকিয়ে কুক্ষিগত করে নিয়ে মায়ের পিছু পিছু চলল সত্যবতী অনিচ্ছামন্থর গতিতে। সত্যিই তার আজ সারদার কাছে শুতে ইচ্ছে ছিল। প্রধানতঃ সারদার প্রতি সহানুভূতি, দ্বিতীয়তঃ মনে আশা করছিল, যদি শুয়ে শুয়ে গল্প করতে করতে 'ভয়ঙ্কর' শব্দগুলোর অর্থ উদ্ধার করে নিতে পারে।

শব্দগুলো যে ভাল নয়, বড়দের কাছে প্রশ্ন করলে যে সত্যি উত্তর পাওয়া যাবে না, ঠেলামারা একটা ভুলভাল উত্তরের সঙ্গে হয়তো বা খানিকটা ধমকই জুটবে—এ বিষয়ে যেন নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে সত্যবতী।

অথচ ভয়ঙ্কর অদম্য একটা কৌতূহল ভিতর থেকে চাড়া দিচ্ছে। শব্দগুলোর অর্থ সংগ্রহ করতে পারলেই যেন অনেক রহস্যের ঘরের চাবি খোলা যায়। অন্ততঃ শঙ্করী কেন চব্বিশ ঘণ্টা 'মরব মরব' করে, আর বাড়ির সকলে কেন তার প্রতি এককড়া সদ্ব্যবহার করে না, এটুকু যেন ওর থেকেই ধরা যাবে।

কিন্তু সকল গুড়ে বালি দিল মা।

তা নতুন কিছুও নয় অবিশ্যি। জন্মাবধি তো এই দেখে আসছে সত্যবতী, বড়দের কাজই হচ্ছে ছোটদের সকল ইচ্ছের গুড়ে বালি দেওয়া।

দীনতারিণীর ঘরে বাড়ির সব কটা 'সোমত্ত' মেয়ের শোবার ব্যবস্থা। ঘরটা প্রকাণ্ড বড় বলেও বটে, তা ছাড়া বড় বড় মেয়েরা এখান ওখান ছড়িয়ে থাকে এটা বিধি নয়। এই 'বয়স্থা' মেয়েদের মধ্যে ন' বছরের সত্যবতীই সবচেয়ে বড়, আর তার বিয়েও হয়ে গেছে, তাই সে হচ্ছে দলনেত্রী। পুণ্যি রাজু নেডী টেঁপি পুঁটি রাখালী, সকলেই তাকে ওপর-ওয়ালার সম্মানটা দেয়।

আজ ওরা সত্যর জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সত্য এসে দেখল ঘুমন্ত পুরী। যে যেমন ইচ্ছে হাত পা ছড়িয়ে শুয়েছে, জায়গা বিশেষ নেই, ওর মধ্যেই ওদের হাত-পা ঠেলে ঠুলে জায়গা করে নিতে হবে।

সত্য বিরক্ত ভাবে আর একবার বলে উঠল, "একদিন অন্তত্তর শুলে যে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত মা মঙ্গলচণ্ডীই জানে। · নে সর দিকি, এই পুঁটি, ঠ্যাংটা একটু গুটো।"

বলা বাহুল্য পুঁটির সুপ্তির গভীরতায় এ স্বর পৌঁছল না, অগত্যাই সত্যবতী বাক্যবলের সাহায্য ছেড়ে বাহুবলের শরণ নিল। পুঁটির পা আর রাখালীর হাত সরিয়ে নিজের মতন একটু জায়গা করে শুয়ে পড়ল বিছানায়। দীনতারিণী এখনো আসেন নি, তাঁর শুতে আসতে দেরি হয়। বিধবাদের দিকের রাতের জলপান চালভাজা তিলের নাড়ুকে বুড়ো দাঁতে জব্দ করতে সময় লাগে।

ঠাকুমার বিছানাটা ঠিক আছে কি না একবার দেখে নিল সত্যবতী। আছে বটে একফালি ঠাঁই। অবিশ্যি বিছানা আর কি, ঘরজোড়া একখানা শতরঞ্চের উপর বড় বড় মোটামোটা খানকয়েক কাঁথা পাতা, আর তারই মাথার দিকে দেয়াল-জোড়া টানা লম্বা মাথার বালিশ।

এক সঙ্গে যাতে সারি সারি অনেকগুলো মাথা ধরানো যায় তার জন্যেই এই অভিনব মাথার বালিশের আয়োজন। এক একটা বালিশ বোধ হয় লম্বায় চার হাত, আর ওজনে

আধ মন, যারা শোয় তারা নিজেরা তাকে এক ইঞ্চিও নড়াতে পারে না। নিজের বালিশকে নিজের ঘাড়ের তলায় ইচ্ছেমত ভঙ্গীতে রাখতে পারার সুখ ওরা জানে না।

বালিশগুলো যে শুধু মাপেই বড় বলে ভারী তাও তো নয়, তুলোগুলোও যে পুরনো। জিনিস যত সস্তাই হোক, আর যত বেশীই প্রাচুর্য থাক্—অপচয় করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না। তাই কর্তাদের বড় বড় তাকিয়াগুলো ছিঁড়ে গেলে যখন তাঁদের জন্যে নতুন 'খেরো' দিয়ে নতুন তুলোর তাকিয়া বানানো হয়, তখন পুরনো তুলো আর ছেঁড়া খেরোগুলো কাজে লাগানো হয় বাড়ির নাবালকদের জন্যে।

সব বাড়িতেই একই ব্যবস্থা। ছেলেপুলে কাচ্চা-বাচ্চা ছাড়া সংসারের যত ওঁচা মালের গতি হবে কাদের উপর দিয়ে? তবু তো কবরেজ বাড়ির অবস্থা উত্তম। বাৎসরিক বৃত্তি দিয়ে সাঁজো-ধোবা ঠিক করা আছে, নিয়মিত সব ফর্সা করে দিয়ে যায় সে। মানে আর কি, কেচে শুকিয়ে পাট করে দিয়ে যায় কি আর? 'কাচা'র পুকুরে কেচে ভিজে কাপড়-চোপড়ের 'ভাঁই' খিড়কির পুকুরের পৈঠেয় নামিয়ে রেখে যায়। তারপর তো আছেন মোক্ষদা। ভাল পুকুরের জল দিয়ে শুদ্ধ করে সেই ভিজের বস্তা রোদে মেলে দেওয়ার দায়িত্ব তাঁর। তারপর আছে বৌ-ঝিরা। শিবজায়ার ছেলের বৌরা, কুঞ্জর বৌ, ভুবনেশ্বরী, পরবর্তী ডিউটি এসে পড়ে এদের ওপর।

নিত্যি বিছানা কাঁথার ওয়াড় খোলা আর ওয়াড় পরানো কম ঝামেলার ব্যাপার নয়, কিন্তু রামকালীর যে ধোবার উপর এবং সংসার-পরিচালিকাদের' উপর কড়া হুকুম-দেওয়া আছে, অন্তত মাসে দু ক্ষেপ্ সব সাফ করতে।

আজই বোধ হয় সব সন্তকাচা। কলার 'বাসনা'র ক্ষার আর সাজিমাটির গন্ধ ছাড়ছে। সত্যবতী নাকে কাপড় দিয়ে শুয়েছে, এই গন্ধটা তার ভারী বিশ্রী লাগে। ও শুয়ে শুয়ে ভাবে এই বিচ্ছিরি গন্ধটা বাদ দিয়ে কাপড় কাচা যায় না? ওটা ভাবতে ভাবতে আরও অন্য ভাবনায় চলে গেল সত্যবতী।...

বড়বৌ তো একা শুলো, মাঝরাতে উঠে যদি জলে ডুবতে যায়? বৌটা তো যাবেই, বাবাকে কি জবাব দেবে সত্য? তারপর গিয়ে রাত পোহালেই বাড়ি কুটুমে ছেয়ে যাবে, তার মাঝখানে সেই বড় বৌয়ের ডুবে মরার ঝ্যালা! আচ্ছা বিপদ হল বটে!

নাঃ, নিশ্চিন্দি থাকা চলে না, বেশী রাতে বাড়ি নিঃসাড় নিশ্চুপ হয়ে গেলে উঠে গিয়ে দেখে আসতে হবে বড় বৌকে। সব চেয়ে ভাল হয় ওর ঘরটায় বাইরে থেকে শেকল তুলে দিলে, নইলে কবার- আর দেখতে যাওয়া যাবে? কোন ফাঁকে যদি উঠে গিয়ে সর্বনাশ ঘটিয়ে বসে থাকে বড় বৌ!

দরজার মাথায় শেকল, সত্যবতীর হাত পৌঁছয় না, কিসের ওপর উঠে শেকলে হাত পাওয়া যায় তাই ভাবতে থাকে সে।

টিপ্ টিপ্ করা বুকটা নিয়ে সারদা ঘরে ঢোকে। সারদার আহারকালীন অবকাশে ছেলে কেঁদে ভুবনেশ্বরীকে জ্বালাতন করেছিল কি না জিজ্ঞেস করতেও পারে না। ভুবনেশ্বরীই নিজে থেকে বলে, "নিঃসাড়ে গিয়ে শুয়ে পড় তো বড় বৌমা, ছেলে সবে ঘুমিয়েছে, জেগে না যায়। শেওরে কাজললতা দিয়ে শুইয়ে রেখে এসেছি।"

রাসুকে ডাকিয়ে এনে ঘরে পুরে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি ছিল না ভুবনেশ্বরীর। কি জানি যদি অন্ধকারে ঠাহর করতে না পেরে 'কে কে' করে চেঁচিয়ে ওঠে সারদা।

এদিকে আবার রাসুকেও বলতে পারে না যে "ঘরের পিদিম নিভিও না", কারণ ছেলেকে শোবার ঘরে পুরে দিয়ে আর তার সঙ্গে কথা কইতে মায়েরই লজ্জা লাগে। এ তো ভাসুরপো! আর সারদাকেই বা স্পষ্টাস্পষ্টি বলা যায় কি করে, "ওগো তোমার জন্যে ঘরের মধ্যে মাণিক আনিয়ে রেখেছি।" বলা যায় না বলেই কচিছেলের ছুতো।

তা ছাড়া আর একটু কারণও কি ছিল না? একটু কৌতুকের সাধ? হলেও শাশুড়ী সম্পর্ক, তবু তো মেয়েমানুষ। আর বাঘা রামকালীব ঘরণী হলেও ভুবনেশ্বরী যেন এখনও ভিতরে ভিতরে কোথায় একটু কাঁচা একটু সবুজ রয়ে গেছে।

'মাণিকে'র উপমাটা ভুবনেশ্বরীরই মনে এসেছে। নিত্যকার মানুষটাই যে আজ সারদার কাছে পরম মূল্যবান হয়ে উঠেছে, একথা বোঝবার ক্ষমতা ভুবনেশ্বরীর আছে। দেখা যাক বড বৌমা কতটুকু করায়ত্ত রাখতে পারে স্বামীকে। অবিশ্যি ভরসা কিছু নেই, বেটাছেলের মন, নতুন বৌ ডাগবটি হয়ে উঠতে উঠতে সারদাও কোন্ না তত্তদিনে তিন ছেলের মা হয়ে বসবে। তখন কি আব রা[illegible] নতুন ফুলের মধু ফেলে—

ভাবতে গিয়ে চমকে গেল ভুবনেশ্বরী। মনে মনে নাক কান মললো। রাসু না তার পুত্রস্থানীয়। তার সম্পর্কে এসব কথা কি বলে ভাবছে সে? সম্পর্কেব মান-মর্যাদা আর থাকছে কি করে তা হলে?

ওদের সম্পর্কে সব ভাবনা জোর করে মুছে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল ভুবনেশ্বরী। এবার তাদের দলের খাবার পালা। তবে আজ আর খাবার পরে ঘুম নয়, রাত জেগে কালকের যজ্জিব কুটনো বাটনা করতে হবে। বড লোকের বাড়ির বৌ বলে তো আর আয়েস করবার হুকুম নেই! বৌ হচ্ছে বৌ। বরং রাখুর মা দু দণ্ড পা ছড়িয়ে বসলে, কি কাজে গাফিলি করলে কেউ কিছু বলবে না, কিন্তু বৌদের সে রকম আচরণ অমার্জনীয়।

তা খাটুনিতেও দুঃখু ছিল না, যদি শুধু নিজেরা জা-ননদের দল থাকতে পায় সে দলে। হাতের সঙ্গে গল্পগাছাও চলে তা হলে। কিন্তু তা তো হবার জো নেই, একজন গিন্নী পাহারাদার থাকেনই। বৌরা 'ঘর ভাঙানি' মন্ত্রণা করছে কিনা সেটা তো দেখতে হবে তাঁদের?

ওই গুরু কর্তব্যের দায়ে বেচারা শিবজায়াকে যে মরতে মরতে রাত জেগে ছেলে-বৌয়ের ঘরের পিছনের ঘুলঘুলির নিচে কান পেতে বসে থাকতে হয়।

সারদার ঘরে অবশ্য ঘুলঘুলি নেই। ভাল জানলা আছে। বাড়ির মধ্যে সব সেরা ঘরটাই সারদার। বর্ধমান থেকে মিস্ত্রী আনিয়ে রামকালী যখন অনেক খরচা করে দক্ষিণের উঠোনে এই ঘরদালান বানিয়েছিলেন, তখন সকলেই ভেবেছিল এটা রামকালীর নিজের স্পেশাল। মিস্ত্রীর কাজ শেষ হয়ে গেলে দীনতারিণীও তাই বলেছিলেন, "একটা শুভদিন ত্থাখ তা হলে রামকালী, নতুন ঘরে ওঠবার।"

রামকালী হেসে উঠে বলেছিলেন, "তোমার যে দেখছি গাছে না উঠতেই এক কাঁদি গো মা! ঘরে যে উঠবে, সে আসুক আগে?"

দীনতারিণী অবাক হয়ে বলেছিলেন, "কে আসবে? কার কথা বলছিস?"

"ঘরের লক্ষ্মীর কথাই বলছি মা," রামকালী বোধ করি মায়ের হৃদ্গত ধারণা অনুমান করেছিলেন, তাই একেবারে মায়ের ধারণা-বৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করে পরম শান্তভাবে কথা শেষ করেছিলেন, "কেন, তুমি কি শোন নি রাসুর বিয়ের কথা চলছে?"

রাসুর! রাসুর বৌ এসে ওই ঘরের দখলীদার হবে?

দীনতারিণীর সতীনপোর ছেলের বৌ। দীনতারিণী আর আত্মসংবরণ করতে পারেন নি, বিরক্তভাবে বলে উঠেছিলেন, "অজ্ঞানের মত কথা বলো না রামকালী! ওই সেরা ঘরখানা তুমি রাসুকে দেবে?"

রামকালী আর হাসেন নি, গম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, "দেওয়া-দিইর কথা কিছু নেই মা, যার যা ন্যায্য প্রাপ্য সে তা পাবে।"

দীনতারিণী তথাপি ছেলের ক্রোধাশঙ্কা তুচ্ছ করেও, মনের উষ্মা প্রকাশ না করে পারেন নি, বলে ফেলেছিলেন, "তুমি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপায় করছ, 'হীরে হেন জিরে' এনে নবাবি পছন্দের ঘর গড়লে, সে দ্রব্যি কুঞ্জর বেটা-বৌয়ের প্রাপ্য হল কোন্ সুবাদে রামকালী?"

না, রামকালী প্রত্যক্ষে তিরস্কার করেন নি মাকে, বরং আরও শান্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "যে সুবাদে মানুষ বনের জন্তু-জানোয়ারদের মতন উদোম হয়ে না বেড়িয়ে কোমরে কাপড় দিচ্ছে মা! যাক্ গে, ওকথা থাক্, 'জ্যেষ্ঠর শ্রেষ্ঠ ভাগ' এ বিধিটা তো তোমার অজানা নয় মা? রাসু এ বাড়ির জ্যেষ্ঠ ছেলে।"

দীনতারিণীর চোখে জল এসে গিয়েছিল, দুঃখে অপমান-বোধে, তাই শেষ-বেশ তর্কে বলে বসেছিলেন, "মেজ বৌমার প্রাণটার দিকেও তো তাকাতে হয়? যতই হোক সে এখনও কাঁচা ছেলে, এই ঘর আরম্ভ হয়ে ইস্তক তার একটা আশা ছিল তো?"

রামকালী এবার আর একটু হেসেছিলেন, "তোমার মেজ বৌমার যদি এমন ইল্লুতে আশা হয়েই থেকে থাকে তো সে আশায় ছাই পড়াই উচিত মা!"

"ছাই পড়াই উচিত?"

আঁচল দিয়ে চোখ মুছেছিলেন দীনতারিণী। মেজ বৌমার আশাভঙ্গের কল্পনায় যত না

হোক, নিজেরই আশাভঙ্গে। কুঞ্জ যে জন্মভোর গায়ে হাওয়া দিয়ে বেড়িয়ে, সংসারের সব কিছুর সেরাভাগটা ভোগ করে, এটা কি চিরকাল সহ্য হয়? দীনতারিণীর আশা ছিল এই ঘরখানার ব্যাপারে অন্ততঃ কুঞ্জ কুঞ্জর বৌয়ের মুখটা ছোট হবে। সেই আশায় ছাই পড়ল। তাই কেঁদে ফেলে বললেন, "ছাই পড়াই উচিত?"

"উচিত বৈ কি! ভবিষ্যতে তা হলে আর কখনও এমন বেয়াড়া আশা জন্মাতে পাবে না।"

এর পর দীনতারিণী নীরবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন চন্দননগর থেকে ছুতোর এসে ঢুকল সেই ঘরে। হাঁা, জোড়াপালঙ্ক বানাতে হলে ঘরের মধ্যে বসেই বানাতে হয়, বাইরে থেকে গড়ে এনে লাগিয়ে দেওয়ার রীতি তখনও হয় নি।

বহুবিধ কারুকার্য-করা পালঙ্ক!

ওর জন্যে চন্দননগরের ছুতোরদের ভাত যোগাতে হয়েছিল মাস দেড়েক ধরে। খেয়ে, মজুরি নিয়ে, আর নতুন কাপড়ের জোড়া বখশিশ আদায় করে ছুতোররা চলে গেল, তার পরই বিয়ে হল রাসুর। নতুন পালঙ্কে ফুলশয্যে হল!

সেই পালঙ্ক ছেড়ে সারাদিন আজ মাটিতে পড়ে ছিল সারদা। এখনও খুড়শাশুড়ীর নির্দেশমত নিঃসাড়ে ঘরে ঢুকে হুড়কোটা লাগিয়েই ছেলের তল্লাস মাত্র না করে ঝুপ্ করে শুয়ে পড়ল মাটিতেই।

ঘরে ঢুকে না তাকিয়েও টের পেয়েছিল সারদা তার আশার আশঙ্কাটা মিথ্যে নয়। আঘ্রাণে অনুমানে, হৃৎস্পন্দনে বুঝিয়ে দিয়েছিল সারদাকে—ঘরে তোমার সাতরাজার ধন মাণিক।

এ যেন আবার নতুন বিয়ের নতুন বর। দ্বিরাগমনে এসে প্রথম রাত্তিরে যখন পাঁচটা সমবয়সী মিলে সারদাকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল লাগিয়ে পালিয়েছিল, তখন এমনি বুকটা ধড়াস ধড়াস করেছিল সারদার। তবু তো তখন মাত্র বারো বছর বয়েস! আর এখন ষোলো। ষোড়শীর হৃদয় তো আলোড়নে আরোই উত্তাল হবে।

ঘরে যে অপরাধী আসামী অবস্থান করছিল তার অবস্থাও অবশ্য সারদার চাইতে কিছু উন্নত নয়। তার বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটছে। জীবনে আর কখনও সারদার মুখোমুখি দাঁড়াতে পাবে, এ আশা বুঝি ছিল না রাসুর। সারাদিন শুধু ভেবেছে জীবনের সমস্ত আনন্দ-আহ্লাদের সমাধি হয়ে গেল তার।

মেজ খুড়ী কেন অন্দরে ডাকিয়ে পাঠিয়েছিল, তাও ঠিক বুঝতে পারে নি। ভেবেছিল আবার কোন নিয়ম লক্ষণের পাকচক্রে পড়তে হবে এসে, কিন্তু এসে যা শুনল অভিনব।

সারদা না কি রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত, আর ভুবনেশ্বরীরও কাজের তাড়া, ভাঁড়ারের দিকে না গেলেই নয়, তাই 'ঘুমন্ত' খোকাকে একটু আগলাতে হবে রাসুকে!

কিছুই নয়, শুধু ঘরে একটু থাকা!

বোকা রাসু তখনও কিছু সন্দেহ করে নি। শুধু একটু তাজ্জব বনে গিয়েছিল প্রস্তাবে। দেশসুদ্ধ লোক থাকতে কিনা ছেলে আগলাবার জন্যে রাসুকে ডাকিয়ে আনা হল বার-বাড়ি থেকে? আশ্চর্য নয় তো কি? যে রাখুর মা ডাকতে গিয়েছিল সেই তো পারত কাজটা! করেই তো বরাবর তাই। তবু কিছু বলতেও পারেনি। না প্রতিবাদ, না প্রশ্ন। নতুন বৌয়ের ব্যাপারে যতটা লজ্জা, ঠিক ততটাই লজ্জা তো নতুন ছেলের বিষয়েও।

সুড় সুড় করে তাই ঘরে ঢুকেছিল রাসু। আর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের মধ্যে সন্দেহের হাতুড়ি পড়েছিল।

মেজখুড়ীর এই ডাকিয়ে আনাটা ছল নয় তো? মেজখুড়ীকে তো এমনিতেই খুব ভালবাসে রাসু, এবার যেন ইচ্ছে হল পূজো করে তাঁকে। ফস করে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে বসে ভাবতে লাগল।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে খেয়াল করল ঘরে খিল পড়েছে, আর পরমুহূর্ত থেকেই অনুভব করল, বাতাসহীন ঘরেব চাপা গুমোটটা যেন একটা চাপা কান্নার ধাক্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে।

টপটপ করে দু ফোঁটা জল পড়ল রাসুর চোখ থেকে। পুরুষ মানুষ? তা হোক, মানুষ তো বটে!

ধড়মড় করে উঠে বসল সারদা। একটা বলিষ্ঠ আবেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে করতে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আর কেন? আর কেন?"

আর কিছু বলতে পারল না। চোখ দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করে বসেছে। সারাদিন ধরে প্রতিজ্ঞা করেছিল যদি কখনও সেই নিষ্ঠুরটার সঙ্গে দেখা হয়, কাঁদবে না, মুখ মলিন করবে না। পরন্তু পরের মত উদাসীন থাকবে। কিন্তু পরিস্থিতিটা সমস্তই গোলমাল করে দিল।

তাই কি দু-চার ফোঁটা?

একেবারে ধারার শ্রাবণ!

একে কি করে রোধ করবে সারদা? কোন্ বাঁধ দিয়ে ঠেকাবে?

"বড় বৌ!"

এতটুকু শব্দের মধ্যে কত মিনতি কত আবেদন!

কিন্তু এই করুণ মিনতি ভরা ডাকেই বা সাড়া দিচ্ছে কে?

"বড় বৌ, আমার কি দোষ? আমার ওপর বিরূপ হচ্ছ কেন? বুঝতে পারছ না আমার প্রাণটাও গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে!"

ধারা শ্রাবণে বন্যা এল।

"থাক থাক্, আর মন-মজানে মিছে কথায় কাজ নেই। পুরুষের প্রাণে আবার দরদ!"

"বড় বৌ, এই আমার মাথা খাও, বিশ্বাস কর তোমার মতনই জ্বলে পুড়ে খাক হচ্ছি আমি। তুমি যে আমাকে বিশ্বাসঘাতুক ভাবছ, এ কষ্ট আমি রাখব কোথায়?"

"রাখবার দরকার কি?" সারদা কান্না সামলে কঠোর হবার চেষ্টা করে, "কাল তোমার নতুন ফুলশয্যে, নতুন সুখ, আজ আবার এত দুঃখু-কষ্টর পালা গাইবার কি আছে?"

"বড় বৌ, বল কি করলে তুমি আমায় বিশ্বাস করবে?"

বলিষ্ঠ আবেষ্টনের চাপটা যেন পিষে ফেলতে চাইছে সারদাকে, কি করে আর কঠিন থাকবে সারদা? তবু শেষ চেষ্টা করে, "আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসে কি এসে যাচ্ছে তোমার? ছেলের মা বুড়ীকে ছেড়ে এখন কচি তালশাঁস—"

"বড় বৌ, তুমি এমন ব্যাভার করলে, আমার আত্মঘাতী হওয়া ছাড়া আর উপায় থাকবে না তা বলে দিচ্ছি—" রামুও কঠিন হতে জানে, তাই বাঁধন আলগা দিয়ে বলে, "এই চললাম মেজকাকার ওষুধের ঘরে। তাজা গোখরো সাপের বিষ সঞ্চয় আছে। কোথায় আছে তাও আমার জানা। এর পর কিন্তু বিধবা হলে দোষ দিও না আমায়।"

বিধবা!

বুকটা থর থর করে ওঠে সারদার। বরং একশটা সতীন নিয়ে ঘর করবে সারদা। বিধবা হওয়ার মত অভিশাপ আর কি আছে? কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে বলাই বা যায় কি?

"তা হলে চললাম। এই জন্মের শোধ দেখা।" বলে রামু দরজার কাছে এগোয়, আশা এই যে এবার সারদা মাথা খাওয়ার অনুরোধ জানাবে, কিন্তু সারদা যেন অনড়।

"ভেবেছিলাম ওকে চিরদিনের মত ত্যাগ দিয়েই রাখব, তুমি আমার যে প্রাণেশ্বরী সেই প্রাণেশ্বরীই থাকবে—"স্বগত উচ্চারণে আক্ষেপ প্রকাশ করে দরজার হুড়কোয় হাত লাগায় রামু, "কিন্তু তুমি পতিহন্ত্রী হয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারলে বড বৌ!"

হুড়কোটা খুলে পাশে রাখল রামু।

এবার সারদা কথা বলল, কিন্তু এ কী কথা! এই কি প্রেমে পাগলিনী অবলা বালার ভাষা?

রুদ্ধকণ্ঠে সারদা বলে উঠেছে, "ঘরের পরিবারের সঙ্গে যাত্রা-গানের মতন নাকী কান্নার সুরে কথা কইছ কেন? হুড়কো খুলে বেরিয়ে গেলেই বুঝি খুব পৌরুষ হবে? তোমার গোখরো বিষ আছে, আর আমার দড়ি-কলসী নেই?"

"তোমার প্রাণটা পাথরে গড়া বড বৌ! মেজকাকা যখন আমার গলায় গামছা মোড়া দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে গেল, তখন তাঁর সামনে গিয়ে বলতে পারলে না 'আমারও দড়ি কলসী আছে!' ঠিক আছে, সবাইকে এবার দেখিয়ে দিচ্ছি—ভালমানুষ রামু কি করতে পারে।"

এই প্রকাণ্ড বীররসের ভূমিকাটি অভিনয় করে কপাটটা ধরে হ্যাঁচকা টান মারল রামু,

কিন্তু টানার সঙ্গে সঙ্গেই পরিস্থিতিটা বুঝতে দেরি হল না, দরজার বাইরে শেকল! এ কাজ কে করল?

মেজ খুড়ী?

কিন্তু তাঁর পক্ষে কি এ ধরনের চপল রসিকতা সম্ভব? অথচ তা ছাড়া আর কে? রাসু যে বাড়ির মধ্যে এসেছে, তাই তো কেউ দেখে নি। মেজখুড়ীই তো আজকের নাটকের নাট্যকার।

"বাইরে থেকে বন্ধ।"

একটা বিপন্ন স্বর আস্তে ঘরে ছড়িয়ে পড়ল।

"বন্ধ!"

সারদারও এতক্ষণকার নীরবতা ভঙ্গ হল, বিস্ময়ে ভয়ে।

"তাই তো দেখছি—" রাসুর কণ্ঠে ব্যাকুলতা, "এখন উপায়? যদি সকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকে? বড় বৌ কি হবে?"

সহসা অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটে।

একেবারে অভাবিত অপ্রত্যাশিত। হয়তো বা সারদা নিজেও এক মুহূর্ত আগে এটা কল্পনা করতে পারত না। ভাবতে পারত না তার কান্নায় বুজে আসা কণ্ঠ সহসা অমন কৌতুকের লীলায় হেসে উঠবে। সে হাসির শব্দ চাপা বটে তবু রহস্যে উচ্ছ্বসিত।

তা এই ধরনেরই স্বভাব বটে সারদার নিতান্ত দুঃখের সময়ও হাসির কথা হলে হেসে ফেলা। কিন্তু আজকের কথা যে আলাদা। আজ সারদার মরণ-বাঁচনের সমস্যা। আজ কান্নায় গলা বুজে রয়েছিল সারদার। তবু রাসুর এই বিপন্ন বিপর্যস্ত কণ্ঠ তাকে কী যে কৌতুকের যোগান দিল, উচ্ছ্বসিত রহস্যে হেসে উঠল সে। হেসে উঠে বলল, "কী আর হবে! দায়ে পড়ে মশাইকে এখন পরনারীর সঙ্গে রাত কাটাতে হবে।"

রাসু চমকে গেছে, থমকে পড়েছে। তবে কি এতক্ষণ ছলনা করছিল সারদা? সতীন হওয়ায় তেমন কিছু লাগে নি তার? এ হাসি এ কথা তো রীতিমত প্রশ্রয়ের।

অতএব দরজা নিয়ে মাথা পরে ঘামালেও চলবে, এখন এদিকের ঘাঁটি সামলে নেওয়া যাক।

খোলা হুড়কো আবার দরজায় উঠল।

অনাদৃত পালঙ্কের বিছানা আবার স্পর্শের উষ্ণতা পেল।

না, একেবারে সহজে ধরা দেবে না সারদা। সে সত্যবদ্ধ করিয়ে নেবে স্বামীকে।

"থাক, আমাকে স্পর্শ করতে হবে না, আগে মা সিংহবাহিনীর নামে দিব্যি কর, আমি বেঁচে থাকতে ছুটকিকে ছোঁবে না?"

রাসুর বুকটা কেঁপে ওঠে।

শপথটা যে মারাত্মক। ভয়ে ভয়ে বলে, "সিংহবাহিনীর নামে দিব্যি করা কি ভাল বড় বৌ?"

"মনে পাপ থাকলে ভাল নয়। একমন একপ্রাণ থাকলে ভয়ের কি আছে?"

"তবু, ঠাকুর-দেবতা বলে কথা।"

"বেশ তো, আমি তো তোমায় সাধি নি। নাই বা আর স্পর্শ করলে আমায়!"

হায় মা সিংহবাহিনী, এমন ঘোরতর বিপদে তোমার গ্রামের আর কেউ কখনও পড়েছে?

একদিকে—একখানি অপরাধ-বোধের ভারে পীড়িত আর নতুন আশায় উদ্বেল ব্যাকুল হৃদয়, আর অপর দিকে এক অনমনীয়া পাষাণী।

তবে কি হাসিটাই ছল?

তাই সম্ভব, নইলে দিব্যি গুছিয়ে ছেলের কাছ ঘেঁষে শোবার আয়োজন করছে কেন সারদা?

"বড় বৌ!"

"আঃ, কেন জ্বালাতন করছ?" সারদার বুকে পরম ভরসা দরজার বাইরে শেকল লাগানো, রাগ করে ছিটকে বেরিয়ে যাবার উপায় নেই বাসুর।

আঃ, কে সেই দেবী, যে রাসুকে এমন করে বন্দী করে ধরে দিয়েছে সারদার কাছে? স্বয়ং মা সিংহবাহিনীই নয় তো?

"তা হলে তোমার দয়া হবে না?"

"সোয়ামী গুরুজন, তুমি আবার দয়ার কথা তুলছ কেন গো? পরিবারই হল গিয়ে কেনা দাসী।"

"আচ্ছা বেশ, করছি দিব্যি। হল তো?"

"কই করলে?"

"মনে মনে করেছি।"

"মনে মনে? হুঁ! মনের কথা বনে যায়। মুখে বল।"

"বেশ বেশ, এই বলছি, তুমি ছাড়া আর কাউকে ছোঁব না সিংহবাহিনী সাক্ষী।"

"আমি ছাড়া নয়, আমি বেঁচে থাকতে—"

এটুকু অনুগ্রহ করে সারদা।

"ওই হল। কে আগে যায় কে পরে যায় বলা যায় কি?"

"আমার কুষ্ঠিতে আছে সধবা মরব।" সারদা আত্মপ্রসাদের হাসি হাসে, "কিন্তু মনে থাকে যেন মা সিংহবাহিনী সাক্ষী।"

"থাকবে থাকবে।"

কিন্তু সত্যিই কি মনে ছিল?

রাসু কি শেষ অবধি মা সিংহবাহিনীর মর্যাদা রাখতে পেরেছিল ?

পুরুষ মানুষ কি তাই পারে ?

রাসুর মত মেরুদণ্ডহীন পুরুষ ?

তবু এমনি মিথ্যে শপথের চোরাবালির উপরই তো ঘর বাঁধতে হয় মেয়েমানুষকে।

তেরো

যজ্ঞির জন্যে ছানাবড়া ভাজা হচ্ছে। ভিয়েনের চালা'য় বড় বড় কাঠের উনুন জেলে কারিগররা লেগে গেছে ভোর থেকে। প্রথমে বোঁদে ভেজে স্তূপাকার করে রেখেছে কাঠের বারকোশে বারকোশে, এখন শুরু হয়েছে ছানাবড়া! প্রচুর পরিমাণে না করলেও তো চলবে না, নিমন্ত্রিতদের পেট উপচে খাওয়ানোর পর আবার সরাভর্তি ছাঁদা দিতে হবে তো? তা ছাড়া—যখন কুল্লে ওই দু রকম মিষ্টি।

তাড়াহুড়োর যজ্ঞি, ওর বেশী আর সম্ভব হল না, অথবা সেটাও হয়তো ঠিক কথা নয়, একটা মোটামুটি কথা মাত্র। রামকালী চাটুয্যে যদি দরকার বুঝতেন, তা হলে এই এক দিনের মধ্যেই কাটোয়া কি গুপ্তিপাড়া থেকে ওস্তাদ ময়রা আনিয়ে পাঁচ-সাত রকম মিষ্টি বানিয়ে তোলাও অসম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। কিন্তু দরকার বোধ করেন নি তিনি।

রাসুর প্রথম বিয়েতে ঘটা হয়েছিল বিস্তর, গ্রামে এখনও তার গল্প ফুরোয় নি। মিষ্টির কারিগর এসেছিল নাটোর থেকে, কেষ্টনগর থেকে, মুড়োগাছা থেকে। কাঁচাগোল্লা ক্ষীরমোহন, মতিচুর সরভাজা, ছানার জিলিপি, খাজা অমৃতি নিখুঁতি ইত্যাদি করে বারো-তেরো রকম মিষ্টি হয়েছিল। আর মাছের কথা তো বলেই শেষ হবে না। এক-এক জনের পাতে বড় বড় এক-একটা মালসা ভর্তি মাছের তরকারি বসিয়ে দিয়ে আবার তিন-চার বার করে পরিবেশন। তা ভিন্ন রান্নার পদ তো বাহান্ন রকম, বাহান্ন ব্যঞ্জন নইলে আবার ঘটা কিসের ?

কুমোর-বাড়ি বরাত দিয়ে সাইজের হাঁড়ি গড়িয়ে আনা হয়েছিল ঝোড়া ঝোড়া, তাতেই গলা উপচে মিষ্টির ছাঁদা। যজ্ঞির জের চলেছিল দিন পনেরো ধরে।

সে কথা আলাদা। সে বিয়ের সঙ্গে এ বিয়ের তুলনা করার কোনও মানেই হয় না। অন্য বাড়ি হলে যজ্ঞিই করত না, নেহাত রামকালী চাটুয্যের বাড়ি বলেই এত আয়োজন। পরিমাণে প্রচুরই হচ্ছে, তবে ওই, মাত্র দু রকম মিষ্টি, ষোলো-কুড়ি মত রান্নার পদ। রান্না এখনও চাপে নি, পাশের চালায় তার তোড়জোড় চলছে, হালুইকর ঠাকুররা স্নান করতে গেছে।

এ গ্রামে হালুইকর ঠাকুর এনে রাঁধানোর প্রথা প্রবর্তন করেছেন রামকালীই। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দেখেছিলেন এ ব্যবস্থা। নইলে এ গ্রামে চিরদিনই কাজেকর্মে গ্রামের ব্রাহ্মণ-কন্যারাই রেঁধে থাকেন। সেটা রীতিমত একটা সম্মান সম্ভ্রমের ব্যাপার। ডাকসাইটে

রাঁধুনী বলে খ্যাতি আছে যাঁদের, তাঁদেরই ডাকা হয় অনেক তোয়াজ করে। রান্নায় বসবার আগে 'পূর্ণপাত্র', নতুন কাপড়ের জোড়া, সধবা ব্রাহ্মণী হলে আলতা সিঁদুর, এই সব দিয়ে, তবে পাকশালে ঢোকাতে হয় তাঁদের।

তথাপি এই রান্নার পর্ব থেকেই অনেক গদাপর্ব মুষলপর্ব বেধে যায়। গ্রামের যে এক দল ছুতো খুঁজে বেড়ানো লোক আছে, তারাই 'যজ্ঞি' দেখলে দক্ষযজ্ঞের আয়োজন করবার তালে ঘোরে। মনকষাকষি, কথান্তর, মান-অভিমান, এসব প্রায় যজ্ঞিরই অঙ্গ। রামকালী ওসব ঝামেলার মধ্যে নেই। পয়সা দিয়ে লোক আনাবেন, কাজ করাবেন, চুকে গেল। রাঁধুনী বামুনের হাতে খেতে যাদের আপত্তি, তারা যাও বিধবার হেঁসেলে ভর্তি হও গে! মাছ জুটবে না।

তা সে দু-চার জন নিতান্ত নিষ্ঠাপরায়ণ গ্রামবৃদ্ধ ছাড়া 'না হুঁ' করে সকলেই বসে পড়ে রামকালীর বাড়ির ভোজে। ওস্তাদ কারিগরের রান্নার হাত, রামকালীর দরাজ হাত, আর রামকালীর প্রতি সমীহ-বোধ এই ত্রিশক্তির আকর্ষণে সকলেই প্রায় নরম হয়ে আসে। পয়সা যে এ অঞ্চলে কারুরই নেই তা তো নয়, কিন্তু এমন দরাজ হাত? এত বড় দিলদরিয়া মন?

খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে সত্ত কাটানো টাটকা ছানার মিষ্টান্ন ভেজে তোলার সুগন্ধে শুধু আশপাশেরই নয়, সারা গ্রামখানারই বাতাস যেন 'ম ম' করছে। বাড়ি বাড়ি ছোট ছেলে-পুলেদের ঘরে আটকে রাখা দুঃসাধ্য হচ্ছে তাদের অভিভাবকদের।

পায়ে রুপোর বোল্ দেওয়া খড়ম, গায়ে বেনিয়ান, পরনে নেত্রকোণার থান। সব দিকে চৌকস হয়ে তদারকি করে বেড়াচ্ছেন রামকালী। শুধু মিষ্টির ভিয়েনে শেকড় গেড়ে বসে থাকবার ভারটা দিয়েছেন বড়দা কুঞ্জকে। ওর থেকে বেশী দায়িত্বর কাজ কুঞ্জকে দেওয়া চলে না।

গয়লারা দইয়ের 'ভার' এনে নামিয়েছে, ক মণ দইয়ের যোগান দিতে পেরেছে তারা, দাঁড়িয়ে তারই হিসেব নিচ্ছিলেন রামকালী, হঠাৎ নেডু এসে কাছে দাঁড়াল। রামকালী গ্রাহ্য করতেন না, কিন্তু নেডু একেবারে গায়ের কাছে দাঁড়িয়েছে, ভাবটা যেন কিছু বক্তব্য আছে। গয়লাদের উপর চোখ রেখেই রামকালী ওর মাথাটায় একবার হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "কিরে নেডু?"

নেডু সভয়ে এদিক ওদিক তাকিয়ে আস্তে বলল, "একবার অন্দরবাড়িতে যেতে বলছে।"

"অন্দরবাড়িতে যেতে বলছে? কাকে বলছে?"

"তোমাকে।"

রামকালী ভুরু কুঁচকে বলেন, "আমাকে এখন যেতে বলছে? পাগলটা কে হল?" অগ্রাহ্য ভরে আবার অদূরবর্তী গোয়ালাদের দিকেই মন দেন, "বলিস কি রে তুষ্টু, ওই পাঁচ মণ বৈ দই দিয়ে উঠতে পারছিস না। তা হলে আমার উপায়? তুই ভরসা দিলি—"

তুষ্টু মাথা চুলকে বলে, "আজ্ঞে ভরসা তো দেছলাম, কিন্তু মা ভগবতীরা যে আমাকে নিভ্‌ভর্সা করে ছাড়লেন। কাল রেতে তো আর নিদ্রেই দিই নি, চৌদিকে সকল গোহালার ঘরে ঘরে বরাত দিয়ে বেড়িয়েছি, তা সবাইয়ের ঘরের দই যোগসাজস করে এই হল!"

"এই হল তা তো বুঝলাম, কিন্তু আমার কি হবে তাই বল্? দাঁড়িয়ে অপমান হতে বলিস আমায়?"

"অপমান!" তুষ্টু বীরবিক্রমে বলে ওঠে, "বলি একটা ঘাড়ে বিশটা মাথা কার আছে কবরেজ ঠাকুর যে, আপনাকে অপমান্যি করবে?"

"মাথা এ গাঁয়ের এক-এক জনের একশটা করে, বুঝলি রে তুষ্টু।" বলে হাসলেন রামকালী, আর ঠিক সেই সময় নেড়ু আর একবার মিহিগলায় ডাক দিল, "মেজখুড়ো!"

"আরে, এ ছোকরা তো ভাল বিপদ করল। কে তোকে পাঠিয়েছে শুনি?"

"পিসঠাকুমা।"

রামকালী বিরক্তভাবে বললেন, "তা আমি বুঝেছি, নইলে আর কার এমন—", বোধ করি 'কার এমন আক্কেল হবে' বলতে যাচ্ছিলেন, সামলে নিলেন। ছোটদের সামনে গুরুজন সম্পর্কে তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য করবার মত অসতর্কতা এসেছিল বলে রীতিমত বিরক্ত হলেন নিজের উপর। অথচ মোক্ষদার মত কাণ্ডজ্ঞানহীন গুরুজন সম্পর্কে সকল প্রকার সমীহনীতি মেনে চলাও শক্ত।

অসতর্কতা সামলে নিয়ে বললেন, "বল গে যাও আমার এখন বিস্তর কাজ, তাঁর যা বলবার যখন ভেতরে যাব তখন যেন বলেন।"

"তুমি একথা বলবে পিসঠাকমা জানে, তাই আমাকে বলে দিল—", নেড়ু ঢোঁক গিলে বলে, "বলে দিল বল গে যা বড় পিসঠাকুমার ভেদবমি হয়েছে, বাঁচে কিনা, এক্ষুনি দরকার।"

ভুরুটা আরও কুঁচকে উঠল রামকালীর। পিসির ভেদবমির দুর্ভাবনায় নয়, মেয়েমানুষের বিবেচনাহীন আবদারের ধৃষ্টতা দেখে। রোগ যে কাশীশ্বরীর হয় নি সেটা নিশ্চিত, তবু অনর্থক হয়রানি করতে ডাকাডাকি। হয়তো বা অভ্যাগত কুটুম্বিনীদের নিয়ে কোনরূপ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, আর সালিশ মানতে ডাকা হয়েছে রামকালীকে। কিন্তু এই কি তার সময়?

সাতপাড়া লোক নেমন্তন্ন হয়েছে, এক দিনের যোগাড়ে যজ্ঞি, মাথায় পর্বত বয়ে ঘুরছেন রামকালী, তখন কিনা এই সব মেয়েলিপনা!

তা ছাড়া আরও বিরক্তিকর, ছোট ছেলেটাকে মিথ্যে কথায় তালিম দিয়ে পাঠানো। কিন্তু যে রাগিণী মোক্ষদা, নেড়ুকে ফেরত দিলে নির্ঘাত নিজেই এখুনি রণরঙ্গিনী মূর্তিতে বার উঠোনেই হানা দেবেন, এবং পাঁচ জনের কান বাঁচাবার চেষ্টামাত্র না করে বকাবকি শুরু করবেন—"পয়সার দেমাকে ধরাকে সরা দেখিস্ নি রামকালী, গুরুজন বলে একটু

সমেহা করিস।”—হ্যাঁ এরকম কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন মোক্ষদা, দ্বিধামাত্র করেন না।

সংসারের এই একটা মানুষকে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারলেন না রামকালী। পারতেন, অনায়াসেই পারতেন, যদি সত্যিই রামকালীর গুরুজনে সমীহবোধ না থাকত। গুরুজন হয়েই মোক্ষদা রামকালীকে জব্দ ফেলেছেন।

কিন্তু শুধুই কি গুরুজন বলে জব্দ?

আরও এক জনের কাছেও কি মাঝে মাঝে জব্দ হয়ে পড়েন না রামকালী? যে মানুষটা নিতান্তই লঘুজন! হ্যাঁ, মনে মনে স্বীকার না করে পারেন না রামকালী, মাঝে মাঝে সত্যবতীর কাছে জব্দ হতে হয় তাঁকে, হার মানতে হয়। কিন্তু তাতে কি বিরক্তি আসে?

“মেজ খুড়ো!” ছেলেটাও কম নয়। তাই রামকালীর কোঁচকানো ভুরু দেখেও ভয়ে পালিয়ে গেল না, বলল, “পিসঠাকুমা তোমায় চুপি চুপি ডেকে নিয়ে যেতে বলল, খুব বিপদ!”

আঃ, এ তো আচ্ছা মুশকিলে ফেলল!

“বিপদটা তো দেখছি আমারই!” বলে রামকালী হাঁক দিলেন, “তুষ্টু, দই সব ভেতর-দালানে তুলে দাও, আর খোঁজ করে দেখ আর কারও ঘরে আরও দু-দশ সের পাওয়া যাবে কি না।”

“পাওয়া গেলে তো ঠাকুরমশাই, আমি নিজেই—” তুষ্টু মাথা চুলকে একটু ধৃষ্টতা করে বসে, “তা তোমার আজ্ঞে পাঁচ মণই কি কম? এ তো আর বড় খোকার পেরথম বিয়ে নয়—”

রামকালী ভুরুটা একবার কুঁচকেই মৃদু হাসলেন। বললেন, “কথাটা গয়লার ছেলের মতই বলেছিস তুষ্টু, পেরথম বিয়ে নয় বলে, কুটুম্বজনকে খাওয়াতে বসে অপরিতুষ্ট রাখব? আচ্ছা তুই ওগুলো তুলে দে গে, আসছি আমি।”

নেড়ুর সঙ্গে সঙ্গে ভিতরবাড়িতে ঢুকলেন রামকালী মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠোনটা পার হয়ে। এই মাঝের উঠোনেই ধানের গোলা মরাই, সারা বছরের জ্বালানী কাঠের মাচা, চালার নিচে জালা জালা বীজধান।

নেড়ু দিগ্বিজয়ীর মত কাশীশ্বরীর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল, কারণ রামকালীকে ডেকে আনার ভার আর কেউ নিতে চায় নি। সত্য পর্যন্ত ঝাড়া জবাব দিয়েছিল, “এই দেখলাম বড় পিসঠাকুমা পুকুরে চান্ করে এল, এক্ষুনি আবার কি ব্যামোয় ধরল যে বাবাকে শত কম্মের মধ্যে থেকে ডেকে আনতে যাব? মানুষটার কি এখন মাথার ঠিক আছে? ঘরে তো জোয়ানের বড়ি আছে, তাই খেয়ে নাও না।”

“তুই বেরো দজ্জাল হারামজাদী—” বলে মোক্ষদা নেড়ুকে ধরেছিলেন।

কিন্তু নেড়ুদের তো আর গিন্নীদের ঘরে ওঠবার হুকুম নেই, তাই “এই যে ঠাকুমা—” বলে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিচু দরজা, রামকালী খড়ম খুলে মাথা নিচু করে ঢুকলেন। আর সমস্ত কৃতজ্ঞতা ভুলে মোক্ষদা “তুই পালা লক্ষ্মীছাড়া ছেলে” বলে নেড়ুকে তাড়া দিয়ে বিদেয়

করলেন।

রামকালী দেখলেন কাশীশ্বরী মাটিতে শুয়ে আছেন থানের আঁচলটুকু মুখে চাপা দিয়ে। এটা আবার কি! নিশ্চয় কোন মান-অভিমানের ব্যাপার। বিরক্তি এল, তবু শান্তভাবেই বললেন, "কি ব্যাপার!"

"ব্যাপার বেশ উত্তম—" চাপা গলায় এটুকু জ্ঞান দান করে মোক্ষদা আরও ফিস ফিস করে বললেন, "দুয়োরটা ভেজিয়ে দিয়ে তবে শুনতে হবে।"

রামকালী একবার বাইরে তাকালেন। শুচিবাই মোক্ষদাদের এই দিকটা বাদে সারাবাড়ি লোকে লোকারণ্য, এর মধ্যে কপাট ভেজিয়ে গুপ্তমন্ত্রণা! তিনি তো পাগল হন নি। গম্ভীর গলায় বললেন, "কপাট থাক, কি বলবার আছে বলো।"

কিন্তু বলবার কিছু আর আছে নাকি?

আছে বলবার মত মুখ?

অথচ এত বড় ভয়ানক কথা রামকালীকে না জানিয়ে করবেন কি মুখ্যু দুটো মেয়েমানুষ? হিতাহিত জ্ঞান কি আর কিছু অবশিষ্ট আছে তাঁদের? মোক্ষদার আর কাশীশ্বরীর। শঙ্করী যে কাশীশ্বরীরই নাত-বৌ।

ভয়ঙ্কর খবরটা এখনও পাঁচ কান হয় নি, এখনও সংসারের সবাই আপন আপন কাজে হাবুডুবু খাচ্ছে, কিন্তু কতক্ষণ আর অন্যমনস্ক থাকবে লোক? কতক্ষণ আর তাদের কান বাঁচিয়ে রাখা যাবে? তার পর? এক কান থেকে পাঁচ কান, তার পরই তো—লহমায় পাঁচ শ কান। খড়ো চালার পাড়ায় আগুন লাগাও যা, আর একটা বিধবার কলঙ্ক-কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে যাওয়াও তা। এ চাল থেকে ও চাল তো, এ মুখ থেকে ও মুখ। হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া মেয়েমানুষটা 'নিড়ুবি' হবার আর দিন পেল না!

যদি জলে ডুবে নিড়ুবি হয়ে থাকে তো সেও বরং ভাল কথা, কিন্তু যদি ভরাডুবি করে বসে থাকে?

কাশীশ্বরীর ধারণা তাই। তাই তিনি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পড়ে আছেন। আর মর্মে মর্মে অনুভব করছেন, কেন সেই সর্বনাশীর খুড়োখুড়ী ও মেয়েকে ঘরে রাখে নি, উপযাচক হয়ে কাশীশ্বরীর গলায় গছিয়ে গেছে। হায় হায়, কালই তো টের পেয়েছিলেন কাশীশ্বরী, নাপিত-বৌয়ের কথার আঁচে, তবে কেন আবাগীর বেটিকে দুয়ারে তালা লাগিয়ে আটকে রাখেন নি! পাঁচটা কুটুমের কাছে সাফাই গাইতে, বললেই হত হঠাৎ মাথাটার কেমন দোষ হয়ে গেছে শঙ্করীর, তাই কাজের বাড়িতে ছেড়ে রাখতে সাহস করেন নি।

মোক্ষদা কিন্তু জলে ডোবার কথাই তোলেন। "কোন্ রাত্তিরে কখন উঠে এ কাজ করেছে কিছু টের পাই নি রামকালী, সকালবেলাও বলি চানে গেছে না কোথায় গেছে। বেলা হতে মাথায় বজ্রাঘাত! আমার থির বিশ্বাস বড় পুকুরে গিয়ে ডুবেছে কপালখাকী।

এই বেলা জাল ফেলালে—"

"না !" রামকালী জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, "জাল ফেলা হবে না।"

"জাল ফেলা হবে না !"

যন্ত্রচালিতের মত উচ্চারণ করেন মোক্ষদা।

"না। এতগুলো লোকের খাওয়া পণ্ড হতে দেব না আমি।"

মোক্ষদা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ নম্রভাবে বলেন, "কিন্তু একটা জীবের জীবনের চাইতে যজ্ঞিটাই বড় হল তোমার বিচারে ?"

"শুধু আমার বিচারে নয়, যে কোন বুদ্ধিমান লোকের বিচারেই।" রামকালী ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে বলেন, "বলছ সকাল থেকে দেখতে পাও নি, ধরে নিতে হবে, কাজটা হয়ে থাকে তো রাতেই হয়েছে। এখন জাল ফেললে জীবটা জীবন্ত উঠবে তোমাদের বিশ্বাস ?"

মোক্ষদা চুপ করে থাকেন, উপযুক্ত উত্তরের অভাবে। আর কাশীশ্বরী চাপা-গলায় হু হু করে কেঁদে ওঠেন।

"থাম ! লোকজন খাওয়ার আগে যেন টুঁ শব্দটি না হয়। যদি ডুবে থাকে তো যতক্ষণ না ভেসে ওঠে ততক্ষণ তাকে জলের তলায় থাকতে দাও। ডুবলে ভেসে উঠতেই হবে, নদী নয় যে ভেসে চলে যাবে। কিন্তু—" পায়চারি থামিয়ে রামকালী কাশীশ্বরীর খুব কাছে সরে আসেন, ঈষৎ নিচু হয়ে চাপা গম্ভীর স্বরে বলেন, "আর যদি ডুবে না থাকে, বৃথা জাল ফেলার পর সমাজে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে অনুমান করতে পারছ ? ঘরের বৌ-ঝিকে আগলে আটকে রাখার ক্ষমতা যখন নেই, তখন নিজেদের জিভকেই আগলে আটকে রাখো।"

কাশীশ্বরী সহসা কেঁদে ওঠেন, "ও রামকালী, তুমি আমায় একটু বিষ দাও বাবা, আমি এ মুখ আর কাউকে দেখাতে পারব না।"

"ছেলেমানুষি করো না।" মৃদুস্বরে ধমকে ওঠেন রামকালী, "বিপদে মতি স্থির রাখ। আমাকে বিবেচনা করবার সময় দাও। কিন্তু এই ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আমি, বলছ তোমাদের কাছে শুতেন, অথচ দু-দুটো মানুষ কিছু টের পেলে না তোমরা ?"

"মরণের ঘুম এসেছিল বাবা আমাদের—" কাশীশ্বরী আর একবার কেঁদে ওঠেন।

"পিসীমা, হাতজোড় করছি তোমায়, হৈ-চৈ করো না ! সবাইকে না হয় বলো খুড়োর অসুখের খবর পেয়ে হঠাৎ বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁকে।"

"মানুষ তো আর ঘাসের বিচি খায় না রামকালী", মোক্ষদা নিজস্ব ভঙ্গীতে ফিরে আসেন, "কাল রাতদুপুর অবধি সবাইয়ের সঙ্গে কুটনো কুটেছে লক্ষ্মীছাড়ী—"

"আশ্চর্য !" আবার পায়চারি করতে করতে বলে ওঠেন রামকালী, "এ রকমটা হল কেন, কিছু অনুমান করতে পারছ তোমরা ?"

কাশীশ্বরী মুখের ঢাকাটা আরও শক্ত করে চাপা দিয়ে বলে ওঠেন, "আমি পারছি

রামকালী! মতিগতি তার ভাল ছিল না। ধিঙ্গী বয়েস অবধি খুড়োর ঘরে থেকেছে, মা-বাপ ছিল না যে সুশিক্ষে দেবে, উচ্ছন্ন যাওয়ার বুদ্ধির বৃদ্ধি করেছে বসে বসে। আমি বুঝছি জলে ডুবে মরে নি ও, আমাদের মুখে চুনকালিই দিয়েছে।"

ঘরটা নিচু-নিচু অন্ধকার-মত। জানলা আছে কি নেই, তবু রামকালীর টক্‌টকে ফরসা মুখটা আরও কত টক্‌টকে হয়ে উঠেছে, টের পেলেন মোক্ষদা। চেয়ে চেয়ে মনে হল যেন ওই টকটকে মুখটা থেকে উত্তাপ বেরোচ্ছে। বেপরোয়া মোক্ষদাও ভয় পেলেন। কি বলতে গিয়ে থেমে গেলেন।

আর ঠিক এই সময় দরজাব গোড়ায় কাঁসর বেজে উঠল।

মাজাঘষা চাঁচাছোলা কাঁসর। "ওগো অ ঠাক্‌মারা, কাটোয়ার বৌ গেল কোথায়? পান সাজবার জন্যে যে হাঁক-পাড়াপাড়ি হচ্ছে তাকে! তোমরাই বা দুই বুনে এই বেলা দুপুর অবধি শোবার ঘরে গুলতুনি করছ কেন? চান করে আবার শোবার ঘরে এসে সেঁধিয়েছ যে বড়? আর একবার চানের বাসনা আছে বুঝি? তা তোমাদের বাসনা মেটাও, বৌকে পাঠিয়ে দাও।"

ঘরে ঢোকবার অধিকার নেই, তাই বাইরে দাঁড়িয়েই বাক্যস্রোত বইয়ে দেয় সত্য। ধারণাও করতে পারে না ঘরের ভিতরে তার বাপের উপস্থিতি সম্ভব।

উঁচু 'পোতা'র ঘর, দরজাব বাইরে থেকে ছোটদের পক্ষে ভিতরটা স্পষ্ট দেখাও সম্ভব নয়।

মোক্ষদা বিনা বাক্যব্যয়ে কপাটের সামনে এসে দাঁড়ান, অতএব ঘরেই আছেন তিনি। সত্য বিরক্ত কণ্ঠে বলে, "কি গো, মুখে বাক্যি-ওক্যি নেই কেন? কাটোয়ার বৌ গেল কোথায় সেটা বলবে তো? ঘাট থেকে আরম্ভ করে সাত চৌহদ্দি ছিষ্টি খুঁজে এলাম—"

সহসা মোক্ষদা সরে দাঁড়ালেন, এবং সেই শূন্যস্থানে রামকালীর মূর্তিটা দেখা গেল।

বাবা!

সত্য বজ্রাহত।

এখানে বাবা! আর সত্য মুখের তোড় খুলে দিয়েছে! ছি ছি! কিন্তু বাবা এখানে কেন? তা হলে নির্ঘাত কাটোয়ার বৌয়েব হঠাৎ কোনও অসুখ করেছে, পিসঠাক্‌মারা তাই নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ছি ছি এদিকে এই কাণ্ড, আর সত্য কিনা পান সাজার তাগাদা দিতে এসেছে! বাবা কি বলবেন! বাড়ির কোনও খবর রাখে না সত্য, এইটাই প্রমাণ হবে।

মনে মনে জিভ কেটে চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে বেচারা। আজ আর মানসিক চাঞ্চল্য নিবারণ করতে, অভ্যাসমত শাড়ির আঁচলটা নিয়ে চিবোবার উপায় নেই, পরনে উৎসব উপলক্ষে নিজের বিবাহকালে লব্ধ একখানা ভারী দামী বালুচরী চেলি।

রামকালী ঘাড় ফিরিয়ে মোক্ষদা ভগ্নীদ্বয়কে উদ্দেশ করে মৃদুস্বরে বললেন, "স্বাভাবিক ভাবে যার যা কাজ করো গে যাও, বৃথা ঘরের মধ্যে বসে থাকবার দরকার নেই," তার পর

ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে সহসা মেয়েকে একটা সহজ পরিহাসের কথা বলে উঠলেন, "ঈস্! মেলাই সেজেছিস যে!"

কথাটা মিথ্যা নয়, শুধু বালুচরী চেলি কেন, মেয়েকে আজ এক গা গয়না পরিয়ে সাজিয়েছে ভুবনেশ্বরী। কমগুলি গয়না তো হয় নি সত্যর বিয়ের সময়, পবে কবে? বাপের কথায় লজ্জিত হাসি হেসে মাথা নিচু করল সত্য। এবার রামকালী পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন, "ভাগ্নে-বৌমাকে কে ডাকছে?"

ভাগ্নে-বৌমা অর্থে আপাততঃ শঙ্করীকেই বোঝাল। সত্য বাবার কথায় নয়, বাবার কণ্ঠস্বরে থতমত খেল, অসহায় অসহায় চোখে বলল, "ওই তো ওবা, যারা এক বরজ পান নিয়ে সাজতে বসেছে।"

"তাদের বলে দাও গে উনি আজ আর পান সাজতে পারবেন না।" হঠাৎ যেন রামকালীও অসহায়তা বোধ করলেন, তাই তাড়াতাড়ি বললেন, "আচ্ছা থাক, তোমার এখন আর ওদিকে যাবার দরকার নেই, যাঁরা পান সাজছেন সাজুন।"

কথায় কথায় পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছেন রামকালী ঘবেব পিছনে ঢেঁকিঘবের দিকে ইচ্ছে করেই। সত্য সে খেয়াল করে না, ম্লানমুখে প্রশ্ন করে, "কাটোয়াব বৌয়ের অসুখ কি বেশী বাবা?"

"অসুখ? কে বললে?" রামকালী চমকে উঠে সামলে নিয়ে গম্ভীর ভাবে বলেন, "শোন, ওঁকে বৃথা ডাকাডাকি কবো না। অসুখ করে নি, ওঁকে হঠাৎ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আশ্চর্য, এ কথা কেন বললেন রামকালী!

একটু আগেও কি সিদ্ধান্ত কবেছিলেন তিনি এ সংবাদটা আর কারও কাছে প্রকাশ করবেন না? হয়তো আর কেউ হলেই করতেন না, হয়তো ভুবনেশ্বরী এসে প্রশ্ন করলেও তাকে ওই "ডাকাডাকি করো না" বলেই থেমে যেতেন, কিন্তু সত্যর ওই উজ্জ্বল বিশ্বস্ত মস্ত বড় বড় চোখ দুটোর সামনে যেন সত্য গোপন করা কঠিন হল। আর রামকালীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে এমনও মনে হল, এই ন বছরের মেয়েটার কাছে বুঝি তিনি চিন্তার ভাগ দেবার আশ্রয় খুঁজছেন।

কিন্তু সত্যর তো ততক্ষণে 'হয়ে গেছে'।

খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?

আস্ত একটা মানুষকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তাতে আবার মেয়েমানুষ! বেটাছেলে নয় যে পায়ে হেঁটে কোথাও চলে গেছে। মেয়েমানুষকে খুঁজে না পাওয়ার অর্থই নির্ঘাত বড়পুকুরের কাকচক্ষু জল। অবশ্য এ জ্ঞানটা সত্যর সম্প্রতিই হয়েছে সারদাকে উপলক্ষ করে। তাই চমকে উঠে বলে, "খুঁজে পাওয়া

যাচ্ছে না? হায় আমার কপাল, ওই ভয়ে বড় বৌকে সমস্ত রাত ঘরে ছেকল তুলে রেখে দিলাম, আর কাটোয়ার বৌ এই করল। হে ঠাকুর, আমি কেন দুটোকেই ছেকল দিলাম না?"

"বড় বৌমাকে ছেকল দিয়ে রেখেছিলে?" চমৎকৃত রামকালী প্রশ্ন করেন।

"না দিলে," সত্য উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলে, "নিশ্চিন্দি হয়ে ঘুম আসে? জলচৌকির ওপর জলচৌকি বসিয়ে কত কাণ্ড করে ছেকলে হাত দিয়েছি! ভোরের বেলা মাকে বলে কয়ে খুলিয়ে দিই। হায় হায়, কাটোয়ার বৌকেও যদি—" বলেই সত্য সহসা স্বর ফেরায়, করুণ রসের পরিবর্তে বীর রসের আমদানী করে, "যাক্, সে বেচারা মরেছে না জুড়িয়েছে। মানুষটা এক দিন ঘাট থেকে আসতে একটু দেরি করেছে, লক্ষ্মীর ঘরে সন্ধ্যে দিতে পারেনি, তার তরে কী গঞ্জনা কী বাক্যিযন্তন্না! একটা মনিষ্যি, তাকে দশটা মানুষে তাড়না। বড় পিস্ঠাকমাটি কি সোজা না কি? গাল দিয়ে দিয়ে আর আশ মেটে না। অত বাক্যযন্তন্নায় পাষাণ পিরতিমে হলেও জলে গে ঝাঁপ দেয়।"

রামকালী যেন ক্রমশঃ রহস্যের সূত্র পাচ্ছেন। বললেন, "বকাবকিটা কখন হল?"

"এই তো কালই। অবিশ্যি বৌয়েরও দোষ আছে, জল নিতে গেছ জল নিয়ে চলে এস, সন্ধ্যেভোর ঘাটে বসে থাকার দরকার কি? তবে হ্যাঁ, এনাদেরও লঘুপাপে গুরুদণ্ড! অবীরে বিধবা, মনেপ্রাণে কি সুখ আছে ওর? দু দণ্ড নয় ছিলই ঘাটে, তার জন্যে অত গালমন্দ! এই গ্রীষ্মিকালে কুল কোথায় তার ঠিক নেই, সকল গাছই তো নেড়া, তবু বলে কি ঘাটে যাবার ছুতোয় কুল খাচ্ছিলি, আরও সব কত কথা—" বলেই হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে সত্য, "আমি তার মানেই জানি না বাবা।"

রহস্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কাল সন্ধ্যায় ঘাটে যে নারীমূর্তিটি দেখেছিলেন রামকালী, সে মূর্তি তা হলে সারদার নয়, কাশীশ্বরীর নাত-বৌয়ের। আত্মহত্যার চেষ্টাই ছিল তার তখন।

এক বারের চেষ্টায় পারে নি, তাই দ্বিতীয় বার আবার! কিন্তু খটকা লাগছে একটা জায়গায়, বকাবকিটা তো তার পরবর্তী ঘটনা। তা ছাড়া সত্যবতী বর্ণিত 'কুল খাওয়া'র শব্দটা! যা শুনে এত চিন্তার মধ্যেও হাসি এসে গিয়েছিল তাঁর।

কাশীশ্বরীও ওই সন্দেহ ব্যক্ত করেছেন।

রামকালী চাটুয্যের বাড়িতে এমন একটা ঘটনাও ঘটা সম্ভব!

ভয়ানক একটা যন্ত্রণা অনুভব করলেন রামকালী। না, শঙ্করীর অপঘাত মৃত্যু ভেবে নয়, চাটুয্যে-বাড়ির সম্ভ্রম নষ্ট বলেও নয়, যন্ত্রণা বোধ করলেন নিজের ত্রুটির কথা ভেবে। আরও হুঁশিয়ার হওয়া উচিত ছিল তাঁর, আরও যথেষ্ট পরিমাণে সাবধান। একটা নিতান্ত তুচ্ছ মেয়েমানুষ যেন রামকালীর ক্ষমতার তুচ্ছতাকে ব্যঙ্গ করে গেল।

মেয়েটার এ ধৃষ্টতাকে ক্ষমা করা যাচ্ছে না।

হঠাৎ অনুভব করলেন সত্য পিছিয়ে পড়েছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখে থমকে গেলেন। সহসা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে নিঃশব্দে কান্না শুরু করেছে সত্যবতী।

রামকালীও পিছিয়ে এলেন। গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমার কাঁদবার দরকার নেই।"

"বাবা!" এবার আর নিঃশব্দে নয়, ডুকরে ওঠে সত্য, "সব দোষ আমার। কাটোয়ার বৌ তো রাতদিন বলত, 'মরণ হলে বাঁচি', আমি যদি তখন তোমাকে বলি তো একটা প্রিতিকার হয়। মনে করতাম অলীক কথা, রাজ্যি সুদ্দু মেয়েমানুষই তো রাতদিন 'মরণ-মরণ' করে—তেমনি। কাটোয়ার বৌ সত্যি ঘটিয়ে ছাড়ল! মা নেই বাপ নেই ভাই নেই, স্বামীপুত্তুর কেউ নেই মানুষটার, গালমন্দ খেয়ে খেয়ে বেঘোরে মরে গেল। তুমি আগে টের পেলে—"

কান্নাটা বড় বেশী উথলে উঠল সত্যর।

রামকালী কি হঠাৎ তড়িতাহত হয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন? নইলে মুখের চেহারা তাঁর হঠাৎ অত অদ্ভুত ভাবে বদলে গেল কি করে? যে ভ্রূকুটি নিয়ে একটা তুচ্ছ মেয়েমানুষের ধৃষ্টতার দিকে তাকিয়েছিলেন, সে ভ্রূকুটি মিলিয়ে গেল কেন? হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে কি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল তাঁর এতক্ষণকার চিন্তাধারা?

"কান্না থামাও" বলে আস্তে আস্তে চলে গেলেন তিনি বারবাড়ির দিকে। গিয়ে দাঁড়ালেন ভিয়েন-ঘরে, যেখানে কুঞ্জ তখন জলচৌকিটা ঘুরিয়ে নিয়ে দেওয়ালের দিকে মুখ করে বসে এক সরা গরম ছানাবড়া চাখছেন।

বললেন, "বড়দা, আমাকে একবার বেরোতে হবে, তুমি দেখো অতিথিদের যেন কোন অমর্যাদা না হয়।"

"আ—আমি!" মিষ্টি গলায় বেধে গেল কুঞ্জর।

"হ্যাঁ তুমি। নয় কেন? তুমি বড়!"

হ্যাঁ, বেরোবেন রামকালী। জেলেদের ঘরে গিয়ে বলতে হবে, পুকুরে আর একবার জাল ফেলানো দরকার। বাড়ীতে কাজ, সন্দেহ করার কিছু নেই। ভাববে মাছের কমতি পড়েছে।

তবে রামকালী যেন বুঝছেন, ওটা নিরর্থক। কাশীশ্বরীর নাতবৌ নিজে ডুবে মরেনি। সংসারটাকেই ডুবিয়েছে।

রামকালী কি তবে এবার নির্দেশের আশ্রয় খুঁজবেন? নিজের ওপর কি আস্থা হারিয়ে ফেলছেন? না হলে যে প্রাণীটাকে শুধু 'প্রাণীমাত্র' ভেবে তার উপর বিরক্ত হচ্ছিলেন, তার ধৃষ্টতার বহর দেখে তাকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন কেন? কেন ভাবছেন তারও কোনো প্রাপ্য পাওনা ছিল সংসারে। তাই রামকালী উপদেষ্টার দরকার অনুভব করছেন।

চোদ্দ

"ওরে বাবা-সকল, একটু চোট্‌প'য়ে চল, তাগাদা আছে।"

পালকি থেকে মুখ বাড়িয়ে আর একবার তাগাদা দিলেন রামকালী। মধ্যাহ্নের মধ্যে গিয়ে পেঁছিতে না পারলে বিদ্যারত্ন মশাইয়ের সঙ্গে দেখা হবে না। প্রাতঃসন্ধ্যা সেরে গঙ্গাস্নানে বেরিয়ে পড়েন বিদ্যারত্ন। যেটা বিদ্যারত্নের আবাসস্থান থেকে অন্ততঃ তিন ক্রোশ দূরে। যাতায়াতে এই ছ ক্রোশ পাড়ি দিয়ে নিত্যস্নানপর্ব সমাধা করে পুনরায় ঠাকুরঘরে ঢুকে পড়েন তিনি গৃহবিগ্রহের ভোগ দিতে। তৎপরে প্রসাদগ্রহণ, তার পর আবার সামান্য সময় বিশ্রাম, এই মধ্যবর্তী সময়টা কারও সঙ্গে দেখা করেন না বিদ্যারত্ন। কাজেই তাঁর কাছে যেতে হলে ওই গঙ্গাস্নান সেরে ফেরার মুহূর্তে, নয় অপরাহ্নে।

কিন্তু অপরাহ্ণ পর্যন্ত সময় কোথা রামকালীর—প্রয়োজন যে বড় জরুরী।

জীবনে যখনই কোনো সমস্যা সমাধানের জরুরী প্রয়োজন পড়ে, তখনই রামকালী বিদ্যারত্নের দরবারে এসে হাজির দেন।

অবশ্য সে রকম প্রয়োজন জীবনে দৈবাৎই এসেছে।

সেই একবার এসেছিল নিবারণ চৌধুরীর মায়ের গঙ্গাযাত্রার ব্যাপারে। তিরানব্বই বছরের বুড়ী সজ্ঞানে গঙ্গাযাত্রা করলেন, আর সে নির্দেশ রামকালীই দিয়েছিলেন। কিন্তু বুড়ী যেন রামকালীর বিদ্যা-বুদ্ধিকে পরিহাস করে পাঁচ দিন গঙ্গাতীরের হাওয়া খেয়ে ফের চাঙ্গা হয়ে উঠল। তারপর তার বায়না, 'আমায় তোরা বাড়ি নে চল।' শরীরে শক্তি আছে, বয়সে মন অবুঝ হয়ে গেছে। নিবারণ চৌধুরী রামকালীকে এসে ধরে পড়লেন, 'বলুন কি বিহিত ?'

সেই সময় চিন্তায় পড়েছিলেন রামকালী।

গঙ্গাযাত্রীর মড়া ফের ভিটেয় ফেরত নিয়ে গেলে সংসারের মহা অকল্যাণ, সদ্য ভিটেটায় তো তোলাই যাবে না তাকে। ঢেঁকিঘরে কি গোয়ালে বড় জোর রাখা যায়, কিন্তু নিবারণ চৌধুরীর মনোভাব দেখে মনে হয়েছিল, সেটুকুতেও তিনি নারাজ। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন তিনি, সংসারের এত বড় অকল্যাণ ঘটাতে বুক কাঁপছে। বার বার তাই কবরেজ মশাইয়ের কাছে বিধি-বিধান চেয়েছিলেন।

সেই সময় এসেছিলেন রামকালী বিদ্যারত্নের কাছে। এসে প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিদ্যারত্ন মশাই, বলুন শাস্ত্র বড়, না মাতৃমর্যাদা বড় ?'

আজ এসেছেন আর এক প্রশ্ন নিয়ে।

অবশ্য আপাততঃ প্রশ্ন তাড়াতাড়ি পেঁছিবার। একখানা গ্রাম পার হয়ে তবে দেবীপুর। বিদ্যারত্নের গ্রাম।

পাল্‌কি থেকে আর একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে বেহারাদের ফের তাগাদা দিতে গিয়ে থেমে গেলেন রামকালী, থাক, এত বিচলিত হবার দরকার নেই, পৌঁছে ওরা দেবেই ঠিক।

বিচলিত হওয়াকে ঘৃণা করেন রামকালী। তবু মনে মনে অস্বীকার করে লাভ নেই, আজ একটু বিচলিত হয়েছেন। কোথায় যেন হেরে গেছেন রামকালী, তারই একটা সূক্ষ্ম অপমানের জ্বালা মনকে বিঁধছে।

কিন্তু রামকালীর মধ্যে এই পরাজয়ের গ্লানি কেন? সংসারের একটা বুদ্ধিহীন মেয়ে যদি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে থাকেই, তাতে রামকালীর পরাজয় কেন?

ঘোড়ায় এলে এতক্ষণে পৌঁছে যেতেন, কিন্তু কোন বয়োজ্যেষ্ঠ বা গুরুস্থানীয়ের সামনা-সামনি সাধ্যপক্ষে ঘোড়ায় চড়েন না রামকালী। তাই পাল্‌কিতেই বেরিয়েছেন। বেরিয়ে এসেছেন একটু সঙ্গোপনেই। জেলেদের জাল ফেলার ব্যাপারটা সামান্য তদারক করেই। বাড়তি কিছু মাছ উঠল, উঠুক। খাদ্যবস্তু কখনো বাড়তি হয় না। ওরা এখন যে যেভাবে কাজ করছে করুক, রামকালীর অনুপস্থিতি টের না পেলেই মঙ্গল। টের পেলেই কাজে ঢিলে দেবে।

কারুর ওপর কি ভরসা করার জো আছে?

কাকা আছেন, সেজকাকা। কিন্তু তাঁকে কোন কাজকর্মের ভার দেওয়াও বিপদ। কারণ তাঁর মতে ডাকহাঁক চেঁচামেচি, এবং নির্বিচারে সকলকে ধমকাতে পারাই পুরুষের প্রধান গুণ। আর বয়েস হয়ে গেলেও পৌরুষের পরিমাণটা যে তাঁর এক তিলও কমেনি, সর্বদা সেটা প্রমাণ করতেও রীতিমত তৎপর সেজকাকা। তাই তাঁকে ডেকেডুকে কর্তৃত্বের ভার দেওয়া মানে বিপদ বাধানো।

আর কুঞ্জ?

কুঞ্জর কথা কি বলারই যোগ্য?

মিষ্টির ভিয়েনের কানাচে হাতে মুখে রসমাখা আর মুখভর্তি ছানাবড়া ঠাসা কুঞ্জর তৎকালীন চেহারাটা একবার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তখন, যখন দেখেছিলেন, মনটা বিরক্তিতে ভরে গিয়েছিল, এখন হঠাৎ একটা মমতা-মিশ্রিত অনুকম্পার ভাব মনে এল।

যে মানুষ লুকিয়ে-চুরিয়ে নিজের ছেলের বিয়ের ভোজের মিষ্টান্ন খেতে বসে, তার উপর অনুকম্পা ছাড়া হৃদয়ের আর কোন্‌ ভাববৃত্তি বিকশিত হবে?

এরা কি রাগেরই যোগ্য?

আশ্চর্য! রাসুটাও হচ্ছে ঠিক বাপের মতই অপদার্থ! ভবিষ্যৎটার দিকে তাকালে খুব একটা আশার আলো চোখে পড়ে না। কিন্তু তার জন্যে হতাশাও আনেন না রামকালী—আপন শক্তিতে বিশ্বাসী, আপন কেন্দ্রে অটুট অবিচল তিনি।

ওদের কথাকে চিন্তার জগতে ঠাঁই দেন না রামকালী, কিন্তু সত্যটা মাঝে মাঝে তাঁকে

ভাবিয়ে তোলে। শুধু যে সেই একটা ভয়ঙ্কর সরল মুখ থেকে উচ্চারিত ভয়ঙ্কর জটিল প্রশ্নগুলোই চিন্তিত করে তোলে রামকালীকে, তা নয়, চিন্তিত করে তোলে সত্যর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

সংসার কি সত্যবতীকে বুঝবে ?

পাল্‌কি থেকে নেমে পড়লেন রামকালী।

বিদ্যারত্নের মাটির কুটির থেকে একটু দূরে। সেটাই সভ্যতা, সেটাই গুরুজনের সম্ভ্রম রক্ষা। গুরুজনের চোখের সামনে গাড়ি পালকি থেকে নামা অবিনয়।

মাটির ঘর দালান দাওয়া, দাওয়ার নিচের উঠোনে আঁকা-ছবির মত বেড়া ঘেরা ছোট্ট ফুলবাগানটি। বিদ্যারত্নের নিজের হাতের বাগান, নিজের হাতের দেওয়া বেড়া। টগর দোপাটি গাঁদা বেল মল্লিকা রক্তজবা করবী সন্ধ্যামণি, নানান গাছ, সারা বছরই ফুলের সমারোহ। এছাড়া বেড়ার ধারে ধারে আছে তুলসীর কেয়ারি। গঙ্গাস্নানের পর পূজোর আগে একবার গাছগাছালিগুলির তদারক করে যাওয়ার অভ্যাস বিদ্যারত্নের। পায়ে খড়ম, পরনে নিজের হাতেকাটা সুতোর ধুতি ও উত্তরীয়,—পিতলের ঝারায় জল নিয়ে গাছের গোড়ায় গোড়ায় ঢালছিলেন বিদ্যারত্ন, রৌদ্রে রামকালীর ছায়া পড়তেই মুখ তুলে তাকালেন।

হৈ হৈ করে সম্ভাষণ করে উঠলেন না বিদ্যারত্ন। হঠাৎ আবির্ভাবের জন্য বিস্ময় প্রকাশও করলেন না, শুধু রামকালীর প্রণাম শেষ হলে, তাঁর মাথায় হাত রেখে বললেন, "এস, দীর্ঘায়ু হও।"

শান্ত সৌম্য মুখ, শ্যামবর্ণ ছোটখাটো চেহারা, মাথার চুলগুলি ধবধবে পাকা, কিন্তু দৃঢ়নিবদ্ধ মুখের চামড়ায় বলিরেখার আভাস মাত্র নেই। সহজে বিশ্বাস করা শক্ত---বিদ্যারত্ন মশাইয়ের বয়স আশী ছোঁয় ছোঁয়। চকচকে সাজানো দাঁতের পাটির শুভ্র হাসিটুকুও বিশ্বাস করতে প্রতিবন্ধকতা করে।

দাওয়ার উপর খান দুই-তিন জলচৌকি, কাছেই পৈঠেয় ঘটিতে জল। পা ধুয়ে দাওয়ায় উঠে জলচৌকিতে বসলেন রামকালী, বিনীত হাস্যে বললেন, "আপনার তো আহ্নিকের বেলা হল ?"

"তা হল।" বিদ্যারত্ন প্রশ্রয়ের হাসি হাসলেন, "বলবে কিছু— যদি বলবার থাকে।"

বলবার কিছু আছেই, নচেৎ এমন অসময়ে ব্যস্ত হয়ে আসবার কারণ কি ?

রামকালী আর গৌরচন্দ্রিকা করলেন না, মুখ তুলে পরিষ্কার কণ্ঠে বললেন, "পণ্ডিতমশাই, আজ আবার এক প্রশ্ন নিয়ে আপনার দরবারে এসে দাঁড়িয়েছি। বলুন মানুষ বড়, না বংশমর্যাদার অহঙ্কার বড় ?"

ঠিক এই একই সময় একটা ছোট মেয়ে ওই একই ধরনের প্রশ্ন করছিল, অন্য কাউকে

নয়, নিজের মনকেই। 'আচ্ছা এও বলব, মানুষ বড় না তোমাদের রাগটাই বড়?'

কী আশ্চয্যি, কী আশ্চয্যি! জলজ্যান্ত একটা মানুষ হারিয়ে গেল, তবু গিন্নীরা কিনা সত্যর ওপর চোখ রাঙাচ্ছেন, 'খবরদার, দুটি ঠোঁট এক করবি না, কারুর যদি কানে যায় তো তোদের সব কটার হাড়মাস দু ঠাঁই করব।'

বেশ বাবা, তোমাদের জেদই থাক, রাগ নিয়ে ধুয়ে ধুয়ে জল খাও তোমরা।

ওদিকে বিদ্যারত্ন রামকালীকে বলছিলেন, "কালের সমুদ্রে একটা মানুষের জীবনমরণ, সুখদুঃখ কিছুই নয় রামকালী, সমুদ্রে বুদ্বুদ মাত্র। কুলত্যাগিনী বধূকে সন্ধান করবার প্রয়োজন নেই।"

"কিন্তু সমাজকেও তো একটা জবাব দিতে হবে?"

"যা সত্য তা বলবে সাহসের সঙ্গে। সত্যকে স্পষ্ট করে বলতে পারা চাই। সেটাই ধর্ম। সেই বিপথগামিনীকে তুমি তো আর ঘরে নিচ্ছ না? ভেবে নাও তার মৃত্যু হয়েছে।"

"কিন্তু পণ্ডিতমশাই, এ আমি ভাবতেই পারছি না – আমার ঘরের কথা নিয়ে অপরে আলোচনা করবে।"

"রামকালী, তোমার দেহে একটা দুষ্ট রোগ হওয়া অসম্ভব নয়, তা যদি হয় কি করবে তুমি? বিধাতার বিধান মেনে নিতেই হবে। তা ছাড়া হয়তো এ রকম একটা কিছুর প্রয়োজনও ছিল। হয়তো তোমার ভিতর কোনখানে একটু অহমিকা এসেছিল,—"

"অহমিকা! পণ্ডিতমশাই, 'আমি'র প্রতি মর্যাদাবোধ থাকাটা কি ভুল? অন্যায়?"

"এই একটা জায়গা বড় গোলমেলে রামকালী, আত্মমর্যাদা-বোধ আর অহমিকা বোধ, এ দুটোর চেহারা যমজ ভাইয়েব মত, প্রায় এক, সূক্ষ্ম আত্ম-বিচারের দ্বারা এদের তফাত বোঝা যায়। তা ছাড়া তুমি ব্রাহ্মণ! রজোগুণ তোমার জন্য নয়। কিন্তু আজ তোমার চিত্ত চঞ্চল, তা ছাড়া তুমি এখন বিশেষ ব্যস্তও, কাজেই আজ এসব আলোচনা থাক।"

রামকালী কয়েক মুহূর্ত মাথা নিচু করে ভূমিসংলগ্ন দৃষ্টিতে কি যেন ভাবলেন, তারপর সহসা মাথা তুলে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেন, "আচ্ছা, আপনার নির্দেশই শিরোধার্য করলাম।"

আর একবার বিদ্যারত্নের পদধূলি নিয়ে বেরিয়ে এসে পাল্কিতে চড়লেন রামকালী। ফেরার মুখে আর বেহারাদের তাড়া দেবার কথা মনে এল না। বিদ্যারত্নের একটা কথা তাঁকে বিশেষ ধাক্কা দিয়েছে। বিদ্যারত্ন বললেন, "তুমি ব্রাহ্মণ, রজোগুণ তোমার জন্য নয়।"

কিন্তু তাই কি সত্য?

ব্রাহ্মণের মধ্যে তেজ থাকবে না? থাকবে কেবলমাত্র রজোগুণ-শূন্য স্তিমিত শান্তি?

ফিরে দেখলেন বাড়ি লোকে লোকারণ্য। নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সকলেই এসে গেছে। রান্নাও প্রস্তুত। শুধু রামকালীর অনুপস্থিতিতে ভোজে বসিয়ে দেবার ব্যবস্থাটা ঠিকমত

হচ্ছে না, সকলে মিলে শুধু গুলতানি চলছে।

এই চনচনে সময়ে দূর থেকে পরিচিত পাল্‌কি বেহারাদের 'হুম্ হুম্' আওয়াজ কানে এল। আশায় অধীর হয়ে উঠল সবাই—'এসে গেছেন, এসে গেছেন' রবে গম্ গম্ করে উঠল জনতা। সকলেই অবশ্য ধরে নিয়েছিল আচমকা কোনও রোগীর মরণ-বাঁচন সংবাদ পেয়ে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে যেতে হয়েছে রামকালীকে। কুঞ্জও সেই কথাই বলে রেখেছিলেন।

অন্দরমহলে মেয়েদের মধ্যে শঙ্করী সম্পর্কে কানাঘুষো শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বার-মহল সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

রামকালী এসে দাড়াতেই বয়োজ্যেষ্ঠ অতিথি অভ্যাগতের দল হৈ হৈ করে এগিয়ে এলেন, "ব্যায়রামটা কার রামকালী? কোন্ গাঁয়ে? কে যেন দেবীপুরের দিকে পালকি যেতে দেখল, ওইখানেই কারও—"

"না, কারও ব্যায়রাম শুনে আমি যাই নি—" রামকালী এবার লোকভর্তি আটচালার সমস্তটায় চোখ বুলিয়ে নিলেন, তার পর একটু থেমে বললেন, "আমি বেরিয়েছিলাম অন্য প্রয়োজনে, সে প্রয়োজনের কথা আপনাদের সকলকেই জানাব। যদিও আপনারা এখনও অভুক্ত ও ক্ষুধার্ত, আমার কথা শুনে ঠিক কি মনোভাব আপনাদের হবে তাও সম্পূর্ণ বুঝতে পারছি না, তবু আহারাদির পূর্বেই কথাটি ব্যক্ত করা উচিত মনে করছি আমি। বলতে আপনারা সকলে অনুমতি করুন আমাকে।"

নিঃশব্দ জনতার মাঝখানে রামকালীর ভরাট ভারী কণ্ঠস্বর গম্ গম্ করে উঠল, অনেকেরই বুক কেঁপে উঠল একটা অজানা আশঙ্কায়।

কুঞ্জ হঠাৎ পিছন দিকে হটে গিয়ে ধুলোর উপর বসে পড়লেন, রাসু ভিড়ের একেবারে পিছনেই ছিল, সে হাঁ করে তাকিয়ে রইল কাকার আরক্ত গৌর মুখের দিকে। সমাগতেরা অনুধাবন করতে পারছেন না ব্যাপারটা কি' আহার্য বস্তুতে কি কোনও অনাচার স্পর্শ ঘটেছে? কিন্তু তাই বা কি করে বলা যায়? রামকালীর আচমকা বেরিয়ে যাওয়ার প্রশ্নটাও যে রয়েছে।

তবে কি সহসা রামকালীদের কোন জ্ঞাতির মৃত্যু ঘটেছে? এই বিরাট ভোজের রান্না সব অশৌচান্ন হয়ে গেছে? সেই সংবাদ পেয়েই রামকালী···! রামকালী কি এমন অর্বাচীন যে এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তে সেই তথ্য এসে প্রকাশ করবেন? মৃত্যুসংবাদ কানে না শুনলে তো অশৌচ হয় না, উনি নিজে গা ঢাকা দিয়ে বেড়ালে তো আর এখানের অন্নগুলো অশৌচান্ন হয়ে যেত না? বলে এমন ক্ষেত্রে ঘরের মড়া কাঁথা চাপা দিয়ে রেখে, লোকে দিন উদ্ধার করে নেয়।

তবে?

রামকালী যে তাঁর বক্তব্য জ্ঞাপন করতে অনুমতি চেয়েছিলেন, একথা কারও মনে ছিল না, ফের চেয়ে সে কথা মনে করিয়ে দিলেন রামকালী।

"তা হলে আপনারা আমায় অনুমতি দিচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্য অবশ্য ! তোমার যা বলবার আছে বল ।"

"তা হলে শুনুন, গতরাত্রে আমার পরিবারভুক্ত একটি বিধবা বধূ গৃহত্যাগ করেছে—"

"অ্যাঁ ! অ্যাঁ ! অ্যাঁ !"

সহসা ভয়ঙ্কর একটা ঝড উঠল। কালবৈশাখীর দুমদাম এলোমেলো ঝড় নয়, যেন একটা বুনো অরণ্যের চাপা শ্বাস গোঁ গোঁ করে উঠল। সেই শ্বাস শুধু সমবেত কণ্ঠের ওই আহত বিস্ময়ের প্রচণ্ড ধ্বনি।

রামকালী কি এই বজ্রটাকেই প্রস্তুত করেছিলেন এতক্ষণ ধরে, তাঁর অভুক্ত ক্ষুধার্ত নিমন্ত্রিত অতিথিদের জন্যে ?

তুমুল ঝড়ের ধ্বনিতে রামকালীর কথার শেষ অংশ চাপা পড়ে গিয়েছিল, আর একবার সে স্বর গম্ গম্ করে উঠল চাপা মেঘমন্দ্রের মত।

"এখন আপনারা স্থির করুন এই অপরাধে আমাকে ত্যাগ করবেন কিনা।"

যেন বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন রামকালী, এমনি ধীর-স্থির সমুন্নত সেই মূর্তি।

এঁকে ত্যাগ !

সম্ভব ?

কিন্তু তাও হওয়া সম্ভব বৈকি ! সমাজ বলে কথা।

নিবারণ চৌধুরীর মামা বেঁটে-খাটো বিপিন লাহিড়ী একটা জলচৌকি টেনে এনে তার উপর দাঁড়িয়ে উঠে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "ত্যাগ করাকরির কথা নয়, ভবিষ্যতে যা বিচার তা' হবে কিন্তু বর্তমানে আজ তো আর আমাদের এখানে খাওয়া হয় না রামকালী।"

রামকালী দুই হাত জোড় করে শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন, "আমি কাউকে অনুরোধের দ্বারা পীড়ন করতে চাই না, তবে এইটুকুই শুধু জানাচ্ছি, আমি সেই মতিভ্রষ্টা মেয়েকে মৃত বলেই গণ্য করব। মানুষের সমাজ থেকে তার মৃত্যু হয়েছে। আহারের পূর্বে এই কথাটি নিবেদন করতে যারপরনাই দুঃখ বোধ করেছি আমি, কিন্তু আমার বিবেকের কাছে এটাই কর্তব্য বলে মনে হল আমার।"

বিপিন লাহিড়ী মনে মনে মুখ ভেঙচান্, আগে বলাই কর্তব্য ভাবলাম ! ওরে আমার যুধিষ্ঠির ! এই যজ্ঞির খাওয়াটা পণ্ড করলি। ভাল হবে, তোর ভাল হবে ?

চোখে জল এসে যাচ্ছিল বিপিন লাহিড়ীর। তবু কথা বলেন তিনি, "আমার মনে হয়, খবরটা তোমার এখন গোপন রাখাই উচিত ছিল রামকালী !"

"সে কথা আমি ভেবেছিলাম।" রামকালী আবার একবার সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'কিন্তু পরে মনকে ঠিক করে নিলাম। আমার এত বড় কলঙ্ক সত্ত্বেও যদি আপনারা আমাকে ত্যাগ না করেন, তা হলে পরম ভাগ্য বলে মানব। আর যদি তা করেন, সে শাস্তি মাথা পেতে নেব।'

এবার আর ঝড় নয়, গুঞ্জনধ্বনি।

সে ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠল। "তা এতে তোমার আর কলঙ্ক কি?"

'আছে বৈ কি! আমার অন্তঃপুর উচিত মত রক্ষা করবার অক্ষমতাই আমার কলঙ্ক। আমার অপরাধ। মার্জনা আমি চাইব না, এ অপরাধের মার্জনা নেই, শুধু আমার প্রতি আপনাদের স্নেহ-ভালবাসার কাছে হাত জোড় করে প্রার্থনা করছি, আপনারা পরে আমার প্রতি যে শাস্তির আদেশ দেন মাথা পেতে নেব, শুধু আজ আপনারা দয়া করে আহার করুন।'

আর একবার ঝড় উঠল।

অসন্তোষের? না উল্লাসের?

বোধকরি বা উল্লাসেরই, তবে জলচৌকির উপর দাঁড়িয়ে থাকা বেঁটেখাটো বিপিন লাহিড়ীর গলাটাই শুধু শোনা গেল, 'আচ্ছা, আজকের মত তোমার অনুরোধ রক্ষা করাই আমরা স্থির করছি।'

রামকালী ধীরে ধীরে সরে গেলেন। মাথা সোজা করেই।

পনেরো

সকালবেলা নেড়ুকে হাতের লেখা মকশ করতে হয়। পূবের উঠোনের রোদ যতক্ষণ না পেয়ারাতলার ঠিক নিচেটায় এসে পড়বে ততক্ষণ পর্যন্ত নেড়ুকে সেই দুরূহ কর্তব্য করেই চলতে হবে, এই নির্দেশ আছে তার উপর। ঋতুভেদে সীমানার কিছু ভেদ হয়, আপাততঃ ওই পেয়ারাতলা।

অবশ্য তার প্রতি আরও একটা নির্দেশ আছে।

সেটা হচ্ছে তালপাতার গোছাগুলি ও দোয়াত-কলম নিয়ে বসার সময়, এবং 'মকশ'র পর, সেগুলি তুলে রাখার সময় ভক্তিভরে মা সরস্বতীকে প্রণাম করা। প্রণাম মন্ত্রের সঙ্গে প্রার্থনা মন্ত্রও যুক্ত করা আছে।

দেবীর প্রসন্নতা লাভের উপায় স্বরূপ বিদ্যা অনুশীলনের চাইতে স্তবস্তুতি প্রণাম প্রার্থনার উপরই নেড়ুর আস্থা বেশী। কাজেই 'শব্দবোধে'র পাতা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি মুড়ে ফেলে, নিঃশব্দ স্তুতিতেই সময় বেশী যায় তার। চোখটা বুজে রেখেও তেরছা কটাক্ষের কৌশলে পেয়ারাতলার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে পরম ভক্তিভরে মন্ত্রোচ্চারণ করছিল সে পাততাড়িটি কপালে ঠেকিয়ে—

> ত্বং ত্বং দেবী শুভ্রবর্ণে,
> রত্নশোভিত কুণ্ডলকর্ণে।
> কণ্ঠে লম্বিত গজমোতি হারে,
> দেবী সরস্বতী বর দাও আমারে।

লাগ্, লাগ্, বাণী কণ্ঠে লাগ্,
যাবজ্জীবন তাবৎ থাক্।
দুষ্ট সরস্বতী দূরে যাক্।
আমি থাকি গুরুর বশে,
ত্রিভুবন পূরিত আমার যশে।

দেবী স্তবের কালে কিন্তু নেড়ু ভাবছিল দেবের কথা। সূর্যদেব।

আশ্চর্য! নিষ্ঠুর সূর্যদেবকে এত আন্তরিকভাবে মাতুল সম্বোধন করেও ভাগ্নের প্রতি তাঁর মমতার কোনও প্রকাশ দেখতে পায় না নেড়ু। পেয়ারাতলার নিচেটায় আসার যেন কোনও গরজই নেই তাঁর। অথচ তিনি সামান্য একটু কৃপাদৃষ্টিপাত করলেই, করা মাত্রই, নেড়ুর আজকের মত যন্ত্রণা শেষ হয়। বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একই স্তবস্তুতি কতক্ষণ ধরেই বা করা যায়?

তবু কপাল থেকে কলম তালপাতা নড়ায় না নেড়ু, ঠেকিয়েই থাকে, এইমাত্র ঠেকানোর ভঙ্গীতে।

"খুব যে বিদ্যে হচ্ছে। আহা মরে যাই, ছেলের কী ভক্তি রে!"

সত্যবতীর শানানো গলা বেজে ওঠে।

বুকটা কেঁপে ওঠে নেড়ুর।

উঃ, যা মেয়ে ও! আর যা জেরা! তথাপি বাইরের প্রকাশে সত্যকে কোন স্বীকৃতি দেয় না নেড়ু, একই ভাবে চোখ বুজে বিড়বিড় করতে থাকে।

সত্যবতী হি-হি করে হেসে ওকে একটা ঠেলা দিয়ে বলে, "এখন যে বড় চোখ বোজা হচ্ছে? এতক্ষণ কি করছিলি? হুঁঃ বাবা, খালি চোখ পিটপিট আর পেয়ারাতলার দিকে তাকানি!"

"আঃ সত্য!" নেড়ু এবার পাতা কলম কপাল থেকে নামিয়ে সযত্নে জলচৌকির উপর স্থাপিত ক'রে বিরক্তি-ব্যঞ্জক গম্ভীর স্বরে বলে, "নমস্কারের সময় গোলমাল করছিস কেন?"

"নমস্কার তো তুই সকাল থেকেই করছিস। এক পোর বেলা হয়ে গেল। সেই এস্তক নমস্কারই হচ্ছে! দেখি নি যেন!"

"ইঃ, দেখেছিস তুই!" নেড়ু উঠোনের দিকে তাকিয়ে দেখে। মনে হচ্ছে যেন মাতুল সূর্যদেব এতক্ষণে সদয় হয়েছেন, পেয়ারাতলার ঠিক নিচেটাতে কৃপা-কটাক্ষ করছেন। অতএব বুকের বল বাড়ে তার। দৃপ্তকণ্ঠে বলে, "কত মক্‌শ করলাম তখন থেকে।"

"কই দেখি কত!" বলেই সত্য একটা কাজ করে বসে। হাতটা একবার মাথায় মুছে নিয়ে চট করে মা সরস্বতীর উদ্দেশে একটা প্রণাম নিবেদন করে নেড়ুর এই মাত্র রক্ষিত তালপাতার গোছায় এক টান মারে।

"অ্যাই অ্যাই, ও কী হচ্ছে?" শিহরিত নেড়ু ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের সুরে বলে ওঠে,

"সত্য! তুই তালপাতায় হাত দিলি?"

"দিলাম তা কি!" নির্ভীক স্বর সত্যর, "আমি তো মা সরস্বতীকে পেন্নাম করে হাত দিয়েছি।'

"পেন্নাম করলেই সব হল? তুই না মেয়েমানুষ?' মেয়েমানুষের তালপাতায় হাত ঠেকালে কি হয় জানিস না?"

সত্য ইতিমধ্যে নেড়ুর সারা সকালের 'শ্রমফল' নিরীক্ষণ শুরু করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য একখানি মাত্র পাতা কালি-কলঙ্কিত, বাকী সবগুলিই নিষ্কলুষ। কাজেই আর একবার তার 'হি-হি'র পালা।

"খুব যে বলছিলি অনেক মক্‌শ করেছিস? কই কোথায়? দোয়াতে বুঝি কালির বদলী জল ভরেছিস? তাই চোখে ঠাহর হচ্ছে না?"

সত্যর বিদ্রূপের ভঙ্গী বড় তীক্ষ্ণ, কারণ উক্ত মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে চোখের তারা পাতার যতটা সম্ভব কাছে নিয়ে এসেছে সে, মুখে কৌতুকের আলোর ঝলমলানি।

এতটা সহ্য করা শক্ত।

নেড়ু এক হ্যাচ্‌কায় নিজ সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "বেশ থাক্। আমার বিদ্যে না হোক তোর কি? নিজের কি হয় দেখ। বলে দিচ্ছি গিয়ে সবাইকে, তালপাতে হাত দিয়েছিস তুই।"

আর কেউ হলে 'সবাইকে বলে দেওয়ার' ভীতি প্রদর্শনেই কাবু হয়ে পড়ে, এবং আপসের সুরে "আচ্ছা আচ্ছা, বেশ ভাই দেখলাম!" ইত্যাদি অভিমানসূচক বাণী উচ্চারণ করে শত্রুপক্ষের মন নরম করে আনে। কিন্তু সত্যর মনোভাব সর্বদাই আপসবিহীন। তাই ভিতরে যাই হোক, বাইরে বিন্দুমাত্র বিচলিত ভাব দেখায় না সে, সমান জোরের সঙ্গে বলে, "বলে দিবি তো দিবি, সবাই আমার কি করবে শুনি? শূলে দেবে?"

"দেয় কি না দেখিস! চালাকি নয়।"

"কেন, মেয়েমানুষ তালপাতে হাত দিলে কি হয়? কলকেতায় তো কত মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে।"

"তোকে বলেছে করে! পড়লে চোখ কানা হয়ে যায় তা জানিস?"

"কক্ষনো না, মিছে কথা! বড্ডই তুই জানিস! যারা পড়েছে তারা সব অমনি কানা হয়ে যাচ্ছে! হুঁঃ।"

কলকেতা নামক অ-দৃষ্ট সেই দেশটায়, কদাচ কখনও যেখানের নাম কানে আসে, সেখানে সত্যিই কোনও মেয়েমানুষ লেখাপড়া করে কি না, এবং করলে তাদের চক্ষুযুগলকে দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন রাখতে পারে কি না, এ সম্পর্কে নেড়ুর স্পষ্ট কিছু জানা নেই, তবু নিজের

অভিমতকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করে সে, "এখন না যাক - আসছে জন্মে যাবে। অমনি না!"

"আসছে জন্মে! হি-হি-হি! তাদের আসছে জন্মটা তুই দেখে এসেছিস বুঝি? আমি এই তোকে বলে দিচ্ছি নেড়ু, ওসব কিছু হয় না। বিদ্যে তো ভাল কাজ, করলে কখনও পাপ হতে পারে?"

লেখাপড়ার ব্যাপারে বুদ্ধি না খুললেও কূটতর্কের ব্যাপারে নেড়ু ওস্তাদ, তাই সে অকাট্য একটি যুক্তি প্রয়োগ করে, "নারায়ণ পূজোও তো ভাল কাজ, করে মেয়েমানুষরা? ছুঁতেই তো পায় না। ভগবান বলে দিয়েছে ভাল কাজগুলো বেটাছেলেরা করবে, খারাপ কাজগুলো মেয়েমানুষেরা করবে, বুঝলি?"

"হ্যাঁ বলেছে ভগবান তোর কান ধরে!" ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সত্য, "ভগবান কখনো অমন একচোখো নয়। ওসব বেটাছেলেরাই ছিষ্টি করেছে।"

বচসার শব্দ খুব মৃদু হচ্ছিল না, শব্দে আকৃষ্ট হয়ে পুণ্যি এসে দাঁড়ায় এবং সকৌতুহলে প্রশ্ন করে, "কি ছিষ্টি করেছে রে বেটাছেলেরা?"

সত্য মুহূর্তে অনুত্তেজিত ভাব পরিগ্রহ করে বলে, "কিছু না, শাস্তরের কথা হচ্ছে।"

শাস্তর!

পুণ্যি হালে পানি পায় না।

সহসা এখানে শাস্ত্রালোচনা শুরু হল কী বাবদ, সেটা অনুধাবন করতে চেষ্টা করে। ইত্যবসরে নেড়ু সেই 'বলে দেওয়া'র সুরে বলে ওঠে, "সত্যর সাহসখানা শুনবি পুণ্যিপিসী? তালপাতে হাত দিয়েছে, আবার বলছে 'দিয়েছি তো হয়েছে কি'।"

তালপাতে হাত!

এটা আবার আর এক আকস্মিকতা। তালপাতটা কি জাতীয় সহসা সেটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না পুণ্যবতী।

"তালপাত কি রে?" প্রশ্ন করে সে সত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে, আর তাকে 'হাঁ' করে দিয়ে সত্য হেসে উঠে দেওয়ালে পোঁতা পেরেকে গোঁজা একখানা তালপাতার হাত-পাখা পেড়ে নিয়ে বলে ওঠে, "এই যে এই। দেখ, এখন হাতে পোকা পড়ল কি না আমার!"

"সত্য!"

নেড়ু চোখ পাকিয়ে বলে, "মা সরস্বতীকে নিয়ে তামাসা করছিস তুই?"

প্রত্যেক সময় প্রত্যেক ব্যাপারেই সত্য জিতে যায়, নেড়ু হারে। নেড়ুর মজ্জায় অবস্থিত পৌরুষবোধ এতে যথেষ্টই আহত হয়, আজ সহসা সত্যকে শাসন করবার একটা ছুতো পেয়ে নেড়ুর আর উল্লাসের সীমা নেই। তাই সহসা-করতলগত সেই শক্তিটাকে অবহেলায় বাজে খরচ করে ফেলতে পারছে না, রীতিমত করে ভাঙিয়ে খেতে চাইছে,

চেখে চেখে।

এবার আর হাসে না সত্য, বিরক্তি প্রকাশ করে, সেই ওর অভ্যস্ত ভঙ্গীতে জোড়াভুরু কুঁচকে, "হাঁদার মতন কথা কস নে নেড়ু! তামাশা আমি মা সরস্বতীকে করছি না, করছি তোকে। তালপাতে একটু হাত দিয়েছি তো কী কাণ্ডই করছিস! যেন সগ্‌গো মত্য রসাতলে গেছে। শুধু হাত দেওয়া কেন, আমি তো লিখতেও পারি।"

"লিখতেও পারিস!"

যুগপৎ নারী পুরুষ দুই কণ্ঠে উচ্চারিত হয় এই সর্পাহত-কণ্ঠবৎ শব্দ। আড়ষ্ট হয়ে গেছে পুণ্যি আর নেড়ু।

কিন্তু নিষ্ঠুর সত্য ওদের ওই আঘাতপ্রাপ্ত চিত্তেই আরও আঘাত হেনে বসে, "পারিই তো, এই দেখ।"

ঝপ করে আলোচ্য তালপত্রখণ্ডের একখানা টেনে নিয়ে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে পরিপাটি করে লিখে ফেলে সত্য, "কর খল ঘট।" লিখে অদৃশ্যের উদ্দেশে আর একটা প্রণাম ঠুকে বলে, "আরও কত লিখতে পারি।"

বিস্ময়ের ঘোর কাটতে কিছুক্ষণ লাগে। পুণ্যির চাইতে নেড়ুই বেশী বিস্ময়াহত। যে দুরূহ কর্মের চেষ্টায় তার ঘাম ছুটে যায়, এত অনায়াসলীলায় সেটা করে ফেলে সত্য!

তা ছাড়া কেমন করে?

মা সরস্বতী কি সহসা ওর উপর ভর করেছেন? যেমন না কি শুনতে পাওয়া যায় কবি কালিদাসের উপর করেছিলেন!

লেখা শব্দ ক'টির উপর চোখ রেখে ঝিম্ হয়ে তাকিয়ে থাকে নেড়ু। আর পুণ্যি স্পর্শ বাঁচিয়ে তালপাতখানার উপর ঝুঁকে পড়ে বিস্ফারিত নেত্রে বলে, "কোথ্‌থেকে শিখ্‌লি রে সত্য? কে শেখালে?"

"শেখাতে আবার কার দায় পড়েছে, আমি নিজে নিজেই শিখেছি। দেখে দেখে!"

"নিজে নিজেই শিখেছিস? দেখে দেখে?"

"না তো কি?"

"দো'ত কলম পেলি কোথা?"

"দো'ত কলম কে দিচ্ছে!" সত্য ঝোঁকের মাথায় তার গোপন কথাটি প্রকাশ করে বসে, "বটপাতার ঠুলি গড়ে, তার মধ্যে পুঁইমেটুলির রস গুলে কালির মতন করি।"

তাজ্জব বনে যাওয়া দুটি প্রাণী ক্ষীণকণ্ঠে বলে, "আর পাত কলম?"

"তোরা আর 'হাঁ'-করা কথা কস নে বাপু! পৃথিবীর তালগাছ কি কেউ সিঁদুকে বন্ধ করে রেখেছে, না আকিঞ্চন করে খুঁজলে একটা শরকাঠি মেলে না?"

গিন্নীর মতন মুখ করে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে সত্য।

এতক্ষণে বুঝি হদিশ পায় পুণ্যি। তা সেও গিন্নীদের মত গালে হাত দিয়ে বলে, "তাহলে

তুই লুকিয়ে লুকিয়ে মক্‌শ করিস ? উঃ ধন্যি বাবা ! কাউকে টেরটি পেতে দিস না। কখন হাত পাকাস ?"

সত্য রহস্যের হাসিতে মুখ রঞ্জিত করে বলে, "যখন তোরা থাকিস না।"

"কিন্তু সত্য !" পুণ্যি চিন্তিত স্বরে বলে, "খেয়াল করে তো করছিস, দেখে আহ্লাদও হচ্ছে, কিন্তু হাজার হোক মেয়েমানুষ, এতে তোর পাপ হবে না ?"

"কেন, পাপ হবে কেন ?" সত্য সহসা উদ্দীপ্ত তেজের সঙ্গে বলে ওঠে, "মেয়েমানুষরা যে রাতদিন ঝগড়া কোঁদল করছে, যাকে তাকে গালমন্দ শাপমন্যি করছে, তাতে পাপ হয় না, আর বিদ্যে শিখলে পাপ হবে ? বলি স্বয়ং মা সরস্বতী নিজে মেয়েমানুষ নয় ? সকল শাস্তরের সার শাস্তর চার বেদ মা সরস্বতীর হাতে থাকে না ?"

নেড়ুর আর বাক্যস্ফূর্তি নেই।

এত বড় অকাট্য যুক্তির সামনে পড়ে গিয়ে যেন বিরাট একটা দৃষ্টির দরজা খুলে যায় তার চোখের সামনে।

সত্যিই তো বটে, মা সরস্বতীটি স্বয়ং নিজেই তো মেয়েমানুষ।

এত বড় স্পষ্ট সত্য কি করে এত দিন তার দৃষ্টির বাইরে ছিল ? আর এই সত্যবতীটাই বা কেমন করে উদ্‌ঘাটন করে ফেলেছে সেই সবাইয়ের ভুলে থাকা, অথচ পরম স্পষ্ট কথাটাকে !

"নে, পুণ্যি ঘাটে যাই চ !"

আলোচনায় ইতি টেনে দিয়ে উঠে পড়ে সত্যবতী, "আর দেরি করলে গিন্নীরা ভাত গেলবার জন্যে হাঁক পাড়বে, ভাল করে চানই হবে না।"

কথাটা মিথ্যা নয়, জলে পড়লে সহজে আশ মিটতে চায় না এদের। সাঁতার দিতে দিতে হাঁপিয়ে না পড়া পর্যন্ত 'ভাল করে চান' হয় না।

"চ" বলে উঠে পড়ে পুণ্যি, কিন্তু নেড়ুর সঙ্গে চোখে চোখে একটা ইশারা হয়ে যায় তার।

কিন্তু না, অসদভিপ্রায় ছিল না তাদের, 'বলে দেওয়া'র মনোভাবও ছিল না আর। সত্যর গুণপনা সমাজে প্রকাশ করে সকলকে চমৎকৃত করে দেওয়াই উদ্দেশ্য ছিল।

সত্য যে তাদেরই একজন।

সত্যর মহিমায় তো তাদেরই মহিমা !

কিন্তু সদভিপ্রায়ের ফল কি সব সময় সুস্বাদু হয় ?

হয় না।

হয় না, সেইটাই আর একবার প্রমাণিত হয়ে গেল নেড়ুর সত্যোদ্‌ঘাটনে।

হুলস্থুল পড়ে গেল অন্দর-বাড়িতে।

প্রচ্ছন্ন বইতে লাগল রামকালীর মেয়েকে আশকারা দেওয়ার সমালোচনা, আর প্রত্যক্ষে

ছিছিক্কার পড়তে লাগল সতার বুকের পাটার।

ও কি ভেবেছে শ্বশুরঘর করতে হবে না ওকে ?

"করতে হবেও না", শিবজায়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলেন, "শ্বশুররা টের পেলে উদ্দিশে হাতজোড় করে ত্যাগ করবে ও বৌকে।"

মোক্ষদা বলেন, "হারামজাদী যখনই জটার নামে ছড়া বেঁধেছিল, তখনই সন্দ হয়েছিল আমার। এখন বুঝছি।"

রাসুর মা কোন দিনই কোন কথায় বড থাকে না, কাজের পাহাড নিয়েই কাটায় সারা দিন, কিন্তু আজকের এই অপরাধের আবিষ্কর্তা না কি স্বয়ং তারই পুত্ররত্ন, তাই বোধ করি কিছুটা দাবি অনুভব করে কথা বলার।

আস্তে আস্তে বলে, "একে তো ঘরের একটা বৌ যা নয় তাই কেলেঙ্কারি করে গালে-মুখে চুনকালি দিয়ে, জন্মের শোধ লোকের কাছে হেয় করে রেখে গেল, আবার ঘরের মেয়েরাও যদি যা ইচ্ছে তাই করতে থাকে—"

কথা শেষ করে না রাসুর মা, শুধু দুটো পাতকই যে একই গাহংতের পর্যায়ে পড়ে সেইটুকুরই ইশারা দেয়।

কাঠ হয়ে তাকিয়ে থাকে ভুবনেশ্বরী।

শুধু কাশীশ্বরীই নীরব। তাঁর আর মুখ নেই।

সমালোচনার উদ্দামতা কিছুটা স্তিমিত হলে দীনতারিণী প্রায় মিনতির ভঙ্গীতে বলেন, "যাক গে বাবা, ওই নিয়ে আর বেশী কথাকথিতে কাজ নেই সেজঠাকুরঝি! প্রবাদে বলে, কথা কানে হাঁটে। কোন্ সূত্রে কার দ্বারা চালিত হয়ে কুটুমবাড়ির কানে উঠবে, হয়তো সেই নিয়ে বিপত্তি বাধবে কে বলতে পারে। একে তো—"

দীনতারিণীও কথায় একটা অকল্পিত সম্ভাবনা উহ্য রেখে ড্যাশ্ টেনে ছেড়ে দেন।

কাশীশ্বরীর সামনে আর শঙ্করীর কথা স্পষ্ট করে তোলেন না।

তবু মোক্ষদা উচ্চ চীৎকারে ভবিষ্যদ্বাণী করতে ছাড়েন না, "সে তুমি যতই সাবধান হও বড়বৌ, আমি এই আগ্ বাড়িয়ে বলে দিচ্ছি, ও মেয়ের কপালে অশেষ দুঃখ আছে। আজ নয় তুমি-আমি চেপে গেলাম, কিন্তু ওকে নিয়ে যারা ঘর করবে, তাদের কি আর গুণ বুঝতে বাকী থাকবে? হবে না তো কি, বাপে শাসন না করলে কি আর বেয়াড়া মেয়ে-ছেলে শায়েস্তা হয়?"

দীনতারিণী অকূলের কূল হিসেবে ম্রিয়মাণভাবে বলেন, "তা, তুমি না হয় রামকালীকে বুঝিয়ে বলো?"

"রক্ষে করো বড়বৌ! আমি আর হেয় হতে চাই না। আমি লাগাতে যাব, আর তিনি মেয়েকে শাসন তো দূরের কথা, উল্টে আরও আশকারা দেবেন।"

অগত্যাই দিশেহারা দীনতারিণী ভুবনেশ্বরীর প্রতিই দৃষ্টিক্ষেপণ করেন, "তা তুমিও তো

সময়ান্তর যখন তার মনমেজাজ ঠাণ্ডা দেখবে, একটু বুঝিয়ে বলতে পার মেজবৌমা ? সত্যিই যে মেয়ে তোমার স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠছে। পরের ঘরে পাঠাতে তো হবে ?"

ভুবনেশ্বরী অবশ্য এ কথার কোন উত্তর দেয় না। দেওয়া সম্ভবও নয় তার পক্ষে। যদিও তার মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, তবু গুরুজনের সমক্ষে স্বামী সম্পর্কে উল্লেখই যে যারপরনাই লজ্জাজনক। ভুবনেশ্বরী যে রামকালীর সঙ্গে কথা কয়, এত বড় লজ্জার কথাটা শাশুড়ী এই লোকসমাজে প্রকাশই বা করে বসলেন কেন ? ছি ছি।

লজ্জা প্রতিকারের আর কিছু না দেখে মাথার ঘোমটাটাই আরও খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে মাথাটা হেঁট করে ভুবনেশ্বরী।

তা মাথাটা আর ভুবনেশ্বরী উঁচু করতে পায় কখন ?

স্বামীকেও যে তার বড় ভয়।

তবু বড্ডই চিন্তাগ্রস্ত হচ্ছে সে মেয়ের ভবিষ্যৎ ভেবে। অহরহ সকলেই যে বলছে—'ও মেয়ে শ্বশুরঘর করতে পারবে না।'

আসামী এক, বিচারকও এক, শুধু কাঠগড়া আর অভিযোক্তা আলাদা।

তবে আসামীকে প্রথমেই হাজির করে নি ভুবনেশ্বরী, তাকে শাসিয়ে রেখে এসে, অনেক কৌশলে ভয়ানক একটা দুঃসাহসিক চেষ্টায় দিনের বেলা একবার স্বামীর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ যোগাড় করে ফেলে সে। রামকালী যখন মধ্যাহ্ন বিশ্রাম করছেন, সেই সময় কাছে এসে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়ায়।

রামকালী ঈষৎ আশ্চর্য হয়ে বলেন, "কিছু বলবে ?"

স্বামীর স্নেহকোমল স্বরে সহসা চোখে জল এসে যায় ভুবনেশ্বরীর, উত্তর দিতে পারে না, শুধু ঘোমটাটা একটু কমায়।

"কি হল ?" রামকালী মৃদু কৌতুকে বলেন, "বাপের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হচ্ছে ?"

"না।" ভুবনেশ্বরী মাথা নেড়ে বাষ্পরুদ্ধস্বরে বলে, "বলছি সত্যর কথা।"

"সত্যর কথা। কেন ?" আর একটু হাসেন রামকালী, "আবার কি মহা-অপরাধ করে বসল সে ?"

"করছেই তো সব সময়," অভিমানের আবেগে কথায় জোর আসে ভুবনেশ্বরীর, "তুমি তো সবই হেসে ওড়াও। কথা শুনতে হয় আমাকেই।"

"বাজে কথা গায়ে মাখতে নেই মেজবৌ!"

"বাজে ? মেয়ে কি করেছে শুনলে আর—"

"কি করেছে ?"

"লিখেছে।"

"লিখেছে ! লিখেছে কি ?"

"তা জানি না। নেড়ুর তালপাতে কি সব বইয়ের কথা লিখেছে। আবার না কি আসপদ্দা করে বলেছে আরও অনেক লিখতে পারে। বুকের পাটা কত, বাগান থেকে তালপাতা কুড়িয়ে শরকাঠি যোগাড় করে·পুঁইমেটুলীর রস দিয়ে লেখা শিখেছে!"

এর পর রামকালী চমৎকৃত না হয়ে পারেন না। বলেন: "তাই নাকি? গুরুমশাইটি কে? নেড়ুই না কি?"

"নেড়ু? নেড়ু বলেছে সাতজন্ম চেষ্টা করলেও নাকি অমন হরফ সে লিখতে পারবে না।"

"বটে। কই এক বার ডাক তো দেখি।"

আসামী পাশের ঘরেই অবস্থান করছে, ভুবনেশ্বরী তাকে চোখ রাঙিয়ে বসিয়ে রেখে এসেছে।

স্বামীকে যে খুব বেশী দুশ্চিন্তিত করতে পেরেছে ভুবনেশ্বরী এমন ভরসা হয় না, শাস্তির মাত্রা কি আর তেমন গুরু হবে? অথচ লঘু শাস্তিতে কাজ হবে বলে মনে হয় না, কারণ সত্যর ভাব যথারীতি অনমনীয়। তাই স্বামীকে একটু তাতিয়ে তোলবার আশায় বলে, "ডাকছি, বেশ ভাল করে শাসন করে দিও। শুধু যে আসপদ্দা করেছে তাও তো নয়, আলাত পালাত কত সব তক্ক করেছে। 'কলকেতায় নাকি অনেক মেয়েমানুষ আজকাল লেখাপড়া শিখছে, তাদের তো কই চোখ কানা হচ্ছে না, বিদ্যের দেবী মা সরস্বতীই তো নিজে 'মেয়েমানুষ', এই সব বাচালতা। তুমি একটু উচিত শিক্ষা দিয়ে বকবে মেয়েকে, বুঝলে?"

শেষাংশে মিনতি ঝরে পড়ে ভুবনেশ্বরীর কণ্ঠে।

সরে গিয়ে পাশের ঘর থেকে ইশারায় ডাকে মেয়েকে। স্বামীর সামনে তো আর গলা খুলতে পারে না।

সত্য এসে হেঁটমুণ্ডে দাঁড়ায়।

কাঠগড়ায় এসে দাঁড়াবার সময় এটাই পদ্ধতি সত্যর। উত্তরদানকালে মুখ তোলে।

রামকালী প্রথমটায় একটুও অন্তত ধমক দেবেন এ আশা ছিল ভুবনেশ্বরীর, কিন্তু তিনি তাকে হতাশ করলেন। ভাবলেশশূন্য কণ্ঠে সহজভাবে বললেন, "তুমি না কি লিখতে শিখেছ?"

মুখটা অবশ্য একটু পাংশু হল সত্যবতীর।

"কই-কি লিখেছ দেখি?"

অস্ফুটে যা উত্তর দেয় সত্য তার অর্থ এই—অপরাধের পর আর সেই অপরাধের চিহ্ন সম্পর্কে সে ওয়াকিবহাল নয়। নেড়ু জানে।

"আচ্ছা ঠিক আছে। আবার লিখতে পার?"

সত্যবতী মুখ তুলে তাকায়।

কই বাপের চোখে তো রুদ্ররোষের চিহ্ন নেই। তবে বোধ হয় তেমন রাগ করেন নি। তাই এবার সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে সত্য।

"আচ্ছা কই লেখো দিকি।"

হাত বাড়িয়ে চৌকির পাশে অবস্থিত জলচৌকিতে রক্ষিত দোয়াত কলম ও খসখসে একখানা বালির কাগজ টেনে নেন রামকালী বলেন, "লেখো। যা শিখেছ লেখো।"

এ কী! এ যে হিতে বিপরীত!

ধমক চুলোয় যাক, মেয়ের হাতে আবার কাগজ কলম তুলে দিচ্ছেন রামকালী!

ভুবনেশ্বরী কি ডুকরে কেঁদে উঠবে, না নিস্পন্দ চিত্তে অপেক্ষা করবে নাটকের শেষদৃশ্যের জন্যে?

অবশ্য এমনও হতে পারে, যাচাই করে দেখছেন নেড়ুর কথার সত্যতা।

সত্যি, আগাগোড়া ব্যাপারটা নেড়ুর চালাকিও তো হতে পারে।

কিন্তু তাই কি? হতচ্ছাড়া মেয়ে তো অস্বীকারও করছে না।

ততক্ষণে সত্য ঘাড় গুঁজে দু-তিনটি শব্দ লিখে ফেলেছে। অবশ্য তালপাতার নিয়মে অধিক জোর প্রয়োগে কাগজগাত্রে সামান্য সামান্য ক্ষতের সৃষ্টি হল, কিন্তু লেখা হল।

রামকালী সেটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারকয়েক দেখে কোনও মন্তব্য না করে শান্ত ভাবে বলেন, "কলকাতায় অনেক মেয়ে লেখাপড়া করছে, একথা তোমায় কে বললে?"

"ছোটমামী।"

"তাই না কি? তিনি কোথা থেকে—ও তিনি যে কলকাতারই মেয়ে! তাই না?"

এ উদ্দেশটা ভুবনেশ্বরীকে। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তো আর অত বড় মেয়েব সামনে গলা খুলে কথা বলতে পারে না, ঘাড় কাত করে সায় দেয়।

"তা তিনি জানেন লেখাপড়া? তোমার মামী?"

"একটু একটু জানেন। বেশী করে কবে আর শিখতে পেল বেচারা? শুধু বলছিল, একজন মেম না কি দিশী ইস্কুল খুলেছে, আব একজন সায়েব বিলিতী ইস্কুল খুলে দিয়েছে, কলকাতার মেয়েরা আর মুখ্যু থাকবে না।"

"মেয়েদের লেখাপড়া শিখে লাভ কি? তারা কি নায়েব গোমস্তা হবে?"

সকৌতুক হাস্যে মেয়েকে প্রশ্ন করেন রামকালী।

এবার সত্যবতীর তেজের পালা।

সব সইতে পারে সে, সইতে পারে না ব্যঙ্গ।

"নায়েব গোমস্তা হতে যাবে কেন? লেখাপড়া শিখে নিজে নিজে রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ বই-টই পড়তে পারে তো? কবে কথকঠাকুর কোথায় পড়বেন বলে অপিক্ষে করে থাকতে হয় না।"

মেয়ের এই ক্রুদ্ধমূর্তি আর সগর্ব উক্তি কি রামকালীব খুশির খোরাক হয়? তাই আরও একটু উত্তপ্ত করতে চান তাকে?

"তা মেয়েমানুষেব এত বেদপুরাণ জানবার দরকারই বা কি?"

এবার সত্যবতী স্থান-পাত্র বিস্মৃত হয়ে নিজমূর্তি ধরে, "এত যদি দরকারের কথা, তো

মেয়েমানুষের জন্মাবারই বা দরকার কি, তাই বল তো বাবা শুনি একবার ?"

মেয়ের এই দুঃসাহসে ভুবনেশ্বরীর বুক থর থর করে, অত বড় মানুষটার মুখে মুখে এতখানি চোপা !

হবে না, হবে না—এ মেয়ের কক্‌খনো শ্বশুরবাড়ি ঘর করা হবে না।

কিন্তু ভুবনেশ্বরীকে চমকে দিয়ে সহসা হেসে ওঠেন রামকালী, বেশ সশব্দেই।

তার পর মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলেন, "তুমি লেখাপড়া শিখতে চাও ?"

"চাই তো, পাচ্ছি কোথায় ?"

"ধরো যদি পাও ?"

"তা হলে রাতদিন লেখাপড়া করব।"

"অতটা করতে হবে না। নিয়ম করে কিছুক্ষণ পড়লেই হবে। কাল থেকে দুপুরবেলা এই সময় আমার কাছে পড়বে।"

"পড়বে !"

ভুবনেশ্বরী আর কথা না বলে পারে না।

"হ্যাঁ, পড়বে লিখবে। পুঁইমেটুলীর কালি দিয়ে নয়, সত্যিকার দোয়াত-কলমই দেব ওকে।"

"বাবা !"

সত্যর মুখ দিয়ে মাত্র এই দুটি অক্ষর সম্বলিত শব্দটা বেরোয়। আর ভুবনেশ্বরীর দুচোখে শ্রাবণ নামে।

ষোলো

বসেছে কাব্যপাঠের আসর।

ঋতুরঙ্গ কাব্য ! 'বর্ষাখণ্ড' শেষ করে প্রকৃতিদেবী সবেমাত্র "শরৎখণ্ডের" মলাটখানি খুলে ধরেছেন, এখনও তার ভিতরের শ্লোক পড়তে বাকী। এখনও কাশের বনে বনে শুরু হয় নি শ্বেতচামরের ব্যজনারতি, শুধু ভোরের বাতাসে লেগেছে অকারণ পুলকের স্পন্দন ! শুধু আকাশের নীল দর্পণের স্বচ্ছতা, পাখীদের 'শিসে' উল্লাসের তীক্ষ্ণতা। দেবী অনন্তকাল ধরে একই কাব্য আবৃত্তি করে চলেছেন, শেষ লাইনের পরই আবার গোড়ার লাইন, তবু সে কাব্য পুরনো হয়ে যায় নি, পুরনো হয়ে যায় না। অনন্তকালের মানুষের কাছে বয়ে নিয়ে আসে আশার বাণী, প্রত্যাশার স্বপ্ন, উৎসাহের সুর।

উৎসাহের জোয়ার লেগেছে বাংলার গ্রামে গ্রামে। প্রতীক্ষার উৎসাহ।

"মা দুর্গা আসছেন !"

"আসছেন বাপের বাড়ি। কৈলাস থেকে মর্ত্যলোকে।" এ কথা গল্প কথা নয়, বাংলার

অন্তরের সত্য বিশ্বাসের কথা। বৎসরান্তে মা মাতৃরূপ আর কন্যারূপের সমন্বয় সাধন করে নেমে আসেন মাটি-মায়ের কোলে, এসে মায়ের কাছে সুখদুঃখের কথা কন, বিদায়কালে চোখের জল ফেলেন, এ কথা কি অবিশ্বাসের? দেবতার সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন পাতিয়ে, দেবতাকে ঘরের লোক করে নিয়েই তো বাঙালীর ঘরকন্না। তাই তারা শিবের বিয়ে দেয়, ইতু-মনসার 'সাধ' দেয়, ভাদুকে সোহাগ করে, আর পার্বতীকে পতিগৃহে পাঠাতে চোখের জলে বুক ভাসায়। আর সবাই তবু দেবদেবী, উমা যে একেবারে ঘরের মেয়ে। মহিমায় তাঁর সহস্রনাম থাক, আসল নাম যে সেই উমা নামটি। শরৎ পড়তেই ভিখারী বৈষ্ণবরা সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায় খঞ্জনীর তালে তালে। "আয় মা উমাশশী, নিরখি মুখশশী, দিবানিশি আছি আসার আশায়।"

হয়তো একটি গ্রামে একটি মাত্র ভাগ্যবানের বাড়িতেই কন্যারূপিণী জগন্মাতার পদার্পণ ঘটবে, কিন্তু গ্রামের প্রতিটি ঘরের অন্তরবীণায় বাজছে আগমনীর সুর।

এবারে আশ্বিনের প্রথম দিকেই পুজো, তাই ভাদ্র পড়তে পড়তেই 'সাজ সাজ' রব। সংসারের নিত্য রান্না খাওয়া বাদে অন্য সব কিছুতেই যে করা চাই মাসখানেকের মত আয়োজন। পুজোর মাসে তো আর কেউ মুড়ি ভাজবে না, চিঁড়ে কুটবে না, মুড়কি মাখবে না, পকান্ন রাঁধবে না, মেটে ঘরের দেয়াল নিকোবে না? এমন কি সলতে পাকানো, সুপুরি কাটা, নারকেল কাঠি চাঁছা, সবই সেরে রাখতে হবে দেবীপক্ষ পড়ার আগে। কোজাগরীর পর আবার এ সব কাজে হাত, আবার কাঁথায় ফোঁড় তোলা, আর তার সঙ্গে সদ্য-বিগত উৎসবের স্মৃতি রোমন্থন।

ভাদ্রমাসে শুধু যে আগমনীর প্রস্তুতি তাও তো নয়, বর্ষার পর যে অনেক কাজ এসে জোটে গেরস্তর। স্যাঁৎসেতে বিছানা-কাঁথা, তোরঙ্গে তোলা কাপড় চাদর, ভাঁড়ারের সম্বচ্ছরের মজুত বড়ি আচার, মশলাপাতি, ডাল কড়াই, সব কিছুকে টেনে টেনে ভাদুরে রোদ খাওয়ানো তো কম কাজ নয়!

ভুবনেশ্বরীর মা নেই, ভাজেরাই সংসারের গিন্নী, কদিন থেকে দুপুর ভোর এই কর্মকাণ্ড নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে তারা। আজ পড়েছে নাড়ু নিয়ে। হাঁড়িভর্তি মুগের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু করে মাচায় তুলে রাখতে পারলে মাসখানেকের মত 'জলপানের'র দায়ে নিশ্চিন্দি। আর পুজোর মাসে ছেলেপুলের পাতে দুটো ভালমন্দ দিতেও হয়। ভুবনেশ্বরীর বড় ভাজ নিভাননী জোর হাতে নারকেল কুরছিল, আর ছোট ভাজ সুকুমারী জাঁতা ঘুরিয়ে মুগ ভাঙছিল, হঠাৎ উঠোনের দরজার শিকলি নড়ে উঠল।

"এই দেখ কাজের গুরু কামাই", নিভাননী নিচুগলায় বলে, "কে আবার এখন বেড়াতে এল কাজ পণ্ড করতে! নে ছোট বৌ, ওঠ, দুয়োর খোল।"

সুকুমারীর অবশ্য মনোভাবটা ঠিক বড় জায়ের সমর্থক নয়, একঘেয়ে কাজ করতে করতে বাইরের হাওয়া একটু ভালই লাগে তার। নিভাননী যদি একটু গল্প-গাছা করতে জানে,

মুখ বুজে খালি কাজ আর কাজ।

দরজা খুলেই সুকুমারী উল্লাসধ্বনি করে ওঠে, "ওমা কী আশ্চর্যি, পূবের সূয্যি কি পশ্চিমে উঠেছে আজ, না যার মুখ কখনও দেখি নি তার মুখ দেখে ঘুম থেকে উঠেছি?"

এহেন সংলাপে নিভাননীর ব্যাজার মুখ কৌতূহলে সরস হয়, সে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'কে এলো গো, কার সঙ্গে এত রসের কথা?"

"এই যে ডুমুরের ফুল, ঠাকুরঝি।" বলে সুকুমারী তাড়াতাড়ি ননদের পা ধোবার জল আনতে ছোটে। ভুবনেশ্বরী মুখের ঘোমটা নামিয়ে দাওয়ায় বসে পড়ে ধুলো পা ঝুলিয়ে। ভাদ্দরের কড়া রোদে তার ফর্সা মুখটা লাল টকটকে হয়ে উঠেছে, ঘোমটা দেওয়ার দরুন চুলের গোড়ায় গোড়ায় আর গলার খাঁজে ঘাম গড়াচ্ছে।

এমন করে ভররোদে হেঁটে আসা ভুবনেশ্বরীর পক্ষে সত্যিই অভাবনীয় ঘটনা। একে তো আসাই তার কম, তা ছাড়া যদি আসার বাসনা প্রকাশ করে, পালকি করে পাঠিয়ে দেন রামকালী। যদিও এর জন্যে বাড়ির আর পাঁচ জন ঠেস-টিটকিরি দিতে ছাড়ে না, পাড়ার সমবয়সী বৌরা বলে 'বাদশাব বেগম,' তবু রামকালীর নির্দেশ মেনে চলতেই হয়।

কিন্তু আজ ব্যাপারটা কি?

পা ধোবার জল আর গামছা এগিয়ে দিয়ে একখানা ঝালর বসানো হাতপাখা নিয়ে ননদকে বাতাস করতে থাকে সুকুমারী। একে তো গুরুজন, তায় আবার বড়ঘরের ঘরনী।

"কার সঙ্গে এলে?" নিভাননী প্রশ্ন করে।

ভুবনেশ্বরী কিন্তু সে কথার উত্তরের আগেই বলে ওঠে, "পাখায় ঝালর বসিয়েছে কে গো?"

"কে আবার, ছোটগিন্নী!" নিভাননী অগ্রাহ্যে মুখ বাঁকিয়ে বলে, "রাতদিন যিনি সংসারের সব্বতাতে বাহার কাটছেন!"

সুকুমারীর মুখটা চুন্ হয়ে যায়, ভুবনেশ্বরী তাড়াতাড়ি বলে, "তা বাহার কাটা তো ভালই, কেমন খাসা দেখাচ্ছে!"

"হোক গে," নিভাননী আর একবার মুখ বাঁকায়, "এখন অবধি তো গাই দোয়াতে শিখল না, কুলো পাছড়াতে পারল না। ঢেঁকিশালে গিয়ে যা রঙ্গ, যদি দেখ তো বুঝবে। না পারে 'পাড়' দিতে, না পারে হাতে-পাতে নড়ে দিতে, পাড়া-পড়শীকে তোয়াজ করে ডেকে এনে কাজ উদ্ধার করতে হয়। আসল কাজ চুলোয় দিয়ে ভাঁড়ারের হাঁড়ি-কলসীর গায়ে চিত্তির কেটে, শিকের দড়িতে কড়ির থোপ্না গেঁথে, আর পাখার ঘাড়ে শালুর ঝালর ঝুলিয়ে গেরস্তর সগ্গের সিঁড়ি হবে।"

ভুবনেশ্বরী দেখে হিতে বিপরীত, এই সূত্র ধরে নিভাননী আরও কোথায় গিয়ে পৌঁছবে কে জানে। তা হলে তো আসল কাজই মাটি। ছোট ভাজকেই যে আজ তার দরকার। তবু ভুবনেশ্বরী আবার একটা ভুল চালই করে বসে। বসে এইজন্যেই যে নিচুতলাদের

নিন্দাবাদ করে ওপরওলাদের প্রসন্ন রাখার যে চিরন্তন কৌশল, সে কৌশলটা তার ভাল আয়ত্তে নেই বলেই। নিজের বাড়িতে তো সেই ভয়ে সে কথাই কয় না সহজে। দেখে ঘোমটা আর নীরবতা অনেক বিপদের রক্ষক। কিন্তু এটা নাকি ভুবনেশ্বরীর বাপের বাড়ি, তাই সাহসে ভর করে বলে বসে, "কেন বাপু, এই তো বেশ ডাল ভাংছে। মুড়ি ভাজতেও পারে। অতবড় একখানা শহরের মেয়ে, আর কত পারবে?"

"তা বটে।" নিভাননী একটি উত্তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "শহর কখনও চোখে দেখি নি, তার মর্মও জানি নে। ঘরসংসারই বুঝি, আর বুঝি মেয়েমানুষের সেখানে হেরে গেলে লজ্জায় মাথাকাটা যায়।...বসো একটু, গুড়ের পানা করে আনি, রোদে এসেছ।"

রোদের সময় ঘরে কিছু না থাক, আখের গুড় জলে গুলে তাতে পাতিলেবুর রস মিশিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ এদিকে আছে, নিভাননীর মগজে সে সহজটাই আসে। কিন্তু সুকুমারীর ওই গুড়ের পানা জিনিসটায় বিষম বিতৃষ্ণা, তাই সে বড়জায়ের ওপর কথা-কওয়া রূপ অসমসাহসিক কাজটাও করে বসে ননদের প্রতি সমীহে। সসংকোচে বলে ফেলে, "কেন দিদি, 'মিছরি-নারকেল' গাছের ডাব তো পাড়ানো রয়েছে ঘরে।"

রয়েছে সেটা নিভাননীর মনে ছিল না, কিন্তু মনে পড়িয়ে দেওয়ায় অপদস্থের একশেষ হয়ে যায় সে। কে জানে ননদ মনে করল কি না, ইচ্ছে করেই ডাবের কথাটা বিস্মৃত হয়েছে সে। এই ছোট বৌটা দেখতে ভালমানুষ হলে কি হবে, টিপে ডান। কিন্তু এক্ষেত্রে নিভাননীকে মনের রাগ চেপে হাসতেই হয়। হেসে বলতেই হয়, "অই দেখ, ভাগ্যিস মনে করলি ছোটবৌ! আমার অমনিতর ভুলো মনই হয়েছে আজকাল, বুঝলে ঠাকুরঝি! ঠাকুরজামাইয়ের কাছ থেকে এবার একটা সিঁতিশক্তির ওষুধ খেতে হবে।...যা তবে ছোটবৌ, দুটো ডাব কেটে আন গে।"

"আহা কেন ব্যস্ত হচ্ছ বড়বৌ?" ভুবনেশ্বরী অকারণে গলা নামিয়ে বলে, "আমি এসেছি বিশেষ একটা দরকারে পড়ে, এখুনি চলে যেতে হবে।"

"ওমা শোন কথা? এখুনি চলে যেতে হবে, কি গো? কি এমন বিশেষ দরকার পড়ল? এলেই বা কার সঙ্গে, যাবেই বা কার সঙ্গে? একা নাকি?"

"একা?" ভুবনেশ্বরী হেসে ওঠে, "সে আর এ-কাটামোয় হবে না। এসেছি পিসশাশুড়ীর সঙ্গে। দুয়োর থেকে আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেলেন, আবার ফিরতি মুখে ডেকে নিয়ে যাবেন। চুপিসাড়ে চলে এসেছি, ঘরে কেউ জানে না।"

"ঠাকুরজামাই?" নিভাননী রহস্যের হাসি হাসে।

ভুবনেশ্বরী নিভাননীর ঠাকুরজামাইয়ের প্রসঙ্গেই মাথার কাপড়টা একটু টেনে বলে, "তিনি তো ভিন্ গাঁয়ে গেছেন রুগী দেখতে, নইলে আর এত বুকের পাটা! নিতান্ত দায়ে পড়েই আসা, পিসশাশুড়ী সইয়ের বাড়ি আসছেন শুনে খুব কাকুতি করলাম, বলি, 'ওই পথ দিয়েই তো যাবে পিসীমা!' তা সে দিকে ভাল আছেন মানুষটা, কেউ শরণ নিলে তাকে

বুক দিয়ে আগলান।"

"তা কাজটা কি?"

এবার ভুবনেশ্বরী থতমত খায়, কাজটা কি, সেটা নিভাননীর সামনে বলা সঙ্গত কিনা এতক্ষণে খেয়াল হয়। আসলে এসেছে সে সুকুমারীর কাছে একখণ্ড লেখা কাগজ নিয়ে, যে কাগজের হিজিবিজি রেখাগুলো এক দুর্বোধ্য ভ্রূকুটি হেনে তার দিকে ক্রমাগত তাকিয়ে আছে আজ কদিন থেকে!

সত্যবতীর লেখা একখণ্ড কাগজ।

জিনিসটা ভুবনেশ্বরীকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে। ঘরের কোণে ঘাড় গুঁজে লিখছিল সত্যবতী, হঠাৎ বুঝি পূজোর দালানে কুমোর এল এই বার্তা পেয়ে ছুটে চলে গিয়েছিল, নেড়ু পুণ্যি আর আরও কুচোকাচাদের সঙ্গে, কাগজখানা চৌকিতে পাতা শেতলপাটির তলায় গুঁজে রেখে। ভুবনেশ্বরী কৌতূহলপরবশ হয়ে পাটিটি ঈষৎ উঁচু করে তুলে দেখতে গিয়েছিল কেমন আখর সত্যর হাতের, কিন্তু দেখতে গিয়েই স্তম্ভিত হয়ে গেল, গোটা গোটা আখরে ঠিক পয়ারের ছাদে এ কী লিখছিল সত্য?

নকল করছিল?

কিন্তু নকল করবে যদি তো সামনে বই খোলা ছিল কই? সর্বনেশে মেয়ে নিজেই পয়ার বাঁধছে না কি? ভয়ে বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল ভুবনেশ্বরীর, কিন্তু কাকে দেখিয়ে রহস্যের মীমাংসা হবে?

রামকালীকে তার বড় ভয়।

রাসুকে বলতে গেলে পাঁচকান হবার সম্ভাবনা। তা ছাড়া বাড়িতে আর যাঁরা লিখন-পঠনক্ষম, সকলেই তো ভুবনেশ্বরীর শ্বশুর-ভাসুর, ভেবে আর কূলকিনারা পাচ্ছিল না বেচারা। তার পর সহসাই মনে পড়ল সুকুমারীর কথা।

সুকুমারী পড়তে জানে!

বামালটা সরিয়ে ফেলে সুকুমারীর কাছে আসার তাল খুঁজছিল সে দু-তিন দিন থেকে। আড়চোখে দেখেছে, সত্য কখন এক সময় শেতলপাটি উল্টে লণ্ডভণ্ড করে খোঁজাখুঁজি করেছে, আবার 'ধুত্তোর' বলে নতুন কাগজ নিয়ে বসেছে। সে কাগজে আর কোন্ রহস্যের রেখা এঁকেছে সত্য, সে কথা ভুবনেশ্বরীর অজ্ঞাত, জিজ্ঞেস করতে গেলে সত্য মারমুখী হয়। বাড়ির লোকের জ্বালায় যে একদণ্ড নিরিবিলিতে বসবার জো নেই তার, এ কথা স্পষ্ট গলায় ঘোষণা করতে বাধে না সত্যবতীর।

অতএব এই টুকরোটুকুই ভরসা।

ঘাড় গুঁজে গুঁজে কি এত লেখে সে জানবার জন্যে মায়ের মন নানা কারণেই ব্যাকুল হয়। ব্যাকুল হয় কৌতূহলে, ব্যাকুল হয় আশঙ্কায়।

সত্যকে যে শ্বশুরবাড়ি যেতে হবে!

হায়, সত্য যদি ভুবনেশ্বীর মেয়ে না হয়ে ছেলে হত! বাপের উপযুক্তই হত। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর কপালে 'এক তরকারি নুনে বিষ'। একটা সন্তান তা মেয়ে।

"কি গো ঠাকুরঝি, বাক্যি-ওক্যি নেই কেন?"

নিভাননী অবাক হয়। এত কুণ্ঠা কিসের?

গরীব ননদ নয় যে, আশঙ্কা করবে ধার চাইতে এসেছে ভাজের কাছে।

আর চেপে রাখা চলে না, ঢোক গিলে বলতেই হয় ভুবনেশ্বরীকে—"এসেছিলাম ছোট বৌয়ের কাছে, একটা কাগজ পড়ানোর দরকার ছিল।"

"কাগজ!" নিভাননী আকাশ থেকে পড়ে, "কাগজ কিসের? কোনো পাট্টা কোবলা না কি?"

"না না, ওমা সে কি? সে সব আমি কোথায় পাব? এ ইয়ে—একটু চিঠির মতন।"

"চিঠির মতন! সেটা আবার কি বস্তু ঠাকুরঝি? আর সে পড়ানোর লোক তোমার বাড়ি হাটকে একটা পুরুষ বেটাছেলে কাউকে পেলে না, সাতপাড়া ডিঙিয়ে একটা মেয়েমাগীর কাছে পড়াতে এলে? কিছু গোপন বুঝি?"

সুকুমার গিয়েছে ডাব কাটতে। ভুবনেশ্বরী অসহায় ভাবে এক বার এদিক ওদিক তাকিয়ে সহসাই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলে, "কি যে বলো বড়বৌ, গোপন আবার কি? এই সত্যর একটু লেখা। বলি অষ্টপ্রহর কি এত লেখে বসে দেখি'তো। বাড়িতে কাউকে দেখালে রসাতল করবে তো মেয়ে!"

নিভাননীর কানে আসতে বাকী ছিল না—সত্য লেখাপড়া করছে, তবু অজ্ঞের ভানে বলে, "বল কি ঠাকুরঝি, সত্যও কি তার ছোটমামীর মতন লেখাপড়া করছে? কালে কালে হল কি? বলি মেয়ে কি তোমার শামলা এঁটে কাছারি যাবে? সবাই তো তোমার ভাইদের মতন ভালমানুষ নয় যে, যা ইচ্ছে তাই চলে যাবে, শ্বশুররা এ খবর টের পেলে?"

"কি করব বড়বৌ, জানোই তো তোমাদের ননদাইকে, কেমন একজেদী? মেয়ে বলল পড়ব, তো পড়ুক। মেয়ে আকাশের চাঁদ চাইলে চাঁদ পেড়ে আনতে যাবেন এমন মানুষ! তাই তো ভাবলাম কি লেখে বসে দেখি। ছেলে বুদ্ধি!"

বড় একটা পাথরবাটিতে ডাবের জল নিয়ে এসে দাঁড়াল সুকুমারী।

"ও বাবা কত? এত পারব না ছোটবৌ, তুমি একটু ঢেলে নাও।" বলে ভুবনেশ্বরী।

"খাও না রোদে এসেছ।"

"তা হোক, অতটা নয় বাপু।"

অগত্যাই খানিক ঢালাঢালি করতে হল সুকুমারীকে। ভুবনেশ্বরী ইত্যবসরে ব্যাপারটাকে লঘুর পর্যায়ে ফেলবার বুদ্ধিটা এঁচে নিয়েছে, তাই ডাবের জলে চুমুক দিতে দিতে ঝট করে বাঁ হাতের মুঠো থেকে কাগজের টুকরোটা এগিয়ে দিয়ে বলে, "এই নাও বিদ্যেবতী বৌ, পড় দিকিন এটা! আমরা তো চোখ থাকতেও অন্ধ!"

"জন্ম জন্ম যেন অন্ধই থাকি বাবা"—নিভাননী বিষমুখে বলে, "যে জাতের দশহাত কাপড়ে কাছা নেই, তাদের আবার এত চোখ-কান ফোটার দরকার কি ?" বলে, কিন্তু জিনিসটার ওপর এমন ভাবে হুমড়ে পড়ে, দেখে মনে হয় চোখকান থাকলে মুহূর্তে গ্রাস করে ফেলত। ভুবনেশ্বরী যাই বলুক, জিনিসটায় যেন রহস্যের গন্ধ।

সুকুমারী কাগজখানা উল্টেপাল্টে বলে, "কি এ ?"

"কি তা আমি বলব কেন ? তুমি বলো ?" কৌতুকের হাসি হাসে ভুবনেশ্বরী।

"একটা তো ত্রিপদী ছন্দের দেবীবন্দনা দেখছি, কার লেখা ? খুব ভাল হাতের লেখা তো ?"

'ত্রিপদীছন্দ' শব্দটা বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়, কিন্তু 'দেবীবন্দনা' কথাটার অর্থ জানা, তাই ভুবনেশ্বরীর বুক থেকে যেন একটা পাহাড় নেমে যায়, তবে জিনিসটা দোষণীয় নয়।

"পড় তো শুনি ?"

সুকুমারী একটু শঙ্কিত দৃষ্টিতে বড়জায়ের দিকে তাকায়। নিভাননীর সামনে পড়া ? তিনি এটাকে কোন্ আলোয় নেবেন ? গুরুজনের প্রতি অসম্মাননা ? কিন্তু নিভাননীই অভয় দেয়, "নাও, পড়ই শুনি। হাবা কালা কানা অন্ধদের একটু জ্ঞান দাও।"

অতএব সুকুমারী একটু কেসে একটু ইতস্তত: করে পড়ে—

"এসো মা জননী, দুর্গে ত্রিনয়নী,
এসো এসো শিবজায়া,
সন্তানের ঘরে এসো দয়া করে,
মহেশ্বরী মহামায়া !
তোমারে হেরিতে আশাভরা চিতে
রয়েছি আকুল হয়ে,
আসিবে মা তুমি, এই মর্ত্যভূমি,
পুত্র কন্যা সাথে লয়ে।
একটি বৎসর শূন্য আছে ঘর,
দুঃখে আছি নিরবধি,
দিবস রজনী কাটে দিন গুণি,
কবে দিন দেবে—"

"ওমা এ কি, শেষ নেই যে ?" সুকুমারী অবাক হয়ে বলে, "এ স্তোত্তর কোথায় পেলে ঠাকুরঝি ?"

"আর বল কেন ?" ভুবনেশ্বরী কুণ্ঠা দমন করতে হাতপাখাখানা তুলে জোরে জোরে নাড়তে নাড়তে বলে, "সত্যর কীর্ত্তি ! লিখছিল—কুমোর এসে কাঠামো বাঁধছে শুনে ফেলে দিয়ে ছুটে চলে গেল। আমি কুড়িয়ে তুলে—"

"তা নকল করেছে কোথ্‌ থেকে ?"

সকৌতূহল প্রশ্ন করে সুকুমারী।

"নকল করেছে তা মনে হল না ছোটবৌ," ভুবনেশ্বরী যাকে বলে 'দোনা মোনা' সেই সুরে বলে, "ও মুখপুড়ী নিয্যস নিজেই বেঁধেছে।"

"কি যে বল ঠাকুরঝি," সুকুমারীর কণ্ঠে অবিশ্বাস, "নিজে বাঁধবে কি ? অতটুকু মেয়ে এ সব কথার মানে জানে ?"

"জানে না কি করে বলি বৌ, মুখপুড়ী লুকিয়ে লুকিয়ে তোমার নন্দাইয়ের কবরেজী শাস্তরের বইগুলো পর্যন্ত টেনে পড়তে বসে।"

"সে কথা আলাদা! পারুক না পারুক আম্বা করে বসে, কিন্তু ছন্দ বেঁধে আখর মিলিয়ে এত বড় একটা স্তোত্তর তৈরী কি সোজা নাকি ?"

ছোটবৌয়ের এই অবিশ্বাসের সুর ভুবনেশ্বরীকে ঈষৎ থতমত করছিল, কিন্তু মেঘ উড়িয়ে দিল নিভাননী, যে নিজে এতক্ষণ মুখে আষাঢ়ের মেঘ নামিয়ে ছোট জায়ের 'অবলীলাক্রমে'র দিকে তাকিয়ে ছিল। সুকুমারীর কথা শেষ হতেই হাত নেড়ে বলে উঠল নিভাননী, "তা এতে আর আশ্চয্যি হবার কি আছে ছোটবৌ ? ঠাকুরঝি মনে বেদনা পাবে তাই রেখে ঢেকে বলা, ঠাকুরঝির এই মেয়েটিই কি সোজা ? কতদিন আগে ভোঁদার নামে ছড়া বাঁধে নি ও ? এ নয় মা দুগগার নামে বেঁধেছে! তবে ভাবনার কথা বটে! ঠাকুর-জামাইয়ের দব্‌দবায় আমরা দশজনা নয় মুখে চাবি দিয়ে আছি, কিন্তু কুটুম তো তা মানবে না ? এক বার টের পেলে—"

কথা শেষ হল না, মোক্ষদার হন্তদন্ত মূর্তি দেখা গেল খোলা দরজার সামনে। "চলে এস মেজবৌমা, ঝটপট্ চলে এস, ওদিকে এক কাণ্ড হয়েছে!"

কাণ্ড হয়েছে!

কী সেই কাণ্ড!

ভুবনেশ্বরীর মুখে কথা যোগায় না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। সুকুমারী তো আগেই ঘোমটা টেনে বসেছে। তবে নিভাননীর কথা আলাদা, এ বাড়ির গিন্নীর পোস্ট্‌টা তার, এগিয়ে গিয়ে বলে, "কিসের কাণ্ড মাউই মা ?"

"আর ব'লো না বাছা! সইয়ের বাড়িতে বসেছি কি না বসেছি, রাখলা ছোঁড়া 'রণপা' নিয়ে গিয়ে হাজির! কি সমাচার ? না শীগগির চল, সত্যর শ্বশুর বাড়ি থেকে লোক এসেছে। ভাগ্যিস দিদিকে বলে এসেছিলাম সইয়ের বাড়ি যাচ্ছি—"

নাঃ, মোক্ষদার কথা শেষ হতে পারে না, সহসা ভুবনেশ্বরী ডুকরে কেঁদে উঠেছে।

"ওমা ও কি! কাঁদছ কেন মেজবৌমা ? চল চল অপিক্ষের সময় নেই।"

কিন্তু চলবে কে ?

ভুবনেশ্বরীর শুধু পা দুখানাই নয়, সমস্ত লোমকূপগুলো পর্যন্ত যে অবশ হয়ে গেছে।

সত্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে লোক!

অতএব আর সন্দেহ কি যে সমস্ত জানাজানি হয়ে গেছে! তা ছাড়া আর কি অর্থ থাকতে পারে এরকম বিনা নোটিসে হঠাৎ শ্বশুরবাড়ির লোক আসার? কোথায় কে ঘরশত্রু বিভীষণ আছে, সে গিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে সত্যর ওই মারাত্মক অপরাধের, আর সত্যর বাপের ওই ভয়ানক দুঃসাহসের খবর! এর পর? এর পর আর কি, ভুবনেশ্বরী ভাবতে পারে না, শুধু ডুকরোনোর মাত্রাটা বাড়িয়ে বলে ওঠে, "ওগো পিসীমা গো, তুমি আমাকে এখেনে মেরে ফেলে রেখে যাও, বাড়ি অবদি যেতে পারবো না আমি।"

"আহা অধোয্য হচ্ছ কেন মেজবৌমা?" মোক্ষদা দেহটাকে প্রায় উল্টো-মুখো ঘুরিয়ে ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন, "এখন কি অধোয্যর সময়? এক্ষুনি না যেতে পারো, একটু সামলে নিয়ে ভেজের সঙ্গে যেও, আমি চললাম। পা তো আমারও কাঁপছে, কে জানে কী বাত্রা নিয়ে এসেছে। তা বলে কোত্তব্য ত্যাগ করা চলে না! আচ্ছা, আমি এগোলাম।"

'রণপা' ব্যতীতই রণ্পায়ের বেগে অদৃশ্য হয়ে যান মোক্ষদা।

ভুবনেশ্বরী যখন নিভাননীর সঙ্গে সন্তর্পণে খিড়কি দরজা দিয়ে ঢুকল, তখন বাড়ির চেহারা নিথর নিস্পন্দ!

যেন এইমাত্র কেউ একটা শোক-সংবাদ পাঠিয়েছে!

তা হলে?

নিভাননী ফিসফিস করে বলে, "বাড়ি এমন থমথমে কেন বল তো ঠাকরঝি? মন তো ভাল নিচ্ছে না! আর পোড়া মনের স্বধর্মই তো কু-কথা গাওয়া! জামাইয়ের কিছু দুঃসংবাদ নেই তো?"

আধমরা মানুষটাকে চোদ্দ আনা মেরে নিভাননী হৃষ্টচিত্তে উঠোনে পা দিয়ে এদিক ওদিক তাকায়।

দালানে কারা যেন নিঃশব্দে জটলা করে বসে রয়েছে, ঘোমটা দিয়ে বোধ করি সারদা ঘোরাঘুরি করছে, ছোট ছেলেমেয়েগুলোর পাত্তা নেই।

"এসো ঠাকুরঝি উঠে এসো, নিয়তি যা করবে তা তো সইতেই হবে, এখন দেখি গে চল কার কি হল!"

নিভাননী নিজে বুঝতে পারুক না পারুক, তার অবচেতন মনের একটা ফটোগ্রাফ নিতে পারলে সেখানে একটা প্রত্যাশার ছবি দেখতে পাওয়া যেত। জামাইটির 'কিছু' হলেই যেন প্রত্যাশাটি পূর্ণ হয়। ননদাইয়ের দবদবা সেই গহন গভীরে যে একটি অনির্বাণ দাহ সৃষ্টি করে রেখেছে, সেটাও বুঝি কিঞ্চিৎ শীতল হয় এমন একটা কিছু হলে।

ভুবনেশ্বরী কিন্তু দাওয়ায় উঠে দালানের চৌকাঠ পার হবার সাহস সঞ্চয় করতে পারে না, উঠোনের পৈঠেতেই বসে পড়ে বলে, "আমার হাত পা উঠছে না বড়বৌ, তুমি দেখ গে।"

"শোন কথা! তুমি এখানে এমন করে বসে থাকলে চলবে কেন? ভীমের গদা বুকে পড়লেও তো বুক পেতে নিতে হবে ঠাকুরঝি!" কণ্ঠস্বর সহানুভূতিতে কোমল হয়ে আসে নিভাননীর, "চল, আমি তোমায় আগলে দাঁড়াই গে।"

ভয় যতই তীব্র হোক, ভয়ের আকর্ষণটাও যে ততোধিক তীব্র। কাজে কাজেই উঠে পড়ে ভুবনেশ্বরী। আস্তে আস্তে দাওয়ায় উঠে দালানের কোণের দিকের একটা জানলায় উঁকি মারে। নিভাননী অবশ্য দরজায় পৌঁছেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা কি হল?

'ভালমন্দে'র মত তো কিছু দেখাচ্ছে না। অন্ততঃ সত্যর শ্বশুরবাড়ি থেকে আগতা হৃষ্টপুষ্টাঙ্গী রমণীটির হিসেবে তো মনে হচ্ছে পুরোপুরি ভালই।

হয় কোনও দাসী, নচেৎ 'নাপিতমেয়ে', এ ছাড়া আর কে-ই বা আসবে? যেই হোক, আপাততঃ তাঁর আদরটা প্রায় মহারাণীর মত। 'জল খাওয়া'তে বসানো হয়েছে তাঁকে, চারিদিকে ঘিরে বসে আছেন দীনতারিণী, কাশীশ্বরী, মোক্ষদা, শিবজায়া, ছোট জ্যেঠী, তা ছাড়া আশ্রিতা প্রতিপালিতার ঝাঁক।

সকলের মুখের চেহারাতেই একটি ভক্তি-বিনম্র সমীহ ভাব।

আর মধ্যমণিটির মুখচ্ছবিতে অহংবোধের দৃপ্ত মহিমা! তাঁর সামনে কানা-উঁচু বড়সড় পাথরের খোরা, তার মধ্যস্থলে মন্দিরাকৃতি শুকনো চিঁড়ের স্তূপ, পাশে একটি উঁচু কালো পাথরবাটি ভর্তি দই, এবং সন্নিকটে একখানি আঙট কলার পাতে স্থাপিত ছড়াখানেক চাটিম কলা, গণ্ডাচারেক দেদো মণ্ডা, একরাশ ফেনী বাতাসা, এবং ক্ষীরের ছাঁচ, চন্দ্রপুলি, নারকেলনাড়ু, বেসননাড়ু ইত্যাদির বেশ একটি বড় গোছের সম্ভার।

অর্থাৎ ঘরে সংসারে যতপ্রকার মিষ্ট বস্তু ছিল, সব কিছু দিয়ে তুষ্ট করার চেষ্টা চলছে কুটুমবাড়ির নাপতিনীকে।

হ্যাঁ নাপতিনীই।

মালুম হয় দীনতারিণীর কথাতেই। নিতান্ত আকুতিভরা কণ্ঠে বলছেন তিনি, "আর দুটোখানি চিঁড়ে দিই না নাপিত-বেয়ান, আর বেয়ানই বা কেন? হিসেবে তো মেয়ে সুবাদ হচ্ছ, মেয়েই বলি। আর দুটো চিঁড়ে একেবারে মেখে জব্দ করে নাও মেয়ে, দইয়ে ভিজলে ও আর কটা? সেই কোন্ ভোরে বেরিয়েছ। রোদে একেবারে সিটিয়ে গেছে।"

ভুবনেশ্বরী বোধ করি বিহ্বলতার বলেই জানলা ছাড়তে ভুলে গিয়েছিল, নিষ্পলক নেত্রে ঠায় দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল সেই দেবীমূর্তি আর তাঁর নৈবেদ্যের দিকে, হঠাৎ এক সময় পিছনে একটা মৃদুকণ্ঠের আভাসে চমকে ফিরে তাকাল, পিছনে সারদা!

"এখানে দাঁড়িয়ে কেন মেজখুড়ীমা?"

"দাঁড়িয়ে কেন? এমনি। ঘরে ঢুকতে পা উঠছে না। ও কেন এসেছে বড় বৌমা?"

"কেন আর?" সারদা অস্ফুট ম্রিয়মাণ গলায় বলে, "এসেছে মস্ত উদ্দেশ্য নিয়ে। বৌ

নিয়ে যাবার বার্তা পাঠিয়েছেন তাঁরা। আশ্বিন পড়তেই নিয়ে যাবেন বলছে।"

"আশ্বিন পড়তেই! বলো কি বড়বৌমা! এই কদিন বাদ?"

"তাই তো বলছে। একেবারে নাকি পুরুত দিয়ে 'দিন' দেখিয়ে পাঠিয়েছেন তাঁরা।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে ভুবনেশ্বরীর বুক ছিঁড়ে একটা প্রশ্ন ওঠে, "সত্য টের পেয়েছে?"

"তা আর পায় নি?"

"কি করছে?"

"তা তো জানি না খুড়ীমা, ভয়ে ভরে ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে বোধ হয়!"

"আমি যে বাড়ি ছিলাম না—এটা কেউ টের পেয়েছে?"

এবার সারদা একটু সত্য গোপন করে, "বলতে পারছি না মেজখুড়ীমা, বোধ হয় পান নি কেউ। গোলেমালে ব্যস্ত আছেন সবাই।"

সত্য কথা বলা চলে না।

কারণ অনুপস্থিত ব্যক্তি সম্পর্কে যে ধরনের আলোচনা হয়, সেটা যথাযথ প্রকাশ করলে 'লাগিয়ে দেওয়া ভাঙিয়ে দেওয়া'র পর্যায়ে পড়ে।

"ব্যস্ত থাকলেই বাঁচন," ভুবনেশ্বরী আর একটা দীর্ঘশ্বাস বাক্যে উচ্চারণ করে, "কিন্তু এখন হঠাৎ এ কী বিপদ বড় বৌমা?"

বড়বৌমা কিছু বলার আগেই নাপিত-মেয়ের মাজা-ঘষা চাঁচা গলাটি ধ্বনিত হয়, "বাপ বাড়ি নেই বলে মত দিতে ছুতো করছ কেন মাউইমা? আমি তো আর আজই নে যাচ্ছি না? আমাকে এ মাসের কটা দিন এখেনে থেকে একেবারে আশ্বিনের তেসরা তারিখে নিয়ে যেতে বলেছে।"

সতেরো

জগতের সমস্ত বিস্ময়কে কি একটিমাত্র প্রশ্নের মধ্যে প্রকাশ করা যায়? সেই একটি প্রশ্নের মধ্যেই ধিক্কার দেওয়া যায় জগতের সর্বাপেক্ষা অসহনীয় ধৃষ্টতাকে?

আর কারো পক্ষে সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু দেখা গেল অন্ততঃ একজনের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে।

বারুইপুরের বাঁড়ুয্যে গিন্নীর একটি মাত্র ছোট্ট প্রশ্নে ধ্বনিত হল বিশ্বের সমস্ত বিস্ময় আর সমস্ত ধিক্কার-বাণী।

"পাঠাল না?"

"না!"

পথশ্রান্ত নাপিত-বৌ শুধু এই একটি শব্দ উচ্চারণ করে পা ছড়িয়ে বসল।

প্রথম বড় ঢেউয়ের পরবর্তী আর একটি ছোট ঢেউ।

"তুই হার মেনে ফিরে এলি ?"

এবার বিস্ময় আর ধিক্কারের পালা নাপিত বৌয়ের। "শোনো কথা ! তাদের মেয়ে, তারা পাঠালে না, আমি কি তাদের ঘর থেকে মেয়ে কেড়ে নিয়ে আসব ?"

এবার বাঁড়ুয্যে গিন্নী নিজেই পা ছড়িয়ে বসলেন, দুই ভ্রূ এক জায়গায় এনে জড়ো করার চেষ্টা করতে করতে বললেন, "ছুতোটা কী দেখাল ?"

"শোনো কথা। ছুতো আবার কিসের, সোজাসুজি মুখের ওপর ঝাড়া জবাব, 'এখন পাঠাব না'।"

নাপিত বৌ আঁচল খুলে পানের কৌটো বার করে।

"এক্ষুনি পান মুখে ভরিস নে নাপিত বৌ, চোদ্দবার উঠবি পিক্ ফেলতে। আমার কথাগুলোর আগে উত্তর দে। বলি ছুতো যুক্তি কিছু না – শুধু পাঠাব না ?"

"এখন পাঠাব না।"

"তা কখন পাঠাবেন ? আমার ছেরাদ্দর সময় ? আমি যে ভেবে থই পাচ্ছি নে রে নাপিত বৌ, মেয়ের বাপের এত বড় বুকের পাটা। পৃথিবীতে এখনও চন্দ্র সুয্যি উঠছে, না থেমে গেছে ? একথা ভেবে বুক কাঁপল না যে, তোর মেয়েকে যদি ত্যাগ দিই।"

নাপিত-বৌ নিষেধ অগ্রাহ্য করে মুখে পান-দোক্তা পুরে বলে, "বুক কাঁপবে। হুঁঃ। একটা কেন একশটা মেয়েকে ঘরে ঠাই দেবার, ভাত কাপড় দে' পোষবার ক্ষমতা তাঁদের আছে ! লক্ষ্মীমন্তর ঘর বটে।"

"খুব বুঝি গিলিয়েছে।" বাঁড়ুয্যে গিন্নী দুরন্ত ক্রোধকে পরিহাসের ছদ্মবেশ পরিয়ে আসরে নামান, "তাই বেয়াই বাড়ির লক্ষ্মীর ঘটায় চোখ ঝলসেছে ! বলি ঘরে ভাত থাকলেই মেয়ের শ্বশুরবাড়ির আশ্রয় ঘোচাতে হবে ? এত বড় আসপদ্দার পর আর ওদের মেয়ে আনব আমি ?"

"খাওয়ার কথা তুলে খোঁটা দিও নি বামুন বৌদি, তোমাদের আশীর্বাদে নাপিত বৌয়ের অমন খাওয়া ঢের জোটে। তবে হ্যাঁ, নজর আছে বটে ! শুধু পয়সা থাকলেই হয় না, নজর থাকা চাই।"

কথাটা অর্থবহ, এবং সে অর্থ বাঁড়ুয্যে গিন্নীর অন্তরে ছুঁচের মত গিয়ে বেঁধে, তবু তিনি নিজেকে সংযত করে বলেন, "তা নজরের পরিচয় কি দেখাল ? বিশ ভরির চন্দরহার গড়িয়ে দিয়েছে তোকে, না কি পঁচিশ ভরির গোট ?"

"উপহাস্যির কিছু নেই, যা অনেয্য তা বললে চলবে কেন ? একজোড়া ফরাসডাঙার থান, একখানা কেটে ধুতি আর নগদ পাঁচ টাকা কে দেয় গা কুটুমবাড়ির লোককে ?"

"দেবে না কেন, যারা মেয়ে ঘরে আটকে রেখে দিতে চায়, তারা ঘুষ দিয়ে মুখ বন্ধ করে কুটুমের লোকের। নইলে তুই তাদের যাচ্ছেতাই শুনিয়ে দিয়ে না এসে সুখ্যোত করছিস বসে বসে। তোর ওপর আমার ভরসা ছিল, এ তল্লাটে তোর মতন 'মুখ' তো

কারুর দেখি না, আর তুইই ডোবালি ? বাঘিনী হয়ে মেড়া বনে এলি ?"

"কী যে তকরার করো বামুন বৌদি, মেয়ের বাপ নিজে তফাতে দাঁড়িয়ে গিন্নীকে বলে দিল, 'মা, কুটুমবাড়ির মেয়েকে বলে দাও, বিয়ের সময় কথা হয়েছিল মেয়ের কুমারীকাল পুন্ন না হলে শ্বশুরবাড়ি পাঠানো হবে না, সে কথা তাঁরা হয়তো বিস্মরণ হয়ে গেছেন, আমি তো হই নি। সময় হলে যাবে বৈ কি!"

বাঁড়ুয্যে গিন্নী বিবাহকালের শর্ত উল্লেখে ধেই ধেই করে ওঠেন, "কী বললি নাপিত বৌ, বিয়ের কালের শত্তু-সাবুদের কথা তুলেছে ? কথা অমন কত হয়—বলে লাখ কথা নইলে বিয়ে হয় না—বলি তাঁদের চরণে খত লিখে দিয়েছিল কেউ ? আমার ঘরের বৌ আমার যদি আনতে ইচ্ছে হয়! আচ্ছা আমিও দেখছি কত তাদের আসপদ্দা, কত তাদের তেজ। মেয়েকে শুধু ভাত-কাপড় দিলেই যদি সব মিটে যেত, তা হলে আর কেউ তাকে বিয়ে দিয়ে পরগোত্তর করে দিত না, বুঝলি নাপিত বৌ ? আসছে মাসেই বেটার আবার বিয়ে দেব আমি, এই তোকে বলে রাখলাম।"

নাপিত বৌ নিমকহারাম নয়। অনেক খেয়ে অনেক পেয়ে এসেছে, তাই বেজার মুখে বলে, "সে তোমাদের কথা তোমরা বুঝবে, বেয়াই তো পত্তর লিখে দিয়েছে বামুনদাদার নামে, ন্যাও রাখো।"

"তুই যে তাজ্জব করলি নাপিত বৌ, এই কদিনে তোকে তুক্ করল না গুণ করল লো ? তাই ঘরশত্তুর বিভীষণ হলি! কেবল ওদের কোলে ঝোল টেনে কথা বলছিস। কই, পত্তর কোথা ?"

"এই যে" নাপিত বৌ নিজের গামছার পুঁটলির গিঁট খোলে।

বাঁড়ুয্যে গিন্নীর অবশ্য তৎপরতার অভাব নেই, তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পুঁটলির মধ্যে শ্যেন-দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলেন, "কই, বড়মানুষ কুটুম কী দিয়েছে দেখি।"

একটি ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলি খুলে একখানি দোমড়ানো মোচড়ানো চিঠি বার করে মাটিতে নামিয়ে দিয়ে নাপিত বৌ প্রাপ্ত সম্পদ দেখায়, "এই কেটে, এই কাপড়ের জোড়া, এই গামছা, আর - "

"ও বাবা আবার নতুন ঘটি কাঁসি দিয়েছে যে দেখছি!" বাঁড়ুয্যে গিন্নী বলেন, "সাধে কি আর বলছি ঘুষ দিয়েছে! তা নাকুর বদলে নরুন নিয়ে ফিরলি তুই ? কাঁসিখানা তো দেখছি ভারী পাথরকুচি।"

"তা ভারী আছে। আর কথাবার্তাও ভাল। বাড়িসুদ্ধু গিন্নীরা যেন আমায় হাতে রাখে কি মাথায় রাখে। সে তুমি যাই বলো বামুন বৌদি, কুটুম তোমার খুব ভাল হয়েছে। অমন কুটুমের সঙ্গে অসরস করলে তুমিই ঠকবে। তবে গিয়ে বৌ তোমার, মিছে বলব না, একটু বাচাল।"

'বাচাল!

সহসা যেন পাথরে পরিণত হলেন বাঁড়ুয্যে গিন্নী।

"বাচাল! আর সে কথা এতক্ষণ বলছিস না তুই? হবেই তো, বাচাল হবে না? বাপের চালচলন তো বুঝতেই পারছি, পয়সার গরমে ধরাকে সরা দেখেন, মেয়েকে আশকারা দিয়ে ধিঙ্গী অবতার করে তুলেছেন আর কি! আমিও এলোকেশী বামনী, বাচাল বৌকে কেমন করে টীট্ করতে হয় তা আমার জানা আছে।"

"তা আর জানা থাকবে না?" ঠোঁটকাটা নাপিত বৌ বলে বসে, "আরও একটা মানুষের মেয়েকে ঘরে পুরে কী হালে রেখেছ তা তো আর কারু অজানা নেই। তা এ বৌকে আর তুমি টীট্ করছ কখন, বেটার তো আবার বে দিচ্ছ।"

নাপিত বৌয়ের কথায় এবার একটু ভয় খান বাঁড়ুয্যে-গিন্নী এলোকেশী। ও যা মুখফোঁড়, পাড়ায় পাড়ায় সমস্ত রটিয়ে বেড়াবে, হাটে হাঁড়ি ভাঙবে। বাঁড়ুয্যেরা বৌ আনতে পাঠিয়েছিল, বড়মানুষ বেহাই মেয়ে পাঠায় নি, এ খবর রাষ্ট্র হলে কি আর মাথা হেঁট হবার কিছু বাকী থাকবে? নাপিত বৌকে চটানোটা ঠিক হয় নি। চটায় না ওকে কেউ, চটাতে সাহসই করে না। সকলের হাঁড়ির খবর রাখে, সকল ঘরে যাতায়াত করে, আর সময় অসময়ে নাপিত বৌয়ের শরণ না নিলে কারুর চলে না। যেমন তেজী তেমনি বিশ্বাসী, আর তেমনি জোরমস্ত ডাকাবুকো। একটা মদ্দজোয়ানের ধাক্কা ধরে নাপিত বৌ। বৌ মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বাপের বাড়ি করতে নাপিত বৌ এ গ্রামের ভরসাস্থল।···চৈতন্য হয় সেটা, এবার তাই আর একবার দেঁতো হাসি হাসেন বাঁড়ুয্যে গিন্নী, "তবে আর কি, যা দেশ-রাজ্যে রাষ্ট্র করে আয়, আমি আবার বিয়ে দিচ্ছি বেটার! মরণ আর কি, গা জ্বলে যায়! কিন্তু তুইই বল, রাগে মাথার রক্ত চড়ে ওঠে কি না। যাক বিশদ বৃত্তান্ত বল দিকি, তুই কি বললি, তারা কি বলল, মেয়েই বা—"

"সাতকাণ্ড রামায়ণ গাইবার সময় এখন আমার নেই বামুন বৌদি, দুদিন দু রাত পায়ের ওপর, সর্ব্বাঙ্গ যেন ভেঙে আসছে। ঘরে যাই এখন।"

"ঘরে আর যাবি কেন", বাঁড়ুয্যে গিন্নী নিষ্প্রভ ভাবে বলেন, "এখানেই নয় দুটো—"

"না বাবা, ওতে আর দরকার নেই, কথায় বলে 'ভাইয়ের ভাত ভেজের হাত!' ঘরে গে দু দণ্ড জিরোই, তার পর বোঝা যাবে।"

আরো নরম হতে হয়, আরো তোয়াজ করতে হয়। শক্তের ভক্ত পৃথিবী।

"হ্যাঁলা, তা মাথায় বিষবাণ বিঁধে রেখে দিলি, উদ্ধার কর? মেয়ে কি বলল তাই বল? তুই কুটুমের বাড়ি থেকে গিয়েছিস, তোর সামনে কি বাচালতা করল?"

"করল কি আর গাছে চড়ল? তা নয়। তবে ঠাকুমাদের সঙ্গে খুব হাত মুখ নেড়ে বক্তিমে করছিল দেখছিলাম। গিন্নীরা বলছিল, কুটুম চটানো ঠিক নয়, তোমার বেয়াইয়ের দুর্বুদ্ধির নিন্দে করছিল, তা দেখি ঘরের মধ্যে ঝাঁজ দেখাচ্ছে, 'বাবার কথার ওপর কথা? বাবার চাইতে তোমার বুদ্ধি বেশী? বে'র সময় যদি কথা হয়ে গেছল বারো

বছর বয়েস না হলে তারা বৌ নিয়ে যাবে না,.তো নিতে পাঠায় কোন্ আইনে' ? এই সব !"

কিন্তু বাঁড়ুয্যে-গিন্নীর তখন আর বাক্‌স্ফূর্তির ক্ষমতা নেই। পুত্রবধূর বাক্-বিন্যাস প্রণালীর সংবাদে সে ক্ষমতা লোপ পেয়েছে তাঁর।

কিছুক্ষণ গালে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে থেকে সনিঃশ্বাসে বলেন, "হ্যাঁলা বৌ, তুই তো আমাকে খুব উপহাস্যি করলি, বেটার আবার বে দেব বলেছি বলে, তা তুইই নিজে মুখে স্বীকের কর, এ বৌ নিয়ে ঘর করা যাবে ? বাবার জন্মে তো এমন কথা শুনি নি নাপিত বৌ, যে শ্বশুরঘরে যাওয়ার কথা নিয়ে ঘরবসতের বৌ কথা কয়, চিপ্‌টেন কাটে !"

"বাপের একটা তো, একটু বাপসোহাগী আছে। তা ও দোষ কি আর থাকবে ? আপনিই যাবে। কথাতেই তো আছে গো—'হলুদ জব্দ শিলে, চোর জব্দ কীলে, আর দুষ্টু মেয়ে জব্দ হয় শ্বশুরবাড়ি গেলে '।"

"জানি নে মা, আমার তো ভয়ে পেটের মধ্যে হাত-পা সেঁদিয়ে যাচ্ছে। বুড়ো বয়সে বেটার বৌয়ের হাতে কি খোয়ার আছে তা জানি নে! আবার বে দেব আর কোথা থেকে ? তোর বামুনদাদা যে বেয়াইয়ের বিষয়-সম্পত্তির ওপর টাঁক করে বসে আছে। বলে বাপের একটা মেয়ে, বাপ চোখ বুজলে সব মেয়ে জামাইয়ের।"

"শোন কথা !" এবার গালে হাতের পালা নাপিত বৌয়ের, "ওই বিরিঞ্চির গুষ্টি, অমন সব সোনারচাঁদ ভাইপো রয়েছে। তারা পাবে না ? তা ছাড়া ভাগভেন্ন তো নয় ?"

"তা জানি নে বাপু, কত্তা বলে তাই শুনি। বলে বাপটা একবার চোখ বুজলে হয় !"

"কার চোখ আগে বোজে, কে কার বিষয় খায়, কে বলতে পারে বামুন বৌদি ! বেয়াইয়ের তো তোমার সোনার গৌরাঙ্গর মতন চেহারা, এখনো বে দিলে বে দেওয়া যায়। যাকগে বাবা, তোমাদের কথা তোমরা বোঝ। যাই উঠি। বামুনদাকে পত্তরখানা দিও।"

নাপিত বৌ উঠতে যায়, আর সেই মুহূর্তেই বামুনদাদার আগমনবার্তা ঘোষণা করে—খড়মের খট খট।

"এ কী, নাপিত বৌ ফিরে এলি যে ?"

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে বাইরের উঠোন থেকে ভিতর উঠোনে পা ফেলেন বাঁড়ুয্যে।

"ফিরে না এসে অকারণ আর কতদিন কুটুমের অন্ন ধ্বংসাব ? অবিশ্যি তারা অনেক বলেছিল আর দশদিন থেকে—"

"তা তুই গিয়েছিলি কি করতে ? বৌ কই ?"

"পাঠাল না।"

বজ্রনির্ঘোষ ধ্বনিত হয় গৃহিণীর কণ্ঠ হতে।

"পাঠাল না !"

আর একবার প্রমাণিত হল একটি প্রশ্নের মধ্যেই জগতের সমস্ত বিস্ময় প্রকাশ করা সম্ভব।

ছেলেকে খেতে বসিয়ে কথাটা পাড়লেন এলোকেশী। নাপিত বৌ নিষিক্ত অগ্নিধার শরীরের মধ্যে পরিপাক করতে করতে বেগুনেরঙা হয়ে উঠেছিলেন তিনি, তাই ভাতের থালাটা ছেলের পাতের গোড়ায় ধরে দিয়ে যখন পিদ্দিমের সলতেটা একটু বাড়িয়ে পা ছড়িয়ে বসলেন, মায়ের ভীষণাকৃতি মুখ দেখে বুকটা কেঁপে উঠল নবকুমারের।

নবকুমারের বয়স আটারো-উনিশ হলেও মায়ের কাছে সে দুগ্ধপোষ্যের সম গোত্র। আর মা এবং যম তার মনের জগতে সমতুল্য। মা যখন মুখ ছোটায়, তখন ভয়ে নবকুমারের হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যায়। যার উদ্দেশেই সেই লাভাস্রোত প্রবাহিত হোক, নবকুমার ভয়ে কাঁপে।

আজকের গালিগালাজের স্রোতটা আবার নবকুমারেরই শ্বশুরবাড়িকে কেন্দ্র করে, কাজেই খাওয়া আর হয় না বেচারার। ভয়ে লজ্জায় ঘাড়টা নিচু হতে হতে প্রায় থালার সঙ্গে ঠেকে আসে।

নাপিত বৌ কুটুমবাড়ি যাওয়া পর্যন্ত মনের মধ্যে একটি পুলকের গুঞ্জরণ বইছিল নবকুমারের, ছড়ানো ছিটোনো কথায় শুনতে পাচ্ছিল এলোকেশী না কি বৌকে আনতে পাঠিয়েছেন।

কেমন সেই বৌ, কি তার নাম, কি রকম দেখতে, এসব লজ্জাকর চিন্তাকে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারছিল না নবকুমার। শয়নে স্বপনে একটি মুখচ্ছবি আবছা আবছা ছায়া ফেলে বাড়ির এখানে সেখানে, এলোকেশীর কাছে কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ঘোমটা টেনে টেনে।

শোবার ঘরে ? অনবগুণ্ঠনে ?

ওরে বাবা, অত দুঃসাহসী কল্পনার সাহস নবকুমারের নেই। সে ভাবনার ধারে-কাছে গেলেই বুক গুরগুর করে ওঠে তার। মার সামনে দাঁড়ালে তো কথাই নেই, আশঙ্কা হয় ছেলের মনের ভিতরটা 'কাঁচদীঘি'র জলের ভিতরটার মতই দেখতে পাচ্ছেন এলোকেশী।

না, শোবার ঘরের এলাকায়, কি নিজের ধারে-কাছে বৌয়ের উপস্থিতির অবস্থা চিন্তা করে না নবকুমার, করে শুধু মায়ের ধারে-কাছেই।

নাপিত বৌয়ের অভিযান কার্যকরী হবে না, এরকম অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনার কথা তার স্বপ্নেও মনে আসে নি, তাই এই ক'দিনই প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভবতোষ মাস্টারের কাছে ইংরিজি পড়া পড়ে বাড়ি ফিরে, উৎকর্ণ হয়ে থাকে একটি মৃদু ঝুনঝুন মলের শব্দের আশায়!

কিন্তু কই ?

ক'দিনের কড়ারে গেছে নাপিত বৌ, সে খবর নবকুমারের জানবার কথা নয়, তবু আশা করছিল পুজোর আগে অবশ্যই। আর পুজোর উৎসবের সঙ্গে হৃদয়ের আর এক উৎসবকে যুক্ত করে নিয়ে অবিরত বিহ্বল হচ্ছিল সে।

পুজো আসছে!

বৌ আসছে!

পুজোটা জানা, কিন্তু না জানি কেমন সে বৌ।

বিয়ে হয়েছিল পনেরো পার হয়ে, এমন কিছু অজ্ঞানের বয়সে নয়, তবু লাজুক-প্রকৃতি নবকুমার বিয়ের কোন অনুষ্ঠানের সময়ই একটু চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেও কনেবৌকে দেখে নেবার চেষ্টা করেনি। এখন যদি কেউ বদলে অন্য মেয়ে গছিয়ে দেয়, ধরার সাধ্য হবে না নবকুমারের।

এমন কি এই কদিন ধরে শত চেষ্টাতেও বৌয়ের নামটা মনে আনতে পারছে না সে। এতদিন অবশ্য মনে আনবার খেয়ালও হয় নি, নাপিত বৌয়ের অভিযানই সহসা নবকুমারকে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছে। কৈশোর থেকে যৌবনের ধাপে।

বিয়ের সময় সম্প্রদানকালে নামটা তো দু-এক বার উচ্চারিত হয়েছিল মনে হচ্ছে, কিন্তু কে তখন ভেবেছে এই নামটা মনে রাখবার দায়িত্ব তার। নবকুমার তো তখন অবিরাম ঘামছে!

ওই ঘামটাই মনে আছে, নাম-টাম নয়।

একে তো বিয়ের বর, তা ছাড়া—শ্বশুরের সেই দৃপ্ত উন্নত চেহারা, গম্ভীর স্বর, আর রাশভারী ভাব। সেটাও সেই ভয়কে বাড়িয়ে দেওয়ার সহায়তা করেছিল।

তা ছাড়া বাসরঘরে আরও কত রকম ভয়!

সে ভয় এখনও বুঝি একটু একটু আছে।

কিন্তু 'বৌ' শব্দটা কী মিষ্টি! ভয়ের মধ্যেও রোমাঞ্চ।

'কওনা কথা মুখ তুলে বৌ,
দেখ না চেয়ে চোখ খুলে!'

মনের মধ্যে বাজছে সুর আর শব্দ। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে বৌয়ের আসন্ন আবির্ভাব নিয়ে আলোচনা করবার ক্ষমতাও নেই নবকুমারের। পাড়ার বন্ধু যারা খবরটা শুনেছিল, তারা যদি একটু-আধটু ঠাট্টা করছে, "ধেৎ, ধেৎ" ছাড়া আর কোনও উত্তর দিতে পারছে না সে।

অথচ যখন ভবতোষ মাস্টারের কাছ থেকে পড়া সেরে সন্ধ্যায় কাঁচদীঘির নির্জন পাড় দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, তখন অনুচ্চারিত শব্দে বারবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে গেয়েছে—

'এনেছি বকুলমালা করবে আলা
তেল চোয়ানো তোর চুলে!

মিশি দাঁতের হাসিটি বেশ,
মুখখানি বেশ ঢলঢলে।'

তারপর কি? তাই তো! 'মুখখানি বেশ ঢলঢলে, মুখখানি বেশ'—পরের লাইনটা কিছুতেই মনে পড়ে না, কোথা থেকে যে শিখেছিল তাও মনে পড়ে না। তবু ওই অসমাপ্ত গানটাই অপূর্ব সুরে গুঞ্জরিত হতে থাকে সমস্ত রাস্তাটা!

ক'দিনের প্রত্যাশার পর আজ বাড়ি ফিরেই এলোকেশীর প্রদত্ত-সমাচারে বুকটা ছলাৎ করে উঠল। আর সেই বিয়ের দিনের মত ঘাম ছুটে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

"নাপিত বৌ এসেছে শুনেছিস!" বলে উঠলেন এলোকেশী।

বাঘিনীর মত বসেছিলেন দাওয়ার ধারে। ছেলে এসে পা-টা হাতটা ধোবে, এটুকু সময়ও দেরি সইল না তাঁর। দিয়ে বসলেন সংবাদ। অন্ধকারেই বলে বসলেন, আলোটাও আনলেন না ছেলের সামনে।

নবকুমারের কাছে অবশ্য এ সংবাদ অন্য অর্থ বহন করে এনেছে, তাই তার চিত্তে বিহ্বলতা! তাই মার বর্তমান অবস্থা ধরতে পারল না সে। ধরতে পারল না কণ্ঠস্বরের ভীষণতাও। তাই না-জানা একটা সুখে শিউবে উঠল।

কিন্তু কতক্ষণের জন্যেই বা!

স্বল্পকালের মধ্যেই নিষ্ঠুর সত্য প্রকাশিত হল।

মান্যগণ্য বেহাইয়ের উদ্দেশে 'ছোটলোক' 'চামার' 'আসপদ্দাবাজ' ইত্যাদি শোভন সুন্দর বিশেষণমালা প্রয়োগ করে এলোকেশী জানালেন, "মেয়ে পাঠাল না।"

মেয়ে পাঠাল না!

এ কী অদ্ভুত বাণী!

মেয়ে না পাঠানো যে সম্ভব, সে কথা তো একবার মনের কোণেও আসে নি নবকুমারের।

কিন্তু এ কথায় আর কি কথা কইবে নবকুমার? আর উত্তরের প্রত্যাশা করেও কথা বলেন নি এলোকেশী।

আরও খানিকক্ষণ ধরে বেহাইয়ের 'পয়সার গরম' তুলে, নাপিতবৌকে ঘুষ দিয়ে 'হাত-করা'র বার্তা জানিয়ে, অবশেষে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন এলোকেশী, ছেলেটা সেই অবধি উঠোনেই দাঁড়িয়ে আছে কাঠ হয়ে।

মাতৃস্নেহ জেগে উঠল।

"আর দাঁড়িয়ে থেকে কি কববি, হাত মুখ ধো।" বলে এলোকেশী উচ্চগ্রামে চীৎকার করলেন, "ভাত নেমেছে সদু?"

রান্নাঘর থেকে সাড়া এল, "নেমেছে মামীমা।"

"আয় মুখ ধুয়ে, ভাত দিই।" বলে রান্নাঘরেব দিকে চলে গেলেন এলোকেশী। আর নবকুমার আস্তে আস্তে গায়ের কোটটা খুলে দেয়ালে লাগানো একটা গজালে টাঙিয়ে রেখে চলে গেল খিড়কি পুকুরের দিকে।

হঠাৎ মনটা কেমন শিথিল আর ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।-যা ছিল না, কোন দিনই যার স্বাদ জোটে নি, তেমন জিনিস হারালেও এমন শূন্যতা-বোধ আসে? সব ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে?

কিন্তু তখনই বা হয়েছে কি?

আসল কথা পাড়লেন এলোকেশী ছেলেকে খেতে দিয়ে পিদ্দিমের সলতে উসকে পা ছড়িয়ে বসে।

যে মুখ দেখে বুক কেঁপে উঠল নবকুমারের।

"আমি এই তোকে বলে রাখছি নবা, শেষবেশ একটা চিঠি চামারটাকে দেওয়াব কর্তাকে দিয়ে, তাতেও যদি মেয়ে না পাঠায়, এই সামনের অঘ্রানেই তোর আবার বিয়ে দেব।"

আবার বিয়ে!

মা কি আজকে বুক ধড়াস ধড়াস করিয়েই মারবে নবকুমারকে?

আবার বিয়ে!

তার মানে আবার আর একবার নবকুমারকে নিয়ে সেই নকড়া-ছকড়া খেলা, আবার আর একটা বাড়িতে গিয়ে সেই সম্প্রদান, সেই বাসর, সেই কানমলা, সেই ঘাম!

ঘাড়টা প্রায় পাতের সঙ্গে ঠেকে যায় নবকুমারের। মুখ দিয়ে কথাও বেরোয় না, মুখের মধ্যে ভাতের গ্রাসও ঢোকে না।

হঠাৎ এক সময় কটূক্তি থামিয়ে এলোকেশী বলেন, "খাচ্ছিস কই?"

"খাচ্ছি তো!" এতক্ষণে অস্ফুটে একটা কথা বলে নবকুমার, এবং বাক্যের সত্যতা রক্ষার্থে এক গ্রাস ভাত ঠেলে তুলে মুখের মধ্যে চালান দেয়।

এবার সদু বা সৌদামিনীর রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। মাটির সরায় এক সরা ধোঁয়া-ওঠা গরম ভাত নিয়ে এসে অবাক গলায় বলে ওঠে সে, "ও মা, ই কি। যেখানকার ভাত সেখানে পড়ে! এতক্ষণ কি করলি রে নবু?"

"খাচ্ছি তো।" আরও একবার পূর্ব কথা এবং পূর্বোক্ত কাজের পুনরাবৃত্তি করে নবকুমার।

"দিয়ে যাই আর দুটো?"

"না না আর নয়", ভরা মুখে হাত মুখ মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে নবকুমার।

"খিদে নেই?"

নবকুমার আর একবার বলে, "খাচ্ছি তো!"

এদিকে ঠেলে ওঠা চোখে জল আসতে চায়।

"খিদে আর থাকবে কোথা থেকে।" এলোকেশী বলে ওঠেন, "শ্বশুরের নিন্দে করেছি যে! একালের ছেলে তো! কিন্তু তোকে আবারও এই বলে রাখছি নবা, তোর দেমাকে-শ্বশুরের ওই খাড়া নাক যদি না ভুঁয়ে ঘষটে দিই আমি তো কি বলেছি! বাপ বাপ বলে ওই মেয়ে ঘাড়ে করে নাকে খৎ দিতে দিতে আসে তো ভাল, নচেৎ আবার ছাদনাতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে তোকে! এবার আর নবাবের বেটী আনব না, গরীব-গুরবো ঘরের মেয়ে নে আসব।"

"ওই শোন্", সদু হেসে ওঠে, "আর মুখগোঁজ করে থাকবার কিছু নেই রে নবু, আশ্বাস-

বাকিয়ে পেয়ে গেলি! এখন বড় বড় খাবার খেয়ে নে।...বৌ এল না বলে মনের দুঃখে নবু অমন সরলপুঁটির টকটাই ভাল করে খেল না, দেখেছ মামী!"

"সব সময় ন্যাকরা করিস নে সত্য", এলোকেশী বেজার মুখে বলেন, "চব্বিশ ঘণ্টা হাসি-মশকরা ভালও বা লাগে! প্রাণে কিসের যে এত উল্লাস তাও তো বুঝি না।"

কথাটা সত্যি।

উল্লাস আসবার কথা সত্যর নয়।

তবু আসে।

তবু রং-তামাশা করে সত্য, হি হি করে হাসে। কিন্তু হাসি আসে কি করে সত্য নিজেই কি জানে ছাই?

হয়তো এ জগতে একমাত্র ওইটুকুই ওর নিজের এক্তারে আছে বলে আনায়। দুর্ভাগ্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে হি হি করে হেসে বেড়ায় সে, বুকের পাথরখানা ঠেলে ফেলে দিতে।

অবিরত ওই পাথরখানা বুকে বইতে হলে কি ঘুরে ফিরে আর অসুরের মত খেটে বেড়াতে পারত?

গাঁ-সুদ্ধ সবাই তো ধিক্কার দেয় সত্যর ভাগ্যকে, সবাই তো জানে সত্যকে বরে নেয় না! অকারণ, শুধু খেয়ালের বশে সত্যকে সত্যর বর ত্যাগ করেছে! স্বভাব-চরিত্র খারাপ তো অনেকেরই থাকে, পরিবারকে ত্যাগ আর কজন করে?

সত্যর মা নেই বাপ নেই, আজন্ম মামার বাড়ি মানুষ। মামা দু তিন বার চেষ্টা করে করে শ্বশুরবাড়ি রেখে এসেছিল তাকে, কিন্তু কিছুতেই নিজের আসন দখল করতে পেরে উঠল না হতভাগা মেয়েটা। দুর্ব্যবহারের চোটে পালিয়ে আসতে পথ পায় নি।

তদবধি আবার এই মামার বাড়িতেই স্থিতি।

তা ছাড়া উপায় কি?

মামার বাড়িতে আছে, দুবেলা হেঁসেল ঠেলছে, জুতো চণ্ডী সব নাড়ছে, আর মামীর মুখনাড়া খাচ্ছে।

তবু সে হাসে।

বলিহারি!

'বলিহারি যাই বাবা!' মামী বলে, পাড়াসুদ্ধ সবাই বলে। শুনে শুনে নবকুমারেরও এমন ধারণা হয়ে গেছে, হাসিটা সত্যদির পক্ষে গর্হিত, তাই সে হাসি-ঠাট্টায় কোনও দিনই তেমন করে যোগ দিতে পারে না। আর আজকের কথা তো স্বতন্ত্রই! আজকের হাসি-ঠাট্টার বিষয়বস্তু তো নবকুমার নিজেই।

"দুধটা আনবি, না দাঁড়িয়ে রঙ্গ করবি?"

ধমকে ওঠেন এলোকেশী।

ছেলের কোলের গোড়ায় ভাতের থালাটি বসিয়ে দেওয়া ছাড়া আর বেশী নড়াচড়া করেন না এলোকেশী। দ্বিতীয়বার যা কিছু লাগে 'সদু সদু' হাঁক। মস্ত স্থবিধে, সদু বিধবা পুত্রি নয়। বিধবা হলে তো এক মহা ঝঞ্ঝাট—রাত্তিরে আঁশ হেঁসেলের ভার দেওয়া যায় না! এক্ষেত্রে আর কোন দ্বিধা-দায় নেই। বড় বড় সরলপুঁটির টক সদু তো নিজেও একটু খাবে, অতএব কুটুক বাছুক রাঁধুক।

কর্তা নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের বয়স যাই হোক, রাতে ভাত খাওয়া ছেড়েছেন তিনি অনেক দিন। ঘরের গরুর খাঁটী দুধ দেড়-সেরখানেককে মেরে আধসের করে সর পড়িয়ে রাখা হয়, তাতেই বাড়িতে ভাজা টাটকা খই ফেলে গোটা আষ্টেক মনোহরা মেখে আহার সারেন নীলাম্বর।

সে সারা তাঁর সন্ধ্যাহ্নিক সেরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই হয়। নবু মাষ্টারের কাছে পড়ে ফেরার আগেই। আবার তিনি যখন বেড়িয়ে ফেরেন, নবুর তখন অর্ধেক রাত্তির, কাজেই এ বেলায় বাপে-ছেলেতে দেখাই হয় না। ছেলের যে এই এক বেয়াড়া খেয়াল হয়েছে, ইংরিজি শিখবে! ওই ম্লেচ্ছের ভাষা শিখে কি চতুর্বর্গ লাভ হবে কে জানে, তবু খুব একটা বাধাও দেন নি নবকুমারের স্নেহশীল পিতা। বলেছেন, ইচ্ছে হয়েছে পড়ুক!

আসল নষ্টের গোড়া তো ওই ভবতোষ বিশ্বাসটা। কলকেতা থেকে ইংরিজি শিখে এসে গাঁয়ে এখন ইস্কুল খোলা হয়েছে বাবুর! সকাল-বিকেল দু বেলা ইস্কুল বসায়। গাঁয়ের ছোঁড়াগুলোকে ক্ষ্যাপানোর গুরু! কানে মন্তর দিচ্ছে, ইংরিজি না শিখলে নাকি উন্নতি নেই, শিখে কলকাতায় গিয়ে হাজির হতে পারলে সাহেবের অফিসে মোটা-মাইনের চাকরি অবধারিত! ছুটছে সবাই ওর ইস্কুলে। চালাকের রাজা ভবতোষ। ফাস্‌ট্ বুক্, সেকেন বুক্, কত সব শক্ত শক্ত বই কিনে এনেছে কলকাতা থেকে, তাই থেকে পড়িয়ে পড়িয়ে বিদ্যে-দিগ্‌গজ করছে সবাইকে!

বামুনের ঘরের ছেলেগুলো যাচ্ছে শুদ্দুরের কাছে বিদ্যে নিতে! কলি পূর্ণ হতে আর কতই বা বাকি!

তবু ছেলেকে বাধা দেন নি নীলাম্বর, কলির তালেই চলেছেন। শুধু ওই ম্লেচ্ছ-ভাষা-শিখে-আসা জামা-কাপড়গুলো ঘরে তোলে না, পরে কিছু ছোঁয় না, ছেড়ে হাত পা ধুয়ে গঙ্গাজল স্পর্শ করে, এই পর্যন্ত!

নবকুমারকে খাইয়ে মামী-ভাগ্নী দু জনে রান্নাঘরে বসে পড়ে খেতে। ওরা তো আর ভাত বেড়ে পিঁড়ে পেতে খাবে না, কাঁসি গামলা যাতে তাতে খেয়ে নেবে মাটিতে থেবড়ে বসে। তা এ সময় গল্পটা চলে ভাল। ফি হাত ধমক দিলেও ভাগ্নীকে নইলে চলেও না এলোকেশীর। কথা কইবার সঙ্গী বলতে দ্বিতীয় আর কে?

খাওয়ার পর রান্নাঘর ধোবার ভার সৌদামিনীর।

ঘর ধুয়ে পরদিনের জন্যে রান্নার কাঠ গুছিয়ে চকমকি ঠিক করে রেখে, কাজকরা কাপড়

কেচে তবে শুতে যায় সদু। শোবার জন্যে তার নামে একটা ঘর আছে বটে, বিছানাও আছে, কিন্তু সে ঘরে সে বিছানায় কতটুকুই বা শুতে পায় সে? নীলাম্বর যতক্ষণ না আসেন, এলোকেশীকে আগলাতে হয়, কারণ এলোকেশীর বড় ভূতের ভয়!

নীলাম্বর আসার পর তাঁর জল চাই কি না, তামাক চাই কি না, খোঁজখবর করে তবে সদুর ছুটি। তা সে ছুটিটা প্রায়ই রাতের আধখানা গড়িয়ে গিয়ে হয়!

অবিশ্যি তার পর বাকীরাতটা সদুকে কে আগলাবে, এ প্রশ্ন ওঠে না। সদু তো সদু! ওকে যদি এ নিয়ে আক্ষেপ প্রশ্ন করো, নিশ্চয় হেসে উঠে বলবে, "ভূতই আমায় আগলায়। জানো না—আমি যে শাঁকচুন্নী!"

তবু সদু মামীকে ভালবাসে, মামাকে ভক্তিসমীহ করে, নবকুমারকে প্রাণতুল্য দেখে।

তার এই বত্রিশ বছরের জীবনে ভালবাসার, ভক্তি করবার, স্নেহ করবার জন্যে পেলই বা আর কাকে?

ভোরবেলাই ঘুমটা ভেঙ্গে গেল।

কারণটা কিছু মনে নেই, তবু যেন মনে হল নবকুমারের, বুকটায় কী একটা পাষাণভার চেপে রয়েছে! যেন আস্ত একটা পাহাড়ই কেউ বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে কোন্ ফাঁকে! রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ছিল যেন কি এক আতঙ্কের স্বপ্ন!

একটুক্ষণ খোলা জানলার দিকে চেয়ে বসে থাকতে থাকতে সব মনে পড়ল। মনে পড়ল মায়ের শপথবাণী। মনে পড়ে হাত-পা ছেড়ে এল!

ধীরে ধীরে উঠে পড়ল, বেরিয়ে এল ঘর থেকে কোঁচার খুঁটটা গায়ে দিয়ে। ভোরের দিকে বেশ শীত শীত পড়ে গেছে। আর শরৎকালের সকালের এই গা সিরসিরে হাওয়াটাই তো কোন উধাও পাথারে মনটাকে ছুটিয়ে নিয়ে যায়।

বাইরে এসে দেখল সৌদামিনী উঠোনে ছড়াঝাঁট দিচ্ছে। কাছে গিয়ে বলল, "মা ওঠে নি সদুদি?"

"মামী!" সকালবেলাই হেসে গড়িয়ে পড়ে সৌদামিনী, "মামী আবার এমন সময়ে কবে ওঠে রে নবু? 'ভোর ঠাকুরের' সঙ্গে যে মামীর বিরোধ!"

খচ্ খচ্ ঝাঁটা চালাতে চালাতে বলে সদু, "সরে দাঁড়া নবু, ধুলো লাগবে!"

"লাগুক গে!" বলে বরং কাছেই সরে এল নবকুমার, কাছে এসে হঠাৎ শীতকালে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গীতে বলে উঠল, "সদুদি, তুমি মাকে বলে দিও ওসব পারব-টারব না।"

ঝাঁটা বন্ধ হল সৌদামিনীর।

চোখ গোল গোল করে বলল, "কি বলে দেব মামীকে? কী পারবি না?"

"ওই সব!" নবকুমার বকে ওঠে, "শুনলে তো কাল নিজের কানে, আবার শুধোচ্ছ কেন?"

"নাঃ, তুই আমায় অথই জলে ফেললি নবু, কালকের দিনভোর কত কথাই তো শুনেছি,

কোন্‌টা তোর মনে গিঁথে আছে, তা কেমন করে বুঝব ?”

“আঃ! আচ্ছা জ্বালায় ফেললে তো! নাপিত খুড়ীর ব্যাপারে রেগে গিয়ে মা যা বলল মনে নেই তোমার ?”

“ও হরি, তাই বল্‌! তোর আবার বিয়ে দেবে, এই কথা তো ?” ফের সত্তর সেই হি হি হাসি, “সেই চিন্তেয় রাতভোর ঘুমুস নি বুঝি ? নাকি সেই ‘ঠাকুর ঘরে কে, না আমি তো কলা খাই নি’, তাই ? মামী পাছে প্রিতিজ্ঞে বিস্মরণ হয়ে যায় তাই ‘আমি পারব না, আমি করব না’ বলে স্মরণ করিয়ে দিতে এসেছিস ?”

“আঃ সত্তদি, ভাল হবে না বলছি। আমি এই তোমায় বলে রাখছি ওসব পারব না। আবার ওই কানমলা-টানমলা—ওরে বাবা!”

সত্ত ফের হাতের কাজে মনোনিবেশ করে বলে, “তা আমায় বলে কি হবে ? মামীকে বল!”

“আমি বলব ? আমি বলব মাকে ?”

সত্ত হাসতে হাসতে বলে, “বলবি না কেন ? ডাগর হয়েছিস, সাহস হচ্ছে না ?”

“মার কাছে সাহস। হুঁঃ! এই তোমায় বলছি সত্তদি, আমি তোমার কাছে বলে খালাস, যা বিহিত করবার তুমি করবে।”

সৌদামিনী ফের হাত থামিয়ে বলে, “বেশ বলব মামীকে, নবুর আমাদের প্রেথম পক্ষের ওপর বড্ড আঁতের টান, ওকে ত্যাগ দিয়ে অন্যত্তর বিয়ে করবে না!”

“সত্তদি, ভাল হবে না বলছি! বলি, আবার ওই সব ভুতুড়ে কাণ্ডর দরকার কি ? নাই বা পাঠাল কেউ মেয়ে, পরের ঘরের মেয়ে নইলে বুঝি সংসার চলে না ?”

“কই আর চলে ?” সত্ত হাত মুখ নেড়ে বলে, “চললে আর এই আদি অন্তকাল ধরে মানুষে ওই সব ভুতুড়ে কাণ্ড করত না, বুঝলি রে নবু। এর পর ওই পরের মেয়েই জগতের সেরা আপন হবে।”

“ছাই হবে।” ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে নবকুমার, “কই, জামাইবাবুর তো হল না!”

সত্তর উচ্ছ্বাস কমে, একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, “ও কথা বাদ দে। আমার মতন ছাই-পোরা কপাল যেন অতি বড় শত্রুরও না হয়!”

নবকুমার সত্তর ভাবান্তরে ঈষৎ থতমত খেয়ে বলে, “আমি কিছু ভেবে বলি নি সত্তদি! কিন্তু যা বললাম, তোমাকে আমার রক্ষাকত্তা হতে হবে।”

“বেশ বলব মামীকে, যা দেখছি দু ঘা ঝাঁটা আছে ললাটে!”

তা সত্তর কথা মিথ্যা নয়। এলোকেশী সেই ব্যবস্থাই করেন।

তবে ললাটের ঝাঁটাটা দৃশ্যমান নয় এই যা। শব্দ অদৃশ্য। তবু এলোকেশী যখন কথার তুবড়ি ছোটান, মনে হয় তাঁর মুখ থেকে আগুনের হলকার মত দৃশ্যমানই কিছু বার হচ্ছে বুঝি।

শাক বাছতে বাছতে কথাটা পেড়েছিল সৌদামিনী, "ওগো মামী. তুমি তো বলছ ওরা পত্তরপাঠ-মাত্তর মেয়ে না পাঠালে তুমি ছেলের আবার বিয়ে দেবে, এদিকে ছেলে তো বেঁকে বসে আছে!"

"কী! কী বললি?"

মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল।

সদুকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি করে গাল দিয়ে ঘোষণা করলেন এলোকেশী, "যে আমার খেয়ে আমার প'রে সংসার ভাঙবার তাল খুঁজবে, তাকে ঝেঁটিয়ে দূর করে দেব তা এই বলে রাখছি সদু! আমার ছেলেকে কানে বিষমন্তর দিয়ে পর করে নিতে চাস লক্ষ্মীছাড়ি! উঠুক তোর মামা আহ্নিক করে, দেখাচ্ছি মজা।"

সদু প্রতিবাদও করে না, নিজের সাফাইও গায় না এবং এ প্রশ্নও তোলে না তার অপরাধ কোথায়? এমন কি তার মুখ দেখে এই মনে হয়, এই বাক্যবাণের লক্ষ্য বুঝি তার অপরিচিত কেউ!

নীলাম্বর আহ্নিক সেরে উঠে বাইরে এসে তামার কুশিতে সূর্যার্ঘ নিবেদন করে কুশিটা মাটিতে উপুড় করে, আর এক দফা সূর্য প্রণাম সেরে মুখ ফিরিয়ে দাড়াতেই, এলোকেশী 'দুধকলা দিয়ে কালসাপ পোষা'র নজীর তুলে স্বামীকে অবহিত করিয়ে দিয়ে বলেন, "তুমি যদি এই দণ্ডে চিঠি লিখে রওনা করে না দেবে তো আমার মাথা খাবে।"

নীলাম্বর 'আহাহা' করে উঠে বলেন, "দিব্যি গালাগালির কি আছে। পত্র লিখছি, কিন্তু পাঠাবার কি হবে তাই ভাবছি। নাপতে বৌ তো—"

"কেন গাঁয়ে কি ও ভিন্ন আর মানুষ নেই? রাখাল তো গেছল সেবার?"

"রাখাল যাবে? কিন্তু অতখানি পথ একেবারে একলা? তাই ভাবছি।"

"তা হলে গোবিন্দ আচার্যির ছেলে গোপনাকে পাঠাও। গাঁজার পয়সা দিলে রাজী হয়ে যাবে।"

"গোপনাকে কুটুমবাড়ি পাঠাব! কি বলতে কি বলে আসবে!"

"আসুক না!" এলোকেশী বীরদর্পে বলেন, "ওই গেঁজেলের কটুবাক্যিতে যদি মিন্‌সের চৈতন্য হয়! তার পর দেখি কেমন সোহাগিনী মেয়ে নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারে। গোপনাকে এও বলে দেবে ওখানে আশেপাশে কুলীনের মেয়ের সন্ধান পায় কি না দেখে আসতে। নাকের সামনে হলেই ভাল হয়।"

নীলাম্বর আর কথা বাড়ান না, কাগজ কলম নিয়ে বসেন এবং অনেক মুসাবিদান্তে একখানি চিঠির খসড়া খাড়া করেও ফেলেন।

তাতে এই কথাই বিশদ বোঝানো থাকে, রামকালী যদি পূর্ব জিদ বজায় রাখতে চান, তার কপালে অশেষ দুঃখু আছে! ছেলের তো আবার বিয়ে দেবেনই এঁরা, তা ছাড়া আরও যা করবেন ক্রমশঃ প্রকাশ্য। রীতিমত ভয় দেখানো চিঠি।

পত্রের ভাব ও ভাষায় এলোকেশী প্রীতিপ্রকাশ করেন। অতএব নীলাম্বর তৎপর হন পাঠাবার চেষ্টায়। কিন্তু মনে তাঁর দুশ্চিন্তা, রামকালীর একমাত্তর মেয়ে সত্যবতী। বেশী টান্ কষলে দড়ি না ছিঁড়ে যায়!

এত কথার কিছুই নবকুমার জানে না। সে স্কুলে।

বেলায় যখন ফিরল, সদুর কাছে গিয়েই আগে দাঁড়াল। "সদুদি, তেল।"

সদু পলায় করে তেল এনে ওর হাতে দিয়ে বলে, "দেখলি তো, বললাম কাজ কিছু হবে না, শুধু আমার কপালে ঝাঁটা, তাই হল। তোর শ্বশুরের মিত্যুবাণ তৈরি, এতক্ষণে বোধ হয় পাঠানোও হয়ে গেল। যদি বা দু দিন দেরি হত, তোর অমত শুনে মামী একেবারে ধেই ধেই।"

হাতের তেল আঙুলের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ে, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে বেচারা নবকুমার।

সদু বোধ করি ওর মুখভঙ্গী দেখেই করুণাপরবশ হয়ে বলে, "যাক গে, তুই আর ও নিয়ে মন উচাটন করিস নে, দিতে হয় আর একবার টোপর মাথায় দিবি। কত আর কষ্ট! তোর একটা বৌ পেলেই হল। তবে মনে নিচ্ছে এবার তালুইমশাই নরম হবে, যতই হোক মেয়ের বাপ।"

হঠাৎ নবকুমার একটা বেথাপ্পা এবং অবান্তর কথা বলে বসে, "সায়েবরা শুধু একটা বিয়ে করে, কক্‌খনো অনেক বিয়ে করে না।"

ব্যস, আর যায় কোথা!

সদুর হাসির ধুম পড়ে যায়। "ওমা তাই না কি? ও বুঝেছি, তাই সায়েবদের বই পড়ে পড়ে তোরও সেই বুদ্ধি মাথায় ঢুকেছে! তা হ্যাঁরে নবু, সায়েবরা যদি একটা বৈ বিয়ে করে না, তো বাকী মেমগুলোর কী দশা হয়? বিধাতাপুরুষ যখন পৃথিবী ছিষ্টি করেছিল, তখন একটা করে বেটাছেলে আর দেড়কুড়ি করে মেয়েমানুষ গড়েছিল, এ তো জানিস? তা হলেই বল! বাকীগুলোর গতি কে করবে, যদি একটা বৈ বিয়ে না করে?"

"যত সব আজগুবী!" নবকুমার মার আড়ালে বেশ সশব্দেই কথা বলে, "পৃথিবীসুদ্ধ বেটাছেলে বুঝি দেড়কুড়ি করে—"

মুখের কথা মুখেই থাকে, রঙ্গস্থলে এলোকেশী দেখা দেন, "বলি নবা, চান করতে যেতে হবে কি হবে না? যখনই দুটোয় এক হবে, অমনি হাসি-মস্করা! হ্যাঁলা সদি, তোকেও বলি, ও কি তোর সমবইসী? তা তো না, রাতদিন কেবল কানে কুমন্তর দেওয়া! রোস, বৌ একটা আসুক না ঘরে, হাঁড়ি গলায় গেঁথে দেবার লোক হোক, তোকে একবার ঝেঁটিয়ে বিদেয় করি।"

মাতৃ-সন্নিধানে নবকুমারের সর্বদাই চোরের ভূমিকা। তাই সদুদির এই অপমানে তার

প্রাণটা ছটফটিয়ে উঠলেও মুখ দিয়ে রা ফোটে না। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই, সন্তুর মুখের কোন ভাব-বৈলক্ষণ্য ফোটে না। সে যথাপূর্বং হাস্যবদনে নবুকে চোখ টিপে ইশারা করে, যার এই অর্থ হয় 'যা নাইতে যা, মামী ক্ষেপেছে!'

হাতের তেল তেলো থেকে সবটাই গড়িয়ে পড়ে গেছে, তেলালো হাতটাই শুধু মাথায় ঘষতে ঘষতে সোজা কাঁচদীঘিতে চলে যায় নবু। আজ আর যেন খিড়কি পুকুরে মন ওঠে না!

যেতে যেতে হঠাৎ সেই একদিনের দেখা শ্বশুরের ওপর ভারী রাগ এসে যায় নবকুমারের। এত ঝামেলার কিছুই তো হত না, যদি সেই মেয়ে না কি পাঠাতেন তিনি।

বুকটায় শুধু পাষাণভারই নয়, যেন কাঁটাও বিঁধছে। দূর ছাই।

আঠারো

সপরিবার তুষ্টু গয়লা মাঠে এসে বুক চাপড়াচ্ছে, আর পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছে। তুষ্টুর পরিবার জলে পড়ে কি আগুনে পড়ে এইভাবে লুটোপুটি খাচ্ছে এখান থেকে ওখান।

একরাশ লোক চারিদিকে ভিড় করে হা-হুতোশ করছে, আর কে কবে কোথায় ঠিক এইরকম, অথবা এই ধরনের ব্যাপার দেখেছে তারই আলোচনায় বাতাস মুখর করে তুলেছে।

আশ্বিনের রোদে সর্দি-গর্মি হবার কথা নয়, কিন্তু সময়টা যে বড্ড কড়া। একেবারে ভর দুপুরবেলা। আর ভিজে পান্ত কটা পেটে ঢেলেই মাঠে জঙ্গলে ঘোরা। মায়েরা তো এঁটে উঠতে পারে না ছেলেগুলোকে।

ছেলেটা তুষ্টু গয়লার নাতি রঘু। সমবয়সের দাবিতে নেড়ু কোম্পানির দলের এক জন। আশ্বিনে আখের ক্ষেত রসে ভরভর, ছেলেগুলোর তাই দ্বিপ্রাহরিক খেলা আখ চুরি। উপকরণের মধ্যে একটুকরো ধারালো লোহার পাত। তারপর ক্ষেত থেকে কেটে আনার পর তো দাঁতই আছে।

দাঁত দিয়ে খোলা ছাড়িয়ে মাথা প্রমাণ লম্বা লাঠিগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে রসগ্রহণ করেছে সকলেই, হঠাৎ রঘুর যে কি হল! বুড়ো বটগাছটার তলায় যেখানে বসেছিল সবাই, সেখানেই ধুলো জঞ্জালের ওপর শুয়ে পড়ল রঘু, যেন নেশাচ্ছন্নের মত।

ছেলেরা প্রথমটা খেয়াল করে নি, আগামীকাল আবার কখন অভিযান চালানো হবে সেই আলোচনাতেই তৎপর হয়ে উঠেছিল, চোখ পড়ল উঠে পড়বার সময়।

"কী রে রঘু, তুই যে দিব্যি ঘুম মারছিস?" বলল, একজন হি হি হাসির সঙ্গে ঠেলা মেরে। কিন্তু পরক্ষণেই হাসি মুখটা কেমন শুকিয়ে উঠল তার। রঘুর দেহটা যেন শক্ত কাঠ মত, রঘুর ঠোঁটের কোণে ফেনা।

"এই রঘুটার কি হয়েছে দেখ্ তো।"

"কি আবার হল ?" বেপরোয়া ছেলেগুলো রঘুর গায়ে হাত দিয়ে প্রথমটা হাসির ফোয়ারা ছোটাল, "দেখেছিস চালাকি, কি রকম মট্‌কা মেরে পড়ে আছে ! এই রঘু, গায়ে কাঠপিঁপড়ে ছেড়ে দেব, ওঠ বলছি ।"

শুধু গায়ে কাঠপিঁপড়েই নয়, কানে জল, পায়ে চিমটি, ইত্যাদি করে ঘুম ভাঙাবার সমস্ত প্রক্রিয়া শেষ করার পর বেদম ভয় ঢুকল ওদের । নিশ্চিত হল, এ ঘুম আর ভাঙবে না রঘুর, একেবারে 'মরণ ঘুম' । নইলে অমন হলদে হলদে রংটা ওর এমন বেগুনে হয়ে উঠবে কেন ?

"চল পালাই" । বলল একজন ।

"পালাব ?" নেড়ু রুখে দাঁড়ায় ।

"পালাব না তো নিজেরাও রঘুর সঙ্গে যমের দক্ষিণ দোরে যাব না কি ? কর্তারা কেউ দেখলে আস্ত রাখবে আমাদের ?"

"যা বলেছিস ! তুষ্টুর ঠাকুর্দা ওর ওই দুধের বাঁক দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেবে ।"

"বাঃ, আমাদের কি দোষ ! আমরা কি মেরে ফেলেছি ?"

"তা কে মানবে ? বলবে তোদের সঙ্গে খেলছিল তোরাই কিছু করেছিস ! চল চল, কে কমনে দেখে ফেলবে ।"

নেড়ু ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "খুব ভাল কথা বলেছিস ! বলি রঘু আমাদের বন্ধু না ? ওকে শ্যাল-কুকুরে খাবে, আর আমরা পালিয়ে প্রাণ বাঁচাব ?"

রঘু বন্ধু, এ কথা সকলের মনেই কাজ করছিল, কিন্তু ভয় কাজ করছিল তার চাইতে অনেক বেশী । কাজেই আর একজন বাস্তববাদী এবং ঈশ্বরবাদী বালক উদাসমুখে বলে, "ভগবান ওর কপালে যা লিখেছে তাই হবে । আমাদের কী সাধ্যি যে খণ্ডাই ?"

"আর রঘুর মা যখন বলবে, 'তোমাদের সঙ্গে খেলতে গেছল রঘু, সে তো বাড়ী ফিরল না । কোথায় সে গেল বাবা ?' তখন কি বলবি ?"

"বলব আজ রঘু আমাদের সঙ্গে খেলতে যায় নি ।"

"মিছে কথা বলবি ?"

"তা কি করব ? বিপাকে পড়লে স্বয়ং নারায়ণও মিছে কথা বলে ।"

"বলে ! তোকে বলেছে !" নেড়ু তীব্রকণ্ঠে বলে ওঠে, "পাহারা দে তোরা ওকে, আমি দেখি গিয়ে মেজকাকা বাড়ি আছেন না কি !"

"আর মেজকাকা ! যমে ওকে গ্রাস করেছে রে নেড়ু !"

"তাতে মেজকাকা ডরায় না । জটাদার বৌ তো মরে গেছল, বাঁচান নি ? কত লোককেই তো বাঁচান । আমি যাব আর আসব । তবে কপালক্রমে যদি দেখা না পাই, তাহলেই রঘুর আশায় জলাঞ্জলি ।"

অগত্যাই রঘুর বাস্তববাদী বন্ধুরা 'য পলায়তি' নীতি ত্যাগ করে রঘুর মৃতদেহ পাহারা দিতে সম্মত হল । মায়া কি তাদেরই করছিল না ? কিন্তু কি করবে ?

তারপর এই জলন্ত আগুনের মত সংবাদটা আগুনের মতই এখান থেকে ওখান, এঘর থেকে ওঘর, দাউ দাউ করে জ্বলিয়ে দিয়ে গ্রামসুদ্ধ সবাইকে টেনে এনেছে এই বুড়ো বটতলায়।

তারপর চলছে জল্পনা-কল্পনা।

সর্দি-গর্মি?

শরৎকালে?

'তা হবে না কেন? শরতের রোদই তো বিষতুল্য।' 'গণেশ তেলির শালীর ছেলেটা সেবার ঠিক এই রকম করে—'

'আর জীবন স্যাকরার ভাইপোটা?'

'নেপালের ভাগ্নীটাও তো—'

'আরে বাবা সে এ নয়, সে অন্য ঘটনা।'

'আমার পিসশ্বশুরের দেশেও একবার কাদের নাকি বুড়ো বাপ ঘাট থেকে আসতে গিয়ে—'

সহসা সমুদ্রকল্লোল স্তব্ধ হয়ে গেল।

কবরেজ মশাই আসছেন!

বাড়ি ছিলেন না, কোথা থেকে যেন ফিরেই শুনে পালকি করেই বুড়োবটতলায় এসে হাজির হয়েছেন।

শায়িত বালকের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন রামকালী, চমকে বললেন, "কখন হয়েছে এ রকম?"

নেড়ুর দিকে তাকিয়েই বললেন।

নেড়ু সভয়ে ঘটনাটা বিবৃত করল। রামকালী নিচু হয়ে ঝুঁকে ছেলেটার হাতটা তুলে ধরে নাড়ি পরীক্ষা করে নিঃশ্বাস ফেললেন, তার পর আস্তে মুখ তুলে বললেন, "কাদের ক্ষেতের আখ খেয়েছিলি?"

অন্য সব বালকরাই নাগালের বাইরে, নেড়ুই রাজসাক্ষী, তাই নিরুপায় স্বরে গুপ্তকথা প্রকাশ করে, "ইয়ে—বসাকদের।"

"কিছু কামড়েছে বলে চেঁচিয়ে ওঠে নি একবারও?"

"না তো!" নেড়ু অবাক হয়। সমগ্র জনসভা একটি মানুষের মুখের দিকে তাকিয়ে চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান। এমন কি তুষ্টুরা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে, হাঁ করে তাকিয়ে আছে, বোধ করি কোনও একটু ক্ষীণ আশায় বুক বেঁধে।

"সর্দি-গর্মি নয়," নিষ্ঠুর নিয়তির মত উচ্চারণ করেন রামকালী, "সাপের বিষ।"

সাপের বিষ!

একটা সমস্বর চীৎকার উঠল, 'কোথায়? কোথায় কেটেছে?'

"কাটে নি কোথাও, সে তো ওর সঙ্গীরাই বলছে," রামকালী নিঃশ্বাস ফেলেন, "খাওয়ার সঙ্গে দেহে বিষ প্রবেশ করেছে। একটু আগে যদি হাতে পেতাম, চেষ্টা দেখতাম, এখন আর কিছু করবার নেই।"

'কবরেজ মশাই!' হাহাকার করে পায়ে আছড়ে পড়ল তুষ্টু, 'জগতের সবাইকে জীবন দিচ্ছেন কবরেজ-ঠাকুর, আর আমার নাতিটাকেই কিছু করবার নেই বলে ত্যাগ দিচ্ছেন!'

রামকালী ডানহাতটা তুলে একবার আপন কপাল স্পর্শ করে বলেন, "আমার ভাগ্য!"

"আপনার পায়ে ধরি ঠাকুরমশাই, ওষুধ একটু দ্যান।"

এবার আছড়ে এসে পড়েছে বুড়ী। তুষ্টুর বৌ।

রামকালী কোন উত্তর দেন না, লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন জনতার দিকে।

কিন্তু সাপের বিষ মানে কি?

আহারের সঙ্গে সাপের বিষ আসবে কোথা থেকে?

সহসা এ কী আকাশ থেকে পড়া বিপর্যয়ের কথা বলছেন কবরেজমশাই।

তুষ্টুর মত নির্বিরোধী নিরীহ মানুষটার এত বড় মহাশত্রু কে আছে যে, তার বংশে বাতি দেবার সলতেটুকু উৎপাটিত করবে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করবে।

গুঞ্জন উঠছে জনতা থেকে।

"কবরেজমশাই, সাপের বিষের কথা বলছেন? এত বড় শত্রু কে আছে তুষ্টুর?"

"কেন, ভগবান।" তীক্ষ্ণ একটা ব্যঙ্গতিক্ত হাসির সঙ্গে কথাটা শেষ করেন রামকালী, "ভগবানের বাড়া পরমশত্রু আর মানুষের কে আছে তুষ্টু?"

কিন্তু এত সংক্ষিপ্ত ভাষণ বোঝে কে?

বিশদ না শুনতে পেলে ছাড়বেই বা কেন লোকে? শুধু 'সাপের বিষ' ফতোয়া জারি করে নিষ্ঠুরের মত নীরব হয়ে থাকলে প্রশ্ন-বিষের দাহে যে ছটফট করবে লোক!

বলতেই হবে রামকালীকে, সাপে কাটল-না, তবু তার বিষ এল কোথা থেকে?

কিন্তু উত্তর দিয়ে যে রামকালী বাক্‌শক্তিরহিত করে দিলেন সবাইকে! এ কী তাজ্জব কথা!

আখের ক্ষেতে সাপের গর্ত ছিল, থাকেই এমন। ঠিক যে আখ গাছটার গোড়ায় সেই বিষের থলি, সেই আখটাই তুলে খেয়েছে হতভাগ্য ছেলেটা!

"এ কী বলছেন কবিরাজ মশাই!"

"যা সত্যি তাই বলছি।" হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন রামকালী, গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়, "নিয়তির উপর হাত নেই, আয়ু কেউ দিতে পারে না। তবু তক্ষুনি টের পেলে বিষ তোলার চেষ্টাটা অন্ততঃ করতাম। কিন্তু তা হবার নয়, অদৃশ্য নিয়তি অমোঘ নিষ্ঠুর!"

অমোঘ নিয়তি।

তবু উৎসাহী কোন এক ব্যক্তি 'সাপের বিষ' শোনা মাত্রই হাড়িপাড়ায় ছুটে গিয়ে ডেকে এনেছে বিন্দে ওঝাকে।

বিন্দে এসেও ধীরে ধীরে মাথা নাড়ে।

অর্থাৎ সেই এককথা—আর কিছু করবার নেই।

কিন্তু মরাকে বাঁচাতে না পারুক, জ্যান্তটাকে তো মারতে পারে বিন্দে! সেই সর্বনাশের মূল স্বয়ং যমটাকে মন্ত্রের জোরে শেষ করে দিক সে। জনমত প্রবল হয়ে ওঠে।

হয়তো এই তীব্র বাসনার মধ্যে অন্য একটা প্রচ্ছন্ন বাসনাও সুপ্ত হয়ে রয়েছে। সন্দেহ নেই রামকালী কবিরাজ দেবতা, তাঁর বিচার নির্ভুল, কিন্তু এহেন কৌতূহলোদ্দীপক কথাটার একটা ফয়সালা হওয়া তো দরকার।

বিন্দেকে ঝুলোঝুলি করতে থাকে সবাই।

রামকালী সামান্য একটু বিষন্ন হাসি হেসে বলেন, "যাচাই করতে চাও?"

"হায় হায়, আজ্ঞে এ কী কথা! কী বলছেন ঠাকুরমশাই!"

"যা বলছি তাতে ভুল নেই বাবা সকল। যাহোক একটা কথা কেউ বললেই সেটা বিশ্বাস করে নিতে হবে, তার কোন হেতু নেই। কিন্তু হতভাগার দেহটার যথাযথ একটা ব্যবস্থা আগে না করে—"

বিন্দে মাথা নেড়ে বলে, "আজ্ঞে বিষহরির পো যখন কাটেন নি, তখন ওতে আমার কিছু করার নেই। ও আপনার সহজ মিত্যুর হিসেবেই যা করবার করতে হবে।"

"কিন্তু দেখছ তো বিষে একেবারে নীল হয়ে গেছে।"

"তা অবিশ্যি দেখছি আজ্ঞে। একেবারে কালকেউটে দংশনের চেহারা। তবু যা কামুন!"

"বাবা সকল, তোমরা তবে আর বৃথা ভিড় না করে কাজে লাগো।" শিথিল স্বরে বলেন রামকালী। রঘুর দিকে আর যেন তাকাতে পারছেন না তিনি।

কিন্তু কে এখন কাজে লাগতে যাবে?

এতবড় একটা উত্তেজনা তাদের অধীর করে তুলেছে। সকলে বিন্দেকে ঘিরে ধরে চেঁচাচ্ছে "কড়ি চাল তুই, কড়ি চাল। হারামজাদা বেটা সুড় সুড় করে এসে তোর ঝাঁপিতে ঢুকুক। তার পর তুই আছিস আর তোর বিষপাথর আছে। আছড়ে মেরে ফেল।"

"তোমরা এত ছেলেমানুষি করছ কেন? সাপটাকে ঠিক পাওয়াই যাবে তার নিশ্চয়তা কি?"

"পাওয়া যাবে না মানে? আপনি যখন বলেছেন—"

"বিষ তো ঠিক, কিন্তু আখের ক্ষেতটা আমার অনুমান মাত্র, তার আগে জলটল কিছুই যখন খায় নি বলছে তাই। কিন্তু এখন বিন্দের কীর্তি নিয়ে পড়লে তোমরা তো—"

কিন্তু যে যতই ভক্তি করুক রামকালীকে, আজকের উত্তেজনা তাকে ছাপিয়ে উঠেছে।

যদি বা আখের গাছের গোড়ায় সাপের বাসা থাকে, সেই খেয়ে জলজ্যান্ত একটা 'সাদস্থি' গোয়ালার ছেলে এক দণ্ডে মরে যাবে? তা যদি হয়, সেটা চোখের সামনে যাচাই হোক।

সাপের গর্ত আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত কেউ নড়বে না।

অতএব সমস্ত দৃশ্য যথাযথ রয়ে গেল, রঘুর ব্যবস্থায় কেউ গা ও দিল না, বিন্দে ওঝা মহাকলরবে সাপ চেলে আনার মন্ত্র আওড়াতে শুরু করে দিল।

রামকালী চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন, হয়তো বা শেষ অবধি দাঁড়িয়েই থাকতেন, হয়তো বা এক সময় চলেই যেতেন, কিন্তু সহসা সেজখুড়ো এসে হাজির হয়ে চাপা গলায় ডাক দিলেন "রামকালী!"।

খানিক আগে গ্রামের আরও অনেক কাজের লোকের মত সেজকর্তাও একবার এখানে এসে ঘুরে ফিরে নানা মন্তব্য করে চলে গেছেন, আবার ফিরে এলেন কোন্ বার্তা নিয়ে?

না, বার্তাটা বলতে রাজী নন সেজকর্তা।

তবে জরুরী দরকার।

বাড়ি যেতে হবে রামকালীকে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন আর করলেন না রামকালী, ধীরে ধীরে সরে এলেন বুড়োবটতলা থেকে। অকর্মা একদল লোক তখন বিন্দেকে ঘিরে উন্মত্ত হট্টগোল করছে।

ভাবলেন মৃত্যুর কারণটা না বললেই হত। মৃত্যু, মৃত্যুই। মৃত্যুর কারণ নির্ণয় করতে পারলেই কি তুষ্টু নাতিকে ফিরে পাবে? নাকি আততায়ীকে 'শেষ' করে ফেললেই পাবে?

তা পায় না

তবু মৃত্যুর পর মৃত্যুর কারণ নিয়ে মাথা ঘামায় লোকে। আর খুন হলে নিহত ব্যক্তির হত্যাকারীর ফাঁসি ঘটাইবার জন্য মরণ-বাঁচন পণ করে লড়ে।

আকাশ আর পাতাল, পাহাড় আর সমুদ্র।

কোন্ পরিবেশ থেকে কোন্ পরিবেশে।

কিন্তু ঘটনা যাই হোক, রামকালীর অন্তঃপুরেও প্রায় শোকেরই দৃশ্য। দীনতারিণী চোখ মুছছেন, চোখ মুছছেন কাশীশ্বরী, ভুবনেশ্বরী মূর্ছাতুরার মত পড়ে আছে একপাশে, মোক্ষদা দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এবং সেজখুড়ী, কুঞ্জর বৌ, আশ্রিতা অনুগতা প্রভৃতি অন্যান্য নারীকুল নিম্নস্বরে রামকালীর জেদ, তেজ ও অদূরদর্শিতার নিন্দাবাদ করছেন।

শুধু সারদা সেখানে নেই, সে তদব্যস্তে কুটুমবাড়ির লোকের আহার আয়োজনে ব্যাপৃত আছে।

তুষ্টু গয়লার নাতির ব্যাপার নিয়ে সারাগ্রাম আজ তোলপাড়, তবে বাইরের কোনো হুজুগে এ বাড়ির অন্তঃপুরিকাদের উঁকি দেবার অধিকার নেই, বাদে মোক্ষদা।

মোক্ষদা একবার দেখে এসে স্নান করেছেন, আর যাবেন না। গিয়ে করবেনই বা কি?

সত্যর শ্বশুরের প্রেরিত চিঠি কুঞ্জবিহারী পড়ে দিয়েছেন, আর তার পর থেকেই বাড়িতে এই শোকের ঝড় বইছে।

জামাইয়ের মা বাপ যদি ছেলের আবার বিয়ে দেয়, মেয়ের মৃত্যুর চাইতে সেটা আর কম কি? পরের মেয়ে-বৌকে উদারতার উপদেশ দেওয়া যায়, তার মধ্যে সতীনের হিংসের পরিচয় পেলে নিন্দা করা যায়, কিন্তু ঘরের মেয়ের কথা আলাদা।

সারাদিনের ক্লান্ত পরিশ্রান্ত দেহ, আর তুষ্টুর নাতির ওই শোচনীয় পরিণামে ক্লিষ্ট মন নিয়ে বাড়ি ঢুকেই ঘটনাটা শুনলেন রামকালী।

তীক্ষ্ণ তীব্র দুই চোখের মণিতে জলে উঠল দু ডেলা আগুন! মনে হল ফেটে পড়বেন এখুনি, ধৈর্যচ্যুত হয়ে চিৎকার করে উঠবেন, কিন্তু তা তিনি করলেন না, শুধু ভয়াবহ ভারী গলায় প্রশ্ন করলেন; "কে এসেছে চিঠি নিয়ে?"

এ সময় মোক্ষদা ভিন্ন আর কার সাধ্য আছে সামনে এগিয়ে যাবার? তিনিই গেলেন। বললেন, "এনেছে ওদের ওখানের এক আচার্যিদের ছেলে। গোপেন আচার্যি না কি বলল।"

"কোথায় সে? চণ্ডীমণ্ডপে?"

"না খেতে বসেছে!"

"ঠিক আছে, খাওয়া হলে আমার সঙ্গে দেখা করতে পাঠিয়ে দিও। চণ্ডীমণ্ডপে আছি আমি।"

মোক্ষদা প্রমাদ গণে বলেন, "তা তুমিও তো আজ সারাদিন নাওয়া খাওয়া কর নি।"

"যাক বেলা পড়ে এসেছে, একেবারে সন্ধ্যাহ্নিক সেরে যা হয় হবে।"

"লোকটা একটু রগচটা আছে, একটু বুঝে সুঝে কথা কয়ো তার সঙ্গে!"

রামকালী ভুরু কুঁচকে বললেন, "লোকটা একটু কি আছে?"

"বলছিলাম রগচটা আছে।"

মোক্ষদাকে অবাক করে দিয়ে সহসা হেসে ওঠেন রামকালী, "তাতে কি? আমি তো আর রগচটা নই।"

তা বলেছিলেন রামকালী ঠিকই।

রগ মাথা সবই তিনি খুব ঠাণ্ডা রেখেছিলেন, বুঝি বা অতিমাত্রাতেই রেখেছিলেন। গোপেন আচার্যিকে ডেকে বেয়াইবাড়ির কুশলবার্তা নিয়ে হাস্যবদনে বলেছিলেন, "শুনলাম নাকি বেয়াইমশায়ের ছেলের বিয়ে? বলো, শুনে খুব আনন্দিত হয়েছি। নেমন্তন্ন পেলে উচিতমত লৌকিকতা পাঠিয়ে দেব।"

গেঁজেল গোপেন আচার্যি কটুকাটব্য দূরের কথা, কথা কইতেই ভুলে গেল, হাঁ করে চেয়ে রইল।

"খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তোমার?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"আজ রাতে তো আর ফিরছ না?"

'আজ্ঞে না!'

"বেশ। সকালে জলটল খেয়ে যাত্রা করো।"

"আজ্ঞে মেয়ে তা হলে পাঠাবেন না?"

"মেয়ে? কার মেয়ে? কোথায় পাঠাবার কথা বলছ হে?"

গোপেন এবার সাহসে ভর করে বলে ওঠে, "আজ্ঞে, আজ্ঞে আপনার মেয়ের কথা ছাড়া আপনাকে আর কার কথা বলতে আসব? মেয়ে তাহলে পাঠাবেন না?"

"আরে বাপু কোথায় পাঠাব তাই বলো? ভদ্রলোকের মেয়ে ভদ্রলোকের ঘরেই যেতে পারে, যেখানে সেখানে তো যেতে পারে না?"

গোপেনের শীর্ণ মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে, "বেশ, তবে পত্রে তাই লিখে দিন।"

"আবার পত্র লিখতে হবে! এই তুচ্ছ কথাটুকু তুমি বলতে পারবে না?"

"আজ্ঞে না। আমি গেঁজেল নেশেল মানুষ, আমার কথায় বিশ্বাস করে না করে! এসেছি যখন পাকা দলিলই নিয়ে যাব।"

"হুঁ।" বলে মিনিটখানেক ভুরু কুঁচকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন রামকালী, তারপর বলেন, "আচ্ছা, তাই হবে। পত্র লিখে রাখব, কাল সকালে রওনা দেবার আগে নিও।"

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তবু ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়লেন রামকালী।

না, সন্ধ্যাহ্নিকের পূর্বে হাতমুখ ধুতে ঘাটে গেলেন না, গেলেন বুড়ো বটগাছতলার দিকে। কি করল ওরা দেখা যাক। এতক্ষণ পরে আবার রঘুর চেহারাটা চোখে ভেসে উঠল।

উঃ! নিয়তি কী অকরুণ!

বাড়ি থেকে একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ালেন রামকালী।

চলচলিয়ে চোট পায়ে আসছে কে অন্ধকারে? সত্যবতী না?

"তুই এখানে একলা যে?"

"একলা নয় বাবা, নেড়ু এসেছিল, তা ও এখন ফিরল না।"

"এসেছিলি কেন?"

"কেন, সে কথা আর শুধোচ্ছ কেন বাবা?" সত্য বিষণ্ণ হতাশ কণ্ঠে বলে, "রঘুটাকে একবার শেষ দেখা দেখতে।"

"এভাবে এসে ভাল কর নি। সেজঠাকুমার সঙ্গে এলে পারতে।"

"সেজঠাকুমার তো আটবার ডুব দেওয়া হয়ে গেছে, আর আসত?"

"আচ্ছা বাড়ি যাও।"

"যাচ্ছি।…বাবা—"

"কি হল? কিছু বলবে?"

"বলছি—"

"কি? কি বলতে চাও বলো?"

"বলছি কোথা থেকে যেন একটা লোক এসেছে না পত্তর নিয়ে?"

রামকালী মেয়ের মুখে এ প্রসঙ্গ শুনে অবাক হন। তার পর ভাবেন মেয়েটা তো চিরকেলে বেপরোয়া। শ্বশুরবাড়ি যাবার ভয়ে বাপের কাছে আর্জি করতে এসেছে! তাই সস্নেহে বলেন, "হ্যাঁ এসেছে তো। তোর শ্বশুরবাড়ি থেকে। তার কি?"

"বলছিলাম কি"—। সত্যবতীর কথা বলার আগে চিন্তা আশ্চর্য বটে!

রামকালী মনে মনে হাসেন, শ্বশুরবাড়ি শব্দটাই মেয়েদের এমন!

"বলো কি বলছ?"

"আচ্ছা এখন থাক। তুমি ঘুরে এসো। গুছিয়ে বলবার কথা। রঘুটার মিতদেহ দেখে অবধি মনটা বড় ডুকরোচ্ছে। বাড়ি ফিরে একটু জিরোই।"

"আচ্ছা!" বলে চলে যান রামকালী।

এই অবোধ মেয়ে—একে এক্ষুনি শ্বশুরবাড়ি পাঠানো চলে? অসম্ভব।

"পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে!"

বহু কণ্ঠের একটা উন্মত্ত উল্লাসধ্বনি ভেসে আসে কবরেজ বাড়ির দিকে, "কবরেজ মশাই, পাওয়া গেছে!"

কী পেল ওরা? কিসের এত উল্লাস? কোন্ পরম প্রাপ্তিতে মানুষ এমন উন্মত্ত হয়ে উঠতে পারে? চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়া থেকে নেমে এলেন রামকালী। তবে কি হতভাগ্য রঘুর প্রাণটাই ফিরে পাওয়া গেল তুষ্টুর পূর্বজন্মের পুণ্যে! কলিযুগেও ভগবান কানে শুনতে পান?

রঘু কি শুধু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?

মৃত্যুর কাছাকাছি অচৈতন্যতার যে গভীর স্তর, সেখানে ডুবেছিল? জটার বৌয়ের মত? রামকালীর নির্ণয় ভুল? তাই হোক-তাই হোক! হে ঈশ্বর, একবারের জন্য অন্ততঃ তুমি রামকালীর গর্ব খর্ব করো, একবারের মত প্রমাণ করো রামকালীর নির্ণয় ভুল।

নাঃ, কলিযুগের ভগবান হাবা কালা ঠুঁটো। রামকালীর গর্ব খর্ব করবারও গরজ নেই তাঁর। রঘুর প্রাণটা ওরা ফিরে পায় নি, পেয়েছে তার প্রাণঘাতককে। ওঝার মন্ত্রচালার গুণে সাপটা এসে লুটিয়ে পড়েছে মুখে ফেনা ভেঙে! আশ্চর্য! এ এক পরম আশ্চর্য!

সাপটাকে নাকি নিতে চেয়েছিল ওঝা, কাকুতি মিনতি করে বলেছিল, "এমন জাত

সাপ দৈবাৎ মেলে।" কিন্তু জনতার আক্রোশ থেকে রক্ষা করতে পারে নি তার জাত সাপকে। লাঠি দিয়ে আর বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তার গোল চকচকে দেহটাকে ছেঁচে কুটে চ্যাপটা করে দিয়েছে সবাই।

"অপরাধ নিও না মা জগদ্‌গৌরী!" বলেছে আর পিটিয়েছে।

এখন লম্বা একটা বাঁশের আগায় সেই মরা সাপটাকে ঝুলিয়ে নিয়ে ওরা এসেছে রামকালীর জয়গান করতে। ওঝা বুড়োও তার নিকষ কালো গুলি-পাকানো বেঁটে শরীরটাকে নিয়ে আসছে ছুটে ছুটে বকশিশের আশায়। মোটা বকশিশ কি আর না দেবেন রামকালী! ওঝার সাফল্য যে রামকালীরও সাফল্য!

উল্লাস-চীৎকার-রত এই লোকগুলো যেন একটা অখণ্ড বর্বরতার প্রতীক। ঘৃণায় ধিক্কারে মনটা বিষিয়ে গেল রামকালীর, হাত তুলে ওদের থামতে নির্দেশ দিয়ে ভ্রূকুটি করে বললেন, "কী হয়েছে কি? এত স্ফূর্তি কিসের তোমাদের? রঘু বেঁচে উঠেছে?"

"বেঁচে উঠবে!" একজন মহোৎসাহে বলে ওঠে, "ভগবানের সাধ্য কি ওকে বাঁচায়! একেবারে কালনাগিনীর বিষ! কিন্তু ধন্যি বলি কবরেজ মশাই আপনার শিক্ষা! কামড়ায় নি, শুধু—"

"থামো।" ধমকে ওঠেন রামকালী, "তা ওই নিয়ে এত হৈ-চৈ করছ কি জন্যে? একটা বালক এখনো মরে পড়ে রয়েছে—"

সহসা একটা প্রবল আবেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে রামকালী চাটুয্যের, যেমনটা তাঁর বড় হয় না। রঘুর এই শোচনীয় মৃত্যুটা বড় লেগেছে রামকালীর। বার বার মনে হচ্ছে হয়তো সময় থাকতে রামকালীর হাতে পড়লে বেঁচে যেত ছেলেটা।

ভাবতে চেষ্টা করছেন, নিয়তি অমোঘ, আয়ু নির্দিষ্ট, এ চিন্তা মূঢ়তা, তবু সে চিন্তাকে রোধ করতে পারছেন না। বিষ-নিবারক ওষুধগুলো তাদের নাম আর চেহারা নিয়ে অনবরত মনে ধাক্কা দিচ্ছে।

"আজ্ঞে কর্তা, মা বিষহরি নিলে কে কি করতে পারে? তবে কীর্তি একটা দেখালেন বটে!" বলে ওঠে ওঝা বুড়ো, "তবে আমাকেও মুখে রক্ত তুলে খাটতে হয়েছে কত্তা! বেটী কি আসতে চায়? একেবারে মোক্ষম মন্তর ঝেড়ে, তবে—"

"বেশ, শুনে সুখী হলাম। যাও তোমরা এখন ওটার একটা সদ্‌গতি করো গে, সাপ মারলে তাকে শাস্ত্রীয় আচারে দাহ করা নিয়ম, সেই কথাই উল্লেখ করে কথাটা বলেন, তার পর ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলেন, "আর সেই হতভাগাটারও একটা গতির ব্যবস্থা করো গে। তুষ্টুর একলার ঘাড়ে সব দায়টা চাপিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না।"

জনতার উল্লাসটা একটু ব্যাহত হয়। এটা কী হল! এমনটা তো তারা আশা করে আসে নি! ভেবেছিল, সাপটা আবিষ্কৃত হয়েছে দেখে নিঃসন্দেহে উৎফুল্ল হবেন রামকালী, কারণ এটা তাঁর জয়পতাকা বলা চলে। অনেকের মধ্যেই তো একটা অবিশ্বাস উঁকি

দিয়েছিল, কবরেজ মশায়ের প্রতি অপরিসীম বিশ্বাস সত্ত্বেও।

একেবারে একটা অসম্ভব কথাই যে বলেছিলেন রামকালী! অসম্ভবও যে সম্ভব হয়, একথা প্রমাণ করত কে, এই সাপটা ছাড়া? অথচ রামকালী যেন নির্বিকার।

ক্ষুব্ধ হল, আহত হল ওরা।

"সে ব্যবস্থা কি আর না হচ্ছে কবরেজ মশাই", ওরা বলে, "এতক্ষণে বাঁশ কাটা হয়ে গেল বোধ হয়। তবে কথা হচ্ছে সাপের মড়া, ওকে তো ভাসাতে হবে?"

"না।" ভারী গলায় বলেন রামকালী, "সাপে কাটে নি। যথারীতি দাহর ব্যবস্থাই করো গে। কতকগুলো হৈ-চৈ করো না।"

বাঁশ ঘাড়ে করে চলে গেল ওরা, তার পিছনে গ্রাম-ঝেঁটনো ছেলে মেয়ে ইতর ভদ্র। ওদের গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল রামকালীর, এরা আমাদের আত্মীয়! এই আমাদের প্রতিবেশী! বুনো জঙ্গলে কোন সাঁওতালদের থেকে এমন কি উন্নত এরা? বর্বতার সুযোগ পেলেই তো মেতে উঠতে চায় সেই বন্য বর্বরতায়। মৃত্যুকে যে একটু শ্রদ্ধা করতে হয়, শ্রদ্ধার লক্ষণ যে নীরবতা, এ বোধের কণামাত্রও তো নেই এদের মধ্যে।

"কর্তা, আমার বকশিশটা?"

নিকটে সরে এসে হাত কচলায় বিন্দে বুড়ো।

"বকশিশ?" রামকালী ভুরুর তীক্ষ্ণতায় কপালে রেখা এঁকে বলেন, "বকশিশ কিসের?"

"আজ্ঞে কত্তা—"

"বলছি বকশিশ কিসের? ছেলেটাকে বাঁচিয়েছ?"

"সে আজ্ঞে মিত্যুর পর আর বাঁচাবে কে?"

"হ্যাঁ, আমি তা জানি। শুধু এইটা বুঝতে পারছি না বকশিশ পাবার দাবিটা কখন হল তোমার?"

"বেশ বকশিশ না দ্যান, মজুরিটা তো দেবেন্ আজ্ঞে।" ওঝা এবার রুখে ওঠে।

"সেটা দেবে যারা ডেকে এনেছে—" শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলেন রামকালী। "আমি তোমায় ডেকে আনি নি।"

"দশ জনের মধ্যে কাকে ধরতে যাব কত্তা", বিন্দে বেজার মুখে বলে, "না দ্যান তো চলে যাব! গরীব মানুষ—"

"দাঁড়াও", রামকালী বেনিয়ানের পকেট থেকে নগদ দুটি টাকা বার করে ওর হাতে দিয়ে আরও গম্ভীর গলায় বলেন, "শুধু তো তোমার মজুরি নয়, একটা সাপেরও দাম। দামী সাপটা গেল তোমার—"

বুড়ো বিহ্বল দৃষ্টি মেলে অভিভূত কণ্ঠে বলে, "আজ্ঞে কী বলছ কত্তা?"

"যা বলছি ঠিকই বুঝেছ।…যাও।"

"কত্তা!"

"কটা সাপ তোমার ঝাঁপিতে ছিল বুড়ো?" নির্নিমেষ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রামকালী আস্তে উচ্চারণ করেন কথাটা।

সে দৃষ্টির সামনে কেঁপে ওঠে লোকটা, কাদো কাদো গলায় বলে, "কত্তা, তুমি অন্তরযামী -"

"বিশ্বাস করছ সে কথা? আচ্ছা যাও, ভয় নেই।"

টাকা, অভয়, দুটো জিনিস পেয়ে গেছে লোকটা, অতএব আর দাঁড়ায় না। কি জানি 'অগ্নিমুখ দেবতা' এক্ষুনি যদি মত পাল্টায়!

রামকালী অদ্ভুত একটা ক্ষোভের দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকেন। এদের তো নিজেদের অজ্ঞতার শেষ নেই, বুদ্ধিহীনতার চরম প্রতীক, তবু অপরের অজ্ঞতা আর মূঢ়তাকে উপজীবিকা করে চালিয়েও চলছে দিব্যি।

সাপটা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ধারণা করেন নি, লোকটা এত সহজে স্বীকার পাবে, এক কথায় এমন গুটিয়ে কেঁচো হয়ে যাবে।

মনটা ভাবাক্রান্ত হয়ে ওঠে একটা বিষণ্ণ বেদনায়। দেহের রোগ সারাবার ভার চিকিৎসকের হাতে, কিন্তু মনের রোগ কে সারাবে? কুসংস্কার, অজ্ঞতা, বোকামি, অথচ তার সঙ্গে ষোলো আনা কুটিলবুদ্ধি। আশ্চর্য!

অন্ধকার হয়ে গেছে। আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণপ্রায়, তবু সেই দাওয়ার ধারেই জলচৌকিটার উপর বসে আছেন রামকালী। খড়মটা পায়ে পরা নেই, পা দুটো আলগা তার ওপর চাপানো। অন্ধকারে খড়মের রুপোর 'বৌল' দুটো ঈষৎ চকচক করছে।

"বাবা!"

চমকে উঠলেন এই অপ্রত্যাশিত ডাকে।

"সত্য? তুমি এখানে? ও, আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে তাই বলতে এসেছ? যাই মা। তুমি ভেতরে যাও।"

"আমি সে কথা বলতে আসি নি বাবা!"

"সে কথা বলতে আস নি? তা হলে?"

"বলছিলাম—" প্রায় মরীয়ার মতন বলে ফেলে সত্য, "বারুইপুরের লোককে 'হ্যাঁ' করেই দাও না বাবা!"

বারুইপুরের!

রামকালী অবাক হয়ে বলেন, "হ্যাঁ' করে দেব? কি 'হ্যাঁ' করে দেব?"

"তুমি তো বুঝতেই পারছ বাবা"—সত্য কাতর স্বরে বলে, "আমি আর নির্লজ্জর মত মুখ ফুটে কি বলব!"

রামকালী মেয়ের মুখটা দেখতে পান না অন্ধকারে, কিন্তু স্বরটা ধরতে পারেন, কিন্তু বুঝতে সত্যিই পারেন না সত্য কি বলতে চায়। বারুইপুরের লোকটার চলে যাওয়ার ব্যাপারে 'হ্যাঁ' করতে বলতে চাইছে না কি? রামকালী তো সে রায় দিয়েই দিয়েছেন, তবে? বাড়ির মেয়েরা বোধ হয় এখনো জের টানছেন।

সান্ত্বনার গলায় বলেন, "ভয় পেও না, শ্বশুরবাড়ি তোমায় যেতে হবে না এখন।"

সত্য বোঝে বাবা তার আবেদন ধরতে পারেন নি, আর পারার কথাও নয়। সত্যর মতন কোন্ মেয়েটা আর নিজের গলা নিজে কাটতে চায়? কিন্তু সত্য যে সাত পাঁচ ভেবে তাই চাইছে। হাড়িকাঠের নীচে গলাটা বাড়িয়েই দিচ্ছে। পিস্ঠাকুমার দল সশব্দে ঘোষণা করেছেন, 'অহঙ্কারে ধরাকে সরা দেখে রামকালী মেয়ের আখের ঘোচালেন! কুটুমরা রক্তমাংসের মানুষ বৈ তো কাঠ পাথরের নয় যে, এত অপমান সহ্য করে বসে থাকবে! ছেলের আবার বিয়ে দেবেই নির্ঘাত, আর রামকালী চিরকাল মেয়ে গলায় করে বসে থাকবেন। গলায় পড়া মেয়ে মানেই হাতে পায়ে বেড়ি।'

সত্য ভেবে ঠিক করেছে বাপ-মায়ের হাতে পায়ে বেড়ি হয়ে থাকাটা কোন কাজের কথা নয়। তার চাইতে বাপের সুমতি করানোই ভাল।

কিন্তু বাবা তার বক্তব্যই ধরতে পারছেন না।

অতএব আর লজ্জার আবরণ রাখা চলল না। সত্য সকালবেলার চিরেতার জল খাওয়ার মতই চোখকান বুজে বলে ফেল্‌ল, "সে ভয়কে আমি মনে ধরাচ্ছি না বাবা, বরং উল্টো কথাই বলছি। ও তুমি পাঠাবার মত করেই দাও, আমার কপালে মরণ বাঁচন যা আছে হবে।"

রামকালী স্তম্ভিত হলেন।

এযাবৎ মেয়ের বহু দুঃসাহসের পরিচয় তিনি পেয়েছেন, সে দুঃসাহস পরিপাকও করেছেন। কারণ তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেছেন। কিন্তু এটা কি? নিজে সেধে শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইছে সে?

বয়স্থা মেয়ে নয় যে, এ চাওয়ার অন্য অর্থ করবেন, তবে?

কণ্ঠস্বর গম্ভীর হল, হয়তো বা একটু রূঢ়ও—"তুমি ইচ্ছে করে শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইছ?"

"যেতে চাইছি কি আর সাধে?" বাবার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার আভাস সত্যর চোখে প্রায় জল এনে ফেলেছে, "চাইছি অনেক ভেবে-চিন্তে। কুটুমকে চটিয়ে শুধু গেরো ডেকে আনা বৈ তো নয়?"

রামকালী বুঝলেন, বাড়িতে এই ধরনের কথার চাষ চলছে। অবোধ শিশু শিখবেই তো। কিন্তু তাই বলে এতই কি অবোধ যে, বাপের সামনে কোন্ কথা বলতে হয় তা বোঝে না?

কঠিন স্বরে বললেন, "আমার গেরোর কথা আমিই বুঝব সত্য, তুমি ছেলেমানুষ এ নিয়ে ভাববার বা এ সব কথায় থাকবার দরকার নেই। এটা বাচালতা।"

কিন্তু সত্য তো দমবে না।

হাল ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া সত্যর কোষ্ঠিতে লেখে নি। তাই ম্লান হলেও জোরালো স্বরে বল, "সে তো বুঝছিই বাবা, বাচালতা, নির্লজ্জতা, কিন্তু উপায় কি? সমিস্থে যে প্রবল! এর পর যখন তোমাকে আমায় নিয়ে ভুগতে হবে, তখন যে মরেও শান্তি পাব না। ওরা ছেলের আবার বিয়ে নাকি দেবে বলেছে। সেটা তো অপমান্যি। তুশ্চু একটা মেয়েসন্তানের জন্যে কেন তোমার উঁচু মাথাটা হেঁট হবে বাবা?"

রামকালীর মনে হল প্রচণ্ড একটা ধমকে মেয়েটার বাচালতা ঠাণ্ডা করে দেন, কিন্তু পরক্ষণেই একটা বিপরীত ভাবের ধাক্কা এল। মেয়েটার মনের মধ্যে আছে কি? এতটুকু মেয়ে এতকথা ভাবেই বা কেন? আর এতখানি দুর্জয় সাহসই বা সংগ্রহ করল কোথা থেকে?

বাপের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার আলোচনা ভূভারতে আর কোন মেয়ে করেছে কখনো? তাও রামকালীর মত রাশভারী বাপ, মা দীনতারিণী পর্যন্ত যার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলেন। তা ছাড়া—'শ্বশুরবাড়ি' শব্দটাই তো মেয়েদের কাছে 'সাপখোপ বাঘ ভাল্লুক ভূত চোর' সব কিছুর চাইতেও ভয়ের। সে ভয়কেও জয় করেছে সত্য কোন্ নির্ভয় মন্ত্রের জোরে?

ঠিক করলেন ধমকে ঠাণ্ডা করবেন না, শেষ অবধি ধৈর্য ধরে শুনবেন ওর কথা। দেখবেন ওর মনের গতির বৈচিত্র্য। রাগের বদলে একটা বিস্মিত কৌতুহল আসছে।

শান্তগলায় বললেন "মেয়েসন্তান যে "তুশ্চ" এটা তো তুমি কখনো বলো না?"

"বলি না, অবস্থাই বলাচ্ছে বাবা! তুশ্চু না হলে আর তাকে সাত তাড়াতাড়ি 'পরগোত্তর' করে দিতে হয়? একটা সন্তান বলে কথা, তাও তো ঘরে রাখতে পার নি, তবে আর মিথ্যা মায়ায় জড়িয়ে কি হবে বাবা? সেই 'পরগোত্তরই' যখন করে দিয়েছ, তখন আর জোর কি? আজ নয় কাল পাঠতে তো হবেই, বলতে তো পারবে না, 'দেব না আমার মেয়ে'! তবে?"

"পাঠাবার একটা সময় আছে, নিয়ম আছে, সে তুমি এখন বুঝবে না। ও নিয়ে মিছে মাথা খারাপ করো না! যাও ভেতরে যাও।"

"ভেতরে নয় যাচ্ছি, কিন্তু মনের ভেতরে যে তোলপাড় হচ্ছে বাবা! রঘুর মিত্যু আজ আমার দিষ্টি খুলে দিয়েছে। ভগবানের রাজ্যেই যখন সময় বাঁধা নেই, নিয়ম নেই, তখন মানুষের আর থাকবে কি? এই আজ আমাকে পরের ঘরে পাঠাতে বুক ফাটছে তোমার, এখুনি যদি মিত্যু এসে দাঁড়ায়, দিতে তো হবে তার হাতে তুলে?" সহসা আঁচলের কোণ তুলে চোখটা মুছে নেয় সত্য, তার পর ভারী গলায় বলে, "তখন তো বলতে পারবে না 'এখনও সময় আসে নি, নিয়ম নেই।' ও শ্বশুরবাড়ি আর যমেরবাড়ি দুই যখন সমতুল্যি, তখন আর মনে খেদ রেখো না। পাঠিয়ে দিয়ে মনে করো সত্য মরে গেছে।"

আর বোধ করি শক্ত থাকতে পারে না সত্য, নিজেই সেই কাল্পনিক মৃত্যুর শোকেই ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

স্তব্ধ রামকালী সেই ক্রন্দনবতীর দিকে তাকিয়ে থাকেন। মেয়েটা কি শুধুই শেখা বুলি কপ্‌চে যায়, না সত্যিই এমনি করে ভাবে?

খানিকক্ষণ পরে স্তব্ধতা ভেঙে বলেন, "মন কেমনের কথা আমি ভাবি না সত্য, তুমি বড়দের মত কথা বলতে শিখেছ তাই বলছি, তোমায় পাঠালে আমার মান থাকবে না!"

সত্য গভীর দুঃখে হতাশ স্বরে বলে, "বুঝি বাবা, বুঝি না কি? কিন্তু এ তো তবু শুধু ওদের কাছে মান থাকা মান যাওয়া। গলবস্তর হয়ে যেদিন ওদের ঘরে মেয়ে দিয়েছ, মান তো সেদিনই গেছে। কিন্তু ওরা যদি তোমার মেয়েকে ত্যাগ দেয়, তা হলে যে দেশসুদ্ধ লোকের কাছে হতমান্যি! দু দিক বিবেচনা করো বাবা!"

রামকালীর গলা দিয়ে বুঝি আর শব্দ বেরোয় না, ভাষা স্তব্ধ হয়ে গেছে তাঁর। মেয়েটা কি সত্যি বালিকা মাত্র নয়, ওর মধ্যে কি কোন শক্তির "ভর" হয়? বুদ্ধির শক্তি, বাক্যের শক্তি?

"আচ্ছা তুমি যাও, আমি ভেবে দেখছি।"

"ভাবো। যা পারো আজ রাত্তিরের মধ্যেই ভেবে নাও। ওই হতচ্ছাড়াটা তো রাত পোহাতেই বিদেয় হবে।"

"ছিঃ মা, শ্বশুরবাড়ির লোকের সম্পর্কে কি এভাবে বলতে আছে?"

"নেই তাতো জানি বাবা, কিন্তু দেখে যে অপিরবিত্তি আসছে। কুটুম-বাড়িতে পাঠাবার যুগ্যি একটা লোকও জোটে নি?"

রামকালী ঈষৎ তরল কণ্ঠে বলে ওঠেন, "তুই তো আমার মুখ হেঁট হবার ভয়ে সারা, কিন্তু শশুররা ত্যাগ না দিয়ে কি ছাড়বে তোকে? দু'দিন ঘর করেই তো ফেরত দেবে। তোকে নিয়ে কে ঘর করবে সত্য? এত বাক্যি কে সইতে পারবে?"

সত্য সগৌরবে মাথা তুলে বলে, "সে তুমি নিশ্চিন্দি থেকো বাবা, সত্যকে দিয়ে তোমার মুখ কখনো হেঁট হবে না।"

রামকালী গভীর স্নেহে মেয়ের পিঠে একটু হাত রাখেন।

মেয়েটা যে কি, তিনি যেন বুঝে উঠতে পারেন না। থেকে থেকে সে যেন তীক্ষ্ণ একটা প্রশ্নের মত তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায়। যে কথাগুলো বলে, সব সময় সেগুলো পাকা মেয়ের শেখা কথা বলে উড়িয়ে দেওয়াও শক্ত, সে সব কথা চিন্তিত করে, বুঝি বা ভীতও করে। তবু রামকালী ওকে বুঝছেন, কিন্তু পৃথিবী কি ওকে বুঝবে?

ও কেন সাধারণ হল না?

পুণ্যির মত, বাড়ির আর পাঁচটা মেয়ের মত? অথবা ওর মার মত? সেটাই তো উচিত। রামকালী তাহলে ওর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতেন। সুখী হতেন।

কিন্তু?

সত্যিই কি সুখী হতেন? সত্য সাধারণ হলে, বোকা হলে, ভোঁতা হলে? সত্যকে

যে তাঁর একটা দামী জিনিস বলে মনে হয়, সেটা কি হত তাহলে? কেবলমাত্র স্নেহের ওজন চাপিয়ে পাল্লাটা এত ভারী করে তুলতে পারতেন?

"যাও মা ভেতরে যাও, আহ্নিক করব এবার।"

"যাচ্ছি—" উঠে দাঁড়িয়েই রামকালীর অসাধারণ মেয়ে সহসাই একটা হাস্যকর সাধারণ কথা বলে বসে, "ভেতর দালান পর্যন্ত একটু এগিয়ে দেবে বাবা?"

"এগিয়ে দেব? কেন রে?"

"রঘুর দিশুটা দেখে অবধি গাটা কেমন ছমছম করছে বাবা! মেলাই অন্ধকার ওখানটায়।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ চল, যাচ্ছি আমি। কেন যে তুমি গেলে সেখানে! ভাল কর নি!"

রামকালী কি একটু আশ্বস্ত হলেন? তাঁর নির্ভীক মেয়ের এই ভয়টুকু দেখে?

মেলাই অন্ধকারটা পার হয়ে এসে সত্য একবার থমকে দাঁড়াল, তার পর ঝপ্ করে বলে উঠল "ভাবতে ভুলে যেও না বাবা!"

"ভাবতে? কি ভাবতে? ও!" অন্যমনস্কতা থেকে সচেতনতায় ফিরে আসেন রামকালী, "ভেবেছি। পাঠিয়েই দেব তোমায়।"

সহসা কান্নায় উথলে উঠল সত্য, "আমার ওপর রাগ করলে বাবা?"

"না রাগ করি নি।"

"আবার আনবে তো?" কান্না অদম্য হয়ে ওঠে।

"ওরা যদি পাঠায়।" নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেন রামকালী।

"পাঠাবে না বৈ কি, ইস্।" মুহূর্তে কান্না থামিয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে সত্য, "তুমি ওদের মান রাখছ, আর ওরা তোমার মান রাখবে না? পাছে কুটুম্বুর সঙ্গে 'অসরস' হয়, আসা-যাওয়া বন্ধ হয়, এই ভয়ে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু যেতে চাইছি আমি, বুঝবে না তারা সে কথা?"

রামকালী আর একবার চমৎকৃত হলেন।

অতটুকু মগজে এত তলিয়ে ও ভাবে কি করে? তার পর হতাশ নিঃশ্বাস ফেললেন, বোঝবার কথা যদি সবাই বুঝত!

মেয়ের বিয়ে দেবার সময় জামাইয়ের রূপ দেখে নেওয়া যায়, কুল দেখে নেওয়া যায়, অবস্থা দেখে নেওয়া যায়, কিন্তু তার সংসার সুদ্ধ পরিজনের প্রকৃতি তো আর দেখে নেওয়া যায় না?

মেয়েকে রামকালী গৌরীদান করেছেন।

পাত্র খোঁজার সময় দীনতারিণী বলেছিলেন, "তোমার মোটে একটা মেয়ে, পরের ঘরে

কেন দেবে ? একটি সোন্দর দেখে কুলীনের ছেলে নিয়ে এসে ঘরজামাই রাখো।"

ভুবনেশ্বরীও স্পন্দিত চিত্তে শাশুড়ীর অন্তরালে বসে রায়-শোনবার জন্যে হাঁ করে ছিল, কিন্তু রামকালী তাঁদের আশায় জল ঢাললেন। বললেন, "ঘরজামাই ? ছি ছি ছি!"

"কেন ?" দীনতারিণী বুকের ভয় চেপে জেদের সুরে বলেছিলেন, "লোকে কি এমন করে না ?"

"লোকে তো কত কি করে মা!"

"তা বৌমার যে আর ছেলেপুলে হবে এ আশা তো দেখি না, কুষ্ঠিতেও নাকি আছে এক সন্তান। তা'লে তোমার বিষয়-আশয় তো জামাইই পাবে, ছোট থেকে গড়ে পিটে তৈরি না করলে—?"

রামকালী তীব্র প্রতিবাদে মাকে নির্বাক্ করে দিয়েছিলেন, "রাসু থাকতে, তা'র ভাইয়েরা থাকতে জামাই বিষয় পাবে এ কথা তুমি মুখে আনলে কি করে মা ? ছি ছি! সত্য কেন বাপের ভাত খেতে যাবে ? এমন পাত্রে দেব, যাতে জামাইকে শ্বশুরের বিষয়ে লোভ করতে না হয়।"

তা সে কথা রামকালী রেখেছিলেন।

মেয়ের যা বিয়ে দিয়েছিলেন, শ্বশুরের সম্পত্তিতে লোভ করার দরকার তাদের নেই।

বিষয়-আশয় ঢের, সে-ও বাপের এক ছেলে।

শুনেছেন বাপ একটু কৃপণ, তা সে আর কি করা যাবে ? নিখুঁত কি হয়!

তেমনি যে চাঁদের মত জামাই।

তা ছাড়া পরম কুলীন।

এর বেশী আর কি দেখা যায় ?

কিন্তু লোভ কি মানুষ দরকার বুঝে করে ? রামকালী কি স্বপ্নেও ভেবেছেন, তাঁর পরমকুলীন বেহাই, শ্যেন দৃষ্টি মেলে বসে আছেন তাঁর বিষয়ের দিকে ? এমনই তীব্র লোভ যে রামকালীর 'অবর্তমান' অবস্থাটাই তাঁর একান্ত চিন্তনীয় বিষয় ?

রামকালীর চাইতে বছর দশেকের বড় হয়েও নিজে তিনি চির বর্তমান থাকবেন, এমনই আশা।

এ সব জানেন না রামকালী।

শুধু জামাই পাঠচর্চা করছে এটা জেনেছেন, জেনে সন্তুষ্ট হয়েছেন।

'ম্লেচ্ছ বিদ্যা' বলে হেয় করবেন, এমন সংস্কারাচ্ছন্ন রামকালী নন। শিখুক, ভালই। ম্লেচ্ছদেরই তো রাজত্ব চলছে এখন।

উনিশ

লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যে মারা গেলেন।

পুণ্যবান মানুষ, নিয়মের শরীর, ভুগলেন না ভোগালেন না, চলে গেলেন সজ্ঞানে। সকালেও যথারীতি স্নান করেছেন, ফুল তুলেছেন, পূজো করেছেন। পূজো করে উঠে বড় ছেলেকে ডেকে বললেন, "তোমরা আজ একটু সকাল সকাল আহারাদি সেরে নাও, আমার শরীরটা ভাল বুঝছি না, মনে হচ্ছে ডাক এসেছে।"

বড় ছেলে হতচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে, বোধ করি ধারণাও করতে পারে না, লক্ষ্মীকান্তর শরীর খারাপের সঙ্গে তাদের আহারাদি সেরে নেওয়ার সম্পর্ক কোথায়! আর 'ডাক' কথাটারই বা অর্থ কি!

লক্ষ্মীকান্ত ছেলের ওই বিহ্বলতায় হাসলেন। হেসে বললেন, "আহারাদি সেরে দুই ভাই আমার কাছে এসে বসবে, কিছু উপদেশ দিয়ে যাব। অবশ্য উপদেশ দেবার অধিকার আর কিছুই নয়, কতটুকুই বা জানি, জগৎকে কতটুকুই বা দেখেছি, তবু বয়সের অভিজ্ঞতা। বধূমাতাদের জানিয়ে দাও গে রান্নার কতকগুলি 'পদ' বাড়িয়ে যেন বিলম্ব না করেন।"

বাপ কেবল তাদের খাওয়ার কথাই বলছেন! কিন্তু তাঁর নিজের?

বড় ছেলে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আপনার অন্নপাক কখন হবে?"

"এই দেখ বোকা ছেলে, বিচলিত হচ্ছ কেন? আমার আজ পূর্ণিমা, অন্ন নেই। ফলাহার একটু করে নেব, নারায়ণের প্রসাদ। প্রসাদে চিত্তশুদ্ধি দেহশুদ্ধি!"

ছেলে গিয়ে ছোট ভাইয়ের কাছে ভেঙে পড়ল। তার পর অন্তঃপুরিকারা টের পেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত সংসারে শোকের ছায়া নেমে এল। কেউ অবিশ্বাস করল না, কেউ হাস্যকর বলে উড়িয়ে দিল না, 'অমোঘ নিশ্চিত' বলে ধ্বংসে পড়ল।

বাঁড়ুয্যের সংসার থেকে এ সংবাদ সঙ্গে সঙ্গেই বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল, কারণ আগুন কখনো এক জায়গায় আবদ্ধ থাকে না।

মুহূর্তে চারিদিকে প্রচার হয়ে গেল, "বাঁড়ুয্যে যে চললেন!"

যেন বাঁড়ুয্যে কোন বিদেশ ভ্রমণে যাচ্ছেন, নৌকো ভাড়া হয়ে গেছে, সঙ্গীরা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোথাও।

উঠোনে তুলসীমঞ্চের নীচে লক্ষ্মীকান্তর শেষ শয্যা বিছানো হয়েছে, বালিশে মাথা রেখে দুই হাত বুকে জড়ো করে, টানটান হয়ে শুয়ে আছেন তিনি সোজা।

কপালে চন্দনলেখায় হরিনাম, দুই চোখের উপর-পাতায় আর দুই কানে চন্দন-মাখানো তুলসীপাতা। বুকের উপর ছোট্ট একটি হাতে-লেখা পুঁথি। লক্ষ্মীকান্তর নিজেরই হাতের লেখা, গীতার কয়েকটি শ্লোক। নিত্য পাঠ করতেন, সেটি সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে।

যাত্রাকালে কেউ স্পর্শ করবে না, যাত্রীর নিষেধ। বিছানাটি ছাড়িয়ে আশেপাশে মাথা হেঁট করে বসে আছে ছেলেরা, পাড়ার কর্তা-ব্যক্তিরা। অন্তঃপুরিকারা অদূরে আলম্ব ঘোমটায় আবৃত হয়ে বসে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছেন।

মৃত্যুর দণ্ডকাল অতীত না হওয়া পর্যন্ত ডাক ছেড়ে কাঁদা চলবে না, সেটাও নিষেধ। ক্রন্দনধ্বনি আত্মার উর্ধ্বগতির পথে বিঘ্ন ঘটায়।

বাঁড়ুয্যে গিন্নীও সেই নিষেধাজ্ঞা শিরোধার্য করে নিঃশব্দে ডুকরোচ্ছেন।

ঘোষাল এসে দাঁড়ালেন।

কাঁপা গলায় বলে উঠলেন, "জনকরাজার মত চললে বাঁড়ুয্যে?"

লক্ষ্মীকান্ত মৃদু হেসে মৃদুস্বরে বললেন, "বিদেশ থেকে স্বদেশে! বিমাতার কাছ থেকে মাতার কাছে।"

তার পর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তারকব্রহ্ম!"

অর্থাৎ বৃথা কথায় কালক্ষেপ নয়।

"নমো নারায়ণায় নমো নারায়ণায়, হরের্নামৈব কেবলম্!"

আস্তে আস্তে চোখের পাতা দুটি বুজলেন লক্ষ্মীকান্ত। তুলসীপাতা দুটি ঢেকে দিল দুটি চোখের পাতা।

নিঃশ্বাসের উত্থানপতনের সঙ্গে নাম জপ হতে থাকল ভিতরে, যতক্ষণ চলল শ্বাসের ওঠাপড়া।

এক সময় থামল।

যাক, বয়স হয়েছিল লক্ষ্মীকান্তর, ভুগলেন না ভোগালেন না, চলে গেলেন, এতে দুঃখের কিছু নেই। অন্ততঃ দুঃখ করা উচিত নয়। মানুষ তো মরবার জন্যেই এসেছে পৃথিবীতে, সেই তার সর্বশেষ আর সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মটি যদি নিপুণ ভাবে নিখুঁত ভাবে করে যেতে পারে, তার চাইতে আনন্দের আর কি আছে?

না, লক্ষ্মীকান্তর মৃত্যুতে দুঃখের কিছু নেই।

তবু নিকট-আত্মীয়রা দুঃখ পায়।

মায়াবদ্ধ জীব দুঃখ না পেয়ে যাবে কোথায়?

কিন্তু নিকট-আত্মীয় না হয়েও একজন এ মৃত্যুতে দুঃখের সাগরে ভাসে, সে হচ্ছে সারদা।

শ্রাদ্ধ উপলক্ষে নতুন কুটুম্বকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছে বাঁড়ুয্যের ছেলেরা, আর 'নিয়মভঙ্গ' অবধি থাকার আবেদন জানিয়ে রাসুকে নিতে লোক পাঠিয়েছে।

তুলনা হিসেবে বলতে গেলে সারদার মাথায় একখানা ইঁট বসিয়েছে।

নিয়ে যাবে পরদিন। কথা চলছে সারাদিন।

এ বাড়ি থেকে রামকালী খবর শোনামাত্র একবার দেখা করে এসেছেন এবং যথারীতি হবিষ্যান্নের যোগাড় পাঠিয়েছেন লৌকিকতা হিসাবে। প্রচুরই পাঠিয়েছেন।

এখন আবার রাসুর সঙ্গে লোক যাবে, শ্রাদ্ধের 'সভাপ্রণামী' আর সমগ্র সংসারের ঘাটে-ওঠার কাপড়-চোপড় নিয়ে! নিয়মভঙ্গের দিন পুকুরে জাল ফেলানো হবে, মাছ যাবে, রাসুর শাশুড়ীদের জন্যে সিঁদুর আলতা পান সুপারি যাবে।

এই সব আলোচনাই চলছে সারাদিন।

সারদার মনে হচ্ছে, সবই যেন বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

এই যে তার বাবার খুড়ি মারা গেলেন সেবার, কই এত সব তো হয় নি!

যাক, সে কথা যাক।

পয়সা আছে বিলোবে।

কিন্তু সারদার খাস তালুকটুকু না এই উপলক্ষে বিকিয়ে যায়।

রাতে ছাড়া কথা কওয়ার উপায় নেই, স্পন্দিত চিত্তে সংসারের কাজ সারে সারদা, আর প্রহর গোনে।

তবু কুটুমদের একটু আক্কেল আছে, দিনে দিনেই নিয়ে চলে যায় নি, একটা রাত হাতে রেখেছে।

এ বাড়ির খাওয়া-দাওয়া মিটতে রাত দুপুর হয়ে যায়।

তবু এক সময় আসে সেই আকাঙ্খিত সময়।

দরজার হুড়কো লাগিয়ে দেওয়া যায় এবার, সমস্ত সংসার থেকে পৃথক হয়ে এসে বসা যায় দুটো মানুষের।

চট্ করে কথা বলা সারদার স্বভাব নয়।

প্রথমটা যথারীতি প্রদীপ উস্কোয়, প্রদীপের শিখার ওপর বাটি ধরে ছেলের দুধ গরম করে, ছেলে তুলে দুধ খাওয়ায়, তারপর তাকে শুইয়ে চাপড়ে তার ঘুম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে, এদিকে এসে পা ঝুলিয়ে বসে।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে।

তারপর বলে ওঠে, "যাচ্ছো তা হলে?"

রাসু অবশ্য এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুতই ছিল, তাই নির্লিপ্ত স্বরে বলে, "না যাওয়া ছাড়া তো উপায় দেখছি না।"

"উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছিলে বুঝি?" ব্যঙ্গ-তীক্ষ্ণ স্বর।

"খুঁজে আর কি বেড়াব? জানি তো ছাড়ান-ছিড়েন নেই!"

"চেষ্টা থাকলে ছাড়ান থাকে।" আরও তীক্ষ্ণ হুল ফোটায় সারদা।

"কি করে শুনি?" ঈষৎ উষ্মা প্রকাশ করে রাসু।

"শরীর খারাপের ছুতো দেখাতে পারলে কেউ টেনে নিয়ে যেতে পারে না।"

রাসু বিরক্তভাবে বলে, "সে ছুতোটা দেখাব কি করে শুনি, এই আকাঁড়া দেহখানা নিয়ে?"

সারদা এ বিরক্তিতে ভয় পায় না, দমে না। অম্লান বদনে বলে, "চেষ্টা থাকলে কি না হয়! বল্‌কা দুধ তোমার খাতে অসৈরন, লুকিয়ে সের দু-তিন কাঁচা দুধ চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললেই এখুনি এক কুড়ি বার মাঠে ছুটতে হত। অসুখ বলে টের পেত সবাই। গুরুজনের সঙ্গে মিছে কথাও বলা হত না।"

"তা এটা আর মিছে ছাড়া কি? মিছে কথা না হয়ে, নয় মিথ্যে আচরণ!"

নীতিবাগীশ রাসু জোর দিয়ে বলে।

"থামো থামো," সারদা তীব্র প্রতিবাদ করে ওঠে, "এটুকু তো আর কখনো কর না গোসাঁইঠাকুর? ফটা বট্‌ঠাকুরদের বাড়ি থেকে পাশা খেলে দেরি করে ফিরে সদর দিয়ে না ঢুকে খিড়কি দিয়ে ঢোকা হয় কেন শুনি? মেজকাকামশাই যে সমস্কৃত পড়ার টোল ঠিক করে দিয়েছেন, সেখানে তো মাসের মধ্যে দশদিন কামাই দাও, সেকথা জানাও ওনাকে? নিত্যি নিয়মে বেরিয়ে এখান-ওখান করে বেড়াও না? আমাকে আর তুমি ধম্ম দেখাতে এস না।"

"আমি কাউকে কিছু জানাতে চাই না," বীরপুরুষ রাসু বলে, "গুরুজন যা নির্দেশ দেবেন মানব, ব্যস।"

"তা তো মানবেই। সেখানে যে মধু আছে। নতুন বাগানের নতুন ফুল। পাটমহলের পাটরাণী!"

"বাজে কথা বলো না।"

"বাজে কথাই বটে!"

সারদা আর একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "আমার গা ছুঁয়ে প্রিতিজ্ঞে করেছিলে, সে কথা মনে পড়ছে?"

"পড়বে না কেন? তা আমি তো আর জামাইষষ্ঠির নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না। যাচ্ছি একটা মান্যমান লোকের শ্রাদ্ধয়।"

"তার সঙ্গে আমারও শ্রাদ্ধ-পিণ্ডির ব্যবস্থা হচ্ছে, অন্তরেই জানছি। এবার নিঘ্‌ঘাত তারা মেয়ে পাঠাবার কথা কইবে।"

রাসু তেড়ে ওঠার ভান করে বলে, "তোমার যেমন কথা! নিজে থেকে কেউ মেয়ে পাঠাবার কথা বলে?"

"বলে বৈ কি! ক্ষেত্তর বিশেষে বলে। সতীনের ওপরে-পড়া মেয়ের কথায় বলে!"

"বলি তার ঘরবসতের বয়েসটা হবে তবে তো? তুমি যেন রাতদিন দড়ি দেখে 'সাপ' বলে আঁতকাচ্ছ।"

"বয়েস!" সারদা তীব্র ঝঙ্কারে বলে ওঠে, "মেয়েমানুষের বয়েস হতে আবার কদিন লাগে? দশ পেরোলেই বয়স! আর মেজকাকামশাইয়ের কড়াকড়ির জারি-জুরি তো ভেঙে গেল। নিজের মেয়েকেই যখন বয়েস না হতেই পাঠালেন।"

"গুরুজনের কাজের ব্যাখ্যানা করো না। কারণ ছিল তাই এ কাজ করেছেন।"

সারদা দুর্বার, সারদা অদম্য।

সেও সমানে সমানে জবাব দেয়, "তা তোমার দ্বিতীয় পক্ষকে শ্বশুরঘর করতে নিয়ে আসারও একটা কারণ আবিষ্কার হবে! তবে এই জেনে রাখো, নতুন বৌ যদি আসে, সেও এক দোর দিয়ে ঢুকবে, আমিও আর এক দোর দিয়ে দড়িকলসী নিয়ে বেরিয়ে যাব।"

অস্ত্রটা মোক্ষম!

রাসু এবার কাবু হয়।

আপসের সুরে বলে, "আচ্ছা অত পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে দুঃখু ডেকে আনবার কি দরকার তোমার বলো তো? যাচ্ছি দাদাশ্বশুরের শ্রাদ্ধয়, খাব মাখব চলে আসব, ব্যস। আমি কি কাউকে আনতে যাচ্ছি?"

"তা, সেটা মনে রাখলেই হল!"

সারদা সহসা রাসুর একটা হাত টেনে নিয়ে ঘুমন্ত ছেলের মাথায় ঠেকিয়ে দিয়ে বলে, 'তবে সত্যি করে যাও সে-কথা।"

"আ ছি ছি! কী মতিবুদ্ধি তোমার? ছেলের মাথায় হাত দিয়ে—"

সারদা অকুতোভয়ে বলে, "তাতে ভয়টা কি? আমায় বলো না খোকার মাথায় হাত দিয়ে দিব্যি করতে—জীবনে কক্ষনো পরপুরুষের দিকে চোখ তুলে চাইব না, এক শ বার সে দিব্যি করব।"

"চমৎকার বুদ্ধি। সেটা আর এটা এক হল?"

"কেন হবে না? আমি ছাড়া জগতের আর সকল মেয়েমানুষকে পরস্ত্রী ভাবলে কোন কষ্ট নেই।"

"বাঃ, যাকে অগ্নি-নারায়ণ সাক্ষী করে গ্রহণ করলাম—"

"ওঃ!" সারদা ঝট করে উঠে দাঁড়ায়। দরজার খিলটা খুলে ফেলে, কপাট ধরে দাঁড়িয়ে চাপা অথচ ভয়ঙ্কর একটা শব্দে বলে ওঠে, "ও বটে! এতক্ষণে প্রোকাশ পেল মনের কথা! তা এতক্ষণ না ভুগিয়ে সেটা বললেই হত! আচ্ছা—"

রাসুও অবশ্য এবার ভয় পেয়েছে, সেও নেমে এসে বলে, "আহা তা কপাট খুলছ কেন? যাচ্ছ কোথায়?"

"যাচ্ছি সেইখানে, যেথানে খলকাপট্য নেই, আগুনের জ্বালা নেই।" বলে ঝট করে বেরিয়ে পড়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যায় সারদা।

নাঃ, আর কিছু করার নেই!

নিরুপায় ক্ষোভে কিছুক্ষণ উঠোনের সেই গভীর রাত্রির নিকষ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশব্দে কপাটটা ভেজিয়ে দিয়ে খাটের ওপর বসে পড়ে রাসু।

ঘাম গড়াচ্ছে সর্বাঙ্গ দিয়ে।

গরমে নয়, আতঙ্কে।

কিন্তু করবার কি আছে এখন? ঘর থেকে বেরিয়ে তো আর বৌ খুঁজে বেড়াতে পারবে না রাসু! মা-খুড়ীর ঘুম ভাঙিয়ে দুঃসংবাদটা জানাতেও পারবে না!

নিজের হাতে যদি করণীয় কিছু থাকে, তো সে হচ্ছে নিজের হাতটা মুঠো পাকিয়ে নিজের মাথায় কীল মারা!

কুড়ি

এলোকেশী দাওয়ায় পাটি পেতে বসে বৌয়ের চুল বেঁধে দিচ্ছেন। দিচ্ছেন অনেকক্ষণ থেকেই। সেই দুপুরবেলা বসেছিলেন—এখন বেলা প্রায় গড়িয়ে এল।

এলোকেশী যেন পণ করেছেন আজ তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি দেখিয়ে ছাড়বেন। বৌকে সামনে রেখে তার পিছনে হাঁটু গেড়ে উঁচু হয়ে বসেছেন তিনি, মুখের ভাব কঠিন কঠোর।

ওদিকে টানের চোটে সত্যবতীর রগের শির ফুলে উঠেছে, চুলের গোড়াগুলো মাথার চামড়া থেকে উঠে আসতে চাইছে, ঘাড় অনেকক্ষণ আগে থেকেই টনটন করতে শুরু করেছে, এখন মেরুদণ্ডের মধ্যেও একটা অস্বস্তি শুরু হচ্ছে।

অথচ তার কেশকলাপ নিয়ে যে অপূর্ব শিল্প-রচনার চেষ্টা চলছে, আশা হচ্ছে না সহজে তার সমাপ্তি ঘটবে।

কিন্তু কেবলমাত্র এলোকেশীর অক্ষমতাকেই দায়ী করলে অবিবেচনার কাজ হবে, দায়ী অপরপক্ষও। সত্যবতীর চুলগুলো যেন বেয়াড়া ঘোড়া, কোনমতেই তাকে বাগ মানিয়ে বশে আনা যাচ্ছে না।

ঝুলে খাটো আর আড়ে ভারী চাপ চাপ কোঁকড়া চুলগুলো খোলা থাকলে যতই সুন্দর দেখাক, তাকে বেণীর বন্ধনে বেঁধে কবরীর আকৃতি দিতে গেলেই মুশকিলের একশেষ। গোড়া বাঁধতে গেলে ফস ফস করে এলিয়ে খুলে পড়ে, কোন রকমে যদি বা তিনগুছির ফেরে ফেলা যায়, তো পাঁচ গুছি, সাত গুছি, ন গুছির দিকেও যাওয়া চলে না।

কিন্তু এলোকেশী আজ বদ্ধপরিকর, সাত গুছির বাঁধনে বেঁধে 'কল্কা খোঁপা' করে দেবেন বৌকে। তাই বার তিনেক অসাফল্যের পর একগোছা মোটা মোটা কালো ঘুনসি দিয়ে চুলের গোড়াটাকে প্রায় ব্রহ্মতালুতে জড় করে এনে প্রাণপণ বিটকেলে বেঁধে ফেলেছেন এবং সাত গুছির সাত ভাগকে আয়ত্ত করতে চেষ্টা করছেন।

দীর্ঘস্থায়ী এই চেষ্টায় সত্যবতীর অবস্থা উপরোক্ত। অনেকক্ষণ বাবু হয়ে বসে থাকার পর এবার হাঁটু দুটো মুড়ে বুকের কাছে জড়ো করে বসেছে সত্যবতী, কারণ পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরেছিল। মুখটা সত্যবতীর আকাশমুখো, আর সেই মুখের ওপর পরনের নীলাম্বরী শাড়ি-খানার আঁচলটুকু চাপা দেওয়া।

মুখে আঁচল চাপা না দিয়ে উপায় নেই, কারণ চুল বাঁধবার সময় ঘোমটা দেওয়া চলে না। অথচ জলজ্যান্ত আস্ত মুখখানা খুলে বসে থাকলেও তো চলে না। না-ই বা ধারে কাছে কেউ থাকল, আর হলই বা শাশুড়ী পিছনে বসে, তবু 'নতুন বৌ' বলে কথা। তাই আঁচলটা তুলে মুখে চাপা দিয়েছে সত্যবতী। মানে দিতে বাধ্য হয়েছে। ঘোমটা খসাবার আগেই এলোকেশী নির্দেশ দিয়েছেন "আঁচলটা মুখে ঢাকা দাও দিকি বাছা। তোমার তো আর বোধ-বুদ্ধির বালাই নেই, অগত্যে সবই পষ্ট করে বলে দিতে হবে আমায়।"

দিনটা কি তবে সত্যবতীর শ্বশুরবাড়ি বাসের প্রথম দিন ?

না তা নয়, এসেছে সত্যবতী প্রায় মাস খানেক হয়ে গেল, কিন্তু মাথাটা ওর এ পর্যন্ত শাশুড়ীর হাতে পড়ে নি। সৌদামিনীই চুল বেঁধে, সরময়দা মাখিয়ে, আলতা পরিয়ে নতুন বৌয়ের প্রসাধন আর যত্নসাধন করছিল কদিন। হঠাৎ আজ সকালে এলোকেশীর নজরে পড়ল বৌয়ের চুল বেড়াবিনুনি করে বাঁধা।

দেখে রেগে জলে উঠলেন এলোকেশী। তবু নিশ্চিত হবার জন্যে ভুরু কুঁচকে ডাক দিলেন, "ইদিকে এস দিকি বৌমা।"

শাশুড়ীর সামনে কথা বলাও নিষেধ, মুখ খোলাও নিষেধ, সত্যবতী নীরবে কাছে এসে দাঁড়াল।

ঘোমটা অবশ্য বজায় থাকলই, এলোকেশী হ্যাঁচকা একটা টানে পুত্রবধূর পিঠের কাপড়টা তুলে খোঁপাটা দেখে নিলেন। ঠিক বটে, বেড়া বিনুনিই বটে।

তেলে বেগুনে জলে ডাক দিলেন, "সদু! সদি!"

যাকে বলে ত্রস্তেব্যস্তে সেই ভাবে ছুটে এল সৌদামিনী। দেখল, নতুন বৌ 'বুকে মাথায় এক' হয়ে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে, আর মামী তার পিঠের কাপড় উঁচু করে তুলে ধরে দণ্ডায়মান। মামীর নয়নে অগ্নিশিখা, কপালে কুটিলরেখা।

'কি বলছ' এ প্রশ্ন উচ্চারণ করল না সৌদামিনী, শুধু শঙ্কিত দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল।

কি হল বৌয়ের পিঠে ?

কোন জড়ুল চিহ্ন, না কোন চর্মরোগের আভাস, নাকি বা কোন পুরনো ক্ষতের দাগ ? অর্থাৎ নতুন বৌ কি 'দাগী' ? আর মামীর শ্যেন দৃষ্টির সামনে ধরা পড়ে গেছে সেটা।

অবশ্য ভুল ধারণা নিয়ে বেশীক্ষণ থাকতে হল না সৌদামিনীকে, এলোকেশী প্রবল স্বরে বলে উঠলেন, "বলি সদি, এমন ব্যাগারঠেলার কাজ কি না করলেই নয় ?

বুক থেকে পাথর নামে সৌদামিনীর।

যাক বাঁচা গেল।

নতুন কিছু নয়। সেই আদি ও অকৃত্রিম লক্ষ্য।

অতএব সাহসে ভর করে বলল, "কি হল ?"

"কি হল। বলি শুধোতে লজ্জা করল না? ধর্মের ষাঁড়ের মতন আকাঁড়া গতর নিয়ে দু বেলা ভাতের পাথর মারছিস, আর গতরে হাওয়া দিয়ে বেড়াচ্ছিস, একটু হায়া আসে না প্রাণে? দশটা নয় বিশটা নয়, একটা ভাই-বৌ, তার চুলটা বেঁধে দিয়েছিস এত অছেদ্দা করে। বলি কেন? কেন? এত অগ্যেরাহ্যি কিসের?"

"হ'লটা কি তা বলবে তো?"

সহজ গলায় বলে সৌদামিনী। আর সত্যবতী ঘোমটার মধ্য থেকে অবাক হয়ে প্রায় থরথর করে কাঁপতে থাকে। না, এলোকেশীর কটু-ভাষণে নয়, গিন্নীদের মুখে এরকম বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা শোনার অভ্যাস পাড়াবেড়ানি সত্যর আছে। রামকালী চাটুয্যের বাড়ির কথাবার্তাগুলো কথঞ্চিৎ সভ্য, নইলে তারই সেজপিসি সাবি পিসির বাড়ি সর্বদা এই ধরনের কথার চাষ। সেজন্যে না। এলোকেশীর কটুভাষণে না। অবাক হয় সৌদামিনীর সহ্যশক্তি দেখে। এত অপমানের পর ওই রকম সহজ ভাবে কথা বলল ঠাকুরঝি।

এটা সত্যবতীর অদেখা।

কটু কথার পরিবর্তে হয় কটু কথা, নয় ক্রন্দন, এই দেখতেই অভ্যস্ত সে। আর ঠাকুরঝি কিনা বলছে "হ'লটা কি তা বলবে তো?"

এলোকেশী অবশ্য অবাক হন না, কারণ সৌদামিনীর এই সহ্যশক্তি তাঁর পরিচিত। তবে তিনি তো আর প্রশংসায় উদ্বেল হন না, বরং এটা তার মামীর প্রতি অগ্রাহ্য বলেই রেগে জলে যান।

এখনো তাই বললেন, "হ'লটা কি, তা বলে তবে বোঝাতে হবে? মনে মনে জানছ না? চোখে দেখতে পাচ্ছ না? এ কী ছিরির চুল বাঁধা হয়েছে? বৌয়েব মাথায় বেডা-বিনুনি। ছি ছি, এতখানি বয়েস হ'ল, কখনো শ্বশুরবাড়ির বৌয়ের মাথায় বেডা বিনুনি দেখি নি। গলায় দড়ি তোর সদু, গলায় দড়ি যে একটা মাত্তর মাথা, তাও একখানা বাহারি খোঁপা বেঁধে দিতে পারিস না।"

সদু হেসে ওঠে, "বৌয়ের চুল যা বাহারি, ওতে আর বাহারি খোঁপা হয় না। বাগ্ মানানোই যায় না।"

"বাগ মানানো যায় না।" এলোকেশী ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, "আচ্ছা দেখব কেমন না যায়। এই বাঁড়ুয্যে-গিন্নীর কাছে জব্দ হয় না এমন কোন্ বস্তু জগতে আছে দেখি। ত্রিজগতের মধ্যে বাগ মানাতে পারলাম না শুধু এই তোমাকে।"

"বেশ তো মামী, তুমি নিজে হাতেই বৌকে সাজিও না, তোমার একটা মাত্তর বেটার বৌ"—বলে সৌদামিনী।

আর এলোকেশী আরও ধেই ধেই করে ওঠেন, "কী বললি সদি? এঁ্যা। এত আস্পদ্দা। মুখে মুখে জবাব। এত অহঙ্কার তোর কবে চুর্ণ হবে, কবে তোর দুঃখে শ্যালকুকুর কাঁদবে, সেই আশায় আছি আমি। এই তোকে দিব্যি দিলাম সদি, যদি আর

কোনদিন তুই আমার বো'র চুলে হাত দিবি।"

"গুরুজনের দিব্যি গায়ে লাগে না—ও মানলে কি চলে গো।" সত্য অম্লানবদনে বলে, "তোমার হল গে মন মর্জি কোনদিন দেবে, কোনদিন বা ভুলে যাবে—"

"কী বললি। কী বললি লক্ষ্মীছাড়ি। আমার একটা বেটার বৌয়ের কথা আমি ভুলে যাব?"

"তা তাতে আর আশ্চয্যি কি মামী।" সত্য নিতান্ত অমায়িক মুখে বলে, "তোমার সে গুণে কি ঘাট আছে? আপনার খিদের খাওয়া, তাই তো অর্ধেক দিন ভুলে যাও, ডেকে খাওয়াতে হয়।"

এলোকেশী সহসা থতমত খান। এটা ঠিক কোন্ ধরনের কথা ধরতে পারেন না। অভিযোগ না প্রশস্তি?

তাই ভারী মুখে বলেন, "হ্যাঁ, আমি ভুলে থাকছি আর রোজ তুমি আমায় ডেকে তুলে ঝিনুকে করে গিলিয়ে দিচ্ছ।"

"আহা তা না দিই, তোমার কি খেয়াল থাকে?"

'না থাকে না থাক। বৌয়ের চুল আজ থেকে আমি বাঁধব এই বলে রাখছি। ওর চুলের দড়ি কাঁটা সব আমার ঘরে রেখে যাবি। পাখী-কাঁটাগুলো দিতে ভুলবি না।"

"দেব, দিয়ে যাব। তা বৌয়ের বাবা যে সোনার চিরুণী, সাপকাঁটা, বাগান ফুল ইত্যেদি করে একরাশ মাথার গয়না দিয়েছেন, সেগুলোই বা বাক্সয় পুরে রাখছ কেন? সব বার করে বাহার করে দিও।"

"সে আমি কি করব না কবব তোমার কাছে পরামর্শ নিতে আসব না। অনবরত খালি চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। ভগবান যে কেন কঠিন রোগ দিয়ে তোর বাক্শক্তি হরণ করে নেন না তাই ভাবি। তুই জন্মের শোধ বোবা হয়ে বসে থাক, আমি 'নিসিংহতলা'য় ভোগ চড়াই।"

"দোহাই মামী, ওসব মানত-টানত করতে যেও না। দেব-দেবীরা এক শুনতে আর এক শুনে বসে থাকে, হয়তো বোবার বদলে ঠুঁটো করে দেবে, তখন মরবে তুমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে।"

"কী বললি সদি। তুই ঠুঁটো হয়ে বসে থাকলে আমার সংসার অচল হয়ে যাবে? সাধে বলি অহঙ্কারের পাঁচ পা তোর। আমার সংসার আমি চালাতে পারি নে ভেবেছিস? বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে পারি। কিন্তু সে আঙুলই বা আমি নাড়ব কেন? ভাতকাপড় দিয়ে তোকে পুষছি যখন।"

"আহা, আমিও তো তাই বলছি গো। ঠুঁটো হলেও তো ভাতকাপড়টা দিতেই হবে।"

"হবে! দায় পড়েছে। ঠ্যাং ধরে টেনে পগারে ফেলে দেব।"

"সর্বনাশ মামী, ও-বুদ্ধি করতে যেও না, পাড়াপড়শী তা হলে সেই পগারের পাঁক

তুলে এনে তোমাদের গালে মুখে মাখাবে।" বলে হাসতে হাসতে চলে যায় সৌদামিনী সত্যবতীকে স্তম্ভিত করে রেখে।

বড় সংসারের মেয়ে সত্যবতী তার এতটুকু জীবনে অনেক চরিত্র দেখেছে, এরকম আর দেখে নি।

যাক, সকালের সেই ঘটনার পরিণামে আজ দুপুরের এই মল্লযুদ্ধ।

সত্যিই বড় ভারী চুলের গোড়া সত্যর, অথচ ওদিকে ঝুলে খাটো! এক গোছা কালো ঘুনসি দিয়ে কষে বেঁধে আর গোছা গোছা ঘুনসির ভেজাল মিশিয়ে বেণী দুটো যদি বা লম্বা করলেন এলোকেশী, তাদের প্রজাপতি ছাঁদে পাক খাওয়াতে গিয়েই গোড়াসুদ্ধ ঢিলে হয়ে নেমে এল। আর সত্যবতীর কপালের ফের, ঠিক সেই মুহূর্তেই সত্যবতী বোধ করি পিঠের খিল আর পায়ের ঝি ঁ ঝি ঁ ধরা কমাতে একটু নড়েচড়ে বসল।

ব্যাপারটা হল পাত্রাধার তৈল কি তৈলাধার পাত্রের মতই। বন্ধনটা ঢিলে হয়ে পড়ার জন্যেই মুক্তির সুখে নড়েচড়ে বসল সত্যবতী, না নড়েচড়ে বসার জন্যেই বেণী বন্ধনমুক্ত হয়ে গেল সেটা বোঝা গেল না। এলোকেশী দেখলেন বৌ নড়ল চুল খুলল।

এলোকেশী পাথরের দেবী নয়, রক্তমাংসের মানুষ, এরপরও যদি তাঁকে ঠাণ্ডা মাথায় সহজভাবে বসে থাকতে দেখবার আশা করা যায়, সে আশাটা পাগলের আশা। পাগলের আশা পূরণ হয় না, হবার নয়।

এতক্ষণের পরিশ্রম পণ্ড হওয়ার রাগে, আর সৌদামিনীকে নিজের শিল্প-প্রতিভা দেখিয়ে দেবার আশাভঙ্গে, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য এলোকেশী সহসা একটা অভাবিত কাজ করে বসলেন। বৌয়ের সেই খিল-ছাড়ানো সিধে পিঠটার ওপর গুম্ করে একটা গোলগাল কীল বসিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, "হল তো! গেল তো গোল্লায়! এক দণ্ড যদি সুস্থির—"

কিন্তু কথা এলোকেশীকে শেষ করতে হল না, মুহূর্তের মধ্যে আর এক প্রলয় ঘটে গেল। শাশুড়ীর হাত থেকে চুলের ভার এক হ্যাঁচকায় টেনে নিয়ে সত্যবতী ছিটকে দাঁড়িয়ে উঠল, আর শাশুড়ীর সঙ্গে যে কথা কওয়া নিষেধ সে কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দৃপ্তস্বরে বলে উঠল, "তুমি আমায় মারলে যে!"

কীলটা বসিয়ে চকিতে হয়তো একটু অনুতপ্ত হয়েছিলেন এলোকেশী, কিন্তু সেই অনুতাপের অনুভূতি দানা বাঁধবার আগেই এই আকস্মিক বিদ্যুতাঘাতে এলোকেশী প্রথমটা যেন পাথর হয়ে গেলেন। বৌয়ের কণ্ঠস্বর কেমন সেটা জানবার সুযোগ এ পর্যন্ত হয় নি এলোকেশীর, কেননা তাঁর সঙ্গে তো বটেই, তাঁর সামনেও কোনদিন বৌ কথা কয় নি। কইবার রেওয়াজও নয়। কোনও প্রশ্ন করলে শুধু ঘাড় নেড়ে "হ্যাঁ না" জানিয়েছে। কথা যা সে সদুর সঙ্গে। কিন্তু সেও তো নিভৃতে। রাত্রে সৌদামিনীর কাছেই শোয় বৌ, কারণ ভাগ্যরটি না হলে তো আর 'ঘর-বরে'র প্রশ্ন ওঠে না।

না, কোন ছলেই সত্যর কণ্ঠস্বর এলোকেশীর কানে আসে নি, সহসা আজ সেই স্বর বাজের মত এসে কানে বাজল।

এ কী জোরালো গলা বৌ-মানুষের!

এতটুকু একটা মানুষের!

অনুতাপের বাষ্প ধুলো হয়ে উড়ে গেল।

এলোকেশীও দাঁড়িয়ে উঠলেন। চেঁচিয়ে তেড়ে উঠলেন, "মেরেছি বেশ করেছি। করবি কি শুনি? তুইও উল্টে মারবি নাকি?"

সত্য তখন এলোকেশীর অনেক পরিশ্রমে গড়া সাত শুছির বেণী দুটোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে চালিয়ে জোরে জোরে খুলে ফেলতে শুরু করেছে। মাথায় কাপড় নেই, মুখের আঁচল খসেছে, সেই মুখে আগুনের আভা।

এলোকেশীর কথায় একবার সেই আগুনভরা মুখটা ফিরিয়ে অবজ্ঞা ভরে উচ্চারণ করল সত্য, "আমি অমন ছোটলোক নই। তবে মনে রেখো আর কোনদিন যেন—"

"কী বললি? আর কোনদিন যেন? গলা টিপলে দুধ বেরোয় এক ফোঁটা মেয়ে, তার এত বড় কথা! মেরে তোকে তুলো ধুনতে পারি তা জানিস?··· সদি লক্ষ্মীছাড়ি, আন্ দিকি একখানা চ্যালাকাঠ, কেমন করে বৌ টিট্ করতে হয় দেখাই ত্রিজগৎকে। চ্যালাকাঠ পিঠে পড়লেই তেজ বেরিয়ে যাবে।"

"মার না দেখি তোমার কত চ্যালাকাঠ আছে!"

বলে দৃপ্তভঙ্গিতে সোজা শাশুড়ীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে সত্যবতী নির্ভীক দুই চোখ মেলে।

জীবনে অনেকবার রেগে জ্ঞানহারা হয়েছেন এলোকেশী, অনেকবার বুক চাপড়েছেন, শাপমন্যি দিয়েছেন, দাপাদাপি করেছেন, কিন্তু আজকের মত অবস্থা বোধহয় তাঁর জীবনে আসে নি।

এ অবস্থা যে তাঁর কল্পনার বাইরে, স্বপ্নের বাইরে। তাই সহসা যেন নিথর হয়ে গেলেন তিনি, সাপের মত ঠাণ্ডা চোখে শুধু তাকিয়ে রইলেন সেই দুঃসাহসের প্রতিমূর্তির দিকে।

ঠিক এই অবস্থায় থাকলে কতক্ষণে কি হত বলা শক্ত, কিন্তু ভাগ্যের কৌতুকে আর এক অঘটন ঘটে গেল।

এই নাটকীয় মুহূর্তে উঠোনের বেড়ার দরজা ঠেলে বাড়িতে এসে ঢুকল নবকুমার।

ঢুকেই যেন বজ্রাহত হয়ে গেল!

এ কী পরিস্থিতি!

সহস্র সাপের ফণার মত একরাশ চুলের ফণায় ঘেরা সম্পূর্ণ খোলা মুখে এলোকেশীর মুখোমুখি অগ্নিবর্ষী দুই চোখে সোজা তাকিয়ে যে মেয়েটা দাঁড়িয়ে রয়েছে, কে ও?

নবকুমারের বৌ নাকি?

কিন্তু তাই কি সম্ভব!

আকাশ থেকে বাজ পড়ছে না, পৃথিবীর মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে না, এমন কি প্রলয়ঙ্কর একটা ঝড়ও উঠছে না, অথচ নবকুমারের বৌ নবকুমারের মার সামনে অমনি করে দাঁড়িয়ে আছে?

আর নবকুমার ঢুকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও দৃকপাতমাত্র করছে না?

অসম্ভব! অসম্ভব!

এ অন্য আর কেউ।

নবকুমারের অজানিত পড়শীবাড়ির মেয়ে। হয়তো ভয়ঙ্কর কোন একটা কিছু ঘটেছে ওদের সঙ্গে।

নবকুমার গলা-খাঁকারি দিতে ভুলে যায়, সরে যেতে ভুলে যায়, স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। বিপদ যে ঘোরতর। 'অসম্ভব' বলে একেবারে নিশ্চিন্ত হতেই বা পারছে কই?

বৌয়ের মুখটা দেখবার সৌভাগ্য কোনদিন না হলেও এই মাসখানেকের মধ্যে কোন্ না বিশ-পঁচিশবার আভাসে ছায়ায় বৌকে দেখতে পেয়েছে সে। যদিও পাছে কেউ দেখে ফেলে বৌয়ের দিকে তাকিয়ে আছে নবকুমার, তাই সেই তাকানোটা পলকস্থায়ী হয়েছে মাত্র!

তবুও ক্যামেরার লেন্‌স্ পলকের মধ্যেই চিরকালের মত ছবি ধরে রাখে।

মুখ না দেখুক, সর্ব অবয়বের একটা ভঙ্গি তো দেখেছে।

আর দেখেছে ওই নীলাম্বরীর আঁচলখানি।

অতএব মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই। চোখ বুজে সূর্যকে অস্বীকার করতে যাওয়া হাস্যকর।

পড়শীবাড়ির কেউ নয়, ওই দৃপ্তমূর্তি নবকুমারের বৌয়েরই।

যে বৌয়ের উদ্দেশে নবকুমার স্বপ্নে জাগরণে নিঃশব্দ উচ্চারণে ক্রমাগত গেয়েছে, গাইছে, "কও না কথা মুখ তুলে বৌ, দেখ না চেয়ে চোখ মেলে।"

কিন্তু সে কী এই চোখ!

নবকুমার যেমন নিঃশব্দে এসেছিল, যদি পরিস্থিতি দেখে তেমনি নিঃশব্দে সরে পড়ত, তাহলে হয়তো নাটকের এই নাট্য মুহূর্তটা এমন চূড়ান্তে উঠত না, হয়তো সত্যবতী নির্ভীক-ভাবে সেখান থেকে সরে যেত, আর এলোকেশী জীবনে যত গালিগালাজ শিখেছেন, সবগুলো উচ্চারণ করতেন বসে বসে। আর স্বামীপুত্র বাড়ি ফিরলে বৌয়ের এই মারাত্মক দুঃসাহস আর ভয়ঙ্কর দুর্বিনয়ের কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনায় পেশ করতেন। তারপর গড়িয়ে যেত ব্যাপারটা।

কিন্তু নির্বোধ নবকুমার সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল হাঁ করে।

আর এক সময় এলোকেশীর চোখ গিয়ে পড়ল তার ওপর। দাওয়ার উপর তিনি, নীচে উঠোনে ছেলে।

নবকুমারকে এভাবে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এলোকেশীও একবার হাঁ হয়ে গেলেন, তারপর সহসা সেই এতক্ষণের স্তব্ধ হয়ে থাকা হাঁ থেকে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার উঠল, "ওরে লক্ষীছাড়া হতভাগা মেনিমুখো ছোঁড়া, পায়ে কি তোর জুতো নেই? জুতোর জুতিয়ে ওর মুখটা যদি জন্মের শোধ ছেঁচে শেষ করে দিতে পারিস, তবে বলি বাপের বেটা বাহাদুর।"

কিন্তু নবকুমার নিশ্চল।

পরক্ষণেই সুরফের্তা ধরলেন এলোকেশী, "ওগো মাগো, কে কোথায় আছ দেখ গো, বেটা বেটার-বৌ দুজনে মিলে কী অপমান্যিটা করছে আমায়। ওরে নবা, বামুনের গরু, ছোটলোকের মেয়েকে বিয়ে করে তুইও কি ছোটলোক হয়ে গেলি? দু-পায়ে খাড়া দাঁড়িয়ে মায়ের অপমানটা দেখ্‌ছিস। তবে মার মার, ধরে ঝাঁটা আমাকেই মার। ঝাঁটা খাওয়াই উপযুক্ত শাস্তি আমার। নইলে এখনো ওই বৌকে ভিটের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দিই। মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দিই না? ওগো মাগো, বৌ আমায় ধরে মারে, আর তাই আমার ছেলে দাঁড়িয়ে দেখে।"

এতক্ষণে নবকুমার বোধ করি চেতনা ফিরে পায়, আর ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোঁ চোঁ দৌড় মারে সেই খোলা দরজাটা দিয়ে।

খিড়কির ঘাটে বাসন মাজছিল সদু, ঘাটের পাশ দিয়ে নবকুমারকে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে দেখে দাঁড়িয়ে উঠে ছাইমাখা হাতটাই নেড়ে ডাক দেয়, "নবু, কি হল রে? অ নবু, অমন করে ছুটছিস্ কেন?"

নবকুমার প্রথমটা ভাবল পিছুডাকে সাড়া দেবে না, ছুটে একেবারেই নিতাইদের বাড়ি গিয়ে পড়বে, তারপর বলবে, "জল দে এক ঘটি"।

কারণ নিতাই হচ্ছে তার সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিচলিত অবস্থায় তার কাছেই যাওয়া চলে।

কিন্তু সৌদামিনীর উত্তরোত্তর ডাকে কি ভেবে থমকে দাঁড়াল, ফিরল, তারপর গুটি গুটি এসে ঘাটের পাশে একটা ঝড়ে-পড়া তালগাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, "আমি আর বাড়ি ফিরব না সদুদি!"

"কথার ছিরি শোন ছেলের। হল কি তাই বল্?"

"সর্বনাশ হয়েছে সদুদি!"

"আরে গেল যা! সর্বনাশ কথা বলতে আছে না কি?"

"হলে বলতে আছে বৈ কি।"

সদু নবকুমারের প্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত, তাই বেশী ভয় না পেয়ে বলে, "কেন তোর

মা হঠাৎ চড়ি ওল্টালো না কি ?"

"মা নয় সত্নদি, মা নয়, আমিই। জানি না, ঠিক বলতে পারছি না, আমি সত্যি বেঁচে আছি কি না!"

"গায়ে চিমটি কেটে দেখ্।" বলে পুকুরের জলে হাত ডুবিয়ে ডুবিয়ে ছাইমাটি ধুতে ধুতে বলে সত্নু, "মামী বুঝি রণচণ্ডী হয়ে তেড়ে এসেছিল ?"

"জানি না!"

"জানিস্ না ? ন্যাকামি রাখ দিকি নবু, হয় কি হয়েছে তাই বল, নয় যে দিকে যাচ্ছিলি সেইদিকে যা। বেটাছেলে না মেয়েমানুষ তুই ?"

"সত্নদি, যে দৃশ্য দেখে এসেছি, তা দেখলে অতি বড় বীর বেটাছেলেরও পেটের ভেতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায়।"

"নাঃ, তোর দেখছি আর গৌরচন্দ্রিকে শেষ হয় না। বলবি তো বল, না বলবি তো যা। ভূত দেখেছিস্ না ডাকাত পড়া দেখেছিস্ তাও তো জানি না।"

নবকুমার বুকে বল করে কণ্ঠে শব্দ আনে, ঝপ করে বলে ওঠে, "মাতে আর তোমাদের বৌতে মারামারি করছে।"

"কি করছে মাতে আর বৌতে ?"

চমকে উঠে বলে সৌদামিনী।

"বললাম তো মারামারি করছে।"

সৌদামিনী এক মুহূর্ত স্তব্ধ থেকে তারপর বলে, "মারামারি কথাটা বলছিস্ কেন, মামী বৌকে ধরে ঠেঙাচ্ছে তাই বল্' আর সেই দৃশ্য দেখে তুই মদ্দ পুরুষ কাছা কোঁচা খুলে ছুট মারছিস্! কেন যে তুই মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাস নি নবু তাই ভাবি। যাই দেখি ইতিমধ্যে কি এমন ঘটল। এই তো খানিক আগে বাসনের পাঁজা নিয়ে বেরিয়ে এলাম— দেখলাম মামী বেটার বৌয়ের চুল বাঁধছে, ইতিমধ্যে হ'লটা কি ?"

"আমি তো এই ঢুকলাম বাড়িতে। তুমি শীগগির যাও সত্নদি !"

"যাই। বাবা পলকে প্রলয়, তিল থেকে তিলভাণ্ডেশ্বর ! কি হল এক্ষুনি ?"

সৌদামিনী তাড়াতাড়ি বাসনগুলো ধুয়ে নিতে থাকে।

"আমি আজ নিতাইদের বাড়িতেই থাকব সত্নদি ! এই চললাম।"

সৌদামিনী ভুরু কুঁচকে বলে, "কদিন পরের বাড়িতে থাকবি ?"

"যতদিন চলে।"

"তার মানে নিজে গা বাঁচিয়ে কেটে পড়বি, আর পরের মেয়েটা, দুধের মেয়েটা, তোর মার হাতে পড়ে মার খাবে !"

পরের মেয়ে এবং দুধের মেয়ে শব্দটায় নবকুমারের বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে, চোখে জল এসে যায়। কষ্টে গোপন করে বলে, "তা আমি আর কি করব !"

সৌদামিনী আড়চোখে একবার ওর মুখচ্ছবি দেখে নিয়ে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে, "দৃশ্য দেখে

চলে না এলে পারতিস, তুই দেখছিস্ জানলে যতই হোক নিজেকে একটু সামলে নিত মামী, একেবারে শেষ করে ফেলত না। যাই দেখি ছুঁড়ি বাঁচল কি মরল।"

নবকুমার লজ্জা ত্যাগ করে সহসা বলে ওঠে, "যাই বল সদুদি, যা দেখলাম ও তোমাদের বৌটি পড়ে মার খাবার মেয়ে নয়।"

"আমারও তাই মনে হয়", বলে সদু সকৌতুকে একটু হেসে বলে, "মারামারি না করুক, পড়ে মার খাবে না। তা তুই তো বলতেই পারলি না হয়েছেটা কি ?"

"গোড়া থেকে কি কিছু জানি ছাই। বাড়ি ঢুকেই দেখি দাওয়ায় দু প্রাণী মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। একজন সাপিনীর মতন ফুঁসছে, আর একজন বাঘিনীর মতন গজরাচ্ছে।"

সৌদামিনী হেসে উঠে বলে, "বারে, তুই তো অনেক নাটুকে কথা শিখেছিস দেখছি। যাক্ কালে ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। তোর বৌও খুব পণ্ডিত।"

বৌয়ের গল্প কান ভরে শুনতে ইচ্ছে করে নবকুমারের, ভুলে যায় এইমাত্র তাকে বাঘিনীর সঙ্গে তুলনা করেছে সে নিজেই। কিন্তু গল্প বাড়বে কি উপায়ে ? নবকুমার তো আর কথা ফেলে বাড়াতে পারে না ?

শুধু ভাবে, 'কালে ভবিষ্যতে' !

সে কত কাল ?

কোন্ ভবিষ্যৎ ?

বাঘিনীর মুখটা বার বার মনে ধাক্কা দিচ্ছে। ভয়ঙ্কর, কিন্তু সুন্দর ! কী বড় বড় চোখ, কী চমৎকার জোড়া ভুরু !

কিন্তু বৌও মায়ের মত রাগী হবে হয়তো। লজ্জায় কুণ্ঠায় বিগলিত বৌটি মাত্র থাকবে না। নবকুমারের কল্পনার সঙ্গে ঠিক খাপ খাচ্ছে কি ?

ঠিক যেন কি একটা লোকসানে দুঃখে বুকটা টনটন করে ওঠে নবকুমারের।

কাদার পুতুলের মত একটি নিরীহ ভালমানুষ বৌ নবকুমারের ভাগ্যে জুটলে, কি এসে যেত ভগবানের ! কত লোকেরই তো তেমন বৌ হয় !

কিন্তু সাপের ফণার মত চুলের ফণায় ঘেরা ওই মুখখানি।

ওতে যেন আগুনের আকর্ষণ !

নবকুমার পতঙ্গ মাত্র।

সৌদামিনী বলে, "বিবাগী হয়ে যাচ্ছিলি তো যা, মেলা রাত করিস নে। হাঁড়ি আগলে বসে থাকতে পারব না।"

হাঁড়ি !

রান্না !

ভাত !

এসব শব্দগুলো কাজে লাগবে আজ ? নবকুমারের যেন বিশ্বাস হয় না। ভয়ে ভয়ে

বলে, "আমি এখানটায় আছি, তুমি একবার দেখে এসে খবরটা আমায় দিতে পার না সদুদি? নিশ্চিন্দি হয়ে তা হলে আমাদের তাসের আড্ডায় যেতে পারি।"

"ওবে আমার কে রে, উনি বাবু বসে থাকবেন, আর আমি ওঁর জন্যে খাবরের থালা বয়ে আনব।"

বলে থালা বাসনের গোছাটা বাগিয়ে কাঁধের ওপর তুলে নেয় সদু। হাতে গামছার পুঁটলিতে ঘটিবাটি। চলে যেতে যেতে ছোট ভাইকে আর একবার অভয় দেয় সে, "বৌয়ের চিন্তা করে মন খারাপ করিস নে, নেহাৎ যদি মামী খুন করে ফাঁসির দায়ে না পড়ে তো ওই বৌয়ের দ্বারাই শায়েস্তা হবে। বৌ তোর যেমন তেমন মেয়ে নয়।"

যদি খুন না করে।

যদিটা নবকুমারের বুকের মধ্যে কাঁটার মত খচখচিয়ে ওঠে, কিন্তু প্রশ্ন তুলতে পারে না, শুধু ম্রিয়মাণ হয়ে বসে থাকে।

"সন্ধ্যে হয়ে আসছে, এখেনে আর বসে থাকতে হবে না, যা কোথায় যাচ্ছিলি ঘুরে আয়।"

সদু লম্বা লম্বা পা ফেলে বাঁশবাগানের খানিকটা অতিক্রম করে। কিন্তু নবকুমার আবার পিছু নিয়েছে। উদ্‌ভ্রান্ত মুখ, ছলছল চোখ।

"সদুদি, তোমার সঙ্গে আমি যাব?"

সদু মৃদু হেসে পা চালাতে চালাতেই বলে, "কেন? এই যে বললি আর কক্ষনো বাড়ী ফিরবি না!"

"মনটা কি রকম যেন করছে সদুদি।" বলে সঙ্গে সঙ্গে এগোতে এগোতে নবকুমার হঠাৎ সুর বদলায়, "বৌ যদি মাকে অপমান করে থাকে, তাকেও শাস্তি করা দরকার।"

"গায়ে পড়ে কাউকে অপমান করবার মেয়ে সে নয় নবু, সেদিকে তুই নিশ্চিন্দি থাক। তবে কেউ যদি গা পেতে অপমান নিতে যায় সে আলাদা কথা। আসল কথা কি জানিস, বৌ হল উঁচুঘরের শিক্ষিতা মেয়ে, শিক্ষা-দীক্ষা উঁচু, লেখাপড়া জানে, বড় বড় বই পড়ে ফেলে, নিজে পয়ার ছন্দ বাঁধে—"

"অ্যাঁ!"

স্থান কাল ভুলে নবকুমার প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, "মস্করা করছ আমার সঙ্গে?"

"কি দরকার আমার? আকাশ থেকে কথা পেড়ে বলতেই বা যাব কি করে? আর ওসব আমি বুঝিই বা কি? বৌ আমার কাছে মনটা খোলে তাই টের পেয়েছি।"

সদুর কাছে মনটা খোলে!

হায়, কবে সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গসুখ আসবে নবকুমারের ভাগ্যে, যেদিন নবকুমারের সামনে বৌ মন খুলবে!

সদু আবার মুখ চালায়, "তোদের এ বাড়িতে বিয়ে হওয়া ওর উচিত হয়নি এই বলে দিলাম পষ্ট কথা! তুই রাগই করিস আর যাই করিস, এ বাড়ি ওর যুগ্যি নয়। মামীর

পয়সাই আছে, নজর বলতে আছে কিছু ? আর বৌয়ের ছোটনজর দেখার অভ্যেসই নেই। এই তো সেদিন মামী পাড়ার লোকের গয়না বাঁধা রেখে টাকা ধার দিয়ে সুদ নেয় শুনে যেন হিমাঙ্গ হয়ে গেল বৌ!"

নবকুমার বিরক্ত স্বরে বলে, "তা ওসব কথা বলতে যাবারই বা দরকার কি ?"

"বলতে আমি যাই নি রে বাপু তোর বৌয়ের কানে ধরে। ওর সামনেই ঘোষগিন্নি এক জোড়া বাজু বন্দক নিয়ে দৈ-দস্তুর করতে লাগল। সে বলে টাকায় এক পয়সা, মামী বলে টাকায় দেড় পয়সা, এই আধপয়সা নিয়ে ধস্তাধস্তি। শেষ অবধি—"

শেষ অবধি কি হল তা আর শোনা হল না নবকুমারের, সহসা বাড়ির মধ্যে থেকে ভয়ঙ্কর একটা চিৎকার রোল ভেসে এল।

"সর্বনাশ করেছে—"

সদুর নিষেধবাণী ভুলে নবকুমার সর্বনাশ শব্দটাই আবারও ব্যবহার করল, "নিশ্চয় হয়ে গেল একটা কিছু!"

সদু ততক্ষণে বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

আর নবকুমার ?

সে চলৎশক্তি হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে নিজেদেরই বাড়িখানার দিকে তাকিয়ে।

তীক্ষ্ণ তীব্র সানুনাসিক এই স্বরটা কার ?

এ তো এলোকেশীর।

তবে হলটা কি ?

কিন্তু যাই ঘটুক, সব কিছু ছাপিয়ে নবকুমারের প্রাণটা হাহাকারে ভরে উঠল এই ভেবে —সেই অ-সাধারণ বৌ নিয়ে ঘর করা হল না নবকুমারের অদৃষ্টে!

মা হয় বৌকে 'মড়িপোড়ার ঘাটে' পাঠাবে, নয় জন্মের শোধ বাপের বাড়ি বিদেয় করে দেবে।

মার চিৎকার উত্তরোত্তর আকাশে উঠছে।

আর দলে দলে পড়শীরা নবকুমারের বাড়ির দিকে দৌড়চ্ছে।

নবকুমার যাত্রাগানের দর্শকের মত পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে সেই দৃশ্য।

একুশ

ত্রিবেণীর ঘাটে এসেছিলেন রামকালী। রোগী দেখতে নয়, যোগে গঙ্গাস্নান করতে। একাই আস্ত একটা পারানী নৌকা ভাড়া করেছিলেন স্নানের জন্য। পাঁচজনের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে নৌকা বোঝাই হয়ে যেতে রামকালী ভালবাসেন না। দরকার হলে একাই ভাড়া করেন।

আগে অবশ্য এমন একা নৌকাভ্রমণ সহজ হত না। কারণ রামকালী যোগের স্নান করতে ত্রিবেণী যাচ্ছেন, কি কাটোয়া যাচ্ছেন, কি নবদ্বীপ যাচ্ছেন, টের পেলে সত্যবতী একেবারে নাছোড়বান্দা হয়ে পেয়ে বসত। পায়ে পায়ে ঘুরে কাকুতি-মিনতি করা মেয়েকে রামকালী এড়াতে পারতেন না, সঙ্গে নিতেন। অগত্যাই নেড়ু আর পুণ্যি। ওদের ফেলে রেখে শুধু নিজের মেয়েকে নিয়ে কোথাও যাবেন, এমন দৃষ্টিকটু কাজ রামকালীর পক্ষে সম্ভব নয়।

ওরা যেত।

রামকালী জলে সাবধান করতেন। আবার স্নানের শেষে ঠাকুর-দেবতা দেখিয়ে নিয়ে ফিরতেন। ঘাট আর পথ, নৌকা আর মন্দির-প্রাঙ্গণ মুখর হয়ে উঠত ছোট্ট একটা বাক্য-বাগীশ মেয়ের বাক্যস্রোতে।

আজকে শুধু জলের উপর দাঁড় টানার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। উন্মুক্ত গঙ্গাবক্ষের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেললেন রামকালী।

আকাশের পাখিটা খাঁচায় বন্দী হয়ে কেমন আছে কে জানে!

পুণ্যিটারও বিয়ের ঠিক হয়ে আছে।

গত ক-মাস "অকাল" ছিল বলে বিয়ে হয় নি। কিন্তু পুণ্যি অন্য ধরনের মেয়ে। নেহাৎ সত্যর "প্রজা" হিসেবে দস্যিপনা করে বেড়িয়েছে, নচেৎ একান্তই ঘরসংসারী মেয়ে সে। খাচার পাখি হয়েই জন্মেছে পুণ্যি, আর পুণ্যির মত মেয়েরা।

কিন্তু সত্যর মত দ্বিতীয় আর একটা মেয়ে আর দেখলেন কই রামকালী? যে মেয়ে প্রতিপদে প্রশ্ন তুলে জানতে চায় "কী" আর "কেন"!

খোলা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আর একবার মনে হল রামকালীর, কতদিন যোগে স্নান করি নি! মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘকাল। আর একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

মাঝিটা একবার কথা কয়ে উঠল, "খুকী শ্বশুর-ঘরে কত্তাবাবু?"

রামকালী বলেন, "হুঁ"।

আর বার দুই ছপাৎ ছপাৎ করে মাঝিটা ফের বলে উঠল, "থাকবে এখন?"

সংক্ষেপে "দেখি" বলে আলোচনায় ইতির সুর টানলেন রামকালী। পুণ্যির বিয়ে আসছে, এই যা একটু আশার আলো দেখা যাচ্ছে, নইলে থাকবে ছাড়া আর কি। চিরকালই থাকবে সেখানে। আর সেইটাই তো কাম্য। মোক্ষদার মত অনবদ্য রূপ আর অশেষ তীক্ষ্ণতা নিয়ে আজীবন বাপের ঘরে বসে জলতে থাকবে, এমন ভাগ্য কেউ মেয়ের জন্যে প্রার্থনা করে না। ঘরে থাকা মেয়ে মানেই দুর্ভাগা মেয়ে। অথচ মাঝে মাঝে পালে-পার্বণে, কি ভাত-পৈতে বিয়েয়, কুটুম্বের মত যে আসা, সে আসায় মায়ের প্রাণ ভরতে পারে, বাপের ভরে না। অতএব তাতে ইতি হয়ে গেছে।

কিন্তু শুধু মেয়ে-সন্তান কেন, পুত্র-সন্তান হলেই বা কতটুকু তফাৎ? ছেলে ঘরে থাকে,

ছেলের ওপর জোর খাটে, এই পর্যন্ত। ছেলে বড় হয়ে গেলে, আর কি তাকে দিয়ে মন ভরে? তাই হয়তো মানুষ জীবনের মধ্যে বারে বারে নতুন শিশুকে ডেকে আনে জীবনকে সরস রাখতে, ভরাট রাখতে। আবার তার পরেও আশ্রয় খোঁজে 'টাকার সুদে'র মধ্যে।

নিত্যানন্দপুর ঘাট থেকে ত্রিবেণী ঘাট সামান্য পথ।

মাঝি নৌকা বাঁধল।

আর ঘাটে নেমেই প্রথম যার সঙ্গে চোখোচোখি হল রামকালীর, সে হচ্ছে "রানার" গোকুল দাস। দূর থেকে রামকালীকে নামতে দেখে ছুটে ছুটে আসছে সে।

কাদার উপরই আভূমি এক প্রণাম করে, কৃতার্থমন্য গোকুল সবিনয় হাস্যে বলে, "আজ আমার কী ভাগ্যি কত্তাবাবু, কী ভাগ্যি।"

রামকালী মৃদু হেসে বলেন, "সকাল বেলা হঠাৎ ভাগ্যের এত জয়-জয়কার যে গোকুল।"

গোকুল বলে, "তা জোকার দেব না আজ্ঞে? এই আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। নইলে তো যেতে হত সেই নিত্যেনন্দপুরে। এই নিন পত্তর আছে আপনার।"

পত্র!

কলকাতা থেকে আসছে। অভাবনীয়।

বিস্মিত হলেন রামকালী, কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। খামে আঁটা চিঠিটা নিজের পরিত্যক্ত গাত্রবস্ত্রের উপর রেখে দিয়ে বললেন, "আচ্ছা ঠিক আছে। ভাল তো সব?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে আজ্ঞে।" বলে ঈষৎ উস্‌খুস করে গোকুল বলে ফেলে, "কলকেতার চিঠি আজ্ঞে?"

"তাই তো দেখছি", বলে রামকালী গামছা কাঁধে ফেলে জলে নামেন। প্রথম সূর্যের কাঁচা রোদ, ঝলসে ওঠে কাঁচা সোনার রঙের দীর্ঘ দেহখানির উপর। গোকুল হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। থাকতে থাকতে মনে ভাবে—"ইস্, যেন আকাশের দেবতা। কী দিব্য অঙ্গ।"

পত্রের কথা মন থেকে সরিয়ে ফেলে, যথাকৃত্য সব সেরে উত্তরীয়ের কোণে পত্রখানা বেঁধে মন্দির-দর্শনে অগ্রসর হলেন রামকালী। অগত্যাই গোকুল আর একটা সাষ্টাঙ্গ সেরে বিদায় নিল। কলকেতা থেকে কার পত্র এল সে কৌতূহল আর মিটল না তার।

নৌকোয় বসে চিঠি খুললেন রামকালী।

আর পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন!

এই সকালের আলো তার সমস্ত উজ্জ্বলতা হারিয়ে যেন আসন্ন সন্ধ্যার মত মলিন হয়ে গেল। সদ্য গঙ্গাস্নানে নির্মল রামকালী যেন একটা অপবিত্র দ্রব্যের সংস্পর্শে এসে নিজেকে অশুচি বোধ করলেন।

চিঠি কোন পরিচিতের নয়। অজ্ঞাত ব্যক্তির।

তাছাড়া নীচে কোনও নাম দস্তখতও নেই।

বেনামী এই চিঠিতে শুধু সম্বোধনের বাগাড়ম্বর অনেক। কিন্তু সেটাই তো কথা নয়। চিঠির বক্তব্য এ কী ভয়ঙ্কর!

বার বার পড়ার পর আরও একবার চিঠিখানা সামনে মেলে ধরলেন রামকালী।

হস্তাক্ষর সুছাঁদের, লাইনগুলি পরিপাটী, বানান বিশুদ্ধ। কোন "লিখিত পড়িত" লোকের দ্বারা লেখা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উপরে "শ্রীশ্রীবাগ্‌দেবী শরণং" দিয়ে শুরু—

"মহামহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত রামকালী চট্টোপাধ্যায় বরাবরেষু—যথাযোগ্যসম্মান-পুরঃসর নিবেদনমেতৎ, অত্র পত্রে এই জ্ঞাত করাই যে, মহাশয়ের কন্যার অতীব বিপদ! তিনি তাঁহার শ্বশ্রূগৃহে যারপরনাই লাঞ্ছিতা উৎপীড়িতা ও অপমানিতা রূপে কালযাপন করিতেছেন। বলিতে মন শিহরিত ও কলেবর কম্পান্বিত হইলেও জ্ঞাতার্থে লিখিতেছি, আপনার কন্যা তাঁহার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতা কর্তৃক প্রহারিতাও হইতেছেন। সেই অবলা বালিকাকে রক্ষা করে, নিষ্ঠুর পাষাণপুরীতে এমন কেহই নাই। আপনার জামাতা ধর্মপত্নীর এবম্বিধ নির্যাতনে অবিরত অশ্রু বিসর্জন সার করিয়াছে। গুরুজনদিগের উপর তাহার আর কী বলিবার সাধ্য আছে? এবম্প্রকার অবস্থায় মহাশয় যদি সত্বর কন্যাকে নিজগৃহে লইয়া যান তবেই মঙ্গল। নচেৎ কি যে হইতে পারে চিন্তা করিতেও মস্তক ঘূর্ণিত হইতেছে। মনুষ্যজনোচিত কর্তব্য বোধে ইহা আপনার গোচরে আনিলাম। নিজ গুণে ধৃষ্টতা মার্জনা করিয়া কৃতার্থ করিবেন। অলমিতিবিস্তারেণ। ইতি—"

না, নাম স্বাক্ষর নেই।

পত্র-লেখকের বাচালতা বা বাগাড়ম্বরে কৌতুক বোধ করবেন, এমন মানসিক অবস্থা থাকে না রামকালীর! চিঠিটা আস্তে আস্তে মুড়ে মেরজাইয়ের পকেটে রেখে দিয়ে এই রৌদ্রকরোজ্জ্বল পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে থাকেন তিনি।

এত আলো পৃথিবীতে, তবু পৃথিবীর মানুষগুলো এত অন্ধকারে কেন!

কিন্তু কে এই পত্র-লেখক?

সত্যর শ্বশুরবাড়ির কোন শত্রু? এভাবে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পত্র লিখে তাঁদের অনিষ্টসাধন করতে চায়? কিন্তু তাহলে চিঠিতে কলকাতার ছাপ কেন? কলকাতা থেকে এ চিঠি আসে কি করে?

ভেবে ভেবে অবশ্য একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন রামকালী। পত্র-লেখকের অবশ্যই কলকাতায় যাতায়াত আছে, এবং নিজেকে গোপন রাখতে কলকাতায় অবস্থানকালে পত্র প্রেরণ করেছে।

তবু একটা সমস্যা থেকেই যায়।

পত্রের মধ্যস্থিত ওই বীভৎস সংবাদটা সত্যি, না শত্রুপক্ষের মিথ্যা রটনা?

রামকালী কি একেবারে নিজে গিয়েই তদন্ত করবেন, না লোক পাঠাবেন? বাইরের লোক গিয়ে কি ভিতরকার প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে পারবে? এক যদি কোন স্ত্রীলোককে পাঠানো যায়!

যারা বারো মাস রামকালীর সংসারে খেটে খায়, চিঁড়ে-কোটানি, মুড়ি-ভাজুনি ইত্যাদি, তাদেরই কারো একজনকে একটা সঙ্গী ও রাহা খরচ দিলে খবর এনে দিতে পারে। পল্লীগ্রামে সচরাচর এরাই এসব কাজ করে। কিন্তু রামকালীর ওদের কথা ভেবে চিত্ত বিমুখ হল। কোন খবর ওরা জানা মানেই সাতখানা গ্রামের লোকের জানা! ঈশ্বর জানেন কী খবর আনবে, আর সেই নিয়ে সারা গ্রামে আলোচনা চলবে।

মনে হল সত্য যদি নিজে চিঠি লিখত!

চিঠি লেখবার মত বিদ্যে সত্য অর্জন করেছে। কিন্তু করে আর লাভ কি? পিত্রালয়ে নিজের খবর জানিয়ে চিঠি দেবে এমন সাধ্য বা সাহস তো হবে না। তবে আর মেয়েদের লেখাপড়া শিখে লাভ কি?

বুকের মধ্যেটা কেমন মোচড় দিয়ে উঠল স্থিতপ্রজ্ঞ রামকালী কবরেজের। চোখের সামনে ভেসে উঠল সত্যর সেই দৃপ্ত মুখচ্ছবি। সেই সত্য পড়ে মার খাচ্ছে! এ যে বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব।

না-না এ চিঠি মিথ্যা চিঠি!

শত্রুপক্ষের কাজ!

নইলে কেনই বা? ভাবলেন রামকালী, সত্যর ওপর নির্যাতন চালাবে কেনই বা? অকারণ এত হিংস্র কখনো হতে পারে মানুষ? তাছাড়া শুধু তো শাশুড়ী নয়, তার শ্বশুর রয়েছে। হাজার হোক একটা ভদ্রব্যক্তি, তাঁর জ্ঞাতসারে এ রকমটা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। আর বাড়ির লোকেরও অজ্ঞাতসারে যদি কোন পীড়ন চলে, পাড়ার লোকে টের পাবে কি করে?

আবার ভাবলেন রামকালী, সত্যবতী তাদের একমাত্র পুত্রবধূ। বিনা প্রতিবাদে রামকালী তাকে শ্বশুরঘর করতে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তার সঙ্গে ঘর-বসত হিসেবে প্রচুর সামগ্রী পাঠিয়েছেন, যাতে অন্তত শাশুড়ীর মন ভোলে। তবু তারা সত্যকে নির্যাতন করবে?

তাই কখনও সম্ভব?

বললে দোষ, ভাবতে বাধা নেই, মেয়ের বিয়ের সময় ঘটক আনীত নানা পাত্রের মধ্যে এই পাত্রটিকেই পছন্দ করেছিলেন রামকালী, কেবলমাত্র তাদের পরিবারের লোকসংখ্যা কম বলে। সেই শৈশব থেকেই লক্ষ্য করেছেন, তাঁর মেয়ে জেদী তেজী অনমনীয়। বৃহৎ গোষ্ঠীর অনেকের মন যুগিয়ে চলা হয়তো তার পক্ষে সহজ হবে না, সে বোধ রামকালীর ছিল, তাই ভেবেছিলেন, এইখানেই ভাল। বাপের একমাত্র ছেলে? দোষ কী? সত্যও

তো তার বাপের একমাত্র মেয়ে!

ঘরজামাইয়ের সাধ একেবারেই ছিল না রামকালীর। শুধু এইটুকু মনে মনে ভেবেছিলেন, ছেলেটা যেন নেহাত রাঙামুলো না হয়। লেখাপড়ার একটু ধার যেন ধারে। তা সে সাধটুকু মিটেছিল রামকালীর, মিটছিলও। জামাই তখনই ছাত্রবৃত্তি পাশ, টোলে সংস্কৃত শিখছে।

তারপর লোক-পরম্পরায় শুনেছিলেন, জামাই না কি ইংরিজি ভাষা শিখতে উদ্যোগী হয়েছে। শুনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন রামকালী। নিজে সামনে উপস্থিত না হলেও জামাইয়ের খবর তিনি লোক মারফত নিতেন, এবং এটুকু জেনে নিশ্চিন্ত ছিলেন, ছেলেটা কুসঙ্গে মেশে না, বদ খেয়ালের দিকে যায় না।

সবই তো একরকম ছিল, হঠাৎ এ কী বিনা মেঘে বজ্রাঘাত!

অবশেষে আবার ভাবলেন, এ শত্রুপক্ষের কাজ।

কিন্তু মনের মধ্যে যে আলোড়ন উঠেছিল, সেটাকে একেবারে চেপে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারলেন না রামকালী, স্থির করলেন, তিনি একবার নিজেই যাবেন বেহাইবাড়ি।

মান খাটো হবে?

তা যেদিন জামাইয়ের হাঁটু ধরে কন্যা-সম্প্রদান করেছেন, সেইদিনই তো মান গেছে। সেকালের মত তো রামকালী মেয়েকে স্বয়ম্বরা করাতে পারেন নি!

তাছাড়া একেবারে অকারণ জামাইবাড়ি যাওয়ার অগৌরবটা পোহাতে হবে না। পুণ্যির বিয়েকে উপলক্ষ করে মেয়ে নিয়ে আসতে চাইবেন। সেই সঙ্গে জামাই-বেহাইকেও নিমন্ত্রণ করে আসা হবে। রামকালী নিজে গিয়ে নিমন্ত্রণ করছেন, এর চেয়ে সৌজন্য আর কি হতে পারে?

ত্রিবেণী থেকে ফিরে রামকালী দীনতারিণীর কাছে সংকল্প ঘোষণা করলেন, "মনে করছি একবার বারুইপুর যাব।"

বারুইপুর! সত্যর শ্বশুরবাড়ি!

দীনতারিণী চমকে উঠে বললেন, "কেন, হঠাৎ? সত্যর কোন রোগব্যামো হয় নি তো?"

"কী আশ্চর্য! রোগ-ব্যামো হবে কেন?" রামকালী শান্তভাবে বললেন, "ভাবছি পুণ্যিটার বিয়ে হয়ে যাবে, তারপর দুজনের কবে দেখাসাক্ষাৎ হয় না হয়, গলাগলি বন্ধু দুটোতে! বিয়ের আগে কিছুদিন একসঙ্গে থাক।"

দীনতারিণী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এত সহজ ভাষা, এত সহজ কথা! রামকালীর মুখে!

ছেলেকে তো তিনি "পাথরের ঠাকুর" আখ্যা দেন।

সহজ কথা।

তবু রামকালীর মুখ থেকে উচ্চারিত হয় বলেই কেউ সহজভাবে নিতে পারে না।

মোক্ষদা খর্‌খরিয়ে বলেন, "এ আর অমনি নয়, লিখিপড়ি-উলি বিদ্বেবতী মেয়ে, নিঘ্‌ঘাত লুকিয়ে বাপকে চিঠি লিখেছে, 'বাবা, আমায় নিয়ে যাও, আর ঘোমটা দিয়ে থাকতে পারছি নে'।"

শিবজায়া আনতমুখী ভুবনেশ্বরীর দিকে কটাক্ষপাত করে কাতর কাতর মুখে বলেন, "আমার কিন্তু তা মন নিচ্ছে না ছোট-ঠাকুরঝি! মনে হচ্ছে কোন কু-খবর আছে, রামকালী চাপছেন।"

বলা বাহুল্য এর পর আর ভুবনেশ্বরীর ডুকরে কেঁদে ওঠা ছাড়া গতি থাকে না।

ভুবনেশ্বরীর একমাত্র অন্তরের সুহৃদ অসমবয়সী এবং অসমসম্পর্ক হলেও ভাসুরপো-বৌ সারদা। কিন্তু এমনি কপালের দুর্দৈব ভুবনেশ্বরীর যে, সারদা আজ চারমাস কাল বাপের বাড়ি।

দ্বিতীয় সন্তানের আবির্ভাব ঘোষণাতেই তার এই পিতৃগৃহে স্থিতি।

না, সেই এক অন্ধকার রাত্রে রাসুর সঙ্গে কলহ করে ডোবার জলে ডুবে মরে নি সারদা। শুধু অন্য ঘরে ননদদের কাছে গিয়ে শুয়েছিল। সে শুধু একটাই রাত। রাতের পর রাত পারবে কেন?

শ্বশুরবাড়ির বৌয়ের রাতটুকুই তো মরুভূমিতে সরোবর! মৃত্যুপুরীর মধ্যে জীবন! যত বড় দুর্জয় মানই হোক, সে মান খাটো না করে উপায় থাকে না তাদের।

সকলেরই তাই। রাত্রে ভুবনেশ্বরীরও কান্নার বেগ অসম্বরণীয় হয়ে ওঠে। রামকালী অপর চৌকি থেকেও সেটা টের পান। কিছুক্ষণ ঘুমের ভান করে চুপচাপ থাকলেও শেষ পর্যন্ত আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না। মৃদু স্বরে বলেন, "অকারণ কাঁদছ কেন?"

বলা বাহুল্য, এ প্রশ্নে যা হয় তাই হল।

কান্নার আবেগ আরও প্রবল হল।

রামকালী বললেন, "ছেলেমানুষি করো না। এস কাছে এস, কান্নার কারণটা শুনি।"

ভুবনেশ্বরী চোখ মুছতে মুছতে উঠেই এল। এসে স্বামীর বিছানার এক প্রান্তে বসে চোখে আঁচল ঘষতে লাগল।

রামকালী ক্ষুব্ধস্বরে বলেন, "তুমিও যদি ওই সব গিন্নীদের মত হও, তাহলে তো নাচার। অপরাধের মধ্যে বলেছি পুণ্যির বিয়ে উপলক্ষে সত্যকে কিছুদিন আগেই আনব। নিজে গেলে আর ওরা অমত করতে পারবে না। কিন্তু এই সহজ কথাটা না বুঝে সবাই মিলে এমন কাণ্ড করছ যে, মনে হচ্ছে বুঝি কি একটা অমঙ্গলই ঘটে গেছে। আশ্চর্য!"

"তা কিছু নয়।" ভুবনেশ্বরী কষ্টে বলে, "মেয়েটার জন্যে প্রাণটা উতলা হচ্ছে তাই—"

"হচ্ছে ঠিকই। হওয়াও স্বাভাবিক।" রামকালী স্নেহ গম্ভীর স্বরে বলেন, "তোমার একমাত্র সন্তান! কিন্তু কান্নাকাটি করলেই তো আর কিছু সুরাহা হয় না। মায়ের প্রাণ উতলা হয়, বাপের প্রাণই কি একেবারে কিছু হয় না?" আর একটু ক্ষুব্ধ হাসি হাসলেন রামকালী।

ভুবনেশ্বরীর পক্ষে এ কথার জবাব দেওয়া সম্ভব নয়।

অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকে বেচারা।

একটু পরে রামকালী বলেন, "যাও, ভগবানের নাম স্মরণ করে শুয়ে পড় গে। দেখি যদি নিয়ে আসতে পারি।"

ভুবনেশ্বরী সহসা আবার কেঁদে ভেঙে পড়ে বলে, "আমার মন বলছে ওরা পাঠাবে না।"

রামকালী আর কিছু বলেন না, 'দুর্গা দুর্গা' বলে পাশ ফিরে শুয়ে পড়েন। ভুবনেশ্বরী অনেকক্ষণ কেঁদে অবশেষে এসে শোয়।

পরদিন মেয়ের বাড়ি যাত্রার আয়োজন করেন রামকালী।

বাইশ

ইংরিজি পড়া আপাতত বন্ধ আছে, কারণ ভবতোষ মাস্টার গ্রামে নেই। ছাত্রদের জন্য 'সেকেণ্ড বুক' সংগ্রহ করতে কলকাতায় গেছে। নবকুমারের তাই এখন অবসর। কিন্তু হায়, অবসরকে কুসুমমণ্ডিত করে তুলবে, এ ভাগ্য নবকুমারের কই? বাড়িতে যে দু-দণ্ড বিশ্রামসুখ উপভোগ করবে, খাবে মাখবে থাকবে, তারও জো নেই। সেখানে জাগন্ত অবস্থায় যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই ভয়ে হৃৎকম্প হতে থাকে তার।

কিন্তু ঘুমন্তই বা থাকে কতক্ষণ?

রাত্রে এখন আর সেই মহিষ-বিনিন্দিত ঘুম নেই নবকুমারের। বিছানায় শুয়ে ঘুম আসে না, ওঠে, বসে, পায়চারি করে, জল খায়, আবার শোয়, এইভাবে অনেকটা সময় কাটে। দিনের বেলা কর্মহীনের কর্ম, নিষ্কর্মার গতি, পুকুরে ছিপ ফেলা!

বন্ধু নিতাই আর সে দুজনে সারা দুপুর সেই কাজটা করে। আজও করছিল। ফাৎনা থেকে চোখ উঠে হঠাৎ চোখ পড়ল নিতাইয়েরই।

বলল, "অমন বাহারে পালকি চড়ে কে আসছে বল দিকি?"

নবকুমার তাকিয়ে বলল, "তাই তো! দিব্যি পালকিখানা! তবে আসছে না বোধ হয়, গাঁ পার হচ্ছে।"

বলল, কিন্তু দুজনের একজনও চোখ ফেরাতে পারল না।

আর কম্পিত চিত্তে ভীত পুলকে দেখল পালকি তাদের দিকেই আসছে।

নবকুমার বলল, "ছিপ ফেলে রেখে চোঁ চাঁ দৌড় দিই আয়।"

নিতাই সবিস্ময়ে বলে, "কেন, পালাব কেন ?"

"আমার মন বলছে এ পালকি নিত্যেনন্দপুরের !"

"অ্যা ! চিনিস বুঝি ?'

"চিনব কেন, অনুমান ! মেয়ে নিতে পাঠিয়েছে নিয্যস। নিতাই, আমি পালাই।"

নিতাই ওর কোঁচার খুঁট চেপে ধরে বলে, "পালাবি মানে ? হেস্তনেস্ত দেখবি না ?"

আর একটু তর্কাতর্কি হয় দুই বন্ধুতে, এবং সত্যি বলতে, নবকুমার যতই পালাবার চিন্তা করুক, নড়তেও পারে না। টিকটিকির শিকারী দৃষ্টির সম্মোহনী শক্তিতে আকর্ষিত কীটের মত নির্জীব হয়ে বসে থাকে।

পাল্কি এই দিকেই আসে, আরোহীর নির্দেশে বেহারারা এখানেই নামায়, এবং আরোহী না নেমেই হাতছানি দিয়ে ডাকেন ওদের। ঘাটের ধার থেকে দুজনেই উঠে আসে কোঁচার খুঁটটা টেনে গায়ে দিতে দিতে।

"তোমরা এ গ্রামের ?"

ভরাট গম্ভীর এই কণ্ঠস্বরে বুক কেঁপে ওঠে দুজনেরই এবং যদিও নবকুমার শ্বশুরকে চেনে না, বিয়ের সময় তাকিয়ে দেখেও নি, দু' দু'বার ষষ্ঠিবাটায় নেমন্তন্ন করেছিল, অসুখের ছুতো করে যায়নি, ভয়েই যায়নি, তবু তার মন বলতে থাকে, এ সেই। এ সেই।

হ্যা, রামকালীই। তিনি ওদের ঘাড়নাড়া উত্তরের পর আবার বলেন, "এ গ্রামের ছেলে, না ভাগিনেয় ?"

নিতাই এগিয়ে এসে বলে, "আজ্ঞে আমি ভাগিনেয়, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণধন দত্ত আমার মাতুল। আমার নাম নিতাইচন্দ্র ঘোষ। আর এ বাঁড়ুয্যে বাড়ির ছেলে নবকুমার বাঁড়ুয্যে। আমার বন্ধু।"

নবকুমার বাঁড়ুয্যে।

রামকালীর দুই চোখে একটা বিদ্যুতের আভা খেলে যায়, 'নিশ্চিন্ত হন অনুমান ঠিক। আর একবার ভাল করে আপাদমস্তক দেখে নেন ছেলেটার। দেখে নেন ওর মেয়েলি মেয়েলি দুধে-আলতা-গোলা রং, আলতা-গোলা ঠোঁট, আর রোদে ঝলসানো টুকটুকে লালরঙা মুখ। তার পর নেমে আসেন পাল্কি থেকে।

গম্ভীরতর স্বরে বলেন, "আমি রামকালী চাটুয্যে !"

বসে পড়বার একটা সুযোগ পেয়েই বোধ হয় বেঁচে যায় ছেলে দুটো, তাড়াতাড়ি বসে পড়েই রামকালীর চরণ-বন্দনা করে।

"থাক্ থাক্" বলে উভয়ের মাথাতেই একটু হাতের স্পর্শ দিয়ে রামকালী একবার নিতাইয়ের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করে নবকুমারকে উদ্দেশ করে বলেন, "এ যখন তোমার বন্ধু, তখন এর সামনে কথা বলতে বাধা নেই, জিজ্ঞেস করছি, এইভাবে মাছ ধরেই দিন কাটাও না কি ?"

নবকুমারের থুতনি বুকে ঠেকে। কিন্তু কায়স্থ বংশধর নিতাই, ওর থেকে অনেক চটপটে চৌকস। আর নির্ভীকও বটে।

সে তাড়াতাড়ি বলে, "না আজ্ঞে, অন্যদিন দুপুরবেলা আমরা মাস্টারের বাড়ি পড়তে যাই। আজ তিনি—"

"কি পড়তে যাও?"

নবকুমার পিছন থেকে প্রবল চিমটি কেটে বন্ধুকে নিষেধ করে, যাতে ইংরিজি পড়াটার কথা না বলে ফেলে। বলা যায় না, ম্লেচ্ছ ভাষা অধ্যয়নের সংবাদে ক্ষেপে ওঠে কি না এই ভয়ঙ্কর লোকটা।

ভয়ঙ্কর?

অন্তত নবকুমারের তাই লাগছে।

কিন্তু নিতাই নিষেধের মান্য রাখে না। বরং একটু বিনয়-আচ্ছাদিত গর্বিত ভঙ্গীতেই বলে, "আজ্ঞে ইংরিজি।"

"ইংরিজি! তা বেশ! কতদূর পড়েছ?"

"ফার্স্ট বুক সেকেণ্ড বুক সারা হয়ে গেছে আজ্ঞে। এখন—"

"ভাল শুনে সুখী হলাম। তা আজ পড়তে যাও নি যে?" প্রশ্নটা নবকুমারকে, তবু উত্তরটা দেয় নিতাই, "মাস্টার মশাই বই আনতে কলকাতায় গেছেন।"

"কলকাতায়! ওঃ। হুঁ। যাক্ বাবাজী, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। জানতে চাইছি, গ্রামে তোমাদের কোন শত্রু আছে?"

"শত্রু!"

নবকুমার বিহ্বল ভাবে তাকিয়ে থাকে।

কোনও শত্রু!

এলোকেশীর মতে তো গ্রামসুদ্ধ সকলেই তাদের শত্রু।

"হ্যাঁ শত্রু। মানে যে তোমাদের অনিষ্টকামী। মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে তোমাদের ক্ষতি করতে চায়। এমন কোনও লোক আছে মনে হয়?"

নবকুমার আস্তে আস্তে নেতিবাচক মাথা নাড়ে, কিন্তু ততক্ষণে নিতাই অন্য উত্তর দিয়ে বসেছে, "আজ্ঞে গাঁয়ে তো সবাই সবাইয়ের শত্রু। ওই ওপরেই দেখন-হাসি। আর নবুর মার মেজাজের জন্যে তো—"

"থাক্ ও কথা—", মৃদু ধমক দিয়ে ওঠেন রামকালী, মেঘমন্দ্র স্বরে বলেন, "গ্রামের সকলের হাতের লেখা চেন? বলতে পার এ লেখা কার?"

মেরজাইয়ের পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে সামান্য একটু মেলে ধরেন রামকালী।

কিন্তু মেলে ধরবার দরকারই বা কি, ওরা তো জানে এ লেখা কার! ভবতোষ মাস্টারের। আর লেখার প্রেরণা নিতাই নিজে। মাস্টারের কাছে হতভাগ্য নবকুমারের

ধর্মপত্নীর যন্ত্রণাময় জীবনের কাহিনী দিব্য বিশদ করেই বলেছিল সে, এবং সহসা ভবতোষ মাস্টার ঘোষণা কবেছিল, "আচ্ছা, আমি এর প্রতিকার সাধনে যত্নবান হব। সাহেবদের দেশে কদাপি কেউ স্ত্রীজাতির প্রতি নির্যাতন সহ্য করে না।"

"কি, চিনতে পারলে বলে মনে হয় ?"

দুজনেই প্রবল বেগে মাথা নাড়ে। বলা বাহুল্য নেতিবাচক। "হ্যাঁ" বলে কে সিংহের মুখবিবরে মাথা গলাতে যাবে ?

"ঠিক আছে। আমি তোমাদের ওখানেই যাচ্ছি। তোমার বাবা বাড়ি আছেন অবশ্যই।"

"আছেন।" অস্ফুট এই শব্দটি এতক্ষণে রামকালীকে নিশ্চিন্ত করে, তাঁর জামাতা বাবাজী বোবা নয়।

পাল্‌কি-বেহারাদের ডেকে জনান্তিকে কি যেন নির্দেশ দিয়ে রামকালী বলেন, "চল, এটুকু তোমাদের সঙ্গে হেঁটেই যাই।"

"আমি আজ্ঞে একটু দৌড়ে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসি—", বলেই বন্ধু নিতাই বিশ্বাস-ঘাতকেব মত নবকুমারকে অথই জলে ফেলে রেখে দৌড় মারে।

রামকালী কয়েক পা অগ্রসর হযে সহসা স্বভাব-বহির্ভূত স্বরে একটা প্রশ্ন করে বসেন, "আমার মেয়ে কি তোমাদের গৃহে কোন উৎপাত ঘটাচ্ছে ?"

"আঁ- -আজ্ঞে, সে —এ কী।"

তোতলা হয়ে ওঠে নবকুমাব।

"না তাই প্রশ্ন করছি। সে বালিকা মাত্র, অবুঝ হওয়া অসম্ভব নয়।"

"আঁ—আঁজ্ঞে। না—না।"

কালঘাম ছুটে যায় নবকুমারের। সে গায়ের একমাত্র আচ্ছাদন কোঁচার খুঁটটুকু টেনে টেনে কপালের ঘাম মুছতে থাকে।

রামকালী মৃদু হাস্যে বলেন, "অধীর হবার কিছু নেই, আমি কৌতূহলপরবশ হয়ে প্রশ্ন করছিলাম মাত্র। যাক্‌, আমি যার জন্য এসেছি তোমাকে জানাই, কারণ তুমি আমার জামাতা। বাড়িতে একটি শুভকাজ আসন্ন, সে কারণ আমার কন্যাকে আমি নিয়ে যেতে মনস্থ করছি। বিবাহের সময় অবশ্য যথারীতি নিমন্ত্রণ আসবে, তুমি এবং তোমার পিতা যাবে। তোমাকে কয়েকদিন থাকবার জন্য মেয়েরা অনুরোধ করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমি তোমার পিতা-মাতাকে জানিয়ে যাব। থাকবার জন্যে প্রস্তুত থেকো।"

এ সবের আর কি উত্তর দেবে নবকুমার ?

ভয়ে আর আনন্দে, আশায় আর উৎকণ্ঠায় তার তো মুহুর্মুহু স্বেদকম্প পুলক দেখা দিচ্ছে। বাড়ির দরজার কাছাকাছি আসতেই নবকুমার সহসা কাতরকণ্ঠে বলে ওঠে, "আমি যাই।"

"কী আশ্চর্য, যাবে কেন ?"

"হ্যাঁ আমি যাই। নিতাই আছে—", বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে শ্বশুরের পায়ের

কাছে মাটিতে একটা থাবল দিয়ে ছুট মারে নবকুমার।

রামকালী সেদিকে চেয়ে একটা নিঃশ্বাস ফেলেন।

লেখাপড়া শিখছে!

কিন্তু মানুষ হচ্ছে কি?

ঠিক এই সময় নিতাই নবকুমারদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, আর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটি সুনিপুণ হাস্য সহযোগে বলেন, "বেহাই মশাই যে? কী মনে করে?"

তেইশ

বেলা না পড়তেই আবার রামকালীর পাল্‌কি ফিরতি মুখ ধরেছে, একা রামকালীকে নিয়েই। এখন পাল্‌কির খোলা দরজা দিয়ে পড়ন্ত সূর্যের স্বর্ণাভা উঁকি মারছে, শেষ ফাল্গুনের উড়ু উড়ু বাতাস যেন দুষ্টু শিশুর মত মাঝে মাঝে ঝুপ করে ঢুকে পড়ে একটা 'টু' দিয়ে যাচ্ছে।

আকাশে বাতাসে গাছে পাতায় সর্বত্রই একটা আলো ঝলসানো আনন্দের আবেশ। কিন্তু প্রকৃতির এই মধুররূপে মন দেবার মত মন এখন নেই রামকালীর। কী এক দুরন্ত ক্ষোভে মনটা যেন হাহাকার করছে। মনে হচ্ছে কোথায় যেন মস্ত একটা হার হয়ে গেছে তাঁর!

ভদ্রতাবোধহীন নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের কাছে কি পরাজয় ঘটেছে রামকালীর? মেয়েকে নিয়ে আসতে পারেন নি এই ক্ষোভেই মন এমন অস্থির?

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো তা নয়। নীলাম্বর তো ভদ্রতার চূড়ান্ত দেখিয়েছেন।

'মেয়ে নিতে এসেছেন' এ প্রস্তাব তোলা মাত্রই নীলাম্বর অমায়িক হাস্যে বলেছেন, "বিলক্ষণ বিলক্ষণ, এ তো অতি উত্তম কথা। আপনার কন্যা আপনি নিয়ে যাবেন, যত দিন ইচ্ছে রাখবেন, এতে আমার কি বলবার আছে? ওরে কে আছিস, পঞ্জিকাটা একবার নিয়ে আয় তো!"

রামকালী বলেছিলেন, "পঞ্জিকা আমি দেখেই এসেছি। আগামী কাল সর্বশুদ্ধা ত্রয়োদশী। বারও ভাল। কালই নিয়ে যাব। রাত্রিবাস না করে উপায় থাকছে না। কাজেই গ্রামে কোনও ব্রাহ্মণ-বাড়িতে শয়নের একটু ব্যবস্থা করে দিন। কিন্তু অনুগ্রহ করে কোনও আহারাদির আয়োজন করতে যাবেন না। বেহারাদের জলপানির ব্যবস্থা ওদের সঙ্গেই আছে।"

নীলাম্বর মেয়েদের ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলে উঠছিলেন, "বলেন কি বেহাইমশাই! আমার এত বড় বাড়ি, এত বড় ঘরদালান থাকতে আপনি অন্যত্র—"

রামকালী গম্ভীর হাস্যে থামিয়ে দিয়েছিলেন, "বেহাইমশাই কি হিন্দু বাঙালীর লোকাচার বিস্মৃত হচ্ছেন? জামাতৃ-গৃহে রাত্রিবাস কি লোকাচারসম্মত?"

নীলাম্বর হাসির সঙ্গে একটি "হ্যা হ্যা" শব্দ করে বলেছিলেন, "তা অবশ্য, তা অবশ্য। কিন্তু আপনার কন্যার সন্তান জন্মের পর তো আর এ জেদ রাখতে পারবেন না?"

রামকালী আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেছিলেন, "সন্তান নয়, পুত্রসন্তান! কিন্তু সুদূর ভবিষ্যতের আলোচনায় বৃথা সময় অপচয়ে দরকার কি? এখন কন্যার সঙ্গে একবার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করুন।"

"বিলক্ষণ, এর আবার ব্যবস্থা কি? ওরে সদু, তোদের বৌকে একবার মাঝের ঘরে নিয়ে আয়, বেহাইমশাই একবার দেখবেন।"

তবে? নীলাম্বরের ব্যবহারে খুঁত কোথায়?

এর চাইতে ভদ্র ব্যবহার আর কি করা যায়? কত বাড়িতে তো বৌয়ের বাপ-ভাই এলে বাইরে থেকেই জল-পান খাইয়ে বিদায় দেওয়া হয়, মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয় না। তা ছাড়া অনেক বাড়িতে বহু সাধ্য-সাধনায় যদি বা মেয়ের দর্শন মেলে, সঙ্গে একজন পাহারা থাকে। সে জায়গায় কিনা চাওয়া মাত্রই পাওয়া? রামকালীর তো কৃতার্থ হয়ে যাওয়া উচিত।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষের মন! রামকালীর মনে হল নীলাম্বরের ওই "সদু" না কাকে ডেকে হুকুম দেওয়া, ওটা যেন তাচ্ছিল্য প্রকাশের একটা চরম অভিব্যক্তি। ওই সুরটার মধ্যে এই কথাগুলোই ঠিক খাপ খেত—"ওরে কে আছিস, একমুঠো ভিক্ষে দিয়ে যা তো, ভিখিরিটা চ্যাঁচাচ্ছে।"

নিজেকে গ্লানিযুক্ত আর সমস্ত পরিবেশটা অশুচি মনে হল রামকালীর। কিন্তু উপায় কি? জামাইয়ের বন্ধু সেই ছেলেটা উঠোনে দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে দেখা যাচ্ছে, নিজে সে গেল কোন্ দিকে?

এদিক ওদিক তাকালেন, হদিস পেলেন না।

সদু কে? ছেলে না মেয়ে? কর্তার তো শুনেছি মেয়ে নেই।

এক ঝাঁক ভাবনার মাঝখানে হঠাৎ বোধ করি সেই মাঝের ঘরেরই দরজার শিকলটা নড়ে উঠল।

নীলাম্বর কোমরের কসি গুঁজতে গুঁজতে উঠলেন। ভিতরে ঢুকে কি বললেন কি করলেন ঈশ্বর জানেন, তারপর বেরিয়ে এসে ডাক দিলেন, "আসুন বেহাই মশাই!"

রামকালী ভিতরে ঢুকলেন।

দেখলেন একটা অন্ধকার-অন্ধকার ঘরের মধ্যে একটা চৌকির ধারে একগলা ঘোমটা ঢাকা বালিকা-মূর্তি। পরনের শাড়ীখানা জমকালো। বোধ করি পিতৃ-সন্নিধানে আসার উপলক্ষে তাকে খানিকটা সাজিয়ে ফেলা হয়েছে।

ঘরের বাইরে একটি কমবয়সী মেয়ে দাঁড়িয়ে, মাথায় ঘোমটা কম। রামকালী এসে ঢুকতেই মেয়েটি তাড়াতাড়ি তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে খাটো গলায় বলল, "ওই যে, কথাবার্তা কন।" তার পর আরও খাটো গলায় হঠাৎ "মেয়ে নিয়ে যাবেন" বলেই টুক করে পাশের একটা দরজা দিয়ে কোথায় ঢুকে গেল। কিন্তু ওর ওই অস্ফুট কথাটা পরিপাক করবার আগেই আর একটা চাপা অথচ তীব্র কথা কানে এল তাঁর, "বৌকে একলা রেখে চলে এলি যে বড় ?"

"বাঃ, আমি আবার সঙের পুতুলের মতন কি দাড়িয়ে থাকব, লজ্জা করে না ?" উত্তরের এই কথাটুকুও কানে এল। তারপর আবার সেই তীব্র স্বর, "ওরে আমার লজ্জাউলি লজ্জাবতী। একলা হয়ে এখন বাপের কাছে সাতখানা করে লাগাক।"

এর উত্তর আর কানে এল না রামকালীর, কিন্তু ইতিপূর্বের তিক্ত মন, কী এক রকম বিকল হয়ে বিস্বাদ হয়ে গেল, কন্যা-সন্দর্শনের প্রথম আনন্দটাই শিথিল হয়ে গেল।

সেই অবকাশে গুণ্ঠনবতী সত্য নিতান্ত নীরবে বাপকে একটি প্রণাম করল। প্রণাম করে যথারীতি পায়ের ধুলো মাথায় বুলোতেও ভুলে গেল না।

কিন্তু রামকালী সহসা এমন বিচলিত হলেন কেন ?

সত্যর এই আচরণে বুকের ভিতরটা হাহাকার করে উঠল তার কেন ? যে হাহাকার এখনো থামাতে পারছেন না এই স্থিতপ্রজ্ঞ মানুষটা ! রামকালী কি আশা করেছিলেন তাঁর সেই সত্য অবিকল তেমনি আছে ? বাপকে দেখেই ছুটে এসে ঢিপ করে একটা প্রণাম ঠুকে গিন্নীদের মত বলে উঠবে, "কি বাবা, এত দিনে মেয়েটাকে মনে পড়ল ? ধন্যি বলি বাপের প্রাণ, এতদিনে একবার দেখতে আসতে ইচ্ছে হল না মেয়েটা মরল কি বাঁচল ? যাই ভাগ্যিস পুণ্যিপিসির বিয়েটা লেগেছিল তাই না—"

অথবা এইটাই কি মনে করেছিলেন, সত্য আর আগের সত্য নেই, একেবারে বদলে গেছে ! তাই প্রত্যাশিত হৃদয়ে অপেক্ষা করেছিলেন, দেখামাত্রই ঝাঁপিয়ে এসে পিতৃবক্ষে আশ্রয় নিয়ে নিঃশব্দে কেঁদে ভাসাবে সে। আর তার সেই অবিরল অশ্রুধারায় রামকালীর জ্বালা করা বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!

কিন্তু এই ইচ্ছে তো রামকালীর হবার কথা নয়। আবেগপ্রবণতা তো রামকালীর সম্পূর্ণ রুচিবিরুদ্ধ। মন কেমন করা বা অনেক দিন পরে দেখা হওয়া ইত্যাদি উপলক্ষ করে কেউ কাঁদছে কাটছে দেখলে ভুরু কুঁচকে ওঠে তাঁর। স্বয়ং রামকালী-দুহিতাই যদি সেই খেলো আর সস্তা পদ্ধতিতে আবেগ প্রকাশ করে বসে, রামকালী অসন্তুষ্ট হতেন না কি ?

বহু বিচিত্র উপাদানে গড়া মানব মন কখন কি চায় বলা বড় শক্ত। কি চায় সে নিজেই বুঝতে পারে না, শুধু এক-এক সময় একান্ত বেদনায় বলে, "এ কী হল ! এ তো আমি চাই নি !"

তাই চির-অবিচলিত রামকালী হঠাৎ আজ নিজের মেয়ের এই শান্ত সভ্য বধূ-মূর্তি দেখে

বিচলিত হয়ে ভাবলেন, "এ কী হল!"

কথা যোগায় না রামকালীর। মৃদু গম্ভীর কণ্ঠ থেকে শুধু একটু কুশল প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছিল, "ভাল আছ তো?"

সত্য তেমনি মাথা নীচু করে বলেছিল "হ্যাঁ বাবা! বাড়ির সব খবর মঙ্গল?"

ঠাকুমা পিসঠাকুমাদের দল থেকে সুরু করে বাগদী ঝিটা পর্যন্ত বাড়ির প্রত্যেকটি সদস্যের নাম করে করে কে কেমন আছে জিজ্ঞেস করল না সত্য, শুধু জিজ্ঞেস করল, "বাড়ির সব মঙ্গল?"

আশ্চর্য! আশ্চর্য! শ্বশুরঘরে এলে কি এমনি করেই মেয়েরা তাদের আজন্মের আশ্রয়কে—তাদের ধুলোমাটির গড়া খেলাঘরের মতই ভেঙে ফেলে? মন থেকে মুছে ফেলে? তাই শকুন্তলাকে আর কোন দিন কণ্ব মুনির আশ্রমে দেখা যায় নি, জনক রাজার ঘরে সীতাকে! মহাকবিদের মহৎ লেখনীও এই অমোঘ নিয়মকে সহজ সত্য বলেই মেনে নিয়েছিল, তাই সে লেখনী নির্মম ঔদাসীন্যে শুধু সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে, পিছু ফিরে তাকায় নি।

নারী আর নদী, এরা তবে এক ধাতুতে গড়া।

কিন্তু গিরিরাজ দুহিতা উমা?

না, উমা তো ইতিহাসের নয়, পুরাণের নয়, মহাকবিদের অমর লেখনীর অনবদ্য সৃষ্টি নয়, সে যে শুধু ঘরোয়া মানুষের মনের মাধুরী দিয়ে গড়া অমিয় ছবি। মানুষের প্রত্যাশা আর কল্পনা, আশা আর আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া ভালবাসার মূর্তি!

রামকালীর মনের মধ্যে অনেক ভাব-তরঙ্গের একটা আলোড়ন উঠেছিল, যেমনটা তাঁর সচরাচর হয় না। ভাবলেন, তবে কি সত্য সম্পর্কে এতদিন যে মূল্যবোধ তাঁর মনের মধ্যে ছিল, সত্য তার উপযুক্ত নয়? সত্য সেই সাধারণ মেয়ে, যারা সহজেই বদলে যায়? ভাবলেন, তবে কি মার খাওয়ার কথাটাই সত্যি, আর সত্য একেবারে নেহাৎ একটা ভীরু মেয়ে মাত্র? যে মেয়েরা পড়ে মার খায়, আর মার খেয়ে ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে, নিজেকে প্রকাশ করতে সাহস পায় না!

সত্যর সম্পর্কে এত হতাশ হতেই বুঝি রামকালীর মধ্যে এত আলোড়ন।

তবু সে আলোড়নকে সংহত রেখে রামকালী বলেছিলেন, "হ্যাঁ, সব সংবাদ মঙ্গল। পুণ্যর বিয়ে যোলই বোশেখ, তাই তোমাকে নিয়ে যাবার সংকল্প করে এসেছি।"

হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটা উচ্চারণের পরই বুকের মধ্যে যেন একটা হাতুড়ির ঘা খেলেন রামকালী!

"বাবা গো তুমি কী ভাল!" বলে আহ্লাদে চেঁচিয়ে উঠল না সত্য, তার বদলে বলল, "বোশেখের মাঝামাঝি বিয়ে, আর এখন তো সবে ফাগুনের শেষ, এত আগে থেকে নিয়ে যেতে চাইলে এরা কিছু মনে করতে পারে বাবা!"

রামকালী সুগভীর একটা নিঃশ্বাস গোপন করে বলেছিলেন, "ওরা অমত করে নি।"

"করে নি সে ওদের ভদ্দরতাই, কিন্তু বাবা আমাদেরও তো একটা বিবেচনা করা দরকার। এদের অসুবিধেয় ফেলে—"

"তোমার তাহলে এখন যাওয়ার মত নেই?"

আর একটা নিঃশ্বাস গোপন করতে হয় রামকালীকে।

সত্য এবার মুখ তুলে তাকায়। সোজাসুজি একেবারে বাপের দিকেই। বাহারে শাড়ীর ঘোমটাটা খসে পিঠের ওপর পড়ে যায়, তাই সত্যর সেই বাগ-না-মানা কোঁকড়া চুলে ঘেরা মুখটা সবটাই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়, আর চোখের দৃষ্টিটা তার বেশ একটু সময় নিয়েই বাপের মুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে।

তারপর চোখ নামিয়ে নিয়ে খসে পড়া আঁচলটা মাথায় তুলতে তুলতে উত্তর দেয় সত্য, "তা কার্যক্ষেত্রে মত নেই-ই বলতে হয় বৈ কি। ঠাকরুনের শরীর স্বাস্থ্য ভাল নয়, একা ননদের ঘাড়ে সমগ্র সংসার—"

রামকালী ঈষৎ বিস্মিত প্রশ্নে বলেন, "ননদ! নবকুমারের ভগিনী আছেন না কি?"

"সহোদর বোন নন, তবে সহোদরের বাড়া বাবা। পিসতুতো ননদ—ওই যে যিনি তোমাকে এঘরে এনে পৌঁছে দিলেন।"

"ও!" ননদ প্রসঙ্গে ইতি টেনে রামকালী বলেন, "যাবার যখন উপায় নেই, তখন আর কি করবার আছে! অতএব রাত্রে আমার আর এ গ্রামে অবস্থান করার প্রয়োজনও দেখি না। এখনি রওনা দেব। তার আগে একটা প্রশ্ন তোমায় করছি, তুমি তো লেখাপড়া কিছু শিখেছিলে, পত্রাদিও পড়তে পার মনে হয়, এই চিঠিটা পড়ে মানে বুঝতে পারবে?" জামার পকেট থেকে চিঠিটা বার করেন রামকালী।

চিঠিখানা কিন্তু সত্য তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে নেয় না। মৃদুস্বরে বলে, "কার পত্তর?"

"সেটাই তো আমার জানা নেই। তুমি হয়তো জানতে পারবে।"

অতঃপর চিঠিটা হাতে নিয়ে কয়েকছত্র পড়ে সত্য, ঈশ্বর জানেন ঘোমটার মধ্যে তার মুখের চেহারা কেমন হয়ে ওঠে, কিন্তু গলাটা তো ঠিকই থাকে। ঠিকঠাক শান্ত গলায় বলে ওঠে সে, "এতবড় একটা জ্ঞানবান্ বিচক্ষণ বেক্তি হয়ে বুঝতে পারলে না বাবা, এ কোনও শত্তুরের কাজ!"

"এমন কে শত্রু আছে তোমাদের?"

"তা কে জানে বাবা? অনেক শত্তুর তো ওপরে ভালমানুষ সেজেও থাকে!" চিঠিটা সব না পড়েই বাবার হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল সত্য।

রামকালী সেটা ফের পকেটে পুরে, দীর্ঘনিঃশ্বাস গোপন না করেই বলেছিলেন, "তাহলে এখানে তোমার কষ্টের কোন কারণ নেই? তোমার সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা করবারও কিছু নেই

আমার! ঈশ্বর মঙ্গল করলেন। তাহলে এই কথাই বলে সান্ত্বনা দিতে পারব তোমার মাকে।"

"মা!" সত্য একটু চমকে বলে, "এ পত্তরের বিষয় মা জানেন?"

"না। তিনি অবশ্য জানেন না কিছু," রামকালী ঈষৎ হাসির মত করে বলেন, "তবে 'মেয়ে মেয়ে' করে একটু উতলা হয়েছেন তো। যাক। তোমার প্রতি যে কোন দুর্ব্যবহার হয় না এইটাই শান্তির বিষয়। আর বিশ্বাস করব তুমি ঠিক কথাই বলছ।"

সত্য আর একবার তেমনি মুখ তুলে তাকায়। এবার যেন ভয়ঙ্কর একটা অভিমানের ছায়া ভর্ৎসনার মত ফুটে ওঠে সে-চোখে। তারপর চোখ নামে। মৃদু আর দৃঢ়কণ্ঠে বলে সত্য, "পেতল কাঁসার ঘটিটা বাটিটাও একত্রে থাকলে মধ্যে মধ্যে ঠোকাঠুকি লাগে বাবা, আর এ তো জলজ্যান্ত মানুষ! একেবারে ঠোকাঠুকি লাগে না, লাগবে না, একথা কি জোর করে বলা যায়? তবে এটুকু বিশ্বাস মেয়ের প্রতি রেখো বাবা, কোনও অন্যায়ই সে করবেও না, সইবেও না।"

তারপর রামকালী চলে এসেছিলেন।

সত্য আর একদফা প্রণাম করেছিল।

কিন্তু এইখানেই তো ইতি নয়।

"মেয়েকে না নিয়েই যে চললেন বেয়াইমশাই?" এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছিল রামকালীকে। আর মিথ্যা কথা বানিয়ে বলতে না পারার জন্যে বিদ্রূপ-হাস্যরঞ্জিত বিস্ময়-প্রশ্নও শুনতে হয়েছিল।

সত্যর শ্বশুর সেই তাঁর মেয়েলি ভঙ্গীতে গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন, "বলেন কি বেহাইমশাই, মেয়ে বাপের ঘর যেতে চায় না! এ যে বড় তাজ্জব কথা শোনালেন দেখছি!"

নিজের জন্যেও ততটা নয়, রামকালীর মনে হয়েছিল, কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে, কিন্তু সত্যর শ্বশুর সম্পর্কে যে তাঁর ওই প্রবাদটা সহজেই মনে আসতে পারল, এটাও তো কম গ্লানির কথা নয়।

আশ্চর্য, ওদের ব্যবহারে বিনয় আর সৌজন্য প্রকাশের ঘটা তো কম ছিল না, তবু কেন রামকালীর ওদের. স্থূল অমার্জিত মনে হয়েছিল? জামাইটা অবশ্য নেহাৎ বোকা বোকা, প্রকৃতি কেমন কে জানে! তা সেই তো মাত্র একবার দেখা দিয়েই উধাও হয়ে গেল।

বন্ধুটাকে তবু আবার দেখলেন, কিন্তু জামাইকে নয়।

বন্ধুটা যে সত্যর শ্বশুর-শাশুড়ীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে।

শ্রদ্ধার যোগ্যই নয় ওরা!

তবু আর একবার বুকটা কেমন মুচড়ে উঠল রামকালীর, তবু সেই শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে দিব্যি মিশে গেছে সত্য। এমন মিশে গেছে যে, শাশুড়ীর শরীর স্বাস্থ্যর অজুহাতে

বাপের বাড়ি যাওয়ার প্রলোভন ত্যাগ করে।

সুযোগ পেয়েও বাপের বাড়ি যেতে চাইল না, এরকম মেয়ে রামকালী কি তাঁর এতখানি জীবনে এর আগে কখনো দেখেছেন? অথচ ঠিক বোঝাও যাচ্ছে না তাকে।

হয়তো তাকে আর কোন দিনই বোঝা যাবে না। রামকালীর মেয়ে রামকালীর কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছে, হয়তো আরও অনেক অনেক দূরে চলে যাবে। সেই সত্যকে আর কোনদিনই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

চিরনিঃসঙ্গ রামকালীর অন্তরের একটি মাত্র ছোট্ট সঙ্গী, রামকালীর আকাশের আলো-ঝিকঝিকে ছোট্ট একটি তারকা, চিরদিনের মত হারিয়ে গেল!

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল।

চোখে পড়ল পালকির পাশ দিয়ে বেহারাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আর একটা মানুষও দৌড়চ্ছে।

কখন থেকে দৌড়চ্ছে?

হঠাৎ কোথা থেকেই বা এল? কিছু বলতে চায় না কি?

রামকালী বেহারাদের আদেশ দিলেন থামাতে।

আর তার পরই নজরে পড়ল এ সেই নিতাই, তাঁর জামাইয়ের বন্ধু।

"কি খবর?"

কিসের একটা প্রত্যাশায় রামকালীর মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

কি ভাবলেন তিনি? তাঁর সত্যবতীই কি আবার বাপকে ফিরিয়ে আনতে ডাক দিয়েছে? এখন কেঁদে ফেলে বলবে, "মেয়ের মুখের কথাটাই তুমি দেখলে বাবা, তার অভিমানটাকে দেখলে না? একবার 'না' করেছি তো রাগ দেখিয়ে চলে গেলে?"

অনেকগুলো কথা মনের মধ্যে হুড়োহুড়ি করে উঠল, তবু সংযত কণ্ঠেই প্রশ্ন করলেন রামকালী, "কি খবর?"

নিতাই হাঁপাচ্ছিল।

একটু জিরিয়ে নিয়ে বলে, "বাচালতা মার্জনা করবেন তালুইমশাই, বলতে এসেছি এ কী করলেন? মেয়ে নিতে এসে খালি হাতে ফিরে যাচ্ছেন? বাঁড়ুয্যে মশায়ের কাছে হেরে গেলেন?"

রামকালীর মুখ লাল হয়ে ওঠে।

কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলেন, "বাচালতা মার্জনা করা শক্ত হচ্ছে।"

"বুঝেছি! কিন্তু বড় আশায় হতাশ্বাস হয়েই ছুটে এসেছি! আপনার কন্যেকে নিয়ে গেলেন না বটে, কিন্তু এর পর আর হয়তো মেয়েকে জীবিত দেখতে পাবেন না। হয়তো আত্মঘাতী হয়ে—মেয়ে তো আপনার ভাঙে তো মচকায় না।"

সহসা রামকালী চাপা ভারী গলায় প্রবল একটা ধমক দিয়ে ওঠেন, "দেখতে তো বেশ ভদ্রসন্তান বলে মনে হচ্ছে, প্রকৃতি এমন ইতরের মত কেন ?"

ইতরের মত !

নিতাই বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে।

রামকালী স্বভাবগম্ভীর স্বরে বলেন, "অপর গৃহের কুলবধূ সম্পর্কে কোন আলোচনা ইতরতারই নামান্তর।"

"বেশ !" নিতাই অভিমান-ক্ষুব্ধ মুখে মাথা নীচু করে বিদায়-প্রণাম করে বলে, "আর কি বলব বলুন ! তবে একা আমিই আস্পর্দা করি না। আপনার জামাই নবকুমারই—", ঢোক গিলে বলে নিতাই, "সে বলেছিল—চোখের সামনে স্ত্রীহত্যে দেখব, প্রতিকার করব না ? তাই আমি—"

নিতাই আস্তে আস্তে চলে যায়।

রামকালী স্তব্ধ হয়ে সেই দিকে তাকিয়ে থাকেন।

আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে রামকালী কি ওকে ফিরে ডাকবেন ?

কিন্তু ডেকে, তারপর ?

আদ্যোপান্ত ঘটনা জেনে নিয়ে, ফের আবার ছুটবেন জামাইবাড়ি ?

তারপর ?

আবার তাদের বলবেন, 'না আমার ভুল হয়েছে, মেয়ে বালিকা, খামখেয়ালের বশে কি বলেছে, সে-কথা কথাই নয়। ওকে নিয়ে যাব।'

আচ্ছা তারপর ?

যদি সত্য আবার বলে, "সে কি বাবা, আবার ফিরে এলে কি বলে ? আমি তো বলেছি এখন যাওয়া হবে না।"

তখন ?

তখন কি করবেন রামকালী ? সত্যর ওই কথার পর ? বলবেন, পাগলী মেয়ে পাগলামি রাখ, তোর মা তোকে না দেখে কেঁদে দিন কাটাচ্ছে ! বলবেন, তোকে না নিয়ে একা ফিরতে আমার প্রাণটা হাহাকার করছে ! বলবেন—না, হয় না, আত্মমর্যাদাকে আর কত বিসর্জন দেবেন রামকালী ?

"তোল পাল্কি।"

বেহারাদের হুকুম দেন রামকালী।

তারা যথারীতি গৃহাভিমুখেই চলতে থাকে।

আর রামকালী বিস্ময়ে মূক হয়ে বসে থাকেন সেই একক পাল্কিতে।

ধীরে ধীরে বিস্ময়ের ধূসরতা ফিকে হয়ে আসে।

কার্যকারণের চেহারাটা চোখে ভেসে ওঠে।

নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের কাছে হেরে যান নি রামকালী, হেরে গেছেন আপন আত্মজার কাছে। বুদ্ধির খেলায় রামকালীকে পরাজিত করেছে সত্য। বাপের কাছে প্রতিপন্ন করেছে সে, শ্বশুরবাড়িতে সুখে আছে সে, সন্তোষে আছে। তাই শ্বশুরবাড়ির কর্তব্যের কাছে বাপের বাড়ির তীব্র মধুর আকর্ষণও তুচ্ছ করতে পারা অসম্ভব হল না তার।

জীবনের বিনিময়েও বাপের শান্তি বজায় রাথবে সত্য।

আর রামকালী? রামকালী সত্যর সেই কৌশলে বিভ্রান্ত হলেন, অভিমানে অন্ধ হলেন, আপন অহঙ্কার নিয়ে ফিরে এলেন!

আর এখন ফিরে যাওয়া যাবে না।

অপেক্ষা করতে হবে ন্যায্য সময়ের জন্য। পুণ্যির বিয়ের তারিখ ঘেঁষে কুটুম্বের মত আসবে সত্য। আসবে—যদি ততদিন বেঁচে থাকে।

চোখ দুটো হঠাৎ লঙ্কার ঝাল লাগার মত জ্বলে উঠল। স্বভাব-বহির্ভূত তীব্রতায় পাল্‌কি থেকে মুখ বাড়িয়ে বেহারাদের উদ্দেশে বলে উঠলেন রামকালী, "কচ্ছপের মত সমস্ত মাটি মাড়িয়ে হাঁটছিস যে তোরা, পায়ে জোর নেই?"

চব্বিশ

চিঠিখানা যে "শত্তুরের রটনা", একথাটা নেহাৎ ভুল নয়। বৌকে এলোকেশী নিত্য প্রহারে জর্জরিত করেন, এ বললে এলোকেশীর প্রতি অন্যায় অবিচার করা হয়। মেরেছিলেন সেই একদিনই। বৌয়ের চুল বাঁধতে বসে। অবিশ্যি একটু আশ মিটিয়েই মারবেন বলে উঠোনের রোদে মেলে দেওয়া জ্বালানি কাঠ থেকে একখানা তুলে এনেছিলেন, কিন্তু সে কাঠ আর বৌয়ের পিঠে ভাঙবার সুখ তাঁর হয় নি। সর্বনেশে সৃষ্টিছাড়া বৌ হঠাৎ ঝট করে কাঠখানা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বেশ মজবুত গলায় বলে উঠেছিল, "দেথ, গুরুজন আছ, গুরুজনের মতন থাক, শিরোধায্যে রাখব। নচেৎ তোমার ললাটে দুঃখু আছে। আমাকে তুমি চেননা, তাই ভেবেছো আমার ওপর যা খুশি করবে। সে বাসনা ছাড়।"

কথা শেষ না হতেই এলোকেশী হঠাৎ মড়াকান্না কেঁদে উঠে পাড়ার লোক জড়ো করেছিলেন।

তারপর তো সে এক হৈ হৈ কাণ্ড, রৈ রৈ ব্যাপার!

কিন্তু সত্যকে আর সে রঙ্গমঞ্চে দেখা যায় নি।

পাড়ার পাঁচজনের বিস্ময়োক্তিকে সদু থামিয়েছিল, "নতুন ফাগুনের গরমে" মামীমার মাথাটা গরম হয়ে উঠেছে বলে। বলেছিল অবশ্য নেপথ্যে ডেকে নিয়ে গিয়ে চুপিচুপি। জনে-জনেই বলেছিল।

তারপর মামীকে চুপিচুপি বলেছিল, "সাপের ল্যাজে পা দিতে যেও না মামী, বৌটি তোমার যেমন তেমন নয়!"

এলোকেশী সত্যকে ন-ভূতো ন-ভবিষ্যতি গালমন্দ করে চিৎকার করে জানিয়েছিলেন—আচ্ছা, ওই বৌকে তিনি মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দিতে পারেন কি না দেখবে গাঁসুদ্ধু সবাই।

কিন্তু আশ্চর্য, কার্যক্ষেত্রে আর তা করে উঠতে পারলেন না। এই কথার পিঠে বৌ সত্যকে উদ্দেশ করে বেশ স্পষ্ট গলায় বলে দিয়েছিল, "ঘরের বৌকে মাথায় ঘোল ঢেলে গাঁয়ের বার করে দিলে যদি গাঁয়ের কাছে তোমাদের মুখোজ্জ্বল হয়, তো তা করতে বল ঠাকুরঝি তোমার মামীকে। তবে বিবেচনা করে দেখতে বলো, তা করলে কার গায়ে ধুলো দেবে লোকে!"

এলোকেশী তেড়ে এসে বলেছিলেন, "তবে আয় তোকে আজ কেটে রক্তগঙ্গা করে নিজে ফাঁসি যাই। উঃ, বৌ-মানুষের এত কথা!"

সত্য নিঃশব্দে রান্নাঘরের দাওয়া থেকে মাছ কাটবার বড় বঁটিটা তুলে এনে এলোকেশীর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেছিল, "তাই তবে কর, তখন তো আর আমি দেখতে আসব না কার মুখটা পুড়ল।"

আশ্চর্য, এই ঘটনার পরই এলোকেশী কেমন নিথর হয়ে গিয়েছিলেন। আর একটিও বাক্ সরে নি তাঁর মুখ থেকে! কিছুক্ষণ সেই বঁটিখানার চক্চকে ফলাটার দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে সরে গিয়েছিলেন।

আর তদবধি—

তর্জন-গর্জনের পথ থেকে সরে এসে বাক্যালাপ বন্ধর পথ ধরে চলেছিলেন এলোকেশী এবং তলে তলে ক্রমাগত নীলাম্বরকে মন্ত্রণা দিচ্ছিলেন, বৌয়ের গহনাগাঁটি সব কেড়ে নিয়ে, কোন ছলে-ছুতোয় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। একবার পাঠিয়ে দিতে পারলে জীবনেও আর ওই সর্বনেশে জাঁহাবাজ মেয়েকে ফিরিয়ে নিয়ে আসছেন না।

কিন্তু ছলছুতো খুঁজতে খুঁজতে দিন গড়িয়ে যাচ্ছিল।

হঠাৎ এমনি সময় রামকালীর আবির্ভাব।

হাতে চাঁদ পেয়েছিলেন এলোকেশী এবং নিশ্চিত ঠিক করে ফেলেছিলেন, এই সূত্রে বৌকে জন্মের শোধ বিদায়। কারণ ইত্যবসরে আর একটি মেয়ে এলোকেশীর দেখা হয়ে গেছে, বয়স সাত-আট, ধরন-ধারন খুব নিরীহ, সর্বোপরি তার বাপ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে চীনে সোনার গহনায় মেয়ের সর্বাঙ্গ মুড়ে দেবে।

ঐ মহামন্ত্রটি স্বামীকে অনবরত জপিয়েছেন এলোকেশী।

অতএব এক কথায় রাজী হয়েছিলেন নীলাম্বর বৌ পাঠাতে। স্বপ্নেও ধারণা করতে পারেন নি, বৌ নিজে বেঁকে বসবে।

রামকালী চলে যেতে—এলোকেশী পতির প্রতি জলন্ত কটাক্ষ করে বলেন, "বুঝলে ? বুঝলে কত বড় জাঁহাবাজ ধড়িবাজ মেয়ে ! বলি নি তোমায় আমি, ও মেয়ের হাড়ে ভেলকি খেলে !"

নীলাম্বর বলেন, "দেখছি বটে !"

"তা হলে বল, ওই বৌ নিয়ে ঘর করতে হবে আমায় ? একে তো ওই লক্ষ্মীছাড়ি সদিকে নিয়ে হাড়ে হাড়ে জ্বলছি, তার সঙ্গে আবার ওই বৌ। আর দুটিতে মিল কত ! আরো ওই জন্যেই বৌকে কুলোর বাতাস দিয়ে বিদেয় করতে চাই ! আর—আরও একটা কথা, চুপি চুপি বলেছিলেন এলোকেশী, "এখনো ঘরে দিই নি তাই। ওই ছক্কা-পাঞ্জা বৌ যেই সোয়ামীকে হাতে পাবে, সেই তো একেবারে "নয়" করে নেবে। আর কি আমার নবু আমার থাকবে ? তার থেকে আমার বকুলফুলের ওই হ্যাওর-ঝিটা হাবা-গোবা মতন আছে—"

কিন্তু বেহাই যখন চলে গেলেন, তখন কিছু আর নীলাম্বর এ-কথা বলতে পারলেন না, "ভাল চান তো মেয়ে নিয়ে যান মশাই, নইলে কুলোর বাতাস দিয়ে বার করে দেক।"

নীলাম্বরের একটা ত্রুটি আছে। বুকের পাটাটা তাঁর যতই থাক, মুখের জোরটা কম।

এলোকেশী গালে মুখে চড়িয়ে বললেন, "কী বলব, ব্যাই বেটাছেলে, তার সঙ্গে তো আমার কথা কওয়া সাজে না, নইলে একবার দেখে নিতাম সে বা কত বড় ঘুঘু, আর—আর ওই বাপ সোহাগী বেটিই বা কত হারামজাদী !"

বৌয়ের সঙ্গে কথা বন্ধ ছিল, সে পণ আর রাখতে পারলেন না এলোকেশী। সত্য যেখানে বসে পান সাজছিল, সেখানে তেড়ে গিয়ে বললেন, "বাপ নিতে এসেছিল, গেলি না যে বড ?"

সত্য একবার চোখ তুলে, চোখ নামিয়ে পান মোড়ায় মন দিল।

"কী, কথার উত্তুর দিলি না যে বড ? গেলি না কেন বাপের সঙ্গে পিসির বিয়েতে ?"

সত্য মৃদু গম্ভীর ভাবে বলে, "বিয়ের তো এখনও দেরি।"

"তা বাপ তো আদিখ্যেতা করে নিতে এসেছিল।"

"বাবার কথায় ও-রকম অচ্ছেদ্দা করে কথা কইবে না।" বলে মোড়া পানগুলো ডাবরে ভরে ভিজে ন্যাকড়া ঢাকা দিয়ে ধীর মন্থর গতিতে উঠে কুলুঙ্গীতে তুলে রাখে সত্য।

এলোকেশী রাগে দিশেহারা হয়ে বোধ করি আর কোন কথা খুঁজে না পেয়েই বলেন, "সর্বনাশী লক্ষ্মীছাড়ি, কি ভেবেছিস তুই ? বাপের ঘরে যাবি না, চিরকাল আমার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবি ?"

সত্য একবার ফিরে তাকিয়ে শাশুড়ীর দিকে একটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, "তা সর্বনাশকে যখন কুলো ডালা দিয়ে বরণ করে ঘরে এনেছ, তখন চিরকাল তার বোঝা বইতে হবে বৈ কি।"

নবকুমার খবরটা পেল ভগ্নদূতের কাছে।

নিতাই বলে গেছে, "তোর শ্বশুর আমাকে শুধু ভস্ম করতে বাকী রেখেছে।"

কিন্তু নিতাইয়ের কথাগুলো নবকুমার গায়ে মাখল না।

'নির্যাতিতা ধর্মপত্নী'কে নির্যাতন থেকে উদ্ধার করবার সাধু সংকল্প নিয়ে নবকুমার অসমসাহসিক কাজ করেছিল, কিন্তু রামকালী ফিরে যাবার পর হঠাৎ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে আবার বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল নবকুমার। আশ্চর্য! সত্যবতীর যাওয়া হল না দেখে তার মনের মধ্যে যেন একটা পুলকের ঢেউ উথলে উঠছে।

নবকুমার এ রহস্যের কিনারা করতে পারল না।

কিন্তু নবকুমারের জন্যে যে আরও কী অদ্ভুত রহস্য তোলা ছিল, তা কি সে দণ্ডখানেক আগেও ভেবেছিল ?

রাত খুব বেশী নয়, সন্ধ্যে রাত্তির।

এলোকেশী যথারীতি বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন, আর নীলাম্বর যথারীতি রাত-সফরে বেরিয়েছেন, সদু রান্নাঘরে কাঠের 'দেল্‌কো'র উপর মাটির প্রদীপ বসিয়ে রান্না করছে। নবকুমার বাড়ি ফিরে সন্তর্পণে অন্ধকার দালানটা পার হচ্ছিল, হঠাৎ পাশের ঘরের দরজার কাছ থেকে একটা চাপা মৃদু অথচ দৃঢ় গলায় কে বলে ওঠে, "একটু দাঁড়াতে হবে।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারে না নবকুমার এবং দাঁড়িয়ে যে পড়ে, সেটা আদেশ-পালনার্থে নয়, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলে বলেই পড়ে।

এ কণ্ঠস্বর তার বাপের নয়, মার নয়, সদুর নয়।

অতএব ?

বাড়িতে আর কে আছে ? নবকুমারের স্বপ্নলোকবাসিনী ছাড়া ?

অন্ধকারে কেউ কাউকে স্পষ্ট দেখতে পায় না—শুধু গলাটাই শোনা যায়, "নিত্যেনন্দপুরে চিঠি পাঠিয়েছিল কে ? আমার দুঃখু কাহিনীর ব্যাখ্যা করে ?"

বলাবাহুল্য নবকুমার দারুমূর্তিতে পরিণত! আর দারুমূর্তির কথা কইবার ক্ষমতা থাকা সম্ভব নয়।

"উত্তুর নেই যে ?"

নবকুমার একবার অস্ফুটে বলে, "কি বলব ?"

"পষ্ট উত্তুর দেবে! আমার বাবাকে চিঠি দিয়েছিল কে ?"

এ কণ্ঠের প্রশ্নে নিরুত্তর থাকা নবকুমারের সাধ্যাতীত। কষ্টে বলে, "আমার সঙ্গে কথা কইছ, কে কমনে দেখে ফেলবে।"

"আচ্ছা সে চিন্তে আমার। কথাটার উত্তুর ফাঁকি না দিয়ে হক্ জবাবটা দাও।"

নবকুমার ঢোক গিলে, ঘাড় চুলকে, ঘেমে-টেমে বলে, "আমি চিঠির কথা কি করে জানব? কিসের চিঠি?"

"ত্যাখো, মিথ্যে কথা কয়ো না, নরকেও ঠাঁই হবে না।" সত্যবতী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "আমার নিয্যস জ্ঞান, এ তোমার কাজ!"

সহসা নবকুমারের স্বামীত্ব প্রভুত্ব এবং পৌরুষ ধিক্কার দিয়ে ওঠে তাকে। তাই সেও সহসা ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "যদি দিয়েই থাকি, দোষটা কি হয়েছে? নিজেই তো মরছিলে!"

অন্ধকার থেকে মৃদু তীক্ষ্ণ স্বর দ্রুত কথা কয়, "মরছিলাম সেটা ঢাক পিটিয়ে বলে বেড়াবার, কুটুমের কানে তোলার মতন কথা নয়। যারা নিজের মায়ের গালে চুনকালি দেয়, তাদের আবার বিদ্যে-বুদ্ধির বড়াই! ঘর-শত্তুর বিভীষণকে ত্রিজগতের লোক ছি ছি-কার করেছে বৈ ধন্যি ধন্যি করে নি। এই বুঝে কাজ করো।"

ঘরের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে যায় দরজায় দাঁড়ানো মূর্তিটার আভাস।

কণ্ঠস্বরের অনুরণনটুকুও বাতাসে মিলিয়ে যায়, অথচ নবকুমার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

প্রথম পত্নী-সম্ভাষণের যে বহুবিধ রোমাঞ্চময় এবং আবেশময় মধুর কল্পনা নবকুমারের লাজুক হৃদয় এতদিন ধরে লালন করে আসছিল, তার উপর কে যেন একটা কালির দোয়াত উপুড় করে দিয়ে গেছে।

স্ত্রীর সঙ্গে জীবনের প্রথম বাক্যবিনিময় এই ভাবেই শেষ হয় নবকুমারের।

পঁচিশ

সত্যর বেহায়াপনার কথা জানতে আর বাকী থাকে না কারো এ তল্লাটে। বাপ নিতে এসেছিল, শ্বশুর শাশুড়ী এক কথায় মত দিয়েছিল, অথচ সত্য যায় নি, নিজে ফিরিয়ে দিয়েছে বাপকে, এই অভাবনীয় সংবাদটা যেন খড়ের চালে আগুন লাগার মত ছড়িয়ে পড়ল এ পাড়া থেকে ওপাড়া। পাড়ার অন্য বৌরা ভাবল, বাঁড়ুয্যে বাড়ির বৌটার নানা নিন্দেবাদ শুনেছি, এতদিনে তার মানে পাওয়া গেল, বৌটা পাগল!

আহা বেচারা নবকুমার!

বেহাইয়ের বিষয়ের লোভে বাপ কিনা একটা পাগল বৌ চাপিয়েছে ছেলের!

তা সত্য সম্পর্কে এ ধরনের আলোচনা আরো একবার হয়ে গেছে ইতিপূর্বে, সত্যর বাপের বাড়ির দেশেই হয়েছে। যখন চাউর হয়ে গেল, রামকালী কবরেজ মেয়ে পাঠাতে চাননি, মেয়ে নিজে বলেছে "পাঠিয়ে দাও বাবা", তখন এর থেকে বেশী বৈ কম ছিছিক্কার পড়েনি।

ভুবনেশ্বরী অবিরল কেঁদে মাটি ভিজিয়েছে, সত্যর বন্ধুরা গাল থেকে আর হাত নামাতে

পারেনি, সত্য নিশ্চল থেকেছে। শুধু যখন সারদা বলেছে, "নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে ঠাকুরঝি?" তখন বলেছে, "কুড়ুল তো—বাবা সেই আট বছর বয়সে গলায় বসিয়ে রেখেছেন বৌ, নতুন আর কি হল?"

"তবু আরো একটা বছর থাকতে পেতে—"

"এতখানি জীবনে একটা বছর কম বেশীতে আর কি বা হবে বৌ? রাগের মাথায় তারা ওই আবার বিয়ে না কি বলেছে, তাই করলে তো, সারা জীবন সতীনের জ্বালায় জ্বলতে হবে।"

সারদা একটা নিঃশ্বাস ফেলে চুপ করেছে।

আর যখন ভুবনেশ্বরী কেঁদে কেঁদে মেয়ের হাত ধরে বলেছে, "আমাদের জন্যে তোর মন কেমন করছে না সত্য?"

তখন সত্য অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে উদাস গলায় বলেছে, "করছে কি করছে না সেকথা কি ঢাক পিটিয়ে বলতে হবে?"

"তবে স্বেচ্ছায় যেতে চাইলি কেন?"

"কেন কথার মানে নেই। নিজেরাই তো বল, 'মা বড় নির্বোধ কেঁদে কেঁদে মর, আপনি ভাবিয়া দেখ কার ঘর কর।' তবে?"

ভুবনেশ্বরী এতেও চৈতন্যলাভ করে নি, বলেছিল, "আমার তো তবু এপাড়া ওপাড়া—তোর মতন দশ বিশ ক্রোশ দূরে নয়।"

কথা শেষ হয় নি।

এই সময় আর বাঁধ রাখতে পারে নি সত্য, হাপুস নয়নে কেঁদে ফেলে বলেছে, "তা সে কথাটা সময়কালে ভাবনি কেন? একটা মাত্তর মেয়ে আমি তোমাদের, চোখছাড়া দেশছাড়া করে এক অ-গঙ্গার দেশে বিদেয় করে দিয়েছ, মায়া মমতা থাকলে পারতে তা? এই তো পুণ্যি মোটে একটা বছরের ছোট আমার চেয়ে, দিব্যি ড্যাংডেঙিয়ে বেড়াচ্ছে, আর আমায় সেই কোন কালে পরগোত্তর করে দিয়ে—", গলাটা ঝেড়ে নিয়ে কথাটা শেষ করেছে সে, "তা' না দিলে, পারতো কেউ আমায় গলায় গামছা দিয়ে টেনে নে যেতে? বাবা মেয়ে বলে মায়া করেন নি, 'গৌরীদান' করে পুণ্যি করেছেন, আমারও নেই মায়া মমতা। নির্মায়িক বাপের নির্মায়িক মেয়ে ", বলেই হঠাৎ মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কেঁদেছে দীর্ঘসময় ধরে।

তবু শ্বশুরবাড়ি যাওয়া রদ হয় নি।

রামকালী আর রামকালীর মেয়ে দুজনেই সমান। দুজনের মতেই 'কথা' যখন দেওয়া হয়ে গেছে, তখন আর নতুন বিবেচনা চলে না।

বাপের আড়ালে আর মায়ের সামনে আলোচনার ঝড় বয়েছিল।

এবারের পালা এই।

এবারে মোটামুটি সত্যর আড়ালেই। শুধু সত্ন বলেছিল, "ধন্যবাদ তোমাকে বৌ, নমস্কার। ছিছিক্কার দেব, না পায়ের ধুলো নেব, ভেবে পাচ্ছি না।"

সত্য এর উত্তরে নিজেই হেঁট হয়ে সত্নর পায়ের ধুলো নিয়ে হেসে বলেছিল, "দুগ্‌গা দুগ্‌গা, গুরুজন তুমি! ছিছিক্কারই দাও বরং! জন্মাবধি যা পেয়ে আসছি!"

সত্যর মধ্যে যে বিরাট সমুদ্রের আলোড়ন চলছে তা কি সত্য লোকের সামনে মেলে ধরবে? হ্যাঁ সমুদ্রের আলোড়নই। তবু বাপ চলে যাবার পর ভেঙে পড়ে নি সে! যথারীতি তার পরই তেল সলতে নিয়ে বসেছে পিদিম সাজাতে, তার পর ঘাটে গেছে গা ধুয়ে কাপড় কেচে মস্ত ঘড়াটা ভরে এনে দাওয়ায় বসিয়ে ভিজে কাপড়েই 'ঠাকুরঘরে' সন্ধ্যে দেখিয়ে, শাঁখ বাজিয়ে, তুলসী মঞ্চে জল দিয়ে শুকনো কাপড় পরে রাত্তিরের রান্নার ব্যবস্থা করতে বসেছে।

রাত্তিরে রান্নাটা সত্যই করে আজকাল। সত্নকে বলে বলে এ অধিকার অর্জ্জন করেছে সে।

রান্না করতে করতে যে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়েছিল তার, ফাল্গুনের শেষ থেকে বৈশাখের মাঝামাঝি আসতে কদ্দিন লাগে, কিছুতেই হিসেব মেলাতে পারেনি, তার কোনো সাক্ষী নেই।

কিন্তু সত্যর জীবনে কি সেই 'বৈশাখের মাঝামাঝি'টা দেখা দিয়েছিল আনন্দের মূর্তি নিয়ে? আলো ঝলমলে উজ্জ্বল মূর্তি নিয়ে?

নাঃ।

সে দেখা পায় নি সত্য।

পুণ্যির বিয়েতে যাওয়া হয় নি তার। ঠিক সেই সময় এলোকেশী রক্ত-আমাশায় পড়ে মরতে বসেছিলেন। আর কাঁথামুড়ি দিয়ে পড়ে থাকা মানুষটাই খিঁচিয়ে উঠে বলেছিল, "কী বললি সত্ন, বাপের বাড়ীর লোকের সঙ্গে যাবে বলে নাচছে হারামজাদী? বাপ যখন সোহাগ করে নিতে এসেছিল তখন যাওয়া হল না, এখন আমি মরতে বসেছি —! বলে দিগে যা যাওয়া হবে না, যে নিতে এসেছে ধুলো পায়ে বিদেয় হোক।"

মামী মরতে পড়েছে বলে যে সত্ন ছেড়ে কথা কইবে, তা কিন্তু করে নি। ঝঙ্কার দিয়ে বলেছিল সে, "তারা তোমার লোককে টাটের শালগেরামের মতন পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে বসিয়ে, খাইয়ে, মাখিয়ে, আর এক পোঁটলা জিনিস দিয়ে বুক ভরিয়ে বিদেয় দিল, আর তুমি তাদের লোককে ধুলো পায়ে বিদেয় দেবে? তা ভালো, মুখটা খুব উজ্জ্বল হবে। কিন্তু আমি বলি কি, দু' দশ দিনের জন্যে পাঠিয়েই দাও। ছেলেমানুষ—তাছাড়া শুনেছি ওই পিসিই চিরকালের খেলুড়ি—"

এলোকেশী চিঁচিঁ করে বলেছিলেন, "তবে বল যেতে। তুমিই বা থাকবে কেন? তুমিও বিদেয় হও। শুধু যাবার আগে একখানা ছুরি এনে আমার গলায় বসিয়ে দিয়ে যাও।"

সদু ছুরি দেয়নি, নিজেও বিদেয় হয় নি, শুধু সত্যর যাওয়ার ব্যবস্থা করছিল, কিন্তু মস্ত বাদ সাধল নবকুমার।

হঠাৎ "পুরুষকর্তার" ভূমিকা নিয়ে বেশ সোচ্চারে ঘোষণা করে বসল, "যাওয়া টাওয়া হবে না কারুর। আমার মা মরছে, আর লোকে এখন খুড়তুতো পিসির বিয়ের ভোজ খেতে ছুটবে! বলে দাও সদুদি, সে গুড়ে বালি! যাওয়া বন্ধ থাক।"

নবকুমারের ঘোষণায় কর্তা গিন্নী পরম পুলকে নির্লিপ্ত সেজে বললেন, "আমরা আর কি বলবো? নবা যখন—"

তবু সদু চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, "সব সময় বুঝি নবার কথাতেই ওঠো বসো তোমরা?"

কিন্তু কাজ হয় নি। এলোকেশী শাপমন্যি দিয়ে ভূত ভাগিয়েছিলেন।

সত্যবতী বলেছিল, "আমি বাবাকে কথা দিয়েছিলাম বিয়েতে যাবো—"

নবকুমার সদু মারফৎ সে কথা শুনে জবাব দিয়েছিল, "সমাজে আমাদের মুখটা হেঁট হয় এই যদি কেউ চায় তো যাক।"

সদু ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলে বলেছিল, "খুব তো বিজ্ঞর মতন কথা বলছিস, আসল ব্যাপারটা কি বল দেখি? বৌকে তো এখনও ঘরে পাসনি, তবু এত মনকেমন?"

সদুর এই কথায় হঠাৎ নবকুমারের কর্তাত্বি ঘুচে গিয়েছিল। 'যাঃ' বলে ঝপ্ করে সরে গিয়েছিল। বোধ করি একথাও ভেবেছিল, সদুদি কি অন্তর্যামী?

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যবতীই বেঁকে বসল। সদু যখন বহু চেষ্টায় রফা করেছিল, নেমন্তন্ন রক্ষা করতে নবকুমার যাবে সেই সঙ্গে বৌও যাবে তিনটি দিনের কড়ারে, বরকনে বিদেয় হবে ওরাও চলে আসবে, তখন সত্যবতী হঠাৎ বলে বসল, "দরকার নেই আমার এই একমুঠো ভিক্ষেয়। তিন দিনের মধ্যে তো পাড়া ভেসে যাক, বাড়ীর সব লোকগুলোর মুখও দেখে ওঠা হবে না, সে যাওয়ায় লাভ? লোকে শুনবে সত্য এসেছিল, সত্য চলে গেছে। ছিঃ।"

"দেখ কথা। ভাত পায়না—গয়না চায়! মুষ্টিভিক্ষেই যে জুটছিল না। তবু বিয়েটাও তো দেখতে পাবি?"

"থাক্, নাই দেখলাম। যার নেমন্তন্ন রক্ষের কথা সে যাক!"

"সে আর গিয়েছে!"

সদু মন্তব্য করে এবং ঠিকই করে। নবকুমার জোড়হাতে বলে, "রক্ষে কর বাবা!"

অতএব শেষ রক্ষে করেন নীলাম্বর।

তিনি রামকালীর প্রেরিত লোকের হাতে পত্র দিয়ে দেন, "নবকুমার বাবাজীবনের

গর্ভধারিণী মৃত্যুশয্যায়, সে কারণ কাহারও যাওয়া সম্ভবপর হইল না, পত্রবাহকের হাতে লৌকিকতা বাবদ দুই টাকা পাঠাইলাম!"

রামকালী সেই পত্র পেয়ে দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে আস্তে বলেছিলেন, "ও টাকা দুটো তুই জলপানি খাস রাখ্! ··আর শোন, বাড়ীর মধ্যে বলে দিগে যা সত্যর শাশুড়ী মরমর, তাই আসা সম্ভব হল না।"

তারপর যথানিয়মে বিয়ে হয়ে গেছে, বৈশাখ কেটেছে, জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় সব কেটে গেছে, রামকালী তাঁর জামাতা বাবাজীবনের গভধারিণীব মৃত্যু সংবাদ পান নি।

এই না পাওয়াটা কি একটা মরুভূমির রুক্ষ বাতাসের মত? যে বাতাস সমস্ত কোমলতা আর সরসতা মুছে নিতে পারে? নইলে রামকালী আস্তে আস্তে কেমন নীরস কঠিন হয়ে গিয়েছেন কেন? কেন বেহাইয়ের সঙ্গে ভদ্রতারক্ষা হিসেবে বেহানের কুশল সংবাদ প্রার্থনা করেননি? কেনই বা ভেবেছেন মেয়ে আনার জন্যে হ্যাংলামি করার মধ্যে অগৌরব আছে।

অন্তঃপুরের মধ্যে একখানি বিচ্ছেদ-ব্যাকুল মাতৃহৃদয় যে রামকালীব এই কাঠিন্যের সামনে মূক বেদনায় স্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে, সেটা বোঝবার ইচ্ছে হয় নি কেন রামকালীব?

রামকালী কি ভেবেছিলেন এবারও সেই এক ফোঁট্টা মেয়েটাই বাপের কাছে অহঙ্কারের পরিমাপ দেখিয়েছে? দৃঢ়তার অহঙ্কার, কাঠিন্যের অহঙ্কার! বলতে চেয়েছে, "দেখ, আমিও কম যাই না।" তাই অভিমানাহত পিতৃহৃদয়টি এই অন্ধকাবে দিশেহারা হয়ে চুপ করে থেকেছে? আর ভেবেছে, "দেখা যাক!"

কিন্তু কতদিন দেখবেন রামকালী?

অসমবয়সী এই দুটো মানুষের দাবা খেলার চালের অবসরে কত ব্যাপারই ঘটে গেল। যে ব্যাপারের একটা ঘটলেও মেয়ে বাপের বাড়ী ছুটে আসতে পরে। কিন্তু বলা তো চাই! মেয়ের বাপ গলায় বস্তর দিয়ে আবার আর্জি পেশ করবে তবে তো?

তা করছেন না রামকালী।

অতএব আরো একবার বর্ষা শরৎ শীত বসন্ত পার হয়ে গেল নিজস্ব নিয়মে!

ছাব্বিশ

নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে নিত্য নিয়মে সন্ধ্যা-গায়ত্রী, আহ্নিক পূজো ইত্যাদি সেরে গৃহদেবতা নারায়ণশিলার প্রসাদী বাতাসা দুখানি মুখে দিয়ে জল খেয়ে হাঁক দিলেন, "সদু, আজ আমার জলখাবার গোছাস নে, শরীরটা তেমন ভাল নেই।"

সদু দুটি চালভাজায় তেল-নুন মাখছিল মামার জন্যে। ঘরে ক্ষীরের তক্তি আছে, আছে নারকেল কোরা, ওতেই হবে। আজকাল আর রাত্রে বেশী কিছু খান না নীলাম্বর।

মামার কথায় বেরিয়ে এসে বলে সদু, "কেন, শরীরে আবার তোমার কি হল মামা?"

"কি জানি, কেমন খিদে নেই।"

বলে যথারীতি বেনিয়ানটি গায়ে এঁটে চাদর কাঁধে ফেলে নিত্যনিয়মিত রাত চরতে বেরিয়ে যান নীলাম্বর।

সত্যবতী ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলে, "শরীর খারাপ যদি, ঠাকুর আবার এই শীতের রাত্তিরে বেরোলেন কেন ঠাকুরঝি?"

সদু হাসি চেপে বলে, "কেন বেরোলেন, তুই নিজে জিগ্যেস করলেই পারতিস বৌ!"

"শোনো কথা, আমি কথা কই?"

"ও তা বটে।"

বলে সদু মুখ টিপে হাসে।

সত্য হঠাৎ সদুর হাত চেপে ধরে সন্দিগ্ধ স্বরে বলে, "আচ্ছা ঠাকুরঝি, ঠাকুর বেড়াতে বেরোলেই তুমি হাস কেন বল তো? কোথায় যান?"

সদু অমায়িক মুখে বলে, "ওমা, হাসি আবার কখন! যান বোধ হয় দাবা পাশার আড্ডায়।"

"তা শরীর খারাপ হলেও যেতে হবে? ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাত কোনতেই কামাই চলবে না? বারণ করতে পার না তোমরা?"

"বারণ? ও বাবা! ও আকর্ষণ যমের আকর্ষণের বাড়া।" বলে আর একবার হাসি চাপে সদু।

"আমি ঠাকুরের সঙ্গে কথা কইলে ঠাকুরের ওই মারাত্মক নেশা ছাড়িয়ে দিতাম।"

"তা সেই চেষ্টাই নয় করিস। নিজে বলতে না পারিস বরকে দিয়ে বলাস। সে উপযুক্ত ছেলে—বাপের এই বদ নেশা যদি ছাড়াতে পারে!"

সদু এবার হাসি চাপে না, হাসে।

কথাটা যে সত্যর মনে লাগল তা নয়, বরং সদুর কথার মধ্যে সে একটা প্রচ্ছন্ন কৌতুকেরই আভাস পেল। তার শ্বশুরের এই আড্ডার আকর্ষণটা যে ঠিক দাবা-পাশার আড্ডা নয়, এই সন্দেহই বদ্ধমূল হল।

রাত্রে তাই ঘরে ঢুকেই প্রথম ওই কথাটাই পাড়ে সত্য, "আচ্ছা, রোজ রাত্তিরে ঠাকুর কোথায় যান বল তো?"

হ্যাঁ, কিছুদিন হল রাত্রির অধিকার পেয়েছে সত্য। সদুরই প্রচেষ্টায়—আর সদুর প্রচেষ্টাটা নবকুমারের প্রতি করুণাতেই। নইলে বৌ তো কিছুতেই হেলে দোলে না।

নববধূর স্বপ্নে বিভোর নবকুমার অবশ্যই এ হেন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই থতমত খেয়ে বলে, "কোথায় আবার! তুমি জান না?"

"জানলে তোমায় শুধোতাম না।"

নবকুমার গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, "বাপ গুরুজন, তাঁর কথা নিয়ে আলোচনা না করাই ভাল।"

সত্য ভুরু কুঁচকে বলে, "গুরুজনের নিন্দে করাই না হয় ভাল নয়, গুরুজনের কথা মাত্তরই কওয়া দোষ?"

নবকুমার গম্ভীরতর হয়ে বলে, "তা এ তো নিন্দেরই কথা। বামুনের ছেলে হয়ে বাগদী পাড়ায় যাওয়া, তাদের হাতের পান জল খাওয়া, এ সব কি আর খুব গুণের কথা?"

বাগদী পাড়ায় যাওয়া!

তাদের হাতে পান জল খাওয়া!

সত্যকে যেন তার স্বামী হঠাৎ ধরে ধোবার পাটে আছাড় মারল।

সত্যও তাই থতমত খায়।

বলে, "ও কথার মানে?"

সত্যর বয়সের দিকে তাকায় না নবকুমার, বৌ সকল জ্ঞানের আধার হবে, এইটাই ধারণা তার। তাই উদাস উদাস গলায় বলে, "মানে যদি না বোঝো তো নাচার। বাপের সম্পর্কে পষ্ট করে আর কী বলব? কথায় বলে—পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম—! নইলে পথেঘাটে যখন উল্লাসী বাগদিনীকে দেখি, তখন কি আর রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে যায় না? কিন্তু কী করব, মনকে প্রবোধ দিতেই হয়, ভাবতে হয়, যতই হোক মাতৃতুল্য।"

পূজনীয় পিতৃদেব সম্পর্কে "কিছু বলব না" বলেও সবটুকুই বলে ফেলে নবকুমার নিশ্চিন্ত হয়ে স্ত্রীকে সমাদর করে কাছে টানতে যায়।

কিন্তু এ কী!

নিত্যকার প্রফুল্ল প্রতিমা সহসা প্রস্তর-প্রতিমায় পরিণত হল কেন? সত্যিই সত্যর সর্বশরীর যেন পাথরের মতই কঠিন হয়ে উঠেছে।

আর সেই শরীরের মধ্যেকার মনটা?

সেই মনটাও কি কাঠ হয়ে উঠল? অজানিত একটা ভয়ে?

হ্যাঁ, ভয়ই!

অনেক অনেকদিন আগে বালিকা সত্যর নিঃশঙ্ক চিত্ত যেমন ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল কাটোয়ার বৌ শঙ্করীর সম্পর্কে এক অজানা অন্ধকার-লোকের বার্তা শুনে, তেমনি ভয়ে। কিন্তু সেদিন ছিল শুধুই অন্ধকার, শুধুই ভয়। কিন্তু আজ সেই অন্ধকারের মাঝখানে জ্বলে উঠেছে একটা তীব্র বিদ্যুৎশিখার চোখ-ধাঁধানো আলো।

আজকের সত্য সেদিনের অবোধ বালিকা নয়, সংসারতত্ত্বের অনেক কিছুই তার জানা হয়ে গেছে। তাই ভয়ের গাঢ় অন্ধকারের মাঝখানে দপদপ করে জ্বলে জ্বলে উঠছে ঘৃণার বিদ্যুৎশিখা।

বার দুই চেষ্টার পর নবকুমার হতাশ হয়ে বলে, 'হলটা কি তোমার? সারাদিনের পর

দুটো সুখ-দুঃখের কথা কইব, একটু হাসি-আনন্দ দেখব এই আশায় হাঁ করে থাকি -"

সত্য রুদ্ধস্বরে বলে, "হাসি আনন্দ তো কুমোরবাড়ির হাঁড়ি-কলসী নয় যে, ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায়, হাসি আনন্দের মতন মন না থাকলে ?"

নির্বোধ নবকুমার পরিহাসের ব্যর্থ চেষ্টায় বলে, "তা এতে আর তোমার এত মন খারাপের কী আছে ? আমি তো আর কোনও বাগদিনীর সঙ্গে ভালবাসা —"

"থামো থামো—", তীব্র ধিক্কারের স্বর ছড়িয়ে পড়ে বন্ধ ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে।

শীতের রাতের সুবিধেয় একটু বা গলা খুলে কথা কওয়া চলে। আর সত্যি কথা বলতে, সত্য এমন কিছু লজ্জাবতী বৌও নয়। গলার শব্দ তার যখন তখনই শুনতে পাওয়া যায়।

ধিক্কার দিয়ে সত্য গায়ের কাঁথাটা টেনে গলা পর্যন্ত ঢেকে ওদিকে মুখ করে শুয়ে বলে, "ওই ঘেন্নার কথা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লজ্জা হয় না তোমাদের ? আমি কিন্তু এই পষ্ট বলে দিচ্ছি, এর পর থেকে যদি ঠাকুরকে আমি ছেদ্দাভক্তি না করতে পারি দুষো না আমায়।"

এর পর নবকুমার কথা কইবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে মনে মনে নিজেকে গালাগাল দিতে থাকে। ছি ছি, কী একটা গাধা সে। বললেই হত, "বাবা কোথায় যায় আমি জানি না।" বৌকে তো সে চেনে। ভাল মেজাজে আছে তো গঙ্গাজল, মেজাজ গেল তো আগুনের খাপরা।

বাবা, কী যে একবগ্‌গা মেয়ে। কবে এক দিন সে-ই নবকুমারের কী একটা মিথ্যে কথা ধরে ফেলে। একেবারে পাঁচ দিন কথা বন্ধ। অবশেষে নবকুমার নিতাইয়ের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে একটা শাস্তরের শ্লোক আউড়ে বোঝায়, পরিবারের সঙ্গে মিথ্যেকথায় পাপ নেই, তবে বৌয়ের মুখের কুলুপ খোলে। অবিশ্যি শাস্ত্রবাক্য মেনে নিয়ে নয়, মুখ খোলে প্রতিবাদের মুখরতায়।

সেদিন তেজের সঙ্গে বলেছিল সত্য, "থাক্ থাক্, আর শাস্তর আওড়াতে হবে না। যে শাস্তরে বলে মিথ্যেকথায় পাপ নেই, সে শাস্তরে আমার অরুচি। পরিবার বুঝি একটা মানুষ নয়, ভগবান বাস করে না তার মধ্যে ? এর পর আর তোমার কোন কথা মন-প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করব আমি ?"

সে যাই হোক, তবু ঝগড়ার সূত্রেও কথার দরজা খুলেছিল। এবার আবার কি না জানি হয় !

আর সত্য ?

সে ভাবছিল, ছি ছি, এই চরিত্র তার শ্বশুরের ! যাকে 'ঠাকুর' বলে সম্বোধন করতে হয় তাকে ! চরিত্রের অন্য বহুবিধ ত্রুটি সে দেখেছে শ্বশুরের, নীচতা ক্ষুদ্রতা স্বার্থপরতায় গিন্নী এলোকেশীর থেকে কিছু কম যান না তিনি, এযাবৎ সে সবই মনে মনে মেনে নিয়েছে সত্য, আর ভেবেছে ত্রিসংসারে আমার বাবার মতন আর কজন হবে ?

কিন্তু এ কী!

এ যে ঘৃণায় লজ্জায় সমস্ত রক্তকণা ছি ছি করে উঠছে। এই বয়সে এই প্রবৃত্তি! আর সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, এরা সে কথা সবাই জানে। অথচ! সত্য নির্বোধ সত্য ন্যাকা, তাই এতদিন দেখেও শ্বশুরের এই রাতচরার অর্থ কোনদিন আবিষ্কার করার চেষ্টা করে নি। সত্যরা ঘুমিয়ে পড়ার অনেক পরে যে তিনি বাড়ি ফেরেন এ কথা তো বরাবরই দেখেছে। তার মানে বোঝে নি। না না, এ শ্বশুরকে সে ভক্তি-ছেদ্দা করতে পারবে না, তাতে সত্যকে যে যাই বলুক।

হঠাৎ সত্যর সব শরীর আলোড়ন করে প্রবল একটা কান্নার উচ্ছ্বাস আসে, আর এই দীর্ঘকাল পরে বাপের ওপব তীব্র অভিমানে হৃদয় বিদীর্ণ হতে থাকে তার।

এ সংসারে এসে অনেক নীচতা অনেক ক্ষুদ্রতা অনেক হৃদয়হীনতা দেখেছে সত্য, সবই এদের অশিক্ষা কুশিক্ষার ফল বলে সহ্য করে নিয়েছে, কিন্তু আজকে এই একটা বুড়ো লোকের চরিত্রহীনতার নোংরামি তাকে যেন আছড়ে আছড়ে মারছে!

তাই, যে সত্য শত উৎপীড়নেও কখনো কাঁদে না, সে আজ কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে বলতে থাকে, "বাবা বাবাগো, দশটা নয় পাঁচটা নয়, একটা মাত্তর মেয়ে আমি তোমাব, না দেখেশুনে এমন ঘরেও দিয়েছিলে! এত তুমি বিচক্ষণ, আব এই তোমার বিচার!"

অনেকক্ষণ কেঁদে একসময় ঘুমিয়ে পড়ে সত্য।

কিন্তু রাতে কম ঘুমিয়েছে বলে সকালে বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে, এত সুখ তো আর বৌ-মানুষের ভাগ্যে ঘটে না। যথারীতি ভোরে উঠে স্নানশুদ্ধ হয়ে নারায়ণের ঘরেব গোছ করতে ঢুকল সত্য ভারাক্রান্ত মনে, আর অভ্যাসমত চন্দন-পাটাখানা টেনে নিয়ে চন্দন ঘষতে গিয়েই কথাটা একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ এনে দিল ওর মধ্যে।

সত্যর এই যত্ন করে চন্দন ঘষা, ফুল তুলসী বাছা, ধূপ-ধূনোয় ঘর মাত করে তোলার মূল্য কি?

এসব উপকরণ নিয়ে পুজো করবেন তো এখন নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে! তাঁর আবার কাশির ধাত বলে প্রাতঃস্নান করেন না, মুখ-হাত ধুয়ে তসর ধুতিখানা জড়িয়ে এসে পুজোর আসনে বসেন।

কিন্তু স্নান করলেই বা কি?

দেহ মন আত্মা সবই যার অশুচি, স্নানে আর কী শুদ্ধ হবে সে?

হাত গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকে সত্য হাঁটুতে মুখ রেখে। ফুল তোলা হয় না, তুলসী চয়ন হয় না।

অনেকক্ষণ পরে সৌদামিনী কি কাজে এদিকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলে, "কী হল বৌ, অমন করে বসে যে?"

সত্য অবশ্য নির্বাক।

সদু ব্যগ্রভাবে দরজার চৌকাঠ অবধি এগিয়ে এসে বলে, "শরীর খারাপ করছে?"

সত্য মাথা নাড়ে।

"তবে? বাপের বাড়ির জন্যে মন উতলা হচ্ছে বুঝি? সত্যি কতকাল হয়ে গেল—"

সত্য হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলে ওঠে, "বাপের বাড়ির জন্যে মন উতলা হতে কখনও দেখেছ ঠাকুরঝি, তাই বলছ?" সদু তার বড় ননদ, তবু এটুকু প্রশ্রয় তার কাছে আছে।

সদু হেসে ফেলে বলে, "তা দেখি নি বটে, তা হলে বরের সঙ্গে কোঁদল?"

"বকো না ঠাকুরঝি, অত তুচ্ছ ব্যাপারে তোমাদের বৌ হারে না। আমার মন ভাল নেই, আজ থেকে পুজোর ঘরের কাজ আর আমি করব না?"

সদু হঠাৎ এই অভাবিত ঘোষণায় স্তম্ভিত হয়ে বলে, "সে কী কথা বৌ?"

"ওই কথা ঠাকুরঝি। গুরুজনের কথায় বলতে কিছু চাই নে, কিন্তু ঠাকুর এসে পুজোর আসনে বসবেন মনে করে পুজোর গোছ করবার প্রবৃত্তি আমার হরে যাচ্ছে।"

সদু ভয়ের চোটে নিজের মুখখানাতেই একবার হাত চাপা দিয়ে আস্তে ব্যস্তে বলে, "ও কি সব্বনেশে কথা বৌ, মামীর কানে গেলে আস্ত থাকবি?"

সত্য মুখটা ফিরিয়ে শুকনো গলায় বলে, "এ সংসারে আর আস্ত থাকবার বাসনা আমার নেই ঠাকুরঝি।"

সদু প্রমাদ গণে।

এ আবার কী কথা রে বাবা! এর মূল কারণ যে সত্যর কালকের সেই শ্বশুর-সম্পর্কিত প্রশ্ন, তাতে আর সন্দেহ নেই, বোধ করি প্রশ্নের উত্তর তার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু তার সঙ্গে এই রণমূর্তির সঠিক সম্বন্ধ অনুমান করতে পারে না সদু।

পারবার কথাও নয়।

সদুর অনেক বয়স হয়েছে, এসব ব্যাপার তার কাছে কিছুই নয়। আশেপাশে অহরহ দেখতে দেখতে হাড়মাস কালি। কাজেই নিজের স্বামী-পুত্র ব্যতীত আর কারো চরিত্র-হীনতায় যে এত বিচলিত হওয়া সম্ভব, এ সদুর বোধের বাইরে।

কিন্তু অন্য বিষয়ে সদু বুদ্ধিমতী, তাই এ কথা নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি না করে বলে, "আচ্ছা বেশ, আমি চট করে চানটা সেরে এসে দিচ্ছি গুছিয়ে, তুমি চলে এস।"

"রাগ করো না ঠাকুরঝি, আমার মন কিছুতেই নিচ্ছে না তাই। তোমার কি কি কাজ আছে দেখিয়ে দাও, আমি করছি।" বলে সত্যিই পুজোর ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সত্য।

কিন্তু পুজোর ঘরের তুলসী-চন্দনের দায় না হয় সদু সামলালো, বধূ-জনোচিত আরও যে একটা কাজ রয়েছে সকালবেলাকার।

সে দায় কে সামলাবে?

সকালবেলা জল মুখে দেবার আগে শ্বশুর-শাশুড়ীর পদবন্দনা, সত্যর নিত্যকর্ম পদ্ধতির একটি অঙ্গ। এলোকেশীই শিখিয়েছেন সদু মারফত।

সত্যও অবশ্য সে শিক্ষা মেনেই চলেছে এযাবৎ।

কিন্তু আজ সত্যর ভয়ানক এক দুঃসাহসিক সংকল্প। 'আস্ত' তাকে না থাকতে হয় তাও ভাল, তবু ওই অপবিত্র মানুষটার পায়ের ধুলো মাথায় নেবে না সে।

গুরুজন ?

তা আর কি করা যাবে ? গুরুজন যদি ইতরজনের মত আচরণ করে ?

এলোকেশীও নিত্য সকালবেলা স্নান সেরে এসেই পূজোর ঘরে ঢোকেন। সাংসারিক কাজের তো কোন দায় নেই। সদু আছে, বৌ আছে। আর এলোকেশীর আছে দেব-দ্বিজে পরমা ভক্তি। নীলাম্বরও সারা সকাল ওইখানেই থাকেন, চণ্ডীর পুঁথি পড়েন, মহিম্নস্তব আওড়ান।

কর্তাগিন্নীর যাবতীয় বিশ্রম্ভালাপ এইখানেই। কারণ সে আলাপের যেটা প্রধান সময় সে সময়টা তো এলোকেশীর হাতের বাইরে। মশারি বক্তৃতার উপায় কোথা ?

তা এইখানেই রোজ একত্রে দুজনকে প্রণাম করে যায় সত্য।

কিন্তু আজ আর সত্যর দেখা নেই।

এলোকেশী কিছুক্ষণ পরে সদুকে ডেকে বিরক্তি-ব্যঞ্জক স্বরে বলেন, "আজ আব নবাব-নন্দিনীর দেখা নেই যে! গেলেন কোথা ?"

ব্যাপার বুঝতে সদুর দেরি হয় না এবং বৌয়ের এই বেখাপ্পা গোঁয়ে একটু বিরক্তই হয় সে, তবু সামলে নিয়ে বলে, "যাবে আর কোথায় ? ওই তো ওই দিকে—"

বলে কল্পিত 'ওদিকে'র দিকে তাকায় সদু।

এলোকেশী বলেন, "ছেদ্দায় অছেদ্দায় দৈনিক একবার শ্বশুর শাশুড়ীর পায়ে মাথাটা নোয়ান, আজ থেকে বুঝি সে বরাদ্দ বন্ধ ?"

নীলাম্বর মহিম্নস্তবের মাঝখানে উৎকর্ণ হয়ে ওঠেন। ততক্ষণে সদু হাওয়া। ওখানে গিয়ে ত্রস্তেব্যস্তে বলে, "কী রে বৌ, এখনো পেন্নামটা ঠুকে আসিস নি বুঝি ?"

সত্য হাতের কাজ সেরে উদাস মুখে বসেছিল। ঘাড় না ফিরিয়েই বলে, "না।"

"শাশুড়ীর টনক নড়েছে। যা যা, চট করে সেরে আয়।" যেন ভুলে গেছে সত্য, তাই মনে পড়িয়ে দেওয়া!

সত্য গম্ভীরভাবে বলে, "দু জনে একত্রে বসে, এক জনকে প্রেণাম করলাম, এক জনকে করলাম না, ভাল দেখায় না। ঠাকরুণ এদিকে আসুন, তখন হবে।"

সদু এবার বিরক্তি গোপন করে না। বলে, "তোর আবার বড্ড বেশী বাড়াবাড়ি বৌ! স্বভাব-দোষ আর কটা বেটাছেলের নেই? তালুই মশাইয়ের মতন দেবচরিত্র কি আর

সবাই ? তা বলে স্বভাব-দোষের অপরাধে শ্বশুরের পাওনা পেন্নামটা বন্দ হয়ে যাবে ?"

"বাবার কথা তুলে কাজ নেই ঠাকুরঝি, তবে আমার যাতে মন নেয় না, সে কাজ আমি করতে পারি না। এক হিসেবে উনি তো পতিত! শালগেরামের পুজো ওঁর দ্বারা হওয়া উচিত নয়।" বলে সত্য জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। বোধ করি মানসিক উত্তেজনাতেই।

সত্র কিছুক্ষণ আর বাকশক্তি থাকে না।

খানিক 'থ' বনে দাঁড়িয়ে থেকে আস্তে আস্তে বলে, "তোর মত লেখাপড়া শিখি নি বৌ, এত কথা বোঝবার ক্ষমতা নেই। আমি সার বুঝি, যে যা করে করুক, আমার কর্তব্য আমি করে যাব।"

"মনে অভক্তি পুষে ভক্তি দেখানোটাই কি কর্তব্য ঠাকুরঝি ?"

সদু চট করে এ কথার উত্তর দিতে পারে না, কি যেন একটা বলতে যায়, কিন্তু ইত্যবসরে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন বাঘিনী। মনের মধ্যে তাঁর সন্দেহের ধোঁয়া। যেন বুঝেছেন একটা কিছু হয়েছে।

বাঘিনীর মতই হাঁক করে রঙ্গস্থলে পড়েন তিনি, "কোত্যব্য অকোত্যব্যর কথা কি হচ্ছে রে সদু ?"

সদু চুপ।

সত্যও চুপ।

এলোকেশীই ফের প্রশ্ন করেন, "মুখে কথা নেই কেন ? কী শলা-পরামর্শ হচ্ছিল দু জনে শুনি ? তুই সদু আমার খাবি পরবি আর আমারই বৌ ভাঙাবি ? কবে বিদেয় হবি তুই আমার সংসার থেকে ?"

কথাটা নতুন নয়, এটাই এলোকেশীর কথার মাত্রা। প্রতিবাদ সদু কোনদিনই করে না, কিন্তু আজ হঠাৎ বিচলিত স্বরে বলে ওঠে, "শলা-পরামর্শ আমি তোমার বৌকে কোন দিন দিই নে মামী, সৎ পরামর্শই দিই। সত্যি-মিথ্যে বৌই বলুক।"

বৌয়ের অবশ্য শাশুড়ীর সামনে কথা বলবার কথা নয়। কিন্তু সত্য যখন তখনই নিয়ম লঙ্ঘন করে বসে, তাই আজও ফস করে বলে, "সে কথা হাজারবার সত্যি। ঠাকুরঝি আমাকে সৎ পরামর্শই দিতে এসেছিল। কিন্তু সে পরামর্শ আমার মনে 'নেয্য' বলে না ধরলে ? তুমি ইদিকে এসেছ ভালই হয়েছে"—বলে সত্য মুহূর্তে হাত বাড়িয়ে শাশুড়ীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলে, "যতই যা হোক, তুমি সতীলক্ষ্মী।"

সতীলক্ষ্মী অবশ্য প্রথমটা বেশ কিছু হকচকিয়ে যান, তারপর বলেন, "এ সবের মানে কি সদি ?"

"মানে বুঝতে আমিও অপারগ মামী," সদু বেজার মুখে বলে চলে যায়, "বৌ পারে তো নিজে বুঝিয়ে বলুক !"

সত্যিই আজ তার ভারী রাগ হয়েছে। এ আবার কী রে বাবা! তিলকে তাল করা! ডেকে অশান্তি টেনে আনা! বিশ্বভুবনে যে কথা কেউ কখনো শোনে নি, বলে নি, ভাবে নি, সেই কথা ওই একফোঁট্টা মেয়ের মাথায় আসেই বা কী করে! আর বুকের পাটা? এযাবৎ সত্যর অনেক বুকের পাটা দেখেছে সদু, দেখে মূর্ছিত হব হব হয়েছে, কিন্তু আজকের সঙ্গে যেন কোন দিনের তুলনাই হয় না।

তা সত্যি তুলনাই হয় না।

কারণ সদু চলে যেতে যেতেও শুনতে পায় সত্য বলছে, "বলতে মাথা কাটা গেলেও না বলে পারছি নে, ঠাকুরের পায়ের ধুলো মাথায় ঠেকাবার প্রবৃত্তি আর আমার নেই। যতদিন না জানতাম, ততদিন—".

কথার শেষাংশ শোনবার ক্ষমতা আর হয় না সদুর। ঝপ করে বিনা প্রয়োজনে একটা ঘড়া নিয়ে ঘাটে চলে যায়।

অনেকক্ষণ পরে ঘড়া কাঁখে নিয়ে আস্তে আস্তে খিড়কির দরজায় দাঁড়ায়। না, কোন শব্দ নেই, সব যেন নিথর। তবে কি একটা হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে? এটা শ্মশানের নিস্তব্ধতা?

দাওয়ায় উঠে কিন্তু অবাক হয়ে গেল সদু। দেখে মাঝের ঘরের দরজার কাছে গোটা দুই তিন গামছাবাঁধা পুঁটুলি, আর মামা-মামী দু জনে মিলে একখানা ছেঁড়া কাপড়ে বড় একটা ধামা বাঁধছেন। ধামা অবশ্য বোঝাই। কি আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এটা অপ্রত্যাশিত। সদুর বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

এই সময়টুকুর মধ্যে এত গোছগাছ হয়ে গেল? আর কেনই বা হল?

এঁরা কি তা হলে বৌয়ের সঙ্গে পেরে না উঠে দেশত্যাগী হচ্ছেন?

কথাটা তাই। এ আর এক অভিনব রূপ এলোকেশীর।

সদুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই এলোকেশী বলেন, "ননদ-ভাজে পুণ্যির সংসার কর সদু, পাপী-তাপীরা বিদেয় হয়ে যাচ্ছে।"

সদু ঘড়া নামিয়ে বসে পড়ে বলে, "মামী তুমি কি ক্ষেপেছ?"

"তা ক্ষেপলে জগৎ দুষতে পারবে না সদু! দশে-ধর্মে সবাইকে শুধিয়ে এস, এতেও যদি মানুষ না ক্ষ্যাপে তো কিসে ক্ষ্যাপে!"

"ও তো একটা পাগল! ওর কথা আবার ধর্তব্য!" গলা নামিয়ে বলে সদু।

"পাগল! আঁঝাড়া কেউটে! তুই আর বৌয়ের হয়ে ওকালতি করতে আসিস নি সদি! এত বড় একটা মান্যিমান মানুষ, পুতবৌয়ের ধিকারে জীবন বিসর্জন দিতে যাচ্ছিল। অনেক বুঝিয়ে নিবিত্তি করে, যাচ্ছি এখন গুরুপাটে। তার পর যা আছে অদৃষ্টে!"

জোরে জোরে গাঁঠরি বাঁধতে থাকেন এলোকেশী।

সত্যর ইচ্ছে করছিল যে ছুটে গিয়ে বৌকে বলে, "ভাল চাস তো পায়ে ধরে মাপ চাইগে যা।" কিন্তু জানে সে কথা বলা বৃথা। স্বয়ং বৈকুণ্ঠের নারায়ণ এলেও সত্যকে স্বমতে আনতে পারবেন না! অনেক গুণ আছে বৌয়ের, কিন্তু ওই এক মহৎ দোষ। জেদ! মেয়েমানুষের এত জেদ? আজকের ব্যাপারটাকে সদু যেন কোন দিক থেকেই সমর্থন করতে পারছে না।

তাই চেষ্টা সে এদিক থেকেই করে।

"তা বাড়ি ছেড়ে তোমরা যাবে কেন শুনি? বাড়ি কি তোমার ছেলে-বৌয়ের?"

"না হোক, যেখানে ওর মুখ দেখতে হবে সেখানে থাকব না, ব্যস।" এতক্ষণে মুখ খোলেন নীলাম্বর, এ কথাটি বলেন তিনিই।

"তা বাড়ি থেকে তো অমনিমুখে যাওয়া চলবে না, ভাত-ডাল চড়িয়েছি আমি। মুখে দিতে হবে।" এ যেন আপাততঃ সমুদ্রে বালির বাঁধ।

চড়িয়েছিল সত্যিই, কিন্তু রান্নাঘরের অবস্থা সম্পর্কে এখন আর কোন জ্ঞান নেই সদুর। কাঠ পুড়ে উনুন নিভে ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে নিশ্চিত।

সহসা নীলাম্বর একটা প্রবল হুঙ্কার দিয়ে মাটিতে পা ঠোকেন, "ভাত-ডাল! এ ভিটেয় আমি আর জলগ্রহণ করব ভেবেছিস তুই?"

সদুর বুকটা ধড়ফড় করে ওঠে। মামীর সঙ্গে সে অনেক কথা চালাতে পারে, কিন্তু মামা? উল্লাসীর হাতে পান-জল খাওয়া ইত্যাদি করে বহু ইতিহাসই তো তার জানা। তবু তো কই ভয় মরে নি। আর ওই বৌ, কোথায় পেল সেই ভয়-জয়ের মন্ত্র? যে মন্ত্রের জোরে স্বচ্ছন্দে বলা যায় 'উনি তো পতিত, শালগ্রামের পূজো করা ওঁর উচিত নয়।"

বেশী গভীরে ভাববার ক্ষমতা থাকে না সদুর, শুধু ভাবতে থাকে, নবাটা আবার আজকেই হাটে দেরি করছে। আর এই ভয়ানক দুর্দিনে কি হাটবারও হতে হয়?

সদু কি করবে?

গিয়ে বৌয়ের পায়ে ধরবে? না কি রান্নাঘরে শেকল তুলে দিয়ে কোথাও আঁচল বিছিয়ে শুয়ে থাকবে? তারই বা এত ভয় পাবার কী আছে? তার দোষে তো আর নবকুমারের মা-বাপ দেশত্যাগী হচ্ছে না!

সাহস দেখে কি সাহস জন্মায়?

দুঃসাহস দেখে দুঃসাহস?

তাই সে হঠাৎ অন্যমূর্তি ধরে। "ঠিক আছে, চুলোয় জল ঢেলে দিই গে" বলে চলে যায়।

আশ্চর্য, আশ্চর্য!

গিয়ে দেখে সত্য কি না রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে শাক বাছছে! মুখ দেখে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

সত্যর আর সহ্য হয় না। সে বলে ওঠে, 'ও-পিণ্ডির কাজ করে আর কী হবে? গিলবে কে? বাড়ির কর্তা-গিন্নী তো সংসার ত্যাগ করছে।"

সদুকে অবাক করে দিয়ে সত্য বলে, "সংসার ত্যাগ করা অত সোজা নয় ঠাকুরঝি! সংসার ত্যাগ করতে বসে কেউ সমগ্র সংসারটাকে পুঁটুলি বেঁধে নিয়ে যেতে চায় না। মিছে ভাবছ। কেউ কোথাও যাবে না। উনুনে আমি কাঠ ঠেলে দিয়েছি, তুমি দেখ এইবার।"

তা সত্যর কথাই ঠিক।

শেষ পর্যন্ত কর্তা-গিন্নী দেশত্যাগের সংকল্প বর্জন করে থেকেই গেলেন। শুধু ভাত খাবার সময় একটু বেশী সাধ্য-সাধনা করতে হল সদুকে।

থেকে গেলেন অবশ্য তাঁরা নবকুমারের নির্বেদে। নবকুমার দু জনের পায়ে মাথা খুঁড়ে "রক্তগঙ্গা" হতে চাইল, আর মায়ের পা ছুঁয়ে শপথ করল বৌকে শাসন করে দেবে।

ছেলের এতটা কাতরতা সহ্য করতে না পেরেই বোধ করি ওঁরা এ যাত্রায় যাত্রা স্থগিত রাখলেন।

আর এই এতদিনের মধ্যে কখনো যা করে নি নবু, আজ তাই করে বসল। দিনের-বেলায় কথা কয়ে বসল বৌয়ের সঙ্গে।

কিন্তু বৌকে কি বাগ মানাতে পেরেছিল নবু? বকে, খোসামোদ করে, পায়ে পড়তে গিয়ে? না, এ কথা সত্যর মুখ দিয়ে বার করাতে পারে নি নবকুমার, "আমার অন্যায় হয়েছে।" শুধু শেষ পর্যন্ত যখন নব আত্মঘাতী হবার ভয় দেখিয়েছিল, তখন সত্য বলে উঠেছিল, "ঘেন্না ধরে যাচ্ছে সবেতেই। পুরুষ না হয়ে মেয়েমানুষ হয়ে জন্মাও নি কেন তুমি, এই বিধাতার রহস্য। বেশ, ছেদ্দাশূন্য পেন্নামে যদি তোমাদের এত দরকার থাকে তো, করব কাল থেকে সেই ন্যাকরা।"

রাত্রে অবশ্য নবকুমারের ভিন্ন রূপ!

সুন্দরী তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধের দুঃসহ কষ্ট বহন করবার মত শক্তি তার নেই, তাই যেচে বলে, "মা-বাপকে শুনিয়ে শুনিয়ে একটু শাসন করতে হল, নইলে বলবে, "ছেলে বৌকে মাথায় তুলে রেখেছে।"

"আজ আমার কথা কইতে মন নেই, ক্ষ্যামা দাও।"

বলে পাশ ফিরে শুয়েছিল সত্য।

আর বেশ কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলেছিল, "আমি কলকাতায় যাব।"

নবকুমার চমকে বলে, 'কলকাতায়! কলকাতায় যাবে তুমি? এতক্ষণে বুঝতে পারছি মাথাটাই বিগড়েছে তোমার।"

"কেন, মাথা না বিগড়োলে কলকাতায় যায় না কেউ? তোমার মাস্টারের মাথা খারাপ?"

"মাস্টার? মাস্টারের সঙ্গে তোমার তুলনা? তিনি বেটাছেলে, একা যাচ্ছেন একা আসছেন, গিয়ে বন্ধুর বাসায় উঠছেন, তুমি এ সবের কোন্‌টা করবে?"

সত্য তীব্রস্বরে বলে, "বেটাছেলে আমি নয়, তুমি তো? তুমি যেতে পারবে না? তোমার সঙ্গেই যাব। বাসা করে থাকবো।"

নবকুমার স্তম্ভিত হয়ে বলে, "তোমার সঙ্গে সঙ্গে আমি তো উন্মাদ হই নি! মা-বাপ দেশ-ভিটে ছেড়ে, যাব কি না কলকাতায় বাসা করতে? কেন শুনি?"

"কেন তা শুনবে? দেখতে যাবে তোমাদের এই বারুইপুরের বাইরেও আরও জগৎ আছে।"

"দেখে আমার দরকার?"

সত্য চরম ধিক্কারের স্বরে বলে, "দরকার? কি দরকার, তাও তোমাদের এই বারুইপুরের গর্তয় পড়ে থেকে বোঝার ক্ষ্যামতা হবে না।"

নবকুমার এ কথার অর্থ ধরতে পারে না, একটা জোরালো যুক্তিই জোর দিয়ে বলে, "মেয়েমানুষ কলকাতায় যাবে? জাতধর্ম কিছু আর থাকবে তা হলে?"

সত্য গম্ভীর স্বরে বলে, "ঠাকুরের যদি এখনো জাত থেকে থাকে, শালগেরাম নাড়ার অধিকার থেকে থাকে তো, আমারও কলকাতায় গিয়ে জাতের হানি হবে না।"

"আবার সেই এক কথা, পুরুষের আড়াই পা বাড়ালেই শুদ্ধ, মেয়েমানুষের তাই হবে? চামড়া দেওয়া কলের জল খেতে হবে তা জান?"

"খেতে হলে খাব। সেখানে আরও দশ-জন ব্রাহ্মণ-সজ্জনের যা গতি হচ্ছে তাই হবে। কেন, হালদারবাড়ির মেজ ছেলে যায় নি কলকাতায়?"

"বৌ নিয়ে যায় নি।"

"তা মরা বৌকে কি আর শ্মশান থেকে তুলে নিয়ে যাবে?"

"হালদারদের ছেলে গেছে চাকরি করতে—"

সত্য দৃঢ়ভাবে বলে, "তুমিও তাই যাবে।"

"আমি?" উপহাসের হাসি হেসে ওঠে নবকুমার, "আমি যাব কলকাতায় চাকরি করতে?"

"কেন নয়? তুমি যত ইংরিজি শিখেছ, এ তল্লাটে আর কেউ শিখেছে?"

অন্যদিন হলে নবু অবশ্যই স্ত্রীর স্বীকৃতিতে বিগলিত হত, কিন্তু আজ তার প্রাণে সে সুখ নেই, নেই সে সুর। তাই বলে, "শুধু বিদ্যে থাকলেই তো হবে না—"

সত্য জোড়া ভুরু কুঁচকে বলে, "তা আর কি থাকা দরকার?"

বিপদের মুখে ফস্ করে সত্যি কথাই বলে বসে নবু, "দরকার সাহসের।"

সত্য এক মিনিট চুপ করে থেকে ঝুপ করে শুয়ে পড়ে বলে, "আচ্ছা, সেটা আমি যোগান দেব।"

কিন্তু এত বড় আশ্বাসেও কি বিশেষ কাজ হল? হল না। নবকুমার ক্রুদ্ধ প্রশ্ন করলো, "পরের চাকরী করতে যাবই বা কেন? ঘরে আমার ভাতের অভাব? দেখে শুনে চালাতে পারলে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে কাটিয়ে দিতে পারি তা জানো? কি জন্যে করবো দাসত্ব?"

সত্য গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'বসে খাবো' এ বাসনা ঘোচাবার শিক্ষে পেতেই যাওয়া দরকার।'

চলল অনেক কথা কাটাকাটি। আর—বহুক্ষণ কথা কাটাকাটি করে নবকুমার এই কথাই ব্যক্ত করল, "আমার দ্বারা হবে না এই পষ্ট বলে দিচ্ছি।"

সত্য ও দৃপ্তস্বরে বলে উঠল, "আমিও পষ্ট বলে রাখছি, কলকাতায় আমি যাব যাব যাব। মেয়েমানুষ কলকাতায় গেলে আকাশের বজ্জর এসে মাথায় পড়ে কিনা তা দেখব।"

কিন্তু সে দৃশ্য কবে দেখতে পেয়েছিল সত্য? তখুনি কি?

না, দেখতে তাঁর আরো অনেকদিন লেগেছিল!

ভিজে ন্যাকড়াকে তাতিয়ে শুকিয়ে সে ন্যাকড়ায় সলতে পাকিয়ে তবে প্রদীপ জ্বালতে হলে, সময় একটু লাগবে বৈ কি। ততদিনে সত্য দুটি ছেলের মা হয়েছে।

সাতাশ

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা বসন্তের অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে বন্দী এই নিয়মতান্ত্রিক পৃথিবী রাজ্যটার প্রধান প্রজা মানুষগুলোর জীবনের কিন্তু না আছে নিয়মের নিশ্চিন্ততা, না আছে শৃঙ্খলার আশ্বাস। তাকে না বিধাতা, না প্রকৃতি কেউ কোনদিন দেয়নি নিশ্চিত নিয়মের ভরসা।

তাই সহজ সুস্থ মানুষও রাতে ঘুমুতে যাবার আগে স্থির বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারে না সকালের আলো সে দেখবেই! বলতে পারে না, তার ভরা বসন্তের মাঝখানে বজ্রের অভিশাপ নেমে আসবে না, শরতের সোনালী আলোকে মুছে দিয়ে শুরু হয়ে যাবে না অপ্রতিরোধ্য ধারা-বর্ষণ!

না, জোর করে এসবের কিছুই বলতে পারে না মানুষ। সে জানে না কখন তার আশায় গড়া সুখের ঘরখানি তচনচ করে দিয়ে যাবে অতর্কিত মৃত্যুর নিষ্ঠুর থাবা, অথবা, সে ঘরকে বিকল করে দিয়ে যাবে আকস্মিক দুর্ঘটনা অথবা দুরারোগ্য ব্যাধি। কে বলবে এই অনিয়মের দেবতা কোথায় বসে আছেন তাঁর অমোঘ নিয়ম নিয়ে।

তবু রামকালী কবরেজের সংসারের উপর্যুপরি দুর্ঘটনাগুলো দেশসুদ্ধ লোককে যেন হতচকিত করে দিল।

আগুন লেগে বাইরের বড় আটচালা দুখানা ভস্মীভূত হয়ে যাওয়াটাতেও কেউ অতটা বিস্ময় বোধ করে নি, কারণ হুতাশনের ক্ষুধাটা ভাগ্যের মার হলেও তার মধ্যে মানুষের অসতর্কতা অথবা মানুষের কারসাজির ছাপটা স্পষ্ট দেখা যায়। তা ছাড়া রামকালীর উপর ভাগ্যের মারটা সেই প্রথম।

না, রামকালীর আটচালার আগুন লাগার মধ্যে কেউ শত্রুর কারসাজি আবিষ্কার করতে যায় নি। ওটা যে নিতান্তই অসতর্কতার ফল এটা সবাই বুঝেছিল। ব্যাপারটা এই—

এ বাড়ি থেকে আগুন সংগ্রহ করে নিয়ে যাওয়া, কাছাকাছির প্রায় প্রতিটি পড়শীরই নিয়ম। বরাবরই সেসব বাড়ির কেউ না কেউ নিজেদের প্রয়োজন মাফিক সময়ে এসে এ বাড়ির রান্নাঘর থেকে একখানা জলন্তকাঠ নিয়ে যায়। ঘরে তাদের উনানে শুকনো নারকেলপাতা, খটখটে ঘুঁটে, অথবা সরু করে কুচনো কাঠ-কুটো ডালপালা সাজানোই থাকে, জ্বলন্ত কাঠখানা এনে তাতে সংযোগ করে দিতে পারলেই মিটে গেল কাজ।

রামকালীর বাড়ীতে নিত্য সকালে তিন-চারটে করে উনুন জ্বলে। অতএব পড়শীরা নিজেদের সংসারে আবার আগুন জ্বালাবার অযথা হাঙ্গামার কথা ভাবতে যাবে কেন? কাজটা তো ঝঞ্ঝাটের। শোলার কাঠি বানাও, চকমকি ঠোকো, সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তার চাইতে -! তা' সেদিনও যথারীতি ওই ওবাড়ির ঘোষালগিন্নীর বিধবা মেয়ে তরু প্রহরখানেক বেলা নাগাদ একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এবাড়ি থেকে নিজেদের বাড়ি যাচ্ছিল, হঠাৎ মাথা বরাবর খোলা আকাশে একটা দাঁড়কাক বিশ্রী করে ডেকে উঠল!

দাঁড়কাকের ডাক অপয়া, এ আর কে না জানে, ঘোষালের মেয়ে তরুও জানত। তা ছাড়া এও জানা ছিল তার যেদিন বৈধব্যদশা ঘটে, সেদিন কোথায় যেন অনবরত দাঁড়কাক ডেকেছিল! তার উপর আবার আজ চতুর্দশী।

তরুর বুকটা কেঁপে উঠল। তাড়াতাড়ি পা বাড়ালো।

কিন্তু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলে যেতে গিয়েও আবার বাধা পেতে হ'ল। কাকটা আরও নেমে এসে প্রায় তরুর মাথার উপরে একটা পাক খেয়ে ডেকে উঠল—কঃ! বুকটা হিম হয়ে হিতাহিতজ্ঞান লোপ পেয়ে গেল তরুর, কী কাজের কী পরিণাম খেয়ালে এল না, হাতের সেই জ্বলন্ত কাঠটা সে কাকটার উদ্দেশে ছুঁড়ে মারল।

বলাবাহুল্য আগুন দাঁড়কাকের পালকাগ্রেও লাগল না, পড়ল গিয়ে রামকালীর বারবাড়ির বড় আটচালার মাথায়। বৈঠকখানা বাড়ি, চণ্ডীমণ্ডপ, এসব রামকালীর পাকা কোঠা, কিন্তু কাজে-কর্মে পুজোআর্চায় বেশী লোক সমাগমের প্রয়োজনে প্রকাণ্ড দুখানা খড়ের আটচালা তিনি করিয়ে রেখেছিলেন, পাশাপাশি, গায়ে গায়ে। অগ্নিদেবতার জোড়া নৈবেদ্য হল সে দুখানা।

তরু শুধু অসতর্কই নয়, অন্যমনস্কও।

কাঠখানা কোথায় গিয়ে পড়ল, অথবা পড়ে কি করল, সে সম্পর্কে খেয়ালমাত্র না করে

তরু আবার এ বাড়িতে ফিরে এসে আর একখানা জলন্তকাঠ নিয়ে বাড়ি ফিরল। কি কাজ করেছে সে, টের পেল তখন যখন লেলিহান আগুনের প্রচণ্ড শিখায় আর অজস্র ধোঁয়ায় আকাশ ভরে গেছে, আর পাড়াসুদ্ধ লোকের চিৎকার আকাশ ছাড়িয়েছে।

বোকা তরু এই বলে বুক চাপড়াতে উদ্যত হয়েছিল, "ওগো এ সর্বনাশ যে আমিই ডেকে আনলাম", তরুর কাকা ইশারায় "চুপ চুপ" বলে থামিয়ে দিল তাকে।

কিন্তু আগুনকে থামানো গেল না। আর থামাবার উপায়ই বা কি? পুকুর থেকে ঘড়ায় করে জল এনে দূরে থেকে ছুঁড়ে মারা বৈ তো নয়।

সে চেষ্টায় লাভ নেই।

রামকালী গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষণা করলেন "আগুনে জল দেবার দরকার নেই, তাতে আরো ছড়াবে! চণ্ডীমণ্ডপের দেয়ালে জল ঢালো। যাদের যাদের কাছাকাছি বাড়ি, তারা আপন আপন বাড়ির দেয়াল ঠাণ্ডা কর।"

তবু সকলে যখন হায় হায় করতে করতে বাড়ি ফিরল, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। রামকালী চাটুয্যের মত নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক অগ্নিতেজা মানুষটার চালায় আগুন লাগল কেন, এই নিয়ে জল্পনাকল্পনার শেষ রইল না।

কিন্তু এ তো সবে প্রথম।

এর কয়েক দিন পরেই দীনতারিণী ঘাট থেকে চান করে এসেই হঠাৎ "শরীর কেমন করছে" বলে পক্ষাঘাত হয়ে পড়লেন।

পক্ষাঘাত পাতক রোগ, দীনতারিণীর তা অজানা নয়। ছেলের দিকে তাকিয়ে তিনি অশ্রু-কলঙ্কিত চোখের ইশারায় কাতর আবেদন করলেন তাঁকে তাড়াতাড়ি "পার" করতে।

রামকালী শুধু কপালের ঘাম মোছার ছলে একবার কপালে হাত ঠেকালেন।

দিন তিনেক পরেই মারা গেলেন দীনতারিণী।

না, অতবড় বদ্যি হয়েও মাকে বাঁচাতে পারলেন না বলে কেউ দুষল না রামকালীকে। বরং দীনতারিণীর ভাগ্যিকে "ধন্যি ধন্যি" করতে লাগল সবাই। বলল, খুব গিয়েছে বুড়ি! ভুগল না, ভোগাল না, এমন মৃত্যুই তো কাম্য!"

তবে এ কথা বলতে ছাড়ল না, "বছরটা একটু সাবধানে থেকো রামকালী, একে অগ্নির কোপ, তায় মহাগুরু নিপাত, সময়টা তোমার ভাল যাচ্ছে না।"

পাড়ার বয়োজ্যেষ্ঠরাই বলেন, এছাড়া কার সাহস?

রামকালীর কাকা দাদা তো সাধ্যপক্ষে তার সামনে আসে না। সামনে আসে রাসু, কবরেজী শেখে কাকার কাছে। তবে প্রায়ই হতাশ করে কাকাকে। রামকালী কখনো ভ্রূকুটি করেন, কখনো হেসে ফেলে বলেন, "তোর কিছু হবে না রাসু!"

কিন্তু শুধুই কি রাসুর?

কুঞ্জর কোন ছেলেটার-ই বা কি হয়েছে? পাঠশালায় গিয়ে অনাসৃষ্টি অনাসৃষ্টি খেলা উদ্ভাবন করা ছাড়া "মাথা" আর খেলতে দেখা যায় না রাসুর কোনো ভাইটারই। রাসু তো তবু ছাত্রবৃত্তি পাস করেছে, টোলেও পড়েছে কিছু দিন। তাছাড়া চেহারাটা সুকান্তি আর বেশ মার্জিত ভাব।

অনেকটা কাকার ধাঁচের রং, গড়ন তার। তাই সামনে দাঁড়ালে একটা মানুষের মত দেখতে লাগে! আরগুলো তো তাতেও না।

তাছাড়া কবরেজী বিদ্যে মাথায় না ঢুকুক, অনেক ব্যাপারেই রাসু রামকালীর ডান-হাত।...এই যে দীনতারিণীর শ্রাদ্ধের অতবড় কাণ্ডটা, রাসু সামনে না থাকলে রীতিমত বেগ পেতে হত না কি রামকালীকে? কারণ স্বপাক হবিষ্যান্ন, ত্রিসন্ধ্যা স্নান ইত্যাদি করে বহুবিধ নিয়মের পাকে বাঁধা থাকায় নিজে তো ঠিক "মুক্তজীব" ছিলেন না।

রাসু 'কাজকর্মের' ব্যাপারে যথেষ্ট পারগ।

'দানসাগর' করলেন রামকালী মাতৃশ্রাদ্ধে, সেই সমারোহে সত্য এল। নবকুমারও এল।

রাসুই আনতে গেল।

ঠাকুমা মারা যাওয়ার খবরে সত্যর প্রাণটা আকুলিব্যাকুলি করছিল, রাসুকে দেখে যেন স্বর্গের চাঁদ দেখল। এ সময় যে বাবা রাখু কি গিরি তাঁতিনীকে পাঠান নি, খুব ভাল করেছেন।

সাড়ে তিন বছর পরে এই প্রথম বাপের বাড়ি যাওয়া।

কিন্তু সত্যর দেহের অন্তঃপুরে তখন যে আর এক "প্রথম" সম্ভাবনার সূচনা দেখা দিয়েছে, সে কি সত্য জানত না? না বুঝতে পারে নি?

তা' সত্য না পারুক, সদু পেরেছিল বুঝতে। কিন্তু রণচণ্ডী মামীকে এই সূচনা মাত্রতেই জানাতে সাহস করেনি সদু। ভেবেছিল যাক আর গোটাকতক দিন, তেমন প্রবল লক্ষণ ধরা পড়লে আপনিই জানবে বুড়ি।

এই সময় দীনতারিণীর বার্তা।

সদু ভয় পেল। এ সময় এই!

ভাবল, মামীকে বলি কি না বলি।

কিন্তু বলা আর হয়ে উঠল না।

বলতে দিল না তার মমতা। এ খবর শুনে যদি এলোকেশী আবার বৌয়ের "যাত্রান্ন" বাদ সাধেন!

আহা বেচারা এই এতদিন এসেছে, একনাগাড়ে আছে। আপন বুদ্ধির দোষেই হোক আর যার দোষেই হোক, আছে তো! এই ছুতোয় যেতে পারে তো যাক। ভগবান ভালই করবেন।

তবে যাত্রাকালে চুপি চুপি সাবধান করে দেয় সত্যকে, "বাপের-বাড়ি যাচ্ছিস, দীর্ঘকাল পরে যাচ্ছিস, কিন্তু সাবধান! বাঁধা-গরু ছাড়া পাওয়ার মত লাফ ঝাঁপ করিসনে। আমার বাপু সন্দ হচ্ছে—"

সত্য একটু ভাবনার মত তাকিয়ে অস্ফুটে বলে ফেলেছিল, "কি ?"

"এই দেখ। পষ্ট করে না বললে হবে না বুঝি? এ দিকে তো পাকা গিন্নী! সন্দ হচ্ছে পেটে বাচ্চা কাচ্চা কিছু এসেছে, বুঝলি? সাবধানে থাকা দরকার।"

ভয় না, আহ্লাদ? ভয়, ভয়, সম্পূর্ণ ভয়। তবে এক অদ্ভুত ভয়!

নিজের মধ্যে কী এক অজ্ঞাত রহস্য বাসা বেঁধেছে, একথা ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে।

গরুর গাড়ীর ভিতরে বসে, ঘোমটার মধ্যে বারবার নবকুমারকে দেখে সত্য আর মানুষটাকে যেন নতুন মনে হয়।

এ খবর ও পেলে?

কী না জানি হবে সেই অবস্থাটা।

গরুরগাড়িতে বেশ ঝাঁকুনি লাগছিল।

এক সময় তাই বলেও ফেলে চুপি চুপি, "পাল্‌কী আনলে না কেন বড়দা?"

রাসু অপ্রতিভ মুখে বলে, "খুব কষ্ট হচ্ছে না রে? আমি বলেছিলাম, তা খুড়োমশাই বললেন—", একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেলে রাসু, "বললেন, কাজের বাড়ীতে চারিদিক থেকে আত্ম কুটুম্ব আসবে, সবাইকে তো আর পাল্‌কী যোগানো যাবে না!" আমি তাও অবিশ্যি বলেছিলাম, সবাই আর জামাই তো সমান নয়? তাতেও বললেন, 'জামাইও তো বাড়িতে একটি নয় রাসু?' ওঁকে আর কে বোঝাবে বল?"

সত্য অন্যমনস্কে 'চুপি চুপি'টা ভুলে বেশ স্পষ্ট গলাতেই বলে ওঠে, "তা এর আর বোঝবার কি আছে বড়দা, সত্যিই তো! জামাই সবাই সমান। নিজের জামাইটি বলে সারপর করলে চলবে কেন? বরং পুণ্যির নতুন বিয়ে হয়েছে " কথা শেষ না করেই নবকুমারের উপস্থিতি স্মরণ করে জিভটা কেটে চুপ করে। ··

কিন্তু সমুদ্রে বালির বাঁধ কতক্ষণ? আবার একসময় কথা কয়ে ওঠে সে।

কত প্রশ্ন, কত ঔৎসুক্য!

এই সাড়ে তিনটে বছরে কত ঘটনা ঘটেছে, কত জন্ম-মৃত্যুর লীলা খেলা হয়েছে, কত ছোট্ট মানুষ বড় হয়েছে, কত আইবুড়োর বিয়ে হয়ে গেছে, সেই সব তথ্যগুলো তো কম মূল্যবান নয়, জানতে হবে না সে সব?

"তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি বড়দা!"

সহাস্য মুখে বলে সত্য।

আর নবকুমার বিগলিত বিস্ময়ে সেই হাস্যোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। বিস্ময়? তা বিস্ময় বৈ কি! সত্যর এই মুখ সে কবে দেখেছে? সত্যর মুখটা যে হেসে উঠলে এমন অপূর্ব লাবণ্যময় দেখায় সে কথাই বা কবে জেনেছে?

তা সত্যর সেই প্রশ্নে রামুও হেসে উঠে বলে, "আমি আবার এই কদিনে বদলাবো কি?"

ক'দিন!

সত্যর যে মনে হচ্ছে কত যুগযুগান্তর পার হয়ে গেছে। সেই কথাই বলে সে বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে, "কদিন। বল কি বড়দা, সাড়ে তিনটি বছর— ক'দিন হলো?"

"সাড়ে তিন বছর?" রামু আবার হেসে ওঠে, বলে, "সাড়ে তিন বছর হয়ে গেল এর মধ্যেই? তা ওই শুনতেই তিনটে বছর, কোথা দিয়ে কেটে গেছে।"

সত্য নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "তা তোমাদের আর না কাটবে কেন? স্বাধীন সুখী মানুষ! আমাদেরই মনে হচ্ছে যেন আর একটা জন্ম পেরিয়ে এলাম।"

তা বাপের ভিটেয় পা দিয়েও ঠিক সেই কথাই মনে হয় সত্যর। যেন আর একটা জন্ম পার হয়ে এল।

কিন্তু কোথায় এল?

ঠিক যে জায়গাটা থেকে চলে গিয়েছিল, সেই জায়গাটায় কি? সেটা কি এখনো তেমনি পড়ে আছে? ফাঁকা খালি?

হয়তো ছিল, হয়তো আছে, কিন্তু এই জন্মান্তর পার হয়ে আসা মেয়েটাকে কি আর এখন সেই খাঁজে ধরবে? কোনো মেয়েকেই কি ধরে? গোত্রান্তরের সঙ্গে সঙ্গেই কি অন্তরের বিরাট একটা পরিবর্তন হয় না?

যে মেয়েটা হয়তো উঠতে বসতে বকুনি খেয়েছে আর নিতান্ত অবহেলায় খেয়ে খেলিয়ে বেড়িয়েছে, সে হয়ে ওঠে আদরের অতিথি, সমীহর কুটুম্ব! কোনখানে তবে আশ্রয় পাবে সেই মেয়েটা?

এত বড় কাজের বাড়ী, তবু ওরা সত্যর সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে! সারদা, ভুবনেশ্বরী, শিবজায়ার নাতনী তুটো, এমন কি মোক্ষদা পর্যন্ত! সত্য কি খাবে, সত্য কোথায় শোবে, সত্য কোথায় বসবে, সত্যর কিছু চেয়ে না পাওয়া হল কিনা, এই সব। ভুবনেশ্বরীর তো কথাই নেই। তার শাশুড়ী গেছেন, মহা অশৌচ, ছুঁয়ে নেড়ে কিছু করার ক্ষমতা নেই, তবু বলে বলেই যা পারে।

ব্যাপারটা স্বস্তিকর নয়, এ যেন প্রতিমুহূর্তে মনে পড়িয়ে দেওয়া, "তুমি কুটুম, তুমি অতিথি।"

এক সময় ঝেঁজেই উঠল সত্য।

মার ওপরই উঠল।

"কী চাও বল তো তোমরা? এক্ষুনি আবার শ্বশুরবাড়ি চলে যাই? বাবাঃ, তোমাদের

এই আদরের ঠ্যালা সামলানো আমার কর্ম নয়। বাড়ীতে তো আরো 'শ্বশুরতি' মেয়ে এসেছে, কই তাদের নিয়ে তো এত হৈ চৈ করছ না?"

কথাটা সত্যি।

আরো শ্বশুরঘর করা মেয়ে এসেছে। পুণ্যি তো এসেইছে, কুঞ্জর দুই গিন্নী-বান্নী মেয়ে এসেছে, শিবজায়ার মেয়ে এসেছে, রামকালীর যে-ছোটখুড়ো নেই তাঁর তিন তিনটে মেয়ে এসেছে, কুঞ্জর সহোদর বোনের মেয়েরা এসেছে, তারা ঝাঁকের কৈ হয়ে রয়েছে। শুধু সত্যকে নিয়েই—।

ভুবনেশ্বরী মেয়ের এই ঝঙ্কারে অপ্রতিভ হয়ে বলে, "তারা সবাই পেরায় পেরায় আসে। তোর মতন কে এমন ঘরবসতে গিয়ে একেবারে তিন চারটে বছর—"

কথা শেষ করতে পারে না ভুবনেশ্বরী।

সত্য মার এই রুদ্ধবাক মুখের দিকে তাকিয়ে একটু নরম হয়ে বলে, 'বুঝলাম! কিন্তু আছি তো দিন কতক! কাজ মিটতেই তো পালাচ্ছি না, সে কথা হয়ে গেছে ওখানে। তখন কোরো মেয়েকে আদরগোবর! এখন তোমার শাশুড়ীর ছেরাদ্দ, এখন মানায় মেয়ে নিয়ে সোহাগ করা?"

ভুবনেশ্বরী সজল চোখে বলে, "ক' দিন থাকবি তুই-ই জানিস—"

"থাকবো বাবা, মাস দুই অন্ততঃ থাকবো, হয়েছে সে কথা। ··চল পুণ্যি, আমাদের সেই বটতলার খেলাঘরটা দেখে আসি।"

বলে পুণ্যির হাতটা চেপে ধরে প্রায় টেনেই বার করে নিয়ে যায় তাকে সত্য খিড়কির দোর দিয়ে।

ওদের ওই "খেলাঘরটা" বাস্তবিকই একটি মনোরম ঠাঁই। স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে প্রশংসা অর্জন করতে পারে ওরা।

প্রকাণ্ড একটা বুড়ো বটগাছ ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে খানিকটা জায়গা এমন একটি ছায়া-পূণ আশ্রয়গৃহ নির্মাণ করে রেখেছে যে, দু এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেলেও বোধ করি সেই গৃহবাসীর মাথা ভিজবে না। রোদের তো কথাই নেই, প্রায় প্রবেশ নিষেধ তার।

এইখানেই সত্যদের শৈশবের খেলাঘর। তা শ্বশুরবাড়ী যাবার ক'দিন আগে অবধিও খেলেছে সে। এখনই পরিত্যক্ত ভূমি। এখনকার ছোটদের অন্য খেলাঘর।

নিকোনো চুকোনো গাছের গোড়াটা এখন ধুলো ভর্তি হয়ে থাকলেও সারি সারি ছোট্ট ছোট্ট উনুনগুলো এখনও পুরনো স্মৃতি বহন করে পড়ে আছে ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে।

কী যত্নেই এই উনুনগুলি পেতেছিল ওরা!···

কিছুক্ষণ গাছের গোড়ায় বসেই থাকল সত্য চুপ করে। ঠিক এই মুহূর্তে যেন কথা কইবার শক্তি নেই। অগত্যা পুণ্যিও চুপ।

অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সত্য বলে, "আশ্চয্যি দেখেছিস পুণ্যি, সবাই বদলে গেছে, সব বদলে গেছে, অথচ এই তুচ্ছ জিনিসগুলো অবিকল আছে।"

পুণ্যিও নিঃশ্বাস ফেলে, "সত্যি যা বলেছিস!"

সত্য আস্তে আস্তে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, "এই উনুনটা পুঁটির, এটা খেঁদির, এটা টেঁপির, এটা গিরিবালার, এটা সুশীলার, এটা তোর, তাই না?"

নিজের কথাটা আর বলে না।

পুণ্যি বলে সে কথা, "এইটে তোর ছিল। দেখ ভাঙা হাঁড়ি-কুঁড়িগুলোও রয়েছে পাঁশকুড়ে!"

হ্যা, খেলাঘরের 'পাঁশকুড়'ও একটা ছিল বৈকি! সবই তো থাকা প্রয়োজন। পাঁশকুড়, পুকুর ঘাট, গোয়াল, ঢেঁকিঘর, অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে কেন? বড়রা যে 'খেলাঘর' নিয়ে মত্ত, ওরা তো তারই নিখুঁৎ অনুকরণ করবে। ওদের মাটির আর কাঠের পুতুলগুলোও ঘাটে বাসন মেজেছে, ক্ষার কেচেছে, ঢেঁকিতে পাড় দিয়েছে, রেঁধেছে, কুটনো কুটেছে, বাটনা বেটেছে, ছেলে ঘুম পাড়িয়েছে, কর্ত্তব্যে তিলমাত্র ফাঁকি দিতে পায় নি। তাদের কাজের ছুতোয় মুখর হয়ে উঠেছে এই বুড়ো বটতলা।

বসে থাকতে থাকতে—হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সত্য।

বলে, "চ পুণ্যি, আর দেখতে ইচ্ছে করছে না, বুকের ভেতরটা কেমন মুচড়ে মুচড়ে উঠছে।"

তা' পুণ্যির মধ্যেও সেই মোচড় পড়ছিল, সেও বলে, "চ। আর মায়া করা বিড়ম্বনা। যেদিন পরগোত্তর করে দূর করে দিয়েছে, সেদিন থেকেই তো সব ঘুচেছে। মেয়ে জন্মটাই ছাই।"

সত্য আর একবার বড়সড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে 'মেয়ে জন্মটাই ছাই নয় রে পুণ্যি, আমাদের বিধেন দাতারাই ছাই। পরগোত্তর করে দিয়ে জন্মের শোধ পর করে দেবার হুকুম ভগবান দেয় নি। এই যে তুই আমার চিরকালের বন্ধু, তোর বিয়েতে আসা হল না, এ দুঃখু কি মলেও যাবে? যাবে না। তবু তো এলাম না। এসব কি ভগবান বলেছে?"

তা নিঃশ্বাস ফেলছে বলে যে, হাসছে না গল্প করছে না, পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে না, সেকথা ভাবলে ভুল হবে, সেটা যথারীতিই চলছে। গল্পের সমুদ্র, কথার পাহাড়। পাড়ার কোন মেয়েটা শ্বশুরবাড়ী গেছে, কোন মেয়েটা বাপের বাড়ী আছে, তার তল্লাস করে বেড়ানো আর গল্পে মুখর হয়ে ওঠা, এটা প্রবল প্রবাহেই চলছে। নিঃশ্বাসটা নিভৃতে।

একান্ত নিভৃতে, মনের অন্তরালে রয়েছে সেই নিঃশ্বাস। এত পূর্ণতার মধ্যেও কোথায় যেন একটা সুগভীর শূন্যতা, সেই শূন্যতার ওপরই বুঝি পা রাখতে হয়েছে সত্যকে, তাই পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পাচ্ছে না।

সে শূন্যতা—সত্য আর এদের নয়। এ সংসার সত্যর নয়।

বিরাট কাজের বাড়ীতে কে কোথায় ঠাঁই পেয়েছে কে জানে। মেয়েরা মেয়ে-মহলে, পুরুষরা বার-মহলে। কোঠাঘরে সব জামাই কুটুম, আর নবনির্মিত আটচালার নীচে জ্ঞাত-গোত্তর।·· নবকুমার যে কোনখানে আছে সত্য জানে না, মাঝে মাঝে সেটা মনে পড়ছে। আহা, মানুষটা মুখচোরা লাজুক, কোথায় কি ভাবে আছে কে জানে! এসে অবধি তো দেখা হয় নি।· ·বাবা সহস্র কাজে বেড়াচ্ছেন, বাবার এমন সময় নেই যে জামাই নিয়ে তদারকী করে বেড়াবেন! যা করে পাঁচজনে।···কি ভাবছে ও আমাকে কে জানে।

থেকে থেকেই সেই মানুষটার কথা মনে পড়ছিল। মনকেমন মনকেমন ভাবটা ছিল, আবার একটু অহঙ্কারী অহঙ্কারী দুষ্টু-বুদ্ধিও ছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল একবার লোকটাকে ডেকে বলে, "দেখছ তো? সবই দেখছ। বুঝতে পারছ, তোমার মা যতই হেলাফেলা করুন, নেহাৎ হেলাফেলা ঘরের মেয়ে আমি নই।"

কিন্তু এসব বলার সুযোগ কোথা?

বিয়েবাড়ী নয় যে সবাই রঙ্গরসে মাতবে। মাতৃদায় উদ্ধার বলে কথা। তাছাড়া অনেকের মধ্যে একজন হলেও দীনতারিণীর পোষ্টটা বাড়ীর গিন্নীর ছিল বৈকি, ছোট ননদদের তিনি যতই ভয় করে চলে থাকুন, আর ছেলেকে যতই সমীহ করে আসুন, সবাই জানতো গিন্নী বলতে দীনতারিণীই। তা গিন্নীর জায়গা শূন্য হয়ে গেলে সবাইয়েরই ফাঁকা ফাঁকা লাগে বৈ কি। খেটে খেটেও জেরবার হচ্ছে সবাই, এর মাঝখানে কার আর একথা মনে উদয় হবে, সত্যর সঙ্গে সত্যর বরের দেখা করিয়ে দিই কোনো ছলছুতোয়! তা'ছাড়া চাতক পক্ষীর অবস্থা তো নয় সত্যর? এই দীর্ঘকাল নিশ্ছিদ্র বরের ঘর করে এসেছে সে। সত্যর বরকে সত্যর দেখতে ইচ্ছে হবে, এ চিন্তা তাদের মনে উদয় হবার কথা নয়।

উদয় হচ্ছে এক ভুবনেশ্বরীর।

কিন্তু সে তো সব দিকেই বন্দিনী। একে তো শাশুড়ী মরার নিয়ম নীতির দায়, তার উপর মেয়ের ভয়ের দায়' ওরকম চেষ্টা করতে গেলে সত্য যে ক্ষেপে উঠবে না, এ প্রতিশ্রুতি কে দেবে ভুবনেশ্বরীকে?

কিন্তু সত্যর মা কি সত্যকে সবটা বুঝে উঠতে পেরেছে?

পারে নি।

সত্য যে ছলছুতো খুঁজে বেড়াচ্ছিল এ তার ধারণার বাইরে।

তা অবশেষে হয়ে গেল যোগাযোগ।

নিয়মভঙ্গের যজ্ঞি মিটতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে গেছল, সত্য পুকুরঘাট থেকে আঁচিয়ে একবার নিজের মামার বাড়ী পর্যন্ত গিয়েছিল মামীদের সঙ্গে, জোরপায়ে ফেরার সময় নেড়ুর সঙ্গে দেখা।···

নেড়ু দাঁড় করাল।

মুখটা রহস্যে উদ্ভাসিত করে বলল, "এই সত্য, তোর ভূতের ভয় আছে ?"

"ভূতের ভয় !"

"হুঁ-হুঁ ! গেছো ভূতের ভয় ! নির্ঘাত আছে তাই না ?"

"নির্ঘাৎ আছে—", সত্য মুখ নেড়ে বলে, "এলেন আমার গণৎকার ঠাকুর !"

"নেই ভয় ? ঠিক বলছিস ? এই ঝিকিমিকি বেলায় তোদের সেই বটগাছতলায় যেতে পারিস ? যেতে আর হয় না, হুঁ ! জনমনিষ্যি যায় না সেখানে।"

"ওরে আমার কে রে ! কেউ যায় না সেখানে ? তুই যাস না তাই বল। তুইও কম খেলিস নি সেখানে, তবু মায়া মমতা নেই ! আমাদের কথাই আলাদা, আমি আর পুণ্যি যাই নি যেন !"

"গিয়েছিলি ?"

"নিয্যস ! তুই হঠাৎ এমন হ্যাকা হচ্ছিস কেন রে নেড়ু ? পেঁচার চোখ গুনতে যেতাম না আমরা ?"

"আহা সে তো আগে। এখন শ্বশুরঘর করে করে সাহস হরে যায়নি ?"

"ইল্লিরে ! গেলেই হ'ল। চল না দেখিয়ে দিচ্ছি, একপো'র রাত অবধি বসে থাকতে পারি তা জানিস ?"

বলে গটগট করে এগিয়ে যায় সত্য নির্ভয়ে নিশ্চিন্তে, এই 'কনে দেখা' আলোতেও যেখানটা প্রায় গভীর অন্ধকার !

কিন্তু কে ওখানে !

কে ! কে !

প্রায় চেঁচিয়েই উঠছিল সত্য, সামলে নিল নেড়ুর ভয়ে। শুনতে পেলে আর রক্ষে রাখবে ? সত্যর ভয়ের কথা ঢাক পিটিয়ে বেড়াবে। কিন্তু লোকটা যে এদিকেই আসছে। পালাবে সত্য ? উঁহু, এ নির্ঘাত নেড়ুর কোন কারসাজি, তা নইলে—

হঠাৎ একটা সম্ভাবনায় পা থেকে মাথা অবধি একটা তড়িৎপ্রবাহ বহে যায়, আর পরক্ষণেই সম্ভাবনাটা প্রত্যক্ষের মূর্তিতে দেখা দেয়।

"ইস্ ! তুমি ! তুমি এখানে যে—"

জেনে বুঝেও বিস্ময়ের ভান করে সত্য।

নবকুমার হতাশ গলায় বলে, "কেন আর ? তোমারই দর্শন আশায়। উঃ বাপের বাড়ী এসে একেবারে ডুমুরের ফুল হয়ে গেছ, লোকটা মরল কি বাঁচল খোঁজও নেই !"

সত্য পুলক গোপনের ব্যর্থ চেষ্টায় হেসে ফেলে বলে, "আহা, কথার কি ছিরি রে ! আমিই তো খোঁজ করে বেড়াব !"

"তা একবার দেখা তো দেবে ? আমি হতভাগা যাই অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে—"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। নেড়ু ছাড়া আর কারুর কানে গেছে নাকি ?"

"নাঃ। শুধু ও—"

"যাক তবে ঠিক আছে। নেড়ু বিশ্বাসঘাতক নয়। তা বলি দরকারটা কি ?"

"দরকার!" নবকুমার আরো হতাশ গলায় বলে, "বিনি দরকারে বুঝি নিজের পরিবারকে একটু দেখতে ইচ্ছে করে না ? তোমার মতন পাষাণ হৃদয় তো নয়!"

"পাষাণ হৃদয়! তা বটে!"

সত্য অমুচ্চস্বরে হেসে ওঠে। তারপর বলে, "কেমন লাগছে ?"

"খুব ভালো।" নবকুমার অকপটে বলে, "মাইরি বলছি স্বপ্নেও ভাবি নি শ্বশুরবাড়ীটা আমার এমন! কী ঐশ্বয্যি, কী দব্দবা! দেশটাও চমৎকার! মা গঙ্গা দেখলে প্রাণ জুড়োয়!"

সত্য একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, "তবেই বোঝ, মেয়েমানুষকে কতটি ত্যাগ করতে হয়!"

"তা' সত্যি!"

নবকুমার আরও একবার অকপটে স্বীকার করে, "এসে অবধি সেই কথাই ভাবছি। বলতে গেলে তুমি তো একটি রাজকন্যে! সে তুলনায় আমি—"

আবেগের মাথায় বেশী কিছু বলে ফেলার আগে সত্য সামলে দেয়, "দুগ্গা-দুগ্গা ও কি কথা! তুমি হলে স্বামী গুরুজন! রাজকন্যের কথা নয়, তবে প্রাণটা হু হু করতে পারে কিনা ?"

"একশোবার পারে, হাজারবার পারে।"

বলে নবকুমার অসমসাহসিকতায় ভর করে হাতটা বাড়িয়ে সত্যর কাঁধে একটা হাত রাখে।

তা সত্য কি এই স্নেহস্পর্শে অথবা প্রেমস্পর্শে পুলকিত হয় না? হয়। তবু মেয়েলি সাবধানতায় চুপিচুপি বলে, "এই, সরে দাঁড়াও, কে কমনে দেখে ফেলবে, এরপর আর তা'হলে জনসমাজে মুখ দেখাবার জো রইবে না। খিড়কির পুকুর বৈ গতি থাকবে না!"

নবকুমার কিন্তু এ ভয়ে ভীত হয় না। বরং আরও একটা হাত স্ত্রীর আরও একটা কাঁধে দিয়ে ঈষৎ আকর্ষণের ভঙ্গীতে বলে, "কেন পরপুরুষ না কি ?"

"না হোক! লোক লজ্জা বলে একটা জিনিস তো আছে ?"

"সে যদি বলো, এখানে নিরালায় চুপিচুপি দেখাতেই নিন্দে হতে পারে। কিন্তু তোমার ভাই তো বলেছে এখানে কেউ আসে না।"

"তা' আসে না বটে!" সত্য ঈষৎ নরম স্বরে বলে, "ওই জন্যেই তো আম বাগান জাম বাগান ছেড়ে এই বটবৃক্ষর ছায়াটুকু বেছে নিয়েছিলাম খেলাঘর পাততে। বটের কিছুই তো লোকের কাজে লাগে না, না ফল, না ফুল, না পাতা, না কাঠ। তাই মানুষের পা পড়ে না। শুধু ছায়ার আশ্রয়।"

সন্ধ্যের অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে—

নবকুমার হঠাৎ একটা কবি কবি কথা বলে বসে, "তা সত্যি! তোমার বাবাকে—ইয়ে শ্বশুরঠাকুরকে দেখলে আমার এমনি বটবৃক্ষের কথা মনে আসে। বিরাট বটবৃক্ষ!"

সত্য চমকে ওঠে।

সত্য অভিভূত হয়।

আর তারই আবেগে হঠাৎ 'লোক লজ্জা' ভুলে নবকুমারের হাত দুটো দু হাতে চেপে ধরে বলে, "সত্যি বলছ? আমার বাবাকে তোমার ভাল লেগেছে?"

"ভাল লাগার কথা বলতে পারছি না, বলছি ভক্তির কথা! সমীহর কথা। বিরাট বটবৃক্ষ দেখলে যেমন সমীহ আসে—"

"কথা কয়েছ বাবার সঙ্গে?"

"কথা? ওরে বাস। তিনি কোথায়, আমি কোথায়? কত ব্যস্ত মানুষ, দূরে থেকেই দেখছি—"

সত্য আবছা বিহ্বল গলায় আস্তে বলে, "বাবাকে সবাই দূরে থেকেই দেখে। সবাই! মা পর্যন্ত, শুধু এই সত্য মুখপুড়িই—"

লোকলজ্জা আরও বিস্মৃত হয়ে সত্য নবকুমারের তৃষিত বক্ষে মাথাটা রাখে।

নবকুমারও অবশ্য বেশ কিছুটা সময় এই মধুর আস্বাদের সুযোগ গ্রহণ করে নেয়, তারপর চুপি চুপি বলে, "নতুন জামাই, প্রথম এলাম এমন একটা শোক-দুঃখুর উপলক্ষে। কারুর বে-থায় এলে অবিশ্যিই আমাদের দুজনকে ঘরে দিত, কি বলো?"

সত্য এই মেয়েলি কথাটা শুনে হেসে ফেলে। হেসে বলে, "দিলেই বুঝি নিতাম?"

"নিতে না?"

"পাগল। ঘটে লজ্জা নেই বুঝি? 'বর' বস্তুটা শ্বশুর-বাড়ীতেই ভাল বুঝলে?"

নবকুমার অভিমানভরে বলে, "বুঝলাম! তাই এই হতভাগা চলে যাবার পর আরও দু'মাস ভাল থাকা হবে—"

সত্যর মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে যায়। দু মাস কি কত মাস কে জানে! পিস্‌ঠাকুমা তো সেই মোক্ষম কথাটা বলে বসেছে। আসার সময় সদুদি যা বলে ভয় জন্মিয়ে দিয়েছিল।...ক্রমশঃ সত্যও যেন অনুভব করছে শরীরের মধ্যে কোথাও একটা অস্বস্তি বাসা বেঁধেছে।...মনে হচ্ছে যেন গলার কাছটাতেই প্রধান অস্বস্তি। কেবলই যেন ভেতর থেকে ঠেলা মারছে, খাদ্যবস্তু নামতে চায় না, উঠে আসার তাল করে।...ওই খাওয়া থেকেই ধরে ফেলেছে পিস্‌ঠাকুমা। আর সঙ্গে সঙ্গে নানাখানা বিষয়ের উপদেশ দিয়ে জব্দ করেছে। তার মধ্যে প্রধান নিষেধ ছিল, 'সাঁঝ-সন্ধ্যেয় আগানে-বাগানে গাছতলায় ছাঁচতলায় না যাওয়া।'

তা' সত্য নিষেধটা মানছে ভাল।

হঠাৎ একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে সত্য। বলে, "যাই, রাত হয়ে যাচ্ছে, বকবে!"

"এখানে আবার বকবে কে?" নরকুমার নিশ্চিন্তে বলে, "এখানে তো তুমি মহারানী! নেড়ু আমায় সব বলেছে। কী আদুরে মেয়ে তুমি কী লাঞ্ছনাতেই পড়েছ—"

সত্য এবার নিজস্ব দৃঢ়তায় ফেরে।

দৃঢ়স্বরে বলে, "ওসব কথা বলছ কেন? যার যা নিয়তি! শ্বশুরঘরে বকুনি ঝকুনি আর কোন মেয়েটার নেই? ছাড়ো ও কথা। যাচ্ছি—"

"নিতান্তই যাবে? কি আর বলব? আবার কবে দেখা হবে?"

"তা কি করে বলি?"

"আমি তো এই সামনের বুধবার চলে যাব। তার মধ্যে একবার হবে না?"

"আচ্ছা দেখি!"

নবকুমার আস্তে আস্তে বলে, "ইচ্ছে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই! কী বাড়ী! সদাই সরগরম। আর আমাদের বাড়ীতে যেন—"

"তা হোক! নিজের যা তাই ভাল!···সত্য আবার দৃঢ়স্বরে বলে, "তুমিও কালে ভবিষ্যতে দশের একজন হবে, তোমার সংসারও এমনি সরগরম হবে।"

"আমার? হুঃ! সে যাক, কবে আবার গরীবের ঘরে যাবে?"

সত্য ঝপ করে বলে বসে, "বলতে পারছি না, ছমাস একবছরও হতে পারে!"

'ছমাস এক বছর!" নবকুমার বিহ্বলভাবে বলে, "তার মানে?"

"আছে মানে।" বলে হঠাৎ ত্বরিত গতিতে দৌড় দেয় সত্য।

যদিও ঘরে পরে সবাই বলছে "কী বড়ই হয়েছে সত্য!" বলছে "রূপ যেন ফেটে পড়ছে, কী বাড়বাড়ন্ত গড়নই হয়েছে—", তথাপি দৌড় ঝাঁপের কমতি নেই তার।

তবে পিসঠাকুমার সামনে আর দৌড়ঝাঁপ চলবে না মনে হচ্ছে।

নবকুমার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আকাশ পাতাল চিন্তা করে। তারপর সিদ্ধান্তে আসে, আর কিছুই নয়, মেয়ে অনেক দিন শ্বশুরঘর করছে, মা বাপ এবার হাতে পেয়ে আটকে ফেলবে।

হেসে খেলে পাড়া বেড়িয়ে বেড়াচ্ছিল সত্য, এখানে আসার প্রাক্কালে সদু যে সন্দেহ প্রকাশ করেছিল সেটাকে চোখ বুজে অস্বীকার করে। ভিতরে যদি কোনো অস্বস্তির আলোড়ন অজানা এক ভয়ের ছায়া ফেলেও থাকে, বাইরের আলোড়নে সেটা মুছে গেছে।

চট করে কারো সন্দেহও আসে নি, কারণ সত্য কতক্ষণই বা কার চোখের ওপর আছে? বৃহৎ যজ্ঞের আনুষঙ্গিক জের নিয়ে ব্যস্ত সবাই। হঠাৎ একদিন সন্দেহ জাগল

ভুবনেশ্বরীর। যে মানুষটার চোখদুটো সহস্র কাজের মধ্যেও সত্যর চোখমুখের কাছাকাছিই আছে।

সন্দেহ জাগতেই চুপি চুপি সারদার কাছে ব্যক্ত করল ভুবনেশ্বরী, আর সারদাও লক্ষ্য ঘনীভূত করে নিঃসংশয় হল।

ব্যস, মুহূর্তে এ মুখ থেকে ও মুখ, এ কান থেকে ও কান!···গ্রামসুদ্ধ মহিলা খবরটা জেনে ফেললেন একটা বেলার মধ্যেই। মহিলাদের মারফৎ পুরুষরাও।

কিন্তু রামকালীর কানে উঠতে কিছুটা দেরী হয়েছিল। কারণ মাতৃ-বিয়োগের পর থেকে আর বাড়ির ভিতর শুচ্ছিলেন না রামকালী। পুরোপুরি কালাশৌচের কালটা যে এই নিয়মেই চলবেন তিনি, সেটা যেন অদৃশ্যকালিতে লেখা হয়ে গিয়েছিল।

ভুবনেশ্বরী তবে কোন্ উপায়ে এই ভয়ঙ্কর আনন্দের বার্তাটা তাঁর কানে পৌঁছে দেবে?

উপায় হচ্ছে না, অথচ এই অপরিসীম আনন্দের ভারটা একা একা বহন করাও কঠিন মনে হচ্ছে।

দুদিনই দুবছর হয়ে ওঠে ভুবনেশ্বরীর।

তবু এ ইচ্ছেও হচ্ছে না, আর কেউ বলে ফেলুক। এই মধুর সুন্দর ভয়ঙ্কর রমণীয় খবরটি ধীরে ধীরে একটি উপহারের মত ধরে দেবে স্বামীকে, এই বাসনায় মর্মরিত হয়ে ওঠে ভুবনেশ্বরী।

কিন্তু নিজ কণ্ঠে সে উপহার দেওয়া আর ঘটে উঠল না তার। রামকালীর খেতে বসার সময় হঠাৎ মোক্ষদা দুম্ করে বলে বসলেন। বললেন, "বললে তোমার মাথায় থাকবে কি না জানি না, তবু বলা কর্তব্য তাই বলছি, দাদামশাই হতে চললে!"

রামকালী চমকে তাকালেন।

কথাটা যেন ঠিক বোধগম্য হল না।

মোক্ষদা এসব পছন্দ করেন না। অতএব তিনি আরও স্পষ্ট প্রখর ভাষায় বলে ফেলেন, বাংলা বৈ উর্দু ফার্সি বলছি না বাবা, বলছি সত্যর ছেলে-পুলে হবে।'

রামকালী সহসা 'বিষম' খেলেন।

জলের গ্লাসটা মুখে ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখলেন, তারপর ঘাড় নিচু করে যেন পাতের ভাতের মধ্যে কথাটার অর্থ খুঁজতে লাগলেন।

না, কথা তিনি এখন কইবেন না। আচমন করে বসেছেন। কালাশৌচের বছরটা রীতিমত বিধিনিষিধের মধ্যে থাকতে চান। এসবে বিশ্বাসী তিনি কোনদিনই নন, কিন্তু মানুষের মন যে কতবড় জটিল জিনিস, দীনতারিণীর মৃত্যুতে তা আর একবার দেখা গেল রামকালীর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আচারনিষ্ঠা দেখে!

কথা কইবেন না। অতএব উত্তরও মিলবে না।

তবু এই সময়টুকু ছাড়া রামকালীকে পাচ্ছে কে ? কাজেই যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই সময়েই রামকালীর কর্ণকুহরে ঢালার পক্ষে প্রকৃষ্ট।

'বিষম' খাওয়া শেষ হলে মোক্ষদা আর একবার বলেন, 'আমি এই জানিয়ে দিলাম, এখন তোমার গুণবতী বেয়ানকে জানাবার কি ব্যবস্থা করবে তা দেখ! মাগীকে তো দিয়ে থুয়েও মন পাওয়া যায় না। এক ঝাঁকা মণ্ডা, আর এক জালা তেল দিয়ে পাঠাও কাউকে, তার সঙ্গে পাদ্য-অর্ঘ।'

রামকালী খেয়ে চলেছেন, ওদিকে ভুবনেশ্বরীর চোখে জল। যে খবর শুনে রামকালীর আহ্লাদে প্রাণ উথলে ওঠার কথা, সেই খবর দেওয়া হল কিনা তাঁর মৌনকালে। কেন খাবার সময় ছাড়া আর বলা যেত না ?

তাছাড়া ভুবনেশ্বরীর আশা আকাঙ্ক্ষা আর উদ্বেগ আনন্দে কম্পমান হৃদয়টি আর দল মেলে বিকশিত হয়ে উঠতে পেল না।

অবিশ্যি এত সুচারু করে কি আর ভাবতে পারল ভুবনেশ্বরী ?

তা'নয়।

শুধু চোখের সেই জলের ধারাটা যেন অবিরল হয়ে উঠল নানা অনুভূতি আর অব্যক্ত বেদনার ধাক্কায়। ··

মোক্ষদা শেষ অস্ত্রটি ত্যাগ করেন, "আর একটা কথা না বলে বাঁচছি না, মেযে তো তোমার এতদিন শ্বশুরঘর করেও কিছুমাত্তর বদলায় নি। যে ধিঙ্গী সেই ধিঙ্গী। সাঁঝ সন্ধ্যে মানেনা, ডিঙানো মাড়ানো গেরাহ্য করে না, আগান বাগান, ঘাট, পুকুর ছিষ্টি মাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমি বারণ করতে গিয়ে শুধু হাস্যাস্পদ হয়েছি মাত্তর। এখন তুমি দেখ যদি শাসন করতে পারো।"

রামকালীর কি আজ গলা দিয়ে ভাত নামছে না ? তাই এত দেরি হচ্ছে খেয়ে উঠতে ?

মোক্ষদার এত অবসর নেই যে বসে থাকবেন, "বড়বৌমা দেখো শ্বশুর আর কিছু নেয় কিনা" বলে চলে যান মোক্ষদা।

রাগ হয়েছে তাঁর। হলেই বা মাতৃশোক, তাই বলে এমন সুখবরে মুখটা প্রসন্ন করবে না ? এত কী ! যাক সত্যর শ্বশুরবাড়ী খবর পাঠানোর ব্যবস্থা যে তাঁকেই করতে হবে এ তিনি জানেন। এটা মেয়েলি কাজ।

সারদা অদূরে বসে আছে পাখা হাতে, তার ওপরই শ্বশুরকে দেখার নির্দেশ।

হ্যাঁ, সারদাই বসে একগলা ঘোমটা দিয়ে। এটা তার সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য। দীনতারিণী মোক্ষদা কাশীশ্বরী শিবজায়া যে-কেউই কাছে থাকুন, খাওয়ার তদারকী করুন, সারদা তফাৎ বাঁচিয়ে বসে পাখা নাড়বেই।

আর কে করবে ?

ভুবনেশ্বরী তো আর এই একবাড়ি গিন্নীর সামনে লজ্জার মাথা খেয়ে স্বামীর খাওয়ার যত্ন করতে আসবে না ?

মোক্ষদা চলে যেতে রামকালী উঠলেন।

দাওয়ার ধারে চকচকে করে মাজা গাড়ু ও তার উপর পাটকরা কাচা গামছা রক্ষিত আছে আঁচানোর জন্যে, তবু হঠাৎ কি ভেবে চলে গেলেন ঘাটে। হবিষ্যের সময় ঘাটে মুখ প্রক্ষালন করাটা বিধি ছিল বটে, কিন্তু এখন কেন ?

যে জন্যেই যান—

আজ ভুবনেশ্বরী ভয়ঙ্কর এক অসমসাহসিক কাজ করে বসল। দ্রুতপায়ে রান্নাঘরের পিছন গলির বেড়ার দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে, মেয়ে-ঘাটের আবরুস্বরূপ আড়ালকরা যে ঝোপঝাড়গুলো আছে, তার পাশ দিয়ে এগিয়ে প্রায় পুরুষঘাটের কাছ বরাবর দাঁড়িয়ে থাকল।

রামকালী হাত মুখ ধুয়ে ফেরার পথে চমকে দাঁড়িয়ে পড়ে বলেন, "এ কী, তুমি এখানে ?"

ভুবনেশ্বরী ঘোমটার মধ্যে থেকেই রুদ্ধকণ্ঠে বলে, "তা' কি করবো ? চোরে কামারে তো দেখা নেই। একটা কথার দরকার থাকলে—"

রামকালী প্রায় বিরক্ত স্বরে বললেন, "তা' এইটা কি কথার জায়গা ?"

ভুবনেশ্বরীর চোখে যে ধারাশ্রাবণ, তা' ঘোমটার মধ্যে থেকেই ধরা যায়।

সেই শ্রাবণ বর্ষণের মধ্যেই তার কথা শোনা যায়। "কখন তোমায় পাচ্ছি ?"

রামকালী ঈষৎ শান্তস্বরে বলেন, "তা কথাটা কি বলে নাও চটপট! চারিদিকে লোকজন—"

"বলছি—সত্যর কথা—"

রামকালীর গলায় কেমন একটা বিরূপ গম্ভীর স্বর বাজে। "হ্যাঁ শুনলাম! ওর দিকে একটু লক্ষ্য রাখবে। বেশী দৌড়ঝাঁপ না করে! যাও বাড়ির মধ্যে যাও।"

ভুবনেশ্বরীর সর্বশরীর একটা মূক অভিমানে কেঁপে ওঠে, আর কথা বলে না সে, আস্তে আস্তে মুখ ফিরিয়ে সরে আসে।

তার গতিভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে রামকালীর একবার মনে হয়, আর একটু নরম করে বললে ভাল হত। নির্বোধ মানুষটা মেয়ের এই সংবাদে ভয়ে সারা হচ্ছে। কিন্তু কি করবেন রামকালী, এটা তো আর স্ত্রীর সঙ্গে গালগপ্পের জায়গা নয়।

ভাবলেন, কোনো এক সময় বলে দেবেন, ভয় পাবার কিছু নেই।

কিন্তু কোন্ সেই সময় ?

রামকালী জানেন কি ?

জানেন কি স্ত্রীর সঙ্গে গালগল্প করা কি বস্তু ? স্নেহ প্রেম ভালবাসা—এগুলো ব্যক্ত করার বস্তু নয়, এটাই জানেন রামকালী।

সত্যর শ্বশুরবাড়িতে খবর পাঠাতে কাকে নির্বাচন করা যায় তাই ভাবতে ভাবতে চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে বসেন রামকালী।

মোক্ষদা চলে আসেন।

এবং তোড়জোড় লাগিয়ে দেন সত্যর শ্বশুরবাড়ীতে খবর দেবার।

গিরি তাঁতিনী যাবে।

গরুরগাড়ী নিয়ে রাখুও যাবে। গিরির জন্যে তসর শাড়ী আসে, রাখুর জন্যে হলুদে ছোপানো ধুতি-চাদর। মস্ত একটা পেতলের হাঁড়িতে এক হাঁড়ি ঘানি ভাঙা তেল, আর মস্ত একটা "মটকি"তে বোঝাই কাঁচাগোল্লা। এ দৃশ্য দেখলেই ঘটনাটা বুঝতে পারবে সত্যর শাশুড়ী, মুখ ফুটে বলতেও হবে না!

ওরা বেরোবার মুখে রামকালী হঠাৎ থামান। মোক্ষদাকে উদ্দেশ করে এক গেঁজে টাকা বাড়িয়ে ধরে বলেন, "সেখানে লোকজন সবাইকে যেন পরিতোষ করে আসে, দিয়ে দাও গিরির হাতে!"

সংসারসুদ্ধ সবাই আহ্লাদে ভাসছে, দীনতারিণীর মৃত্যুশোক এ আহ্লাদকে পরাভূত করতে পারছে না। শুধু রামকালীই যেন পরাভূত হয়ে যাচ্ছেন, চেষ্টা করেও তেমন আহ্লাদ আনতে পারছেন না।

যেন রামকালীর কী একটা লোকসানই ঘটেছে!

সত্য বড় হয়ে যাচ্ছে, সত্য বড় হয়ে গেছে!

গিয়েই তো ছিল। তবু যেন কোথায় একটু আশা ছিল। মাতৃশ্রাদ্ধের বিরাট কাজের মধ্যে দেখছিলেন সত্যর ছুটোছুটি, আসা-যাওয়া, গালগল্প। মনে করছিলেন—যা ভেবেছিলাম তা নয়, শুধু শ্বশুরবাড়ীর চাপে পড়েই—

ভাবছিলেন হাতের কাজটা হালকা হলেই সত্যকে ডেকে কাছে বসিয়ে কথা বলবেন।

কাজ না মিটতেই মোক্ষদা এলেন ভগ্নদূতের মূর্তিতে।

আর কাকে "কাছে" বসাবেন রামকালী?

অনেক দূরে চলে গেল যে সে!

নাঃ কাছে আর কোনোদিন পাবেন না তাকে রামকালী।

এক নতুন চক্রের চক্রান্তে পড়ে অন্য আর এক রাজ্যের প্রজা হয়ে গেছে সত্য।

সে রাজ্য প্রমীলার রাজা, সে চক্রান্ত বিধাতার চক্রের।

আঠাশ

নবকুমার চলে গিয়ে পর্যন্ত এই ক'টা দিন আরো "টো-টো" করে বেড়াচ্ছিল সত্য, বাঁধা গরু ছাড়া পাওয়ার ধরনের। নবকুমারের উপস্থিতিতে সামান্য যেটুকু সাবধান হতে হচ্ছিল, তাও ঘুচেছিল, হঠাৎ শ্যেনদৃষ্টি মোক্ষদার মোক্ষম আবিষ্কারের ফলে স্বাধীনতাটা সাংঘাতিক রকম খর্ব হয়ে গেল তার।

বিদ্রোহ করা চলছে না, উঠতে বসতে উপদেশের ঠেলা। 'দরজায় বসিসনি, দু'জনের মাঝখান দিয়ে যাসনি, সাঁঝসন্ধ্যে হয়ে গেলে উঠোনে নামিসনি, শনি মঙ্গল বারে পথে বেরোস নি, ঘাটে পুকুরে একা যাসনি', নিষেধের বৃন্দাবন একেবারে। তা' ছাড়া আছে "বিধি"।

পায়ের আঙুলে রূপোর আঙটি পরে থাকো, চুলের আগায় আর শাড়ীর 'কোল আঁচলে' সর্বদা গিঁঠ বেঁধে রাখো, শত্রুপক্ষ জাতীয় কোনো মহিলাকে দেখলেই সরে থাকো, এবং "নজরখরা" কোনো মহিলার নজরে পড়ে গেছ সন্দেহ হলেই দেহের কোনোখানে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দাও, এই সব অনুশাসনের শাসনে চলতে হচ্ছে সত্যকে।

সত্যকে যেন বেঁধে মারছে এরা।

তবু সত্য যখন তখনই ভয়ানক ভয়ানক অঘটন ঘটিয়ে বসছে।

যেমন অন্যমনস্কতায় পান-ধোওয়া জল মাড়িয়ে গেল, মাছ-ধোওয়া জল ডিঙিয়ে গেল, ছেঁচ্তলায় নিজের শাড়ীখানা মেলে দিয়ে বসল, এই সব সর্বনেশে কাণ্ড!

ভুবনেশ্বরী কেবল বলে, "অ সত্য, কখন কি করে বসবি, আয় না আমার কাছে এসে একটু বোস না!"

এক আধবার বসে সত্য।

হয়তো ভিতরের কোনো ক্লান্তিতেই। কিন্তু বেশীক্ষণ মায়ের কাছে কাছে থাকতে তার লজ্জা করে। তাছাড়া চিরচঞ্চল চিত্ত তার দীর্ঘকাল শ্বশুরঘর করেছে অচঞ্চলের ভূমিকা নিয়ে, আর সে সহজে ক্লান্তির কাছে হার মানতে রাজী হয় না, রাজী হয় না মমতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে।

অতএব একদিন রামকালীর কাছে নালিশ পৌঁছল। বলা হল 'তুমি শাসন করো।'

কিন্তু রামকালী কি করলেন শাসন?

নাকি চিকিৎসক-জনোচিত নিষেধের বাণী বর্ষণ করলেন?

না, সে সব কিছুই করলেন না রামকালী। কেন কে জানে ভিতরে ভিতরে একটা পীড়া বোধ করছেন তিনি। কেমন যেন একটা বিমুখতা। যেন শেষ সম্বলটুকুও হারিয়েছেন, তাই মনের মধ্যে নির্লিপ্ত শূন্যতা।

রামকালী শুধু একদিন মেয়েকে ডেকে বললেন, "গুরুজনরা যা বলছেন, মন দিয়ে শুনবে। ওঁরা বোঝেন, ওঁদের কথা মেনে না চললে ক্ষতি হতে পারে।"

অভিমানে সত্য তিন দিন শুয়ে রইল।

ভুবনেশ্বরী অনুযোগ করলে বলল, "এই তো চাও তোমরা। বেশ তো, যা চাও তাই হচ্ছে।"

সত্যিই হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেল সত্য।

কিন্তু ক্ষতিকে কি রোধ করা গেল?

না, রামকালী এখন গ্রহের কোপে পড়েছেন।

রামকালী "মহাগুরু নিপাতের" বিপাক থেকে মুক্ত হতে পারছেন না।

তাই রামকালীর প্রথম দৌহিত্র সন্তান পৃথিবীর আলোয় উদ্‌ভাসিত না হতেই অন্ধকারের রাজ্যে হারিয়ে গেল।

তা ছাড়া আর কি কারণ?

সত্য তো সব কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলছিল ইদানীং।

মোক্ষদা অবশ্য বললেন, "সেই গোড়ার কালে ধিঙ্গীপনা করার ফল।" কিন্তু চিকিৎসক রামকালী তা' বলেন না। রামকালীর হঠাৎ মনে হয়, এ বোধ করি তাঁর নিজেরই অবহেলার ফল। পিতা হিসেবে না হোক, চিকিৎসক হিসেবে তাঁর আর একটু কর্তব্য ছিল।

তবু এটাও তো সত্যি, এ পরিবারভুক্ত আত্মীয় আশ্রিত মিলিয়ে যে গোষ্ঠীটি, সে গোষ্ঠীতে বছরে গড়ে অন্ততঃ পাঁচ সাতটা শিশুর জন্ম হচ্ছে, নিতান্ত সহজে, প্রায় কর্তা পুরুষদের অজ্ঞাতসারেই।

না, অত্যুক্তি নয়। ওই ছেলেমেয়েগুলো একটু বড় হয়ে যখন অন্যের ট্যাঁকে চড়ে বহির্জগতে বেরোয়, তখন এঁরা কৌতুহলী হয়ে প্রশ্ন করেন, "কার এটা?"

অতএব অপরাধটা কোথায় রামকালীর?

এই ক'টা দিন আগে "তেল সন্দেশ" সহকারে খবর পাঠানো হয়েছিল সত্যর শ্বশুর-বাড়িতে, এবং এলোকেশী হেন মানুষও খবরদাত্রীকে একখানি নতুন কাপড় দানে পুরস্কৃত করেছিলেন, বৌকে বাপের ঘরে রাখার অনুমতিও দিয়েছিলেন দীর্ঘকালের জন্যে, আবার এখন এই বার্তা পাঠাতে হবে।

ঘটা করে মেয়ের 'সাধ' দিচ্ছেন বৌয়ের বড়লোক বাপ, তা' নয়, মূলে হাবাৎ! হয়েছিল অবিশ্যি মেয়ে সন্তান, তবু প্রথম সন্তান তো! সত্য তো "ভাঙা" হয়ে গেল। আর তো "অখণ্ড পোয়াতি" রইল না। কোনো শুভকর্মে নিয়ম লক্ষণের কাজে আগ বাড়িয়ে আসতে তো পারবে না সত্য!

কড়া হুকুম দিলেন এলোকেশী, শরীর স্বাস্থ্য একটু ভাল হলেই যেন মেয়েকে পাল্কী চড়িয়ে সাবধানে পাঠিয়ে দেন বেহাই। আহ্লাদে মেয়ে বাপের বাড়ি গিয়ে আহ্লাদেপনা

করেই যে এইটি ঘটিয়েছেন, তাতে আর সন্দেহ কি !

এ বচন হজম করতে হল রামকালীকে।

এ নির্দেশ মানতেই হল।

আবার রাসুকে যেতে হল সত্যর শ্বশুরবাড়ী, কেঁদে কেঁদে চোখ-ফোলানো ম্রিয়মাণ সত্যকে নিয়ে।

কিন্তু রামকালীর গ্রহের কোপ কি কাটল ?

মহাগুরু নিপাতের বছর পূর্ণ হয়েও তো আরো বছর কেটে গেল, তবু রামকালীর সংসারে অঘটন ঘটতেই লাগল কেন ? কোনোখানে কিছু নেই, "নেড়ু" নামক নিরীহ ছেলেটা হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল। যেমন করে একদিন রামকালী হারিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু নেড়ু তো খড়মপেটা খায় নি !

অনেক খোঁজাখুজি করলেন রামকালী, কুঞ্জ অনেক কাঁদলেন মেয়েমানুষের মত, নেড়ুর বার্তা পাওয়া গেল না। এর ক মাস পরেই কাশীশ্বরী মারা গেলেন, আরো ক মাস পরে শিবজায়ার বড়মেয়ে বিধবা হয়ে বাপের বাড়িতে এসে আশ্রয় নিল, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে।

এ সমস্তই যে রামকালীর গ্রহবৈগুণ্য, একথা কে না বলবে ?

এব সব 'হ্যাপা'ই তো রামকালীকে নিতে হচ্ছে।

আর মজা এই, শত অসুবিধের মধ্যেও রামকালী কাউকে বলেন না, "সুবিধে হবে না", শত ঝঞ্ঝাটেও বলে ফেলেন না, "আর পারা যাচ্ছে না।"

বিধবা হয়ে বাপের বাড়ি আসা খুড়তুতো বোনের বিয়ের যুগ্যি মেয়ে দুটোর জন্যেও তোড়জোড় করে পাত্র খুঁজতে ঘটক ঠিক করে স্যাকরা ডেকে পাঠালেন। পাত্র খোঁজা হোক, গহনাপত্রও প্রস্তুত হোক ! বোনের ছেলে চারটের কথাও ভুলে থাকলেন না, যথাযথ হিসেবে তাদের কাউকে টোলে, কাউকে পাঠশালে ভর্তি করে দিলেন।

কর্তব্যের ত্রুটি করছেন না রামকালী, করছেন না কোনো অনাচার, তথাপি বারেবারেই ভাগ্যের মার পড়ছে তাঁর উপর।

কিন্তু "ওস্তাদের মার" না কি শেষরাত্রে, আর ভাগ্য নামক ব্যক্তিটির মত ওস্তাদ আর কে আছে ?

তাই—

রাত্রি শেষের ছায়াচ্ছন্ন আলো-আঁধারি মুহূর্তে সে তার প্রধান মারের খেলা দেখিয়ে গেল।

ঘণ্টা কয়েকের ভেদবমিতে ভুবনেশ্বরী মারা গেল।

রামকালী কবরেজের 'ডেকে কথা কওয়া' ওষুধের সমস্ত মাহাত্ম্য কি ব্যর্থ হল ? হয়তো ব্যর্থই হত, নিয়তিকে কে পারে ঠেকাতে ? কে পারে অপ্রতিরোধ্যকে রোধ করতে ? তবু চেষ্টা করবার সময়টাও যে পেলেন না রামকালী। হয়তো সময়টা পেলে আক্ষেপটা কম হত। কিন্তু লাজুক ভুবনেশ্বরী, নির্বোধ ভুবনেশ্বরী সে চেষ্টাটুকুর অবকাশ দেয় নি।

সে মাঝরাত্রে বিছানা থেকে উঠে সেই যে ঘাটের ধারে গিয়ে পড়েছিল, আর উঠে আসে নি, কাউকে জানায় নি। হয়তো বা পারেও নি।

বাগদী বুড়ী শেষ রাত্রে ঘাটে গিয়ে আবিষ্কার করল এই ভয়ঙ্কর ঘটনার দৃশ্য।

"ও মা আঁ আঁ—' করে চেঁচাতে চেঁচাতে এসে সে আছড়ে পড়ল। তার আর্তনাদ থেকে ব্যাপারটা বুঝতেও কিছুক্ষণ গেল লোকের।

কিন্তু দু-পাঁচ মিনিট আগে বুঝেই বা কী এমন লাভ হত? তখন তো একেবারে শেষ সময়। চোখমুখ বসে গেছে, নাড়ী ছেড়ে গেছে।

রামকালী নাড়ীটায় একবার হাত দিয়েই, আস্তে সেই প্রায়-স্পন্দনহীন হাতখানা নামিয়ে রাখলেন। ঝুঁকে বসে রুদ্ধ কম্পিত স্বরে বললেন, "মেজ বৌ, এ কী করলে?"

রাসু হাতে ধরা প্রদীপটা রোগিণীর মুখের আরো কাছে এগিয়ে আনল, ভুবনেশ্বরী কষ্টে চোখের পাতা টেনে চোখ দুটো একবার খুলল। কি একটা বলতে গেল, ঠোঁট নাড়তে পারল না। চোখের কোণ থেকে দু ফোঁটা জল রগ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

এ রোগে রোগীর শেষ অবধি জ্ঞান থাকে, চৈতন্যাবলুপ্তি ঘটে না। কিছু একটু বলবার জন্যে ভয়ঙ্কর একটা আকুলতা যে সেই মৃত্যুপথযাত্রিনীর ভিতরটাকে তোলপাড় করছে তা সেই বাতাসে-কাঁপা ক্ষীণ প্রদীপশিখার আলোতেও ধরা পড়ল।

রামকালী তেমনি রুদ্ধগম্ভীর আবেগকম্পিত গলায় বললেন, "মেজ বৌ, এমন কঠিন শাস্তি কেন?'

মুহূর্তের জন্য রোগিণীর ভিতরকার সেই আকুলতার জয় হল। ঠোঁটটা নড়ে উঠল। উচ্চারিত হল, "ছিঃ!"

"সত্যকে না দেখেই চললে?"

হঠাৎ সেই কাঠ হয়ে আসা দেহটা বিদ্যুতাহতের মত নড়ে উঠল, একঝলক জল সেই কোটরগত চোখের চারধার থেকে উথলে উঠে গড়িয়ে পড়ল।

রাসুর হাতের প্রদীপটা নিভে গেল বাতাসের ঝটকায়।

গত রাত্রে সহজ সুস্থ ভুবনেশ্বরী সংসারের বহুবিধ কাজ সেরে, আগামী সকালের রসদ বাবদ তিন-তিনটে মোচা কুটে রেখে, এক জামবাটি ডাল ভিজিয়ে ঘুমোতে গিয়েছিল, আজ আর সে সেই সকালের মুখ দেখতে পেল না। ভোরের প্রথম আলো একজোড়া ঘুমন্ত চোখের ওপর এসে স্থির হয়ে পড়ে রইল ব্যর্থতার গ্লানি বহন করে।

রাসু মেয়েমানুষের মত হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল। কেঁদে উঠল যে যেখানে ছিল সকলেই।

মোক্ষদার তীব্র তীক্ষ্ণ চিৎকার প্রথম ভোরের স্নিগ্ধ পবিত্রতাকে যেন দীর্ণ বিদীর্ণ করে ধিক্কার দিয়ে উঠল।

কুঞ্জ ভাসুর মানুষ, বেশী কাছে আসবেন না, দূরে বসে বুক চাপড়ে বলে উঠলেন, "জীবন-

তোর এত লোককে বাঁচালে রামকালী, সোনার প্রতিমা ঘরের লক্ষ্মীকে বাঁচাতে পারলে না? হেরে গেলে?"

রামকালী শুধু একবার সেই হাহাকারের দিকে ফিরে তাকালেন, বললেন না, "যুদ্ধের অবকাশ পেলাম কই?"

অজাতশত্রু ভুবনেশ্বরী মরণকালে তার পরমদেবতার সঙ্গে যেন ভয়ঙ্কর একটা শত্রুতা সেধে গেল।

সেজকর্তা ভাঙা ভাঙা গলায় মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বললেন, "নারায়ণ! নারায়ণ! অন্তিমে নারায়ণ! রামকালী, আত্মা এখনো এখানেই অবস্থান করছেন। নারায়ণের নাম কর।"

"আপনারা করুন!" বলে রামকালী উঠে দাঁড়ালেন।

এমন অকস্মাৎ মৃত্যুতে ঘরের পাশের লোকের সঙ্গেই দেখা হয় না, তা গ্রামান্তরের! মায়ের এ হেন মৃত্যু সত্যবতীর দেখবার কথা নয়, কিন্তু মাতৃশ্রাদ্ধও দেখা হল না তার।

হ্যাঁ, শ্রাদ্ধ ভুবনেশ্বরীর ভাল করেই হল।

বাড়িতে পাঁচটা বুড়ী আছে বলে যে আর কেউ তার প্রাপ্য পাওনা পাবে না, এমন নীতিতে বিশ্বাসী নন রামকালী। আয়োজন দেখে ক্ষুব্ধ মোক্ষদা রামকালীকে বললেন, "আমাদের কথা না হয় ছেড়েই দিলে, কিন্তু তোমার খুড়ো এখনো বেঁচে, তাঁর চোখের সামনে একটা কচি বৌয়ের ছেরাদ্দয় এত ঘটা করা কি বেশ বিবেচনার কাজ হচ্ছে রামকালী?"

রামকালী পিসীর মুখের দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিলেন, "তোমাদের কথা ছেড়ে দেবার কিছু নেই, কারুর কথাই আমি ছেড়ে দিচ্ছি না, যেটা বিধি সেটাই করছি।"

মোক্ষদা একটা ঈর্ষাকাতর নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেন, "পাঁচটা বুড়ীর চোখের ওপর ওই কচি বৌটার সমারোহ করে ছেরাদ্দ করাই তাহলে বিধি?"

রামকালী তেমনি মুখ ফিরিয়েই বললেন, "আত্মার বয়স নেই।"

"কিন্তু চোখে যে সহ্য করতে পারা যায় না রামকালী!"

বললেন মোক্ষদা।

রামকালী মৃদুস্বরে বললেন, "জগতে অনেক জিনিসই সহ্য করে নিতে হয়। ও নিয়ে বৃথা আলোচনায় ফল কি?"

মোক্ষদা চুপ করে গেলেন। কথাটা সত্যি বৈ কি। কনিষ্ঠজনের মৃত্যুটাই যদি সহ্য করে নেওয়া যায়, তার সেই প্রিয় পরিচিত মূর্তিটা আগুনে পুড়িয়ে শেষ করে চিতায় জল ঢেলে এসেই আবার খাওয়া যায়, ঘুমনো যায়, তবে আর কোন্ মুখে বলা চলে "তার পারলৌকিক কাজটা চোখ মেলে দেখে সহ্য করার ক্ষমতা আমার নেই!"

কিন্তু মায়ের শ্রাদ্ধ চোখে দেখবার ক্ষমতা ছেলেমানুষ সত্যবতীর হবে না বলেই কি নিয়ে আসা হল না তাকে ?

না, তা নয়, নিজেরই তার আসা সম্ভব হল না। সে যখন মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেল, তখন দু' দিনের ছেলে নিয়ে আঁতুড়ঘরে। ভুবনেশ্বরী যেদিন ভোরে মারা গেছেন ঠিক সেইদিনই সকালবেলা সত্যর দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়েছে। পুত্রসন্তান।

দু পরিবার থেকে দু জন লোক কুটুমবাড়ি এসেছে খবর জানাজানি করতে। একজন জন্মের, আর একজন মৃত্যুর খবর বহন করে।

কিন্তু সত্য কেন প্রসবের প্রাক্কালে বাপের বাড়ি আসে নি ? বিশেষ করে বাপ যার অতবড় চিকিৎসক !

আসে নি তার কারণ আছে। যদিও ধরতে গেলে কারণটা নিতান্তই মেয়েলি, কিন্তু এসব ক্ষেত্রে মেয়েলি প্রথা আর মেয়েলি কুসংস্কারই জয়ী হয়। সত্যর বেলাতেও তার অন্যথা হয় নি। সত্যর প্রথম বারের ঘটনাটাই এমন অনিয়মের কারণ ! বাপের বাড়িতে যখন অমন একটা অপয়া ব্যাপার ঘটে গেছে, তখন পালা বদল হোক !

তাই এবারে দু পক্ষ থেকেই একমত হয়ে স্থির করা হয়েছিল, সত্যর এবারের সন্তান মাতুলালয়ে ভূমিষ্ঠ না হয়ে পিত্রালয়ে ভূমিষ্ঠ হবে।

সত্য তাই ওখানেই আছে।

ভালই আছে। বেটা ছেলেটি কোলে এসেছে। এলোকেশী বড় মুখ করে লোক পাঠিয়েছিলেন বড়লোক কুটুমবাড়ি। তাকে বলে দিয়েছিলেন, "শুভসংবাদের বখশিশ হিসেবে পেতলের গামলাটা সরাটা দিলে নিবি না ! বলবি ঘড়া কই ?"

কিন্তু ঘড়া গামলা কিছুই চাওয়া হল না তার। এসে শুনল এই বিপদ !

ওদিকে সত্যবতীও পুলকে আনন্দে আশায় গর্বে প্রত্যাশিত হয়ে বসেছিল কখন সংবাদ-দাতা ঘড়া নিয়ে ফিরবে। কিন্তু তার ফেরা পর্যন্ত আর অপেক্ষা করে বসে থাকতে হল না। লোক এল ওদিক থেকে।

এলোকেশী আঁতুড়ের দরজায় এসে মুখটা কঠিনে কোমলে করে বললেন, "আঁতুড়ঘরে কাঁদতে নেই, কাঁদলে ছেলের অকল্যাণের ভয়, নাড়ির দোষ হবার ভয়, সাবধান করে দিয়ে খবরটা বলি বৌমা, ভেদবমি হয়ে তোমার মা-টি মরেছেন। লুকোছাপা করে চেপে রাখবার তো খবর নয়, 'চতুর্থী' করা না হোক, দু দিন মাছভাতটা তো বন্ধ দিতে হবে ? তাই জানিয়েই দিলাম। দেখি ভট্চাযকে জিজ্ঞেসবাদ করতে পাঠাই, এক্ষেত্তরে কী বিধি-ব্যবস্থা !"

একটা সদ্যপ্রসূতি তরুণী মেয়ের নিঃশঙ্ক বুকে বেপরোয়া একখানা ধারালো ছুরি বসিয়ে দিয়ে, নিতান্ত সহজভাবে সেখান থেকে সরে গেলেন এলোকেশী। ছুরিটার ক্ষমতার বহরটা

তাকিয়ে দেখে গেলেন না।

কিন্তু পাড়ায় বেরিয়ে এলোকেশী তাঁর প্রিয় সখীমহলে এই সরেস খবরটি পরিবেশন করে বলে বেড়ালেন, "দেখলি তো? মিথ্যে বলি কাঠ প্রাণ? মা মরার খবর শুনে প্যাঁট প্যাঁট করে তাকিয়ে বসে রইল, ডুকরে কেঁদে উঠল না।"

সত্যিই ডুকরে কেঁদে সত্যবতী ওঠে নি।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুকনো চোখ দুটো মেলে বসেই ছিল অনেকক্ষণ। তার পর কখন এক সময় নবজাত শিশুটা তার দেহের ওজনের চেয়ে অনেক গুণ বেশী ওজনে চীৎকার করে উঠেছে, ধীরে ধীরে তাকে কোলে তুলে নিয়ে এদিকে পিঠ ফিরিয়ে চুপ করে বসে থেকেছে দেওয়ালের দিকে মুখ করে।

ওদিকে যদি একটুকরো জানলা থাকত, সত্যর প্রাণটা বুঝি তাহলে সেই খোলা পথটুকু দিয়েই দৃষ্টির খেয়া-নৌকো চড়ে অসীম আকাশ সাঁতরে সাঁতরে আছড়ে গিয়ে পড়ত সেই তার শৈশবনীড়ে।

যেখানে "মেজবৌ" পরিচয়ে চিহ্নিত একটি নিটোল মুখ, ফর্সা রং, ছোটখাটো মানুষ ভীরু কুণ্ঠিত পদক্ষেপে সারাদিন শুধু সকলের মনোরঞ্জন করে বেড়াচ্ছে। আর তারই আশেপাশে এখানে সেখানে, তাকে প্রায় বিস্মৃত হয়ে দৃপ্ত পদপাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে একটি গাছকোমর-বেধে-কাপড়-পরা স্বাস্থ্যবতী বালিকা। কিন্তু এই আঁতুড় ঘরের এধারে ওধারে কোন ধারেই জানলা নেই। তিনদিকেই গোবর-লেপা নিরেট মাটির দেয়াল। দৃষ্টি সেখানে অচল হয়ে থেমে থাকে।

মা কেন সর্বদা এমন ভয়ে ভয়ে থাকে, এই নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করত সত্যবতী। বলত, "ভয় ভয় ভয়! ওই ভয়ের জ্বালাতেই সগ্‌গো পাবে না তুমি মা, দেখে নিও।"

সত্যবতীর মা কি স্বর্গ পায় নি?

সত্যবতীর প্রাণটা তবে কেন 'স্বর্গ' নামক সেই এক অদৃশ্য লোকের অসীম শূন্যতায় হাহাকার করে বেড়াচ্ছে?

"মা নেই, মাকে আর দেখতে পাবো না," এ কথা মনে করতে পারছে না সত্য, শুধু মনে হচ্ছে সেই চিরমমতাময়ী মানুষটা যেন ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুর খেলায় মেতে এক ছুটে কোন্ দূর-দূরান্তর লোকে পৌঁছে গিয়ে সত্যকে 'দুয়ো' দিয়ে ব্যঙ্গহাসি হাসছে।

বলছে, "কি গো, রাতদিন তো নিজের খেলা নিয়েই উন্মত্ত হয়ে বেড়াতে, 'মা' বলে যে একটা মানুষ ছিল সংসারে, তার দিকে তাকিয়ে দেখেছিলে কোন দিন? মনে রেখেছিলে তুমি তার একমাত্র সন্তান, তুমি ছাড়া 'আপনার' বলতে আর কেউ নেই তার?"

"মা মারা গেছেন" এ দুঃখের চেয়ে দুরন্ত হয়ে উঠেছে সত্যর, ছেলেবেলাকার সত্যর সেই মার প্রতি ঔদাসীন্যের দুঃখ। মাকে কেন ভাল করে দেখে নি সত্য, দু দণ্ড কেন স্থির হয়ে এসে বসেনি মার কোলের কাছে! কেন রাতে আর পাঁচটা মেয়ের সঙ্গে ঠাকুমার ঘরে

শোয়ার বদলে মায়ের গলাটি জড়িয়ে ঘুমোয় নি! প্রায়ই তো কুণ্ঠিত মানুষটি ভীরু ভীরু মুখটি হাসিতে উজ্জ্বল করে চুপি চুপি অনুনয় করত, "এ ঘরে আমার বিছানায় শুবি আয় না। রূপকথার গল্প বলব।"

যার কাছে এই অনুনয়, সে কোনদিনই তার মান রাখত না। নিতান্ত তাচ্ছিল্যে বলত, "হুঁঃ কতই না গল্প জান তুমি! ওঘরে বলে আমার বন্ধুরা সবাই, ওদের ছেড়ে তোমার কাছে শুতে আসব আমি! বলিহারী কথা বটে।"

কী পাষাণ ওই মেয়েটা গো! কী পাষাণ!

গোবরলেপা ওই নিরেট দেয়ালটায় মাথা কুটেকুটে মাথার মধ্যেকার ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাটাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে ইচ্ছে করে সত্যর।

ভগবান, একবারের জন্যে সেই দিনটা এনে দিতে পারো না? সত্য তাহলে সেইদিনের সেই নিষ্ঠুর মেয়েটার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে!

সেই ছোটখাটো দেহটাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে বলে, "মা মা মাগো, নিষ্ঠুর ছিল না সে মেয়েটা, শুধু অবোধ ছিল।"

ইদানীংএর মাকে, শ্বশুরবাড়ি থেকে ঘুরে গিয়ে দেখা মাকে, কিছুতেই যেন মনে পড়াতে পারে না সত্য, ঘুরে ফিরে শুধু মার সেই নিতান্ত বধূমূর্তিটিই রামকালী কবরেজের মস্তবড় বাড়িটার সর্বত্র সঞ্চরণ করে ফেরে।

সত্য যদি এখুনি মরে যায়, 'স্বর্গ' নামক সেই জায়গাটায় কি দেখা হবে মার সঙ্গে? তা হলে সত্য তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠবে, 'মা মাগো, এত পাষাণ তুমি কী করে হলে মা!"

আত্মবিস্মৃত সত্য কি মনে করে বসেছিল সত্যিই সেখানে পৌঁছে গেছে? ঝাঁপিয়ে পড়েছে মার বুকে? আর তার ডুকরে ওঠাটা এত তীক্ষ্ণ হয়ে গেছে যে, মর্ত্য লোকের এইখানে এসে ধাক্কা দিয়েছে?

নইলে এলোকেশী ছুটে আসবেন কেন? কেন কঠিন গলায় ধমকে উঠবেন, "বৌমা, একটাকে বিসর্জন দিয়ে আশ মেটে নি, এটাকেও দিতে চাও? ওই আঁতুড়েষষ্ঠির ছেলে কোলে নিয়ে মড়া-কান্না? বুকের পাটাকেও ধন্যি! বলি মা-বাপ কি কারো চিরদিনের? তবু তো বিধাতা পুরুষের সুবিচার হয়েছে, বাপ না গিয়ে মা গিয়েছে। শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে এয়োসতী ভাগ্যবতী ড্যাংডেঙিয়ে চলে গেল, দেখে আহ্লাদ কর, তা নয় মা মা করে চীৎকার তুলছ! বলি আর বেশীদিন বাঁচলে কপালে দুর্ভোগ ছাড়া কি ছাই সুখভোগ আসত? হাত শুধু করে থান পরে বোগনো বেড়ির ঘরে ভর্তি হতে হত না? চোখের জল যদি ছেলের গায়ে পড়ে বৌমা, তোমায় আমি বাপান্ত করে ছাড়ব তা বলে দিচ্ছি, মা-মা করে ন্যাকামি করা বার করে দেব।"

চোখের জল ছেলের গায়ে!

সত্য আঁচলটা তুলে ঘষে ঘষে চোখটা শুকনো করে ফেলে সভয়ে তাকিয়ে দেখে ছেলের গায়ে কোথাও জলের ফোঁটা লেগে আছে কি না।

এই তো এই যে! এই যে জলের ফোঁটা! শিউরে ওঠে সত্য।

হে মা ষষ্ঠি, রক্ষা করো মা! এমন বুদ্ধিহীনের মত কাজ আর কখনো করবে না সত্য।

কল্পিত সেই জলের ফোঁটা আঁচলের কোণ দিয়ে মুছে নিয়ে ছেলেকে নিবিড় করে ধরে সত্য। মৃত্যুর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জীবনের মুখোমুখি বসে।

উনত্রিশ

কথায় বলে "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান বয়।" রাসুর বৌ সারদা অবশ্য নিজেকে খুব একটা ভাগ্যবতী মনে করে না, বরং যখন তখন "আমার যেমন ভাগ্য" বলে আক্ষেপ করতে ছাড়ে না, কিন্তু এক হিসেবে এযাবৎ ভগবান তার বোঝা বয়ে এসেছেন। বয়ে এসেছেন গ্রহ-নক্ষত্রের একটি সুকৌশল সমাবেশ ঘটিয়ে।

নইলে পাটমহলের লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের নাতনীর তো এখনো পাটমহলেই পড়ে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তাই পড়ে আছে সে, সারদাকে নিঃসপত্ন রাজ্যভোগের সুযোগ দিয়ে।

লক্ষ্মীকান্ত নেই, কিন্তু তাঁর পুত্র শ্যামাকান্ত বাপের ঠাট-বাট বজায় রেখেছেন। সর্ববিধ শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ মেনে চলেন তিনি। নড়তে চড়তে পাঁজী-পুঁথি দেখেন, এবং গ্রহ ফাঁড়া ঠিকুজি কোষ্ঠী ইত্যাদি গোলমেলে ব্যাপারে প্রত্যেক সময় কাশী-প্রত্যাগত জ্যোতিষার্ণব ঠাকুরের উপদেশ গ্রহণ করে থাকেন।

জ্যোতিষার্ণবই পটলীর কোষ্ঠী দেখে তার পতিগৃহ যাত্রা সম্পর্কে একটি বিশেষ বিধিনিষেধ আরোপ করেছিলেন।

ঘোষণা করেছিলেন, আঠারো বছরে পদার্পণের আগে পটলীর স্বামী সন্দর্শনে বিপদ আছে। উক্ত কালাবধি তার পতিসুখ স্থানে রাহুর কটাক্ষ।

জোতিষার্ণবের ঘোষণায় অবশ্য আশ্চর্য কেউ হয় নি, বরং যেন এ ধরনের একটা কিছু না হলেই আশ্চর্য হত। কারণ পটলীর পতিসুখ স্থানে যে রাহুর দৃষ্টি সে আর জ্যোতিষীকে বলতে হবে কেন? সে তো তার বিয়ের দিনই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেছে।

নেহাৎ নাকি ওর বাপের পূর্বজন্মের পুণ্যি ছিল, তাই সেই বিয়ের বর রামকালী কবরেজের দৃষ্টিপথে পড়ে গিয়েছিল। নয়তো পটলীকে তো বাসররাতেই শাঁখা-নোয়া খুলতে হত। আর নয়তো 'দ-পড়া', আধা বিধবা হয়ে জীবনটা কাটাতে হত।

রামকালী কবরেজ ভগবান হয়ে এসে উদ্ধার করেছেন। কিন্তু "অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল।" তাই গ্রহ-নক্ষত্ররা আঙুল তুলে নিষেধ করে রেখেছে, "পটলী, তুই স্বামীর দিকে চোখ তুলবি না। অন্তত আঠারো বছর বয়স হবার আগে নয়।"

লক্ষ্মীকান্তর শ্রাদ্ধের সময় সামাজিক আচার অনুযায়ী জামাইকে শ্যামাকান্ত নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তবে বাড়িতে কড়া শাসন করে রেখেছিলেন, মেয়ে জামাইয়ে যেন দেখাশুনো না হয়। কিন্তু ভাগ্যচক্রে জামাইয়ের আসাই হল না। সেইদিনই নাকি জামাইয়ের রক্ত-আমাশা দেখা দিল। কে জানে সের-দুই কাঁচা দুধ খাবার ফল কিনা সেটা।

যাক সে সব তো অতীত কথা।

শ্যামাকান্ত মেয়ের শ্বশুরকে তার কোষ্ঠীঘটিত বিপর্যয় জানিয়েছিলেন। কাজেই এতদিন ও পক্ষ থেকে বৌ নিয়ে যাবার প্রস্তাব ওঠে নি। দীনতারিণীর অত বড় সমারোহের শ্রাদ্ধেও শ্বশুরবাড়ি আসা হল না তার।

"একঘাট" করতে যে যেখানে জ্ঞাতিগোত্র ছিল সবাই এসে জড় হল, সত্য পুণ্যি কুঞ্জর পাঁচ-পাঁচটা শ্বশুর-ঘরন্তী মেয়ে, শিবজায়ার দৌত্তুরগুষ্টি বাকী কেউ থাকে নি, বাকী ছিল শুধু পটলী, যে নাকি সর্বপ্রধানের এক প্রধান।

কিন্তু এবার সময় এসেছে।

আঠারো বছরে পদার্পণ করেছে পটলী। কুঞ্জগৃহিণী অভয়া ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন নতুন বৌকে আনতে। মুখে বলছেন অবশ্য "আর ফেলে রাখলে কি ভাল দেখায়?" কিন্তু ভিতরের উদ্দেশ্য আরো গভীর। উদ্দেশ্য, বড় বৌয়ের তেজ অহঙ্কার ভাঙা। সারদার যত তেজ, তত অহঙ্কার। দিন দিন যেন বাড়ছে। সংসারে ভুবনেশ্বরীর শূন্য স্থানটা কেমন করে কে জানে আস্তে আস্তে সারদার দখলে এসে গেছে, ভুবনেশ্বরীর মতই এখন সারদা ভিন্ন যেন সব দিক অচল। কিন্তু ভুবনেশ্বরীর নম্র নীরবতা সারদার মধ্যে নেই. সারদা যতটা চৌকস. ততটাই প্রখর। শাশুড়ীকেও সে ডিঙিয়ে যেতে চায়।

অথচ দীনতারিণীর মৃত্যুতে গিন্নীর যে পোস্টটা অভয়ার পাবার কথা, সেটা যেন অভয়া পেলেন না। অভয়ার সেই 'হেঁসেলের চাকরি'র উর্ধ্বে নতুন কিছু হল না, বরং সেটাই আরও জটিল হয়ে উঠেছে। কারণ কাশীশ্বরী তো নেই-ই, হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে মোক্ষদাও কেমন কমজোরি হয়ে গেছেন। কাজেই অভয়াকে সদ্য-স্নানান্তে ওঁদের ঘরেও কিছু গুছিয়ে দিয়ে আসতে হয়। বাটনাটা, জলটা।

মোক্ষদা "হাতী হাবড়ে পড়ার নীতিতে"ই সেই চির অস্পৃশ্যার জলস্পর্শ করেন।

অতএব সমগ্র সংসারটা অনেকটা বেলা পর্যন্ত সারদার হাতেই থাকে। সঙ্গে থাকেন অবশ্য শিবজায়া, থাকেন আরও জ্ঞাতি মহিলারা. কিন্তু আশ্চর্য, সবাই যেন 'আমে দুধে' মিশে গেছে। আর অভয়া-রূপিণী আঁঠির ঠাঁই হয়েছে ছাইগাদায়। অন্তত অভয়ার তাই ধারণা।

বৌয়ের এই প্রতাপ, এই দপদপা আর সহ্য করতে পারছেন না অভয়া। টিট করতে ইচ্ছে করছে বৌকে। তা অস্ত্র তাঁর হাতে এসে গেছে এবার। শ্যামাকান্ত জানিয়েছেন আঠারো বছরে পা দিয়েছে পটলী।

শুনে বুকের জোর বাড়ল অভয়ার।

ভাবলেন বড়বৌমার "তেজ আসপদ্দা" কমুক একটু।

সতীন এনে বুকে বসিয়ে দিলে মেয়েমানুষ যেমন টিট হয়, তেমন আর কিসে?

ওদিকে পাটমহলে মস্ত তোড়জোড়।

ফাঁড়া কেটেছে, এতদিন পরে ঘরবসত হচ্ছে মেয়ের, ঘরভরা জিনিস দেবার বাসনা পটলীর মা বেহুলার। জিনিস গোছাচ্ছে, আর উঠতে বসতে মেয়েকে উপদেশ দিচ্ছে কিসে মেয়ে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে "একজন" হতে পারে। মেয়েটা যে বড় ন্যাকা-হাবা, তাই ভাবনা বেহুলার।

তবে অন্যদিকে একটা মস্ত ভরসা আছে পটলীর মার। অলক্ষ্যে প্রতি মুহূর্তে মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছাখে আর সেই ভরসার আলো মুখে ফুটে ওঠে। পটলীর সতীনের বয়সটা মনে মনে হিসেব করে সে আলো আরও জোরালো হয়। পটলীর সঙ্গে কার তুলনা?

একে তো ভরন্ত বয়েস, তায় আবার এইকাল অবধি বাপের ঘরে নিশ্চিন্দির ভাত খেয়ে খেয়ে গড়ন হয়েছে পুরস্ত বাড়ন্ত। আর রূপ? সে তো সেই শৈশব থেকেই একরকম তাকসাইটে।

ঘরে পরে সবাই বরং ওই রূপের জন্যেই খোঁটা দেয় তাকে। বলে, "অতি সুন্দরী না পায় বর' শাস্তরের এ কথাটা নতুন করে প্রেমান করছিস পটলী তুই। এর থেকে আমাদের কালো খেঁদি মেয়েরা বরং ভাল। তোর বয়সী সবাই তিন-চার ছেলের মা হল।"

এখন আবার ভয়ও দেখাচ্ছে অনেকে।

বলছে, "সতীন এখন স্থলকূল দিলে হয়। এযাবৎ একা পাটেশ্বরী হয়ে রয়েছে। পটলীর মা, তুমি মেয়ের গলায় কোমরে ভালমতন রক্ষেকবচ বেঁধে দিও। কে জানে কার মনে কী আছে।...মেয়েকে বারণ করে দিও যেন সতীনের হাতের পান জল না খায়।"

আশা আর আশঙ্কা, স্বপ্ন আর আতঙ্ক, এই নিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে অবশেষে একদিন পটলীর জীবনের সেই পরম দিনটি এসে পড়ে। শ্বশুরবাড়ি যাত্রা করে পটলী।

বাড়িটার খানিক খানিক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মনে আছে। বড় যে উঠোনটায় বৌছত্তরের ওপর গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, মস্ত যে দালানটায় তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছিল, ঘাটের যে ধারটায় স্নান করিয়েছিল পটলীকে, যে ঘরে আটদিন বাস করেছিল সে, এইরকম একটু একটু। আর বিশেষ কিছু না।

অতগুলো মেয়েমানুষের মধ্যে কে যে তার সতীন, সে কথা বুঝতেই পারে নি পটলী। তা ছাড়া বোঝবার চেষ্টাই বা করছে কে? কেঁদে কেঁদে যার চোখ ফুলে করমচা!

শুধু তো শ্বশুরবাড়ি আসার কান্না নয়, নিজেকে ভয়ঙ্কর একটা অপরাধী ভেবে আরও কান্নার যোগ হয়েছিল তার সঙ্গে। সত্যি পটলীর মত মহা-অপয়া ত্রিজগতে আর কে আছে?

বিয়ের বর বিয়ে করতে এসে রাস্তায় মরে, এমন কথা কে কবে শুনেছে? তার পর আবার এ বাড়ি? বৌভাতের যজ্ঞির দিন বাড়ি যখন রমরম করছে, তখন কি না বাড়ির একটা জলজ্যান্ত বৌ হারিয়ে গেল! শুনে 'হাঁ' হয়ে গিয়েছিল পটলী।

পুরুষমানুষ রাস্তায়-ঘাটে বেরিয়ে সাপের পেটে, বাঘের পেটে, কি চোর ডাকাতের হাতে পড়ে হারিয়ে যেতে পারে, কিন্তু মেয়েমানুষ? বিশেষ করে বৌ-মানুষ! ঘরের মধ্যে থেকে হারিয়ে যাবে কি? ভূতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া ব্যাপার ছাড়া আর কিছু ব্যাখ্যা চলে না এর।

সেই ব্যাখ্যাতেই নিশ্চিন্ত হয়ে সকল কারণের মূল নিজের উপর ধিক্কারে আর ভয়ে যখন খালি কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছিল, তখন সত্য এসে জ্ঞান দিয়েছিল তাকে।

হ্যাঁ, ওই আর একটা বস্তু মনে আছে পটলীর।

সত্য!

আর্শির মতন চকচকে সেই বড় বড় দুটো চোখ, আর তার উপরকার ঘনকালো জোড়াভুরু, এখনও যেন স্পষ্ট মনে পড়ে যায় পটলীর।

পটলীর কান্নার কারণ শুনে সেই ভুরু কুঁচকে বলেছিল সত্য, "নিজেকে 'অপয়া' বলে কেঁদে মরছ কেন? ভগবান যার ভাগ্যে যা লিখে রেখেছে তার তাই হবে। নিজেকে সমস্ত ঘটন-অঘটনের হেতু ভাববার হেতু? তুমি যদি না জন্মাতে, এই পৃথিবীর কলকব্জা বন্ধ থাকত?"

অবাক হয়ে গিয়েছিল পটলী, তার সেই প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো ননদের কথা শুনে। তার জীবনে এ হেন কথা সে কখনো শোনে নি। তাও আবার এতটুকু মেয়ের মুখে।

অথচ এই কদিন ধরে অনবরত সব গুরুজনের মুখে শুনছে পটলী, পটলীই না কি সকল অঘটনের কারণ।

পটলীর দোষেই নাকি যত কিছু খারাপ।

সেই ননদ এখন নিশ্চয় শ্বশুরবাড়ি। কোন্ মেয়েটা আর পটলীর মত ফাঁড়া নিয়ে বাপের বাড়ি বসে থাকে?

তোড়জোড় এ বাড়িতেও চলছিল।

অভয়া যেন একটু বেশী-বেশীই করছেন।

করছেন ভালবেসে যতটা না হোক, লোক জানাতে! সারদা এবং সারদার 'সুয়ো'রা যাতে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, যে আসছে সে কারো করুণার ভিখিরী হয়ে নয়। আসছে

রীতিমত অধিকারের দাবি নিয়ে।

অবিশ্যি 'ঘর'টা সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু উচ্চারণ করতে পারেন নি, কিন্তু ইশারায় ইঙ্গিতে ব্যক্ত করছেন, এখন থেকে সারদার উচিত ছেলেদের নিয়ে এদিককার ঘরে শোওয়া। ছেলে ডাগর হয়ে উঠেছে, আর এখন 'ঘর' আগলানো কেন?

তবে সারদা এসব ইশারা-ইঙ্গিত গায়ে মাখে না। বড় ছেলে ডাগর হয়ে ওঠা অবধি তো তাকে তার কাকাদের কাছে ভর্তি করে দিয়েছে সারদা। নিজের এলাকা ঠিক রেখেছে!

বড় ছেলে 'বঙ্কু' বা বনবিহারী তো ছোটকাকা নেড়ুর প্রাণপুতুল ছিল। নেড়ু হারিয়ে যাওয়া অবধি অন্য কাকাদের। প্রাণপুতুল অবশ্য সকলেরই, কিন্তু সর্বেসর্বা প্রথম নাতিটিকে অভয়া যেন তেমন দেখতে পারেন না। ছেলেটা শুধু সারদার পেটের বলেই নয়, বড্ড বেশী মা-ঘেঁষা বলেও। তাই যখন-তখনই তাকে খিঁচিয়ে বলতেন, "রাতদিন ছোটকাকা ছোটকাকা! ছোটকাকার যখন বিয়ে হয়ে যাবে?"

মেজকাকা থাকতে ছোটকাকার বিয়ে কেন হবে, অথবা বিয়ে হলে ভাইপোর সঙ্গে সংঘর্ষ বাধবার কারণটা কি, এ প্রশ্ন করত না ছেলেটা, শুধু সবেগে বলে উঠতো, "ছোটকাকাকে বিয়ে করতে দেবই না।"

অভয়া আরও খিঁচিয়ে, বলেন, "তা দিবি কেন? কারুর আর এসে কাজ নেই, ভাগ নিয়ে কাজ নেই! একা তোর মা-ই সব্বস্ব দখল করে বসে থাকুক!" তা' তার সেই ছোটকাকা নিরুদ্দেশই হয়ে গেল, বিয়ে আর হল না।

অভয়া ভাবেন এ ওই অপয়া ছেলেটার বাক্যির ফল।

আর বাক্যিগুলো মার 'শিক্ষা'র ফল।

সারদা হাতের বাইরে বলে, অভয়া হাতের মুঠোয় পুরতে পারেন এমন একটি হাতের পুতুলের বাসনা করছেন। তাকে নিয়ে অভয়া সাজাবেন খাওয়াবেন, চোখের ইশারায় ওঠাবেন বসাবেন।

"মেজবৌটা এলেও হত!"

অথচ অভয়ার মেজ ছেলের বিয়ের কথা মুখেও আনছেন না রামকালী। বরং একদিন বড় ভাইয়ের মুখের ওপর স্পষ্ট বলেছিলেন, "ওই অপদার্থ টার বিয়ে দিয়ে কি হবে?"

"অপদার্থ" বলে যে বেটাছেলের বিয়ে হবে না, এমন ছিষ্টিছাড়া কথা ত্রিসংসারে কে কবে শুনেছে? কিন্তু কুঞ্জ চিরদিনই ছোটভাইয়ের ভয়ে কাঁটা! সমালোচনা যা করেন, সে আড়ালে। তাই যা বলেছেন আড়ালেই বলেছেন। নিজে সাহস করে বিয়ের ব্যবস্থা করতে যাননি।

যাক, এতদিনে অভয়ার একটা নিজস্ব বস্তু পাবার আশা হচ্ছে।

কিন্তু একেবারে নিঃসংশয় সুখ জগতে কোথা?

নতুন বৌয়ের বয়সের কথা ভেবে বুকের মধ্যে তেমন স্বস্তি নেই।

বুড়ো শালিখ কি পোষ মানবে?

পাকা বাঁশ কি নুইবে?

কিন্তু পটলী কি পাকা বাঁশ?

কে জানে পটলী কি!

মেয়েমানুষ যতক্ষণ না নিজের স্বার্থ-কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়, ততক্ষণ তাকে কে চিনতে পারে? 'ভাল মেয়ে' 'লক্ষ্মী মেয়ে' এ সব বিশেষণ কত ক্ষেত্রেই ব্যর্থ হয়ে যায়।

পটলী কি তা না জানলেও পটলীর ফাঁড়া কাটার খবর পাওয়া পর্যন্ত সারদার বুকে বাঁশ পড়েছে। কে যেন সেই বাঁশ দিয়ে অহরহ ডলছে তাকে।

আর রাসু?

রাসুরও যন্ত্রণার শেষ নেই।

মনের মধ্যে দারুণ এক ভয়, অথচ পুলককম্পিত আবেগ। না জানি সেই সাত বছরের মেয়েটি আঠারো বছরের হয়ে কেমনটি হয়েছে? এখান থেকে পত্তর নিয়ে যে গিয়েছিল, সেই রাখুর মা তো এসে বলেছে, "বৌ তো নয়, যেন পদ্মফুল!"

শুনে অবধি এক অবর্ণনীয় সুখকর যন্ত্রণা রাসুর মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে।

সেই পদ্মফুল কি রাসুর পুজোয় লাগতে দেবে সারদা? না কি বহুদিন আগের সেই এক দুর্বল মুহূর্তের শপথটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বঞ্চিত করে রাখবে রাসুকে?

সারদা কোন দিনই পদ্মফুল নয়।

পদ্ম গোলাপ চামেলী মল্লিকা কিছুই নয়, ফুলের সঙ্গেই যদি তুলনা করতে হয় তো বলতে হয় বরং অপরাজিতার গা-ঘেঁষা।

কিন্তু শ্যামলা রং হলেও তীক্ষ্ণ মুখশ্রী আর অনবদ্য গঠন-সৌকুমার্যের জোরে এ বাড়ির বড় বৌ হয়ে ঢোকবার সৌভাগ্য তার হয়েছিল।

আর এখন প্রবল ব্যক্তিত্বের জোরে বাড়ির একেবারে শীর্ষস্থানীয় হয়ে বসে আছে সে। কিন্তু রাসু এখনো জীবনরসের সন্ধানী নবীন যুবক। প্রখরা আর মুখরা সারদাকে সে আজকাল ভয় করে।

অবশ্য স্বামীসেবার নিখুঁৎ নৈপুণ্যে বরকে আয়ত্তে রেখে দিয়েছে সারদা নিখুঁতভাবেই। এখনো গরমকালের রাতে পাখা ভিজিয়ে বাতাস করে স্বামীকে, শীতের রাতে পিদ্দিমে হাত তাতিয়ে ঠাণ্ডা সিরসিরে হাত-পা গরম করে দেয় তার।

আর সংসারের কাজে রান্নাঘরের গরমে যতই গলদঘর্ম হোক, শৌখিন বরটির কাছে রাতে শুতে আসার সময় গা-হাত ধুয়ে কোঁচানো মিহি শাড়িখানি পরতে ছাড়ে না, মাথায় গন্ধ তেলটি দিয়ে একটু চকচকে হয়ে আসতে ভোলে না।

কিন্তু প্রস্ফুটিত পদ্মের সঙ্গে কি গন্ধ তেল পাল্লা দিতে পারবে?

বৌ এসে দাঁড়াতেই একটা 'ধন্যি ধন্যি' রব উঠল। উঠল দু কারণেই। একে তো বৌয়ের রূপ, তার উপর ঘরবসতের সামগ্রীর বহর।

রামকালী কবরেজের সংসারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রাচুর্য, ঘর-সংসারে জিনিসপত্র তিনি অপ্রয়োজনেই কতকগুলো করে করিয়ে রেখে দেন, কোন একটা উপলক্ষ হলেই। খুঁজলে বাড়িতে ছোটয়-বড়য় খান বারো জাঁতা মিলবে, খান ষোলো শিল। জলের ঘড়া না হোক গোটা চল্লিশ-পঞ্চাশ। তবু মেয়েদের মন!

সেই শিল-নোড়া জাঁতা-কুলো ঘড়া-ঘটি ইত্যাদি করে সংসার নির্বাহের তুচ্ছ উপকরণ-গুলোই তাদের মন আহ্লাদে ভরে তোলে।

সকলেই একবাক্যে স্বীকার করে, 'কুটুমের নজর আছে।' ঠানদি নন্দরাণী হেসে বলে, 'না-দেওয়ার মধ্যে দেখছি ঢেঁকি। একটা ঢেঁকি দিলেই রাসুর শ্বশুরের ষোলকলা দেওয়া হত! ঘরবসতে বৌমার বেহাই ওইটাই বা বাকী রাখল কেন?'

না, ঢেঁকিটা পটলীর বাবা দেয় নি।

কিন্তু পটলীকে দিয়েছে।

আর পটলীই ঢেঁকির মুষল হয়ে অন্ততঃ একজনের বুকের গহ্বরে পাড দিতে শুরু করেছে।

তবু সেই ঢেঁকির পাড়ের মধ্যে থেকেই শক্তি সঞ্চয় করে নেয় সারদা। সংকল্প করে এ সতীনকে সে স্বামীর ধারে কাছে আসতে দেবে না। সেই 'সিংহবাহিনীর' শপথটা রীতিমত কাজে লাগাবে।

তা ছাড়া আর উপায় কি!

রাসুকে তো চিনতে বাকী নেই সারদার। এই রূপসীর কাছে আসতে পেলে, রাসু তো তদ্দণ্ডেই মাথা মুড়িয়ে তার চরণে নিজেকে বিকিয়ে দেবে।

প্রথম দিন অবিশ্যি অভয়াই বৌকে কাছে নিয়ে শুলেন এবং অনেক রাত পর্যন্ত জেগে আর জাগিয়ে বৌকে জ্ঞানদান করতে চেষ্টা করলেন—এ সংসারে তার কে আপন, কে পর। কাকে সমীহ করতে হবে, আর কাকে সন্দেহ করতে হবে।

কিন্তু পরদিন কি হবে?

অথবা তারও পরদিন?

পর পর চিরদিন?

সারদা সেই কথাই ভাবতে থাকে।

আজ তো গেল! কিন্তু কাল?

এবং চিরকাল?

রাসুর জন্যে না হয় সিংহবাহিনীর শপথ। কিন্তু সংসারের আর দশ জনের জন্যে কী ব্যবস্থা? তাদের প্রশ্নবাণ যখন বিষের প্রলেপ মেখে বুকে এসে বিঁধবে? কি উত্তর দেবে সারদা?

ঘরের প্রদীপ নেভানো, রাসু এখনো বারবাড়ি থেকে আসে নি।

বৈশাখের দুরন্ত বাতাসে বৈশাখী চাঁপার মদির গন্ধ, ছোট ছোট গবাক্ষ পথেও সেই বাতাস ঝলকে ঝলকে ঢুকে পড়ছে, আর সারা ঘরে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার সুবাস।

এই রাত্রি, এই মোহময় বাতাস, আর এই ব্যথায় টনটনে বুক। এর মাঝখানে কি মনে আনা যায়, সারদা অনেকদিন স্বামীসঙ্গ পেয়েছে, সারদার ছেলের বয়স বারো?

ভাবা যায়, সারদার আর জীবনের ভোগপাত্রের দিকে হাত বাড়ানো শোভন নয়, স্বামীর অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে, ভাঁড়ারের হাঁড়িকুঁড়ির মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজে বার করাই এখন তার উচিত?

আশ্চর্য, আশ্চর্য, কিছুতেই কেন বিশ্বাস হচ্ছে না এই ঘর সারদা এত দিন ভোগ করছে?

বরং দৃষ্টি অন্ধকার করে দেওয়া অশ্রু-বাষ্পের সঙ্গে বারে বারে মনে হচ্ছে, ক'দিনই বা।

মাঝে মাঝে কদাচ কখনো যে বাপের বাড়ি গিয়ে থেকেছে, সেইগুলোই যেন এখন মনে হচ্ছে বিরাট এক-একটা বিরতি।

কিন্তু গরীব গেরস্ত বাপ সারদার, কতই বা নিয়ে যেতে পেরেছে মেয়েকে? ওর এই ষোলো সতেরো বছরের বিবাহিত জীবনের মধ্যে দিন মাস ঘণ্টা মিলিয়ে হিসেব করলে না হয় চার পাঁচটা বছর।

তা হলেও তো হাতে থাকে এক যুগ।

কখন কোথা দিয়ে পার হয়ে গেল সেই দীর্ঘ এক যুগ?··

আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকল রাসু। বরাবর যেমন ঢোকে। সারদা যে ধরনটাকে ব্যঙ্গ হাসিতে অভিষিক্ত করে বলে "চোরের মতন"।

এই নতুন বিয়ের বরের ভঙ্গীটা আর কোন দিনই বদলাল না রাসুর।

তবে কি সেও টের পায় নি কবে কখন তার বয়স আঠারো থেকে চৌত্রিশে এসে পৌঁচেছে? টের পায় নি, মাঝখানের সেই বয়সগুলো হাত ফসকে পালাল কি করে?

তাই আজও শয়নমন্দিরে ঢুকতে তার লজ্জা।

আজ কিন্তু সমস্তটা দিন রাসুর বড় যন্ত্রণায় কেটেছে। অব্যক্ত সেই যন্ত্রণাটা যেন ধরা-ছোঁওয়া যাচ্ছে না, শুধু মনটা ভারাক্রান্ত করে রেখেছে।

তা যন্ত্রণার কারণ আছে বৈ কি।

এ যন্ত্রণা শুধু যে রূপসী স্ত্রীকে এখনো চোখে দেখতে পায় নি বলে তা নয়। কর্তব্য নির্ধারণের দ্বন্দ্বই বেচারী রাসুকে এত বিচলিত করছে।

অতঃপর রাসুর কর্তব্য কি?

পূর্ব শপথ স্মরণ করে দ্বিতীয়ার মুখদর্শন না করা? সারদার প্রতিই একান্ত অনুরক্তি রেখে চলা? না শপথটা একটা মুখের কথা মাত্র বলে উড়িয়ে দিয়ে—

যন্ত্রণা এইখানেই।

উড়িয়ে দিলে সারদা যদি ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে বসে? তা ছাড়া সারদা মর্মাহত হবে, সারদা রাসুকে ধিক্কার দেবে, ঘৃণা করবে, এ কথা ভাবতেও তো বুকটা ফাটছে।

অথচ সারদার প্রতি সেই আনুগত্যের শপথ রক্ষা করতে গেলে আর একটা নির্দোষ অবলা সরলার প্রতি অবিচার করা হয়। এতদিন পরে স্বামীগৃহে এসে স্বামীর এই নিষ্ঠুরতা দেখে, সেও কি দুঃখে লজ্জায় অভিমানে অপমানে দেহত্যাগ করতে চাইবে না? এতখানি আঘাত তাকে দেওয়া যাবে? যে না কি "বৌ নয়, যেন পদ্মফুল!"

এই দোটানায় রাসু সারাদিন টুকরো টুকরো হচ্ছে।

তবু ঘরে ঢুকে সহজ হবার চেষ্টা করল রাসু। বলল, "উঃ, কী অন্ধকার!"

একটা মাত্র মাটির প্রদীপে মস্ত একখানা ঘরের অন্ধকার দূরীভূত হয়, এ কথা রাসুর আমলে হাস্যকর ছিল না। তাই সেই দীপশিখাটুকুর অভাবেই রাসু বলল, "উঃ, কী অন্ধকার!"

কিন্তু ও পক্ষ থেকে এ সম্পর্কে কোন সাড়া এল না।

রাসু যথানিয়মে দরজায় হুড়কোটা এঁটে সরে এসে বলল, "পিদ্দিম জ্বাল নি যে?"

এবার সারদা কথা বলল।

আর আশ্চর্য, ভিতরকার সেই বেদনা-বিধুর হাহাকার যখন 'কথা' হয়ে বেরিয়ে এল, এল তীক্ষ্ণ তীব্র একটি ব্যঙ্গের মূর্তিতে। হয়তো এইজন্যই 'স্বভাব' জিনিসটাকে মৃত্যুর ওপার পর্যন্ত বিস্তৃতি দেওয়া হয়েছে।

সারদা তীক্ষ্ণ হুল ফোটানোর সুরে বলে উঠল, "আর পিদ্দিম জ্বালার দরকার কি? বাড়িতে যেকালে পুন্নিমা চাঁদের উদয় হয়েছে!"

"পূর্ণিমা চাঁদ!"

রাসু সরল, রাসু অবোধ, রাসু এইমাত্র স্বর্গ হতে খসে পৃথিবীতে এসে পড়েছে। "পূর্ণিমা চাঁদ মানে?"

"ও, মানে জান না বুঝি?" স্বামীকে যেন বিদ্রূপে খানখান করে দেয় সারদা, "কেন, বাড়িসুদ্ধ সবাই এত ধন্যি ধন্যি গাইছে, আর তোমার কানে ওঠে নি? তোমার দ্বিতীয়-পক্ষর রূপেই তো ভুবন আলো গো! তাতেই আর তেল খরচা করে আলো জ্বালি নি!"

রাসু হঠাৎ বল সঞ্চয় করে বলে ওঠে, "মেয়েমানুষ বড় হিংসুটে জাত।"

"কী? কী বললে?" সারদা যেন তীক্ষ্ণতার প্রতিযোগিতায় নেমেছে, "মেয়েমানুষ হিংসুটে জাত?"

"তবে না তো কি?"

"মহাপুরুষ পুরুষজাতটা একেবারে দেবতা, কেমন?" সারদা ক্রুদ্ধ গর্জনে বলে, "কি বলব—মুখ ফুটে তুলনা করে দেখাতে গেলে মহাপাতকের ভয়, তবু বলি—মেয়েমানুষের অবস্থার সঙ্গে একবার নিজেদের অবস্থা মিলিয়ে দেখ না! পরিবার যদি একবার পরপুরুষের দিকে তাকায়, তা হলে তো মহাপুরুষদের মাথায় খুন চাপে।"

রাসু ধিক্কার-বিজড়িত কণ্ঠে বলে, "ছি ছি, কিসের সঙ্গে কী! পরপুরুষের নাম মুখে আনতে লজ্জা করল না তোমার? দ্বিতীয়পক্ষ বুঝি পরস্ত্রী? ছিঃ!"

সারদা কিন্তু এ-হেন ধিক্কারেও বিচলিত হয় না, তাই অনমনীয় কণ্ঠে বলে, "তা দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ যত ইচ্ছে 'পক্ষ' জুটলে আর পরস্ত্রীতে কি দরকার? মেয়েমানুষের তো আর সে সুবিধে নেই?"

রাসু হতাশ কণ্ঠে বলে, "হিংসের জ্বালায় তোমার দিগ্বিদিক জ্ঞান ঘুচে গেছে বড় বৌ, তাই যা নয় তাই মুখে আনছ। নতুন বৌকে আমি আনাতে যাইনি, গুরুজনরা বুঝেসুঝে এনেছে। নইলে এতাবৎ কাল তো সেখানেই পড়ে ছিল!"

"ওঃ ইস! দুঃখু যে উথলে উঠছে দেখছি! পড়েই ছিল! আহা-হা মরে যাই, অথই জলে পড়ে থেকেছিল একেবারে।"

সারদা ছুরি দিয়ে কেটে কেটে কথা বলে, "আমি কিন্তু সাফ কথা কয়ে দিচ্ছি, ভাগা-ভাগির ইল্লুতেপনায় আমি নেই। আমায় চাও তো ওকে স্পশ্য করতে পাবে না, আর ওকে চাও তো, আমি—"

হঠাৎ কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায় সারদার। আর এই রুদ্ধ কণ্ঠেই বড় ভয় রাসুর।

আরও হতাশ গলায় বলে সে, "তা আমায় কি করতে বলো? মাথার ওপরকার গুরুজনরা যে ব্যবস্থা দেবে তাই মানব, না চেঁচামেচি করে তার প্রতিবাদ করব?"

"কি করবে সে তোমার নিজের বিবেচনা। তুমিও কিছু কচি খোকাটি নও। মাথার ওপরকার গুরুজন যদি বিষ খেতে বলে, খাবে? খুড়োঠাকুর ধম্ম করলেন, ভদ্দরলোকের জাত রক্ষে করলেন আমার বুকে বাঁশ ডলে! এতই যদি ধম্মজ্ঞান, নিজেই কেন—"

"বড় বৌ!" হঠাৎ ধমকে ওঠে রাসু, "কি বলছ কি? উন্মাদ হয়ে গেলে নাকি?"

সারদা ঝপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে গম্ভীর গলায় বলে, "উন্মাদ হবার ঘটনা ঘটলে মানুষ উন্মাদ হবে, এ আর আশ্চর্য্য কি? খুড়োঠাকুর যদি তখন আমার ঘর না ভাঙতেন, তা হলে বরং আজ ওনার ভাঙা ঘর ভরত!"

"বড় বৌ! কাকে নিয়ে তুলনা? এসব অকথা কুকথা মুখে উচ্চারণ করলেও মহাপাতক হয় তা জান?"

"মুখে উচ্চারণ করলে মহাপাতক, কিন্তু মনে? মনকে কেউ শাসিয়ে রাখতে পারে? যাক গে, ভাল মন্দ কিছুই বলব না আমি! আমার যা বলবার বলেছি।"

রাসু আপসের সুরে বলে, "অতই বা খাপ্পা হচ্ছ কেন বড় বৌ? তুমি ঘরণী গিন্নী, বলতে গেলে জোয়ান ব্যাটার মা। তোমার জায়গা কে কাড়ে? তবে লোক-স্যাখতা একটা কথা আছে তো? ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে—"

সারদা গম্ভীরভাবে বলে, "মা সিংহবাহিনীর নামে দিব্যি গেলেছিলে, সে কথা বোধ হয় ভুলেই গেছ?"

"ভুলে যাব কেন", রাসু অসন্তুষ্ট স্বরে বলে, "কিন্তু লোকে কি বলবে, সেটাও তো চিন্তা করতে হবে?"

সারদা আবার ঝপ করে উঠে বসে। বলে, "কেন, লোককে বোঝাবার উপায় নেই? লোক বোঝাতে কত কল-কাঠি আছে। লোককে বলতে পারবে না, কোনও সাধু-ফকির তোমার হাত দেখে বলেছে, ওই দ্বিতীয় পক্ষের পরিবারকে স্পর্শ করলে তোমার পরমায়ুক্ষয় যোগ আছে?"

ত্রিশ

সংসারসুদ্ধ সকলেই আশা করেছিল প্রস্তাবটা সারদার দিক থেকেই উঠবে। কারণ সত্যিই কি আর এতটা বেয়াক্কেলে আর চক্ষুলজ্জাহীন হবে সে? কিন্তু আক্কেল সম্পর্কে নিতান্ত উদাসীন হয়েই অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দিল সারদা। চক্ষুলজ্জার প্রকাশ দেখা গেল না।

তাহলে?

চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো ছাড়া তো উপায় নেই। কিন্তু সেই আঙুলটা বাড়ায় কে? যে মুখরা সারদা, সুযোগ পেলে গুরুজনকেও রেয়াত করে কথা কয় না। ঘোমটার মধ্যে থেকেই এমন কুটুস কামড়টি দেয়, তাতে কামড়াহতের সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরে যায়।

কাজেই আড়ালে আবডালে সমালোচনা উদ্দাম হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ এখনকার অবস্থা এই, সারদা যখনই যে কাজে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গিয়ে পড়ে, দেখে দু-তিনটি মুখ একত্র হয়ে গুঞ্জরণ করছে, সারদা গিয়ে পড়তেই ঝপ করে গুঞ্জরণটা থেমে যায়, এবং মুখগুলি বিভক্ত হয়ে গিয়ে সহসা যা হোক একটা কাজের কথা নিয়ে সোরগোল শুরু করে দেয়।

সারদা কি বোঝে না কি কথা হচ্ছিল ওঁদের? বোঝে বৈ কি। বুঝে মাথা থেকে পা অবধি 'রি রি' করে জ্বলে ওঠে তার। তবু বুঝতে না পারার ভানটাই চালিয়ে যায় সে। চালায় এই জন্যে, জানে 'বুঝতে পেরেছি' বলার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত ব্যাপারটা নিরাবরণ হয়ে

যাবে, যেটুকু চক্ষুলজ্জার আড়ালে আবডালে রেখে ঢেকে বলছে ওরা, সেটুকু ঘুচে গিয়ে প্রকাশ্য আক্রমণের পথে নেমে আসবে। কাজেই, ওই মুখোমুখিটা যতক্ষণ এড়ানো যায়!

তা ছাড়া এমনিতেই সারদা বিশেষ আত্মস্থ, গায়ে পড়ে কিছু বলতে যাওয়া বা জবাব দিতে যাওয়া ওর স্বভাবই নয়।···

কিন্তু ওঁরাই এবার গায়ে পড়ে বলতে আসার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। সারদার নিজের শাশুড়ী আর পিসশাশুড়ী শশীতারা। এই পিসশাশুড়ীটিকে জীবনে এই প্রথম দেখল সারদা। কারণ প্রায় বছর তিরিশ পরে তিনি পিত্রালয়ে এসেছেন। এতদিনের বিরতির কারণ অবশ্য বৈবাহিক-কলহ। তা দুই বৈবাহিকের একজন তো বহুদিন গত হয়েছেন, কুঞ্জ রামকালী আর শশীতারার বাবা জয়কালী। অপরটি, অর্থাৎ শশীতারার শ্বশুর নাকি এতদিন বেঁচে থেকে পুত্রবধূর পিত্রালয়ের পথের কাঁটাটি দৃঢ়মূল রেখেছিলেন।

সম্প্রতি তাঁর শ্রাদ্ধ চুকেছে, শশীতারা এত বছর পরে পিত্রালয়ে এসেছেন। এখন কিছুদিন থাকবেন।

এসে দিন দুই লেগেছে তাঁর সংসারের হালচাল বুঝতে, তারপর কার্যক্ষেত্রে নেমেছেন। সংসারে নিজের ভাই কুঞ্জর প্রতিপত্তিহীন অবস্থা, ও সতাতো ভাই রামকালীর 'বোলবোলাও দাপট'টা তাঁর বুকে শেল বিঁধেছে, এবং রাসুর 'প্রথম পক্ষ'র নির্লজ্জতায় গালে হাত দিতে বাধ্য হয়েছেন তিনি।

অবাক হয়ে বলেছেন, 'হ্যাগা, ও বুড়োমাগী গায়ের জোরে বর আগলে বসে থাকবে, আর সোমত্ত যুবতী বৌটা শাশুড়ীর ঘরে শুয়ে ঘরের 'আড়া' গুণবে? এই তোমরা চলতে দিচ্ছ? বলি ছেলেটার কথাও তো ভাবতে হবে? তার টাটকাটি রইল ধামা চাপা দেওয়া, আর শুকনো বাসিটায় মন সন্তোষ করে থাকার জুলুম! এতখানি বয়সে এমন কথা শুনি নি, দেখিনি।'

সারদার শাশুড়ী সুদীর্ঘ কালের অদেখা ননদিনীটিকে পরম আত্মীয়ের অধিকার দিয়ে বিগলিত স্বরে বলেন, 'দেখ ঠাকুরঝি, দেখ।· যত থাকবে ততই বুঝবে। একে তো তোমার দাদার ওই মিনমিনে স্বভাবের জন্যে আমি চিরদিন বড় হয়েও ছোট, হাঁড়ি-হেঁসেল ছাড়া আর কিছু দেখলাম না, তার ওপর বৌটি হয়েছেন জাঁহাবাজ। এমনিতে দেখবে ওকে কারুর সাতে-পাঁচে নেই, কিন্তু অহঙ্কারে মটমট। কারুর মতে চলাতে যাও দিকি? চলবে না। আর এমন রাশভারী প্রিকিতি, ডেকে একটা কথা বলতে সাহস হয় না!'

"তোমাদের হয় না, আমার হবে।" শশীতারা দৃঢ় রায় দেন, "এ নিঘিন্নেপনার বিহিত আমি করে ছাড়ব।"

বিহিত করতে ভাজকে নিয়ে এজলাসে এসে আসামীকে তলব করলেন শশীতারা।

সারদা এল, ঘাড় হেঁট করে বসে ঘোমটার মধ্যে থেকেই মৃদু অথচ স্পষ্ট স্বরে বলল,

"কি বলছ ?"

শশীতারা নড়ে চড়ে বসে হাতপাখা নাড়তে নাড়তে বললেন, "বলছি একটা নেয্য কথা। মনে কিছু ক'রো না। আক্কেল যাদের শরীরে নেই, তাদের আক্কেল করাতে হলে চোখে আঙুল দেওয়া ভিন্ন তো গতিও নেই। তাই দেব। তাতে চোখে যদি তোমার জ্বালা ধরে, আমায় কিন্তু দুষো না বাছা !"

সারদার কণ্ঠ থেকে একটু হাসির আওয়াজ পাওয়া গেল, 'তোমাদের দুষব ? এত কি আসপদ্দা আমার পিসীমা ?"

"আসপদ্দা !" শশীতারা পাখার বেগটা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, "না, আসপদ্দা তোমার দেখি না বটে, কিন্তু আক্কেলটুকুও তো তিলমাত্তর দেখি না বাছা ? নতুন বৌমার দিকটা তো একেবারে ভাবছ না !"

পরক্ষণে শশীতারা আর তার ভাজকে অবাক করে দিয়ে সারদার মৃদু কণ্ঠের স্পষ্ট স্বর ধ্বনিত হয়, "আমি না ভাবলাম, তোমরা এতজনে তো ভাবছ।"

"এতজনে ভাবছি ? আমরা এতজনে ভাবছি ? তুমি যে অবাক করলে বড় বৌমা ! আমরা ভেবে তার কী উবগারটা করতে পারব শুনি ? তুমি এদিকে আগুঘাতী হবার ভয় দেখিয়ে সোয়ামীকে শাসিয়ে রেখেছ, ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে সে, আমরা কি করব ? এই তো সিদিনকে রাত্তিরে ছোঁড়াকে হাত ধরে হিঁচড়ে এনে বললাম, 'রাসু, তুই ইদিকে আয়। ঘরের তো অভাব নেই বাড়িতে ? এ ঘরে নবাবী পালঙ্ক না থাক, সোয়ামী পেলে নতুন বৌয়ের এখন আমতক্তাই রাজতক্ত।' তা আনতে কি পারলাম ? ভয়ে সিটিয়ে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে গেল। বলে কি, 'তাহলে তোমাদের বড় বৌ আগুঘাতী হবে।'···হ্যাঁ গা, বাপ তো তোমার শুনলাম ভালমানুষ, তোমার এ কী ছোটলোকমি !"

শশীতারার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে যেন একটা তীব্র বিদ্যুৎ ঝলসে ওঠে। বিদ্যুৎটা আর কিছু নয়, সারদার চোখের আগুন। হঠাৎ মুখ তুলতে গিয়ে মাথার ঘোমটাটা খসে গিয়েছিল সারদার। ঘোমটাটা আবার একটু তুলে মুখ প্রায় অনাবৃত রেখেই সারদা বলে, "দশচক্রে ভগবান ভূত হয় পিসীমা, তার মানুষ তো কোন্ ছার ! পাকেচক্রে ভদ্দরলোকের মেয়ে ছোটলোক হয়ে উঠবে এতে আর আশ্চয্যি কি !"

একে মুখ খোলা, তাতে এই বাক্যি !

সারদার শাশুড়ী বোধকরি নিজের 'পোষ্ট' সম্পর্কে এবার সচেতন না হয়ে পারেন না। তাই নথপরা মুখ ঘুরিয়ে বলে ওঠেন, "মুখের ঘোমটা খুলে শাউড়ীদের সঙ্গে ঝগড়া করছ তুমি বড়বৌমা ! বুকের পাটা তোমার এত কিসের ! জান, জন্মের শোধ বাপের বাড়ি বিদেয় করে দিতে পারি তোমায়।"

এ এজলাসটা বোধকরি সারদার ধারণার জগতে ছিল, আর সওয়ালের জন্যে প্রস্তুতও ছিল সে। তাই তীক্ষ্ণ একটু হাসির সঙ্গে বলল, "জন্মের শোধ যদি যেতেই হয় তো বাপের

বাড়ি যাব কেন? যমের বাড়ি তো কেউ কেড়ে নেয় নি!"

শশীতারা এবার চাকা নথ ঘুরিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে ওঠেন, 'যমের বাড়ির ভয় দেখিয়ে আমাদের জব্দ করতে পারবে না বড়বৌমা, আমরা রাসু নই। বলি ওই যে একটা বড়ঘরের মেয়ে এসেছে, যার বাপ ঘর-বসতের প্রব্যিতে বাড়ি ভরিয়ে দিয়েছে, তার দাবি-দাওয়াটা মানবে না তুমি? আর ওই রূপের কান্তি টাটকা পদ্মফুল, সোয়ামীকে তুমি এই ভোগ থেকে বঞ্চিত করছ, এতে যে তোমার নরকেও ঠাঁই হবে না!"

হঠাৎ হেসে উঠে সারদা দিব্যি স্পষ্ট গলায় বলে, "ভালই তো পিসীমা! নরকে ঠাঁই না হলে সগ্‌গে যাব। দুটো বৈ তো আর দশটা জায়গা নেই!"

দুটো গিন্নীকে হতবাক করে দিয়ে উঠে দাঁড়ায় সারদা। বলে "তালের বড়া খেতে চেয়েছে ছোটঠাকুরপো, তালগুলো মেড়ে রাখিগে।"

অর্থাৎ তোমাদের কাঠগড়া থেকে ফসকে পালাচ্ছি এবার।

শশীতারা বোঝেন, যেমন ভেবেছিলেন ঠিক তেমনটি নয়। ধিক্কার দিয়ে বিচলিত করে কার্যসিদ্ধি করা যাবে না। অন্য চাল চালেন তিনি। বলেন, "সভ্যতা-ভব্যতার পাঠশালায় দেখছি একেবারেই পড়নি তুমি বড়বৌমা! গুরুজনের সামনে থেকে অনুমতি না নিয়ে উঠতে, আমি আমার শ্বশুরবাড়ির দিকের কোন ঝি-বৌকে কখনও দেখি নি। আমরা নিজেরাও—গুরুজন ডেকে একটা কথা শুধোলে ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ হুঁ' করে উত্তর দিয়েছি, উঠে যেতে না বললে ঘাড় গুঁজে বসে থেকেছি।"

সারদাকে এতেও অপ্রতিভ করা যায় না, সে তেমনি মৃদু হাসির সঙ্গে বলে, "বসবার অবকাশ থাকলে তো বসে থাকাও একটা সুখ পিসীমা!"

"হুঁ! কথার পিঠে কথা দেওয়াই তোমার রোগ দেখছি। হাবাগঙ্গা শাউড়ী পেয়েছ, তাই এমন দুরবস্থা হয়েছে। যাক বলি শোন, আপস মীমাংসার কথাই কইছি। ঘরণী গিন্নী বেটার মা তুমি, অনেকদিন তো সোয়ামীকে ভোগ করলে! ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিলে চলবে কেন? ওরও আগুন সাক্ষী বিয়ে। আমি বলি কি একটা পালা ঠিক করো।"

মনে মনে হাসেন শশীতারা, একবার যদি রাসুকে নতুনের নেশা ধরিয়ে দেওয়া যায়, তার পর দেখা যাবে তোমার কত আদর থাকে! দেখা যাবে কোথায় থাকে তোমার ঐ তেজ! ওই বৌয়ের আস্বাদ পেলে, তুমি গলায় দড়ি দিলে, কি জলে ডুবলেও কিছু এসে যাবে না রাসুর।

'পালা'র বুদ্ধিটা মাথায় আসার জন্যে নিজেকে নিজে তারিফ করেন শশীতারা।

কিন্তু সারদা সে তারিফ বেশীক্ষণ বজায় থাকতে দেয় না। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, "তোমাদের অনুমতি না নিয়েই যাচ্ছি, পিসীমা! এসব নিচু কথা শুনতে মাথা কাটা যাচ্ছে।"

"অ্যাঁ অ্যাঁ? কী বললি? আমরা নীচু কথা কইছি? ছোটলোকের বেটি, হাঘরের মেয়ে! বলতে জিভ আড়িয়ে গেল না?" শশীতারা ধেই ধেই করে নেচে ওঠেন, "খুব

উঁচু কথাটা তুমি কইছ বটে! একলা খাব, একলা পরব, একলা ভোগ করব, এই তো মহত্ত্বের কথা! 'পালা' করাটা নিচু কথা হল! বলি তাতে তো দুই দিকই রক্ষে হয়।"

সারদার বোধকরি কী একটা কঠিন কথা মুখে আসে, কিন্তু সেটা কষ্টে দমন করে বলে, "দু দিক রক্ষের দরকার নেই, একদিকই রক্ষে করো তোমরা।"

এরপর আর দাঁড়ানো চলে না।

মান-সম্মান বজায় রাখা শক্ত হবে। সারদার নিজের চোখই তাকে অপদস্থ করে ছাড়বে।

দু-দুটো গিন্নীকে পাথর করে দিয়ে চলে যায় সারদা।

এই চরম অপমানের মুহূর্তে ভুবনেশ্বরীকে মনে পড়ে তার। সারদার ভাগ্যটিই মন্দ, নইলে অমন একটা স্নেহের আশ্রয় হারায় সে? ভুবনেশ্বরীর কি এখন মরবার বয়স?

হ্যাঁ, সারদা নির্লজ্জ, সারদা বেহায়া, সারদা স্বার্থপর। কিন্তু পরার্থপরতায় উদার হবার ভাগ্য সে পেল কবে? ভাগ্য যে তাকে বঞ্চনাই করেছে। আর সে বঞ্চনা এসেছে তার গুরুজনদের হাত থেকেই।

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা সম্মান তার আসবে কোথা থেকে? বিষ-পাত্রের বিনিময়ে কে অমৃত-পাত্রের উপহার নিয়ে হাত বাড়ায়?...

শশীতারা গালে হাত দিয়ে অভয়াকে উদ্দেশ করে বলেন, "মান্যে বড় গুরুজন তুমি বৌ, তোমার পায়ের ধুলো নেবারই কথা। তবু বলি তোমার পায়ের ধুলোয় গড়াগড়ি দিতে ইচ্ছে করছে। এই কাল্‌কেউটে নিয়ে ঘর করছ তুমি?"

কুঞ্জ-গৃহিণী কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেন, "অদেষ্ট ঠাকুরঝি!"

আসল কথা, "অদেষ্ট"টা তাঁর নিজের কাছে ধরা পড়েছে এই সম্প্রতি। ননদিনীর দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে এবং এযাবৎ যত বোকামি করে এসেছেন, সুদে-আসলে সেটা উসুল করে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে তাঁর!

"ওই কালনাগিনীর দিক থেকে রাসুর মন একেবারে ঘুরিয়ে দিতে পারি, এমন "ওষুধ" আমার জানা আছে বৌ—" শশীতারা চাপা হিংস্রস্বরে বলেন, "অব্যর্থ তুক। রাসু তোমার ছটফটিয়ে এসে নতুন বৌর পায়ে এসে পড়বে, বড়বৌকে জন্মের বিষ দেখবে!"

ভাজ অবাক হয়ে বলেন, "সত্যি ঠাকুরঝি, তেমন ওষুধ তোমার জানা আছে?"

শশীতারার মুখে একটি বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে, "জানা না থাকলে আর তোমার নন্‌দাইকে অমন কেনা গোলাম করে রেখেছি? বয়সকালে কি কম দুর্দান্ত ছিল নাকি? সম্পর্ক অসম্পর্ক মানত না, রূপসী মেয়েমানুষ দেখলেই উন্মাদ হয়ে উঠত। এক বাগদীবুড়ী শেখাল আমায় সেই তুক, তার পর থেকে এমন নেলাখেপা হয়ে গেল যে, আমি বৈ আর কিছু জানে না। আমি উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে, খেতে বললে খায়, ঘুমুতে বললে ঘুমোয়। আমার মুখের দিকে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকে। আমি বলি থাক্‌,

ওই আমার ভাল, নাই বা রোজগার করল, নাই বা হট্টগোল করে বেড়াল, ভাতের তো অভাব নেই ঘরে! আমার আঁচলটিতে তো বাঁধা রইল জন্মের শোধ।"

রাসুর মা ইতস্ততঃ করে বলেন, "কোন শেকড়বাকড় না কি? রাসুর কোন ক্ষেতি হবে না তো?"

"শোন কথা! সে কাজ আমি করব? এ আর কিছুটি নয়, শুধু একজনের থেকে মন ঘুরে আর একজনের ওপর পড়া। তাহলে বলি শোন, তোমার কপালক্রমে এই পরশুই অমাবস্যে আসছে—একেবারে দুপুর রাতে নতুন বৌমা যদি এলোচুলে বিবস্ত্র হয়ে একটা কলাগাছের গোড়ায় এক ঠোকায় একটি ছুঁচ বিঁধে দিয়ে আসতে পারে, তাহলে—"

কথা শেষ হয় না শশীতারার, সারদার ছেলে দৌড়ে এসে বলে, "তোমরা শীগ্‌গির চলে এস, মেজঠাকুদ্দা অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

মেজঠাকুদ্দা!

মানে রামকালী?

যিনি জ্ঞানের পারাবার! রামকালী অজ্ঞান হয়ে গেছেন, এ কী অদ্ভুত ভাষা?

সকলেই দৌড়য়।

তবে কি রামকালীও ভুবনেশ্বরীর মত বিনা নোটিশে -

ব্যাপারটা এত জানাজানি হল, ভিতর বাড়িতে পড়ে গিয়ে। বারবাড়িতে পড়লে অন্ততঃ মেয়েমহলের দল এভাবে ধারে কাছে গিয়ে হা-হুতাশ করতে পারত না।

যাদের স্পর্শের অধিকার আছে, তারা মুখে মাথায় জল ঢেলে গঙ্গা বইয়ে দিল, বাড়িতে যত হাতপাখা এনে জড় করল। এ শুধু দুর্ভাবনাই নয়, এক প্রকার রোমাঞ্চও। যে মানুষটার মুখের দিকে কেউ কোনদিন স্পষ্ট করে তাকিয়ে দেখবার সাহস পায় নি, সে মানুষটা অসহায় ভাবে চোখ মুদে পড়ে আছে, তাকিয়ে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে কেমন তার নাকমুখ, করুণা করা যাচ্ছে তাকে জল দিয়ে বাতাস দিয়ে, এটা প্রায় সুখের পর্যায়েই পড়ে।

সারদাও একখানা হাতপাখা নিয়ে এসেছিল, আর দূর থেকে বাতাস করছিল, এবং ভাবছিল, আশ্চর্য, এতদিন ঘর করছি, মানুষটা কেমন দেখতে তা তো কোনদিন দেখি নি। একেই কি বলে "তপ্ত-কাঞ্চন-বর্ণাভাং—"

ভয়ঙ্কর একটা আবেগের আলোড়নে চোখে ছলাৎ করে জল এসে যায় সারদার, "এ হেন স্বামীকে ফেলে চলে যেতে হয়েছে মেজখুড়ির! আর তাই বুঝি স্বর্গেও তিষ্ঠোতে পারছেন না, আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যেতে চাইছেন নিজের কাছে? মনের মত স্বামী এমনি জিনিস! তার পর চোখ মুছে ভাবল, মেজখুড়ো আমাদের মায়া কাটিয়ে চললেন।

কিন্তু আপাততঃ দেখা গেল সারদার আশঙ্কা অমূলক। চিরশান্ত চিরসুকুমার ক্ষীণশক্তি ভুবনেশ্বরীর আকর্ষণ মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে জোরালো হল না।

রামকালী চোখ মেললেন।

চারিদিকে এতগুলো মুখ দেখে ভুরুটা ঈষৎ কুঁচকে গেল, আবার চোখ বুজলেন। আর অনেকক্ষণ পরে বললেন, "আমাকে বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে বিছানা করে দাও।"

হ্যাঁ, বাইরেই শুলেন রামকালী। মেয়েদের এই হা-হুতাশ তাঁর অসহ্য, নিজের কাছে নিজে ভয়ানক লজ্জিত হচ্ছেন। রামকালীর পক্ষে এ হেন দুর্বলতা ক্ষমার অযোগ্য। রামকালী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলেন, পাঁচজনে মুখে-মাথায় জল দিল, হা-হুতাশ করল, এর চাইতে ঘৃণ্য ব্যাপার আর কি আছে!

এ রকমটা হল কেন?

অনেকদিন থেকেই যেন ভিতরে ভিতরে একটা ক্ষয় চলছে, যেন একটা ভাঙনের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন। শরীর খারাপ হয়ে গেছে। সেই থেকেই গেছে।

রামকালীর মধ্যেও একটা আবেগের আলোড়ন উঠল। সেই ছোটখাটো মানুষটা, যাকে রামকালী কোন দিনই পুরো একটা মানুষ বলে গণ্য করেন নি; সে যে দৃঢ়কঠিন রামকালীর ভিতরের এতটা শক্তি হরণ করে ফেলবে, এ রামকালীর ধারণার মধ্যেই ছিল না।

ভুবনেশ্বরী সম্পর্কে যেন তাঁর একটা বাৎসল্যমিশ্রিত প্রীতি ছিল, জীবনের কোন আদর্শে, কোন চিন্তায়, কোন সুখদুঃখে তাকে ডাক দেন নি। আজ মনে হচ্ছে, সম্পূর্ণ বিচার করেন নি রামকালী স্ত্রীর উপর। চিরদিন যাকে ছোট ভেবে এসেছেন, সে হয়তো তেমন ছোট ছিল না, যাকে সামান্য ভেবেছেন, সে হয়তো সামান্য নয়। রামকালী যদি তাকে স্নেহের সঙ্গে কিছু শ্রদ্ধাও দিয়ে হৃদয়ের সহধর্মিনী করে তুলতে পারতেন, হয়তো সারাটা জীবন এতখানি নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতেন না।

মৃত্যুর মহিমায় ভুবনেশ্বরী যেন অনেক বড় হয়ে উঠেছে।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই সংকল্প করলেন রামকালী, শীঘ্রই তীর্থযাত্রা করবেন। বায়ু-পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে।

বায়ু-পরিবর্তন ভিন্ন ভাঙন-ধরা স্বাস্থ্যের ক্ষয় পূরণ সম্ভব নয়।

তীর্থযাত্রার সংকল্প ঘোষণা করলেন রামকালী।

দু-তিনটে দিন রামকালী সম্পর্কে উদ্বেগ নিয়েই দিন গেছে সকলের, রাসু বারবাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপেই রাত কাটিয়েছে কাকার নিষেধ সত্ত্বেও, চুপি চুপি—তাঁর অলক্ষ্যে।

আজ আবার স্বাভাবিকত্ব এল সংসারে। যদিও রামকালীর তীর্থযাত্রার সংকল্পে ভয় ভাবনা আতঙ্ক দেখা দিল, তবু সেটা তো আজই নয়। তীর্থযাত্রার অনেক তোড়জোড়।

রাসুকে আজ শশীতারা আবার ডেকে পাঠালেন। বললেন, "দেখ, পুরুষের চামড়া যদি গায়ে থাকে তো, বৌয়ের নাকেকান্নায় ভিজিসনে। আপ্তঘাতী অমনি হলেই হল! আজ

তুই ইদিককার ঘরে শুবি।”

তিনতিনটে রাত বাইরের ঘরে কাটিয়ে রাসুরও মন চঞ্চল, এ প্রস্তাবে আরও চঞ্চল হয়ে ওঠে। অথচ সায় দেবার উপায় নেই। এ যেন পেটে খিদে, সামনে সুখাদ্য, অথচ মুখ বাঁধা!

তা ছাড়া রাসু সারদা নয় যে, এসব কথার পিঠে কথা কইবে। লজ্জায় ঘাড় হেঁট করে থাকে সে। শশীতারা বোঝেন মৌনং সম্মতি লক্ষণম্! হৃষ্টচিত্তে বলেন, “তোকে কিছু ভাবতে হবে না, তুই শুধু খাওয়ার পর আমার ঘরে এসে বসবি। পিসি-ভাইপোয় গল্প করবার ছুতোয় রাতটা একটু ঘোর করে দেব, তার পর—আহা নতুন বৌটার মনের দিকে একটু তাকাবি না তুই? ভাববি না তার কথা?”

রাসুর চোখে জল এসে পড়ে, সে তাড়াতাড়ি সরে যায়। নতুনবৌয়ের কথা ভাবছে না সে? অহরহই তো ভাবছে।

কিন্তু যাকে নিয়ে এত দুর্ভাবনা শশীতারার, সে কোথায়? পাটমহলের লক্ষ্মীকান্ত বাঁড়ুয্যের নাতনী পটলী।

সে যেন একটা অদ্ভুত ভয়ে কাঠ হয়ে আছে। এতদিনে অবশ্য সে চিনে ফেলেছে কে তার সতীন। সতীনকে যে এতটাই ভীতিকর মনে হয় তা বুঝি ধারণা ছিল না তার। সারদার মুখের দিকে কোন দিন ভাল করে তাকাতে পারে না সে। কথা বলা তো দূরের কথা।

অথচ সারদা হরদমই তার সঙ্গে কথা বলে। সংসারের সবাইকে খেতে দেওয়ার ভার যে সারদারই হাতে—অগত্যাই পটলীকেও তার হাতে পড়তে হয়েছে। তার শাশুড়ী দু-চার দিন নিজের এক্তারে রাখবার চেষ্টা করে অক্ষমতাবশতই হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

সারদা ফি হাত ডাকে, “নতুনবৌ খাবে এসো,···নতুনবৌ এখন মুড়ি খাবে?··নতুনবৌ তুমি মাছের পেটি ভালবাস না দাগা?···নতুনবৌ তুমি ছ্যাঁচা আমের আচার খাও না?··· নতুনবৌ আচারের তেল দিয়ে কৎবেল মেখে খেয়েছ কোনদিন? খাবে তো বল মাখি।”

নতুনবৌ যে কার নতুনবৌ সে কথা যেন জানে না সারদা। কুটুম্বর মেয়ে এসেছে, তাকে আদরযত্ন করছে ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী।

আজও ফুলুরি আর তিলপিটুলি বেগুনভাজা করে এক বাটি হাতে নিয়ে ডাকতে এসেছিল সারদা নতুনবৌকে, “খাবে গরম গরম?”

পটলী মাথা নেড়ে বলল, ‘না!’

সারদা একটু আশ্চর্য হল। কারণ নতুনবৌ কোনদিন কিছুতেই ‘না’ করে না। করে না বলে মনে মনে বরং একটু কৌতুকই অনুভব করে সারদা। ভাবে, ভাল করে খাইয়ে-দাইয়ে ঠাণ্ডা করে রাখা যাবে ওকে।

পটলী যে ভয়েই ‘না’ করতে পারে না, সেটা বোঝে না সারদা। হয়তো বোঝারই কথাও

নয়। আজ 'না' শুনে বলে, "কেন গো খাবে না কেন, খিদে নেই ?"

পটলী মাথা আরও নিচু করে মাথাটা আর একবার নাড়ে।

সারদা একটু চুপ করে থেকে মুচকে হেসে বলে, "কেন, বল তো নতুনবৌ ? তোমার তো কখনও অগ্নিমান্দ্য দেখি নে।"

এরপর নতুন বৌয়ের দিক থেকে কোনও সাড়া আসে না, শুধু তার ঘাড়টা আরও নুয়ে পড়ে। সারদা চলে যেতে উদ্যত হয়ে বলে, "তবে নয় দুটো তিলেরনাড়ু পাঠিয়ে দিই গে, খেয়ে জল খাও।"

এবার হঠাৎ নতুনবৌ বলে ওঠে, "তুমি আমায় এত যত্ন করো কেন ?"

সারদা বোধকরি এ প্রশ্নের জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না, তাই হঠাৎ একটু থতমত খেয়ে যায়, তবে সে মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ একটু হেসে বলে, "করব না কেন, যত্ন করবারই তো সম্পর্ক গো !"

এতক্ষণ ঘাড় নিচু ছিল, এবার বোধ করি অজ্ঞাতসারেই মুখটা তুলে ফেলে পটলী, আর দীর্ঘ পল্লবাচ্ছন্ন দুটি চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে তার। সে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা অসহায় ভর্ৎসনা। সে দৃষ্টি সারদার উপর নিবদ্ধ রেখেই বলে, "তামাশা করছ ?"

মুখরা সারদা সহসাই যেন মূক হয়ে যায়। ওই দুফোঁটা চোখের জলের দিকে তাকাতে পারে না, আর ভগবান জানেন কোন এক অদ্ভুত হৃদয়-রহস্যে সারদার নিজের চোখ দুটোও জলে ভরে ওঠে।

তবু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে, "করলামই বা একটু তামাশা ? করতে নেই ?"

পটলীর বোধকরি এতক্ষণে খেয়াল হয় যে, তার চোখ দুটো শুধু দু ফোঁটা জল ফেলেই ক্ষান্ত হয় নি। তাই সে-দুটোকে নামিয়ে ফেলে এবার। আর কষ্টে গলার স্বর পরিষ্কার করে বলে, "আমি তো তোমার শত্তুর, আমাকে বিদেয় করে দাও না ? তুমি বাঁচ, আমিও বাঁচি।"

সারদা ঈষৎ বিষণ্ণ কৌতুকে বলে, "আমি না হয় বাঁচব, তোর বাঁচবার হেতু ?"

"তোমার বুকের পাথর হয়ে আর সংসারসুদ্ধ সকলের দয়ার পাত্র হয়ে থাকতে হয় না, সেই বাঁচন !"

সারদা আর একবার মূক হয়। দেখে নতুন বৌয়ের হেঁটমুণ্ডের অন্তরাল থেকে জল ঝরে ঝরে তার কোলের-উপর-জড়ো-হয়ে-থাকা ফর্সা ফর্সা ফুলো ফুলো দুখানি করপল্লবের ওপর পড়েই চলেছে।

স্তব্ধ হয়ে অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে থাকে সারদা, তারপর সহসাই আত্মস্থ হয়ে শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলে, "চোখ মোছ, নতুনবৌ, আর কাঁদতে হবে না।"

"তোমার পায়ে ধরি দিদি, আমার পাটমহলে পাঠিয়ে দাও।"

"শোন কথা, আমি কি পাঠিয়ে দেবার কর্তা?" সারদা হেসে ওঠে, "বলে আমার ওপরই হুকুমজারি হয়েছে—'জন্মের শোধ বিদেয়!' সে যাক, বলি এত রূপ-যৌবন নিয়ে কেঁদে মরবি আর হেরে পালাবি কি লো? লড়াই করে সতীনের কাছ থেকে বর কেড়ে নিবি নে?"

"লড়াই-টড়াই আমি কিছু চাই না দিদি!"

"লড়াই চাস না? কি মুশকিল, তবে তো খয়রাত করতে হয়," সারদা তেমনি বিষণ্ণ কৌতুকে বলে, "তুই দেখছি আমার সব মজা মাটি করে দিলি! লড়াই করতে বসলে জোরের পরীক্ষে হয়, দান-খয়রাত করতে গেলে যে বেবাক সবটাই তুলে দেওয়া ছাড়া গতি থাকে না!"

"আমার কিছু চাই না দিদি!"

ব্যাকুল আবেগে উচ্চারণ করে নতুনবৌ।

সারদা হাসে, "কিছু চাস না? বরও চাস না?"

"না।"

সারদা বলে, "কিন্তু জগতের কি নিয়ম জানিস, না চাইলে সব জিনিস মেলে, চাইতে বসলেই হাতছাড়া?...ইস্, কথা কইতে কইতে এমন খাসা তিলপিটুলী বেগুনভাজাগুলো নেতিয়ে গেল। খা, খেয়ে ফেল্, মন ভাল হবে।"

"মেজঠাকুদ্দা!"

রামকালী একখানা সরু খাতার উপর ঝুঁকে পড়ে আসন্ন তীর্থযাত্রার হিসেবের খসড়া করছিলেন, হঠাৎ রাসুর ছোট ছেলের এই ডাকে চমকে উঠে স্নেহকোমল স্বরে বললেন, "কি দাদা?"

"মা বলছে, মা তোমার কাছে ভিক্ষে চাইবে।"

এ আবার কী অভূতপূর্ব কথা!

রামকালী বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখেন।

দরজার ওপাশে রাসুর বৌয়ের উপস্থিতি টের পান। প্রায় বিচলিত স্বরে বলেন, "কি বলছ দাদা, বুঝতে পারলাম না তো!"

এবার মাধ্যমের ভূমিকা গুরুত্ব হারায়। মাধ্যমকে মাধ্যম মাত্র করে সারদা মৃদু কণ্ঠে বলে, "খোকন বল, মা বলছে কখনো তো কিছু চায় নি মা, বাড়ির বড় বৌ, একটা ভিক্ষে চাইছে—"

রামকালী ধারণা করেন, এ আর কিছু নয়, রাসুর দ্বিতীয়পক্ষ-ঘটিত নাটক। নির্ঘাৎ সপত্নী-অসহিষ্ণু এই মেয়েটা সতীনকে তার পিত্রালয়ে পাঠানোর প্রস্তাব করতে এসেছে। বিরূপ চিত্তে গম্ভীর হাস্যে বলেন, "ভিক্ষেটা কি, সেটা না জানলে তো সাদা কাগজে দস্তখত

করা যায় না বড় বৌমা! দেবার ক্ষমতা যদি আমার না থাকে?"

"খোকা বল, আপনি ইচ্ছে করলেই হয়।"

রামকালী যদিও রাসুর বৌয়ের এই অসমসাহসিকতায় স্তম্ভিত হন, তবু ঈষৎ চমৎকৃতও হন। হঠাৎ একটা অতি অসমসাহসী মেয়ের কথা মনে পড়ে গিয়ে মনটা শিথিল হয়ে যায়। বলেন, "মাকে বল দাদাভাই, ইচ্ছে করবার মত হলে অবশ্যই করব।"

"খোকা বল, আপনি তীর্থে যাচ্ছেন, আমার মাকে সঙ্গে নিন।"

এ আবার কি কথা!

এ যে রামকালীর ধারণার অগোচর, স্বপ্নের অগোচর। এই কথা বলতে এসেছে রাসুর বৌ! মেয়েটা পাগল নাকি! তবে নাকি নিতান্তই হাস্যকর অলীক কথা, তাই ঈষৎ কৌতুকের সুরে বলেন, "তোমার মাকে নিয়ে যাই এত সাধ্যি কি আমার আছে দাদাভাই? তুমি বড় হও, মাকে নিয়ে যাবে।"

"মেজঠাকুদ্দা, মা বলছে তামাশা করে উড়িয়ে দিলে হবে না, মা সত্যি ভিক্ষে চাইতে এসেছে।"

রামকালী আর মাধ্যমকে গ্রাহ্য করেন না, বলেন, "বড় বৌমা, তোমার প্রার্থনাটা যে বড় অসম্ভব। আমি পুরুষমানুষ, কোথায় উঠব, কোথায় থাকব, কি ভাবে ঘুরব—"

"মেজঠাকুদ্দা, মা বলছে, মা কষ্ট করতে হারবে না। তোমার রান্না-করা, বাসন-মাজা, এর জন্যেও তো একটা লোক চাই? মা সব করে দেবে।"

"দাদাভাই, তোমার মা ছেলেমানুষ, সবটা বুঝতে পারছেন না। সম্ভব হলে আমাকে দুবার বলতে হত না। তোমার মাকে বল, বাড়ির বড় বৌ বলে আমার কাছে একটা আবদার করলেন, রাখতে পারছি না, এটা আমারও কষ্ট। আমি তার বদলে তাঁর নামে খাসে কুড়ি বিঘে ধানজমি লেখাপড়া করে দেব। তার আদায় থেকে উনি যা খুশি করতে পারবেন। আর তুমি যখন বড় হবে—"

"খোকা বল বাবা, বিষয়-সম্পত্তিতে মার কোন দরকার নেই।"

খাসে কুড়ি বিঘে ধানজমি!

এতেও একটু প্রলোভিত হল না মেয়েটা? আশ্চর্য তো! সত্যি বলতে কি, এ সংকল্প রামকালীর সহসা আজকের নয়। কিছুদিন থেকেই ভাবছিলেন তিনি, এই ধরনের একটা কিছু করবেন। ওই মেয়েটাকে তিনি যতই সাধারণ হিংসুটে মেয়েছেলে ভেবে আসুন, ওর সম্পর্কে কোথায় যেন একটু অপরাধবোধ তাঁকে হৃদয়ের গভীর স্তরে পীড়িত করত! তাই ভাবতেন ক্ষতিপূরণার্থে—

কিন্তু মেয়েটা বলে কি! বিষয়-সম্পত্তিতে তার দরকার নেই?

একটু চুপ করে থেকে বলেন, "তবে আর কি করব বল দাদাভাই! যাতে লোকে নিন্দে করতে পারে এমন কাজ কি করে করা যায়?"

"মেজঠাকুদ্দা, তুমি তো লোকনিন্দেকে ডরাও না!"

"লোকনিন্দেকে ডরাই না?"

রামকালী যেন হঠাৎ অদ্ভুত অজানা একটা রহস্যের রাজ্যের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন! এরা সব রামকালীকে ভাবে কী। রামকালী সম্পর্কে, রামকালীর অপরিচিত যে একটা জগৎ আছে, তাদের ধারণাটা কি! একটা কৌতুকের বিস্ময়ে স্বল্পবাক রামকালী আজ একটু বেশী কথাই বলে ফেলছেন।

"লোকনিন্দেকে ডরাই না, একথা কে বলে দাদু? ডরাই বৈকি! সত্যি নিন্দের কাজ করলে—" রামকালীও কথা সমাপ্ত করতে করতে ভাবেন—শেষ করতে গিয়ে থামেন। এই অবসরে এতক্ষণের নম্র আর মৃদু চাপা কণ্ঠস্বরটা প্রায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে, "খোকা বল, আপনার যদি একটা দুঃখিনী মেয়ে থাকত, তাকে তীর্থে নিয়ে গেলে লোকে নিন্দে করত?"

রামকালী স্তব্ধ হয়ে যান।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন, "আচ্ছা দাদু, তোমরা ভেতরে যাও। আমাকে একটু ভাবতে দাও।"

হ্যাঁ, ভাববেন রামকালী। অনেক কিছু ভাববেন। এইটুকু মেয়েটা কুড়ি বিঘে ধানজমির মোহ ত্যাগ করে তীর্থে যেতে চায় কোন্ মানসিক অবস্থায় তা ভাববেন, আর ভাববেন মোক্ষদাকে সঙ্গে নিয়ে রাসুর বৌয়ের প্রার্থনাটা পূরণ করা যায় কি না! মোক্ষদার হাত ভেঙেছে, পা-টা তো মজবুত আছে! তাঁর জীবনেও তো কখনো কিছু হয় নি। এ কর্তব্যটা করা উচিত ছিল রামকালীর!

রান্না-ভাঁড়ার ঘরের জীবগুলো সম্পর্কে এত বেশী করে কখনও ভাবেন নি রামকালী।

একটা মেয়ে তাঁকে মাঝে মাঝেই ভাবাত। অনেকদিন সে রামকালীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। আশ্চর্য হয়ে ভাবছেন রামকালী, কতদিন তার কথা ভাবি নি!

সে পাছে ভাবে বলে রামকালীর অসুখের খবর দেওয়া হয় নি। কিন্তু তীর্থ যাত্রার খবর? সেটাও কি না দিলে চলবে?

একত্রিশ

জ্বর-জ্বর!

পক্ষকাল কাটল।

উত্তরোত্তর বাড়ছে বৈ কমছে না। ক্রমশঃ বিকার ধরল। হাত মুঠো করে আস্ফালন করছে রোগী, বিছানায় তেড়ে তেড়ে উঠছে। দু-দুটো লোক দুদিকে ঠায় বসে আছে রোগীকে বিছানায় চেপে ধরে রাখতে।

আর একজন তো অবিরত পানাপুকুরের ঠাণ্ডা জল এনে কলসী কলসী ঢালছে রোগীর মাথায়। কবিরাজ এসে ওষুধ দিচ্ছেন বটে, কিন্তু যেভাবে মুখ প্যাঁচা করে আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ছেন, তাতে ওষুধ সম্পর্কে ভরসা বোধ করছে না কেউ।

এদিকে বাড়িতে রথদোলের ভিড়!

পাড়ার লোকের যেন খেয়ে ঘুমিয়ে স্বস্তি নেই। তারা প্রতি মুহূর্তে চরম মুহূর্তের অপেক্ষায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। নাটকের শেষ দৃশ্যটা পাছে ফসকায়! অবিশ্যি অহিতৈষী কেউ নয়। সকলেই নিরীহ নবকুমারকে ভালবাসে! তেমন তেমন কেউ ওর নামে পূজো মানত করেছে, "গা শেতল" হবার আবদার নিয়ে গঙ্গাজলের ঘড়ার মধ্যে পাঁচ কড়া কড়ি ফেলে রেখেছে, আর ওলাইচণ্ডীতলা থেকে নিত্য মায়ের চরণামৃত এনে যোগান দিচ্ছে।

বাঁড়ুয্যে গিন্নীর ওই সবেধন নীলমণিটুকুর প্রাণের জন্য উদ্বেগ উৎকণ্ঠার আর অন্ত নেই লোকের! তবু আশা যখন ছাড়তেই হচ্ছে, বিশেষ নাট্যমুহূর্তটিকে ছাড়বে কেন?

অতএব নিজের নিজের সংসারের রান্না-খাওয়া সংক্ষিপ্ত করে এ বাড়ির হাজরেটা বজায় রাখছে সবাই। তা ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই তো এক-এক জন অভিজ্ঞ চিকিৎসক! সে চিকিৎসা-বিদ্যা কাজে লাগাবার যখন সুযোগ পাওয়া গেছে, কাজে লাগাবে না?

প্রকৃত পক্ষে এখন কবিরাজী চিকিৎসা বাতিল হয়ে গেছে, পাড়ার গিন্নীদের চিকিৎসাই চলছে। গতকাল হুটু স্যাকরার মার ব্যবস্থাপনায় পেটে পচা পুকুরের শ্যাওলার প্রলেপ দেওয়া হচ্ছিল। কারণ হুটুর মার এক ভাসুরপোর নাকি ঠিক এই অবস্থায় ওই দাওয়াই অব্যর্থ হয়েছিল।

না হবেই বা কেন?

কথায় বলে "মুড়ি আর ভুঁড়ি।" দুটোর মধ্যে দূরত্ব বেশ খানিকটা থাকলেও সম্বন্ধ যে অবিচ্ছেদ্য। এক জনকে ঠাণ্ডা করতে পারলেই আর এক জন ঠাণ্ডা হতে বাধ্য। তাই পেটে শ্যাওলার প্রলেপ চাপিয়ে চাপিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করে আনবার চেষ্টা চলছিল—মাথায়-চড়ে-ওঠা রক্তকে চড় চড় করে নামিয়ে আনতে।

কিন্তু হুটুর মার কপাল! অতবড় অব্যর্থ প্রয়োগটাও বিফল হল। রোগী বিছানায় মাথা ঘষটাতে শুরু করল।

আজ তাই হরি ঘোষালের গিন্নীর দাওয়াই চলছে। গায়ের তাপ "ধান দিলে খৈ ফুটছে", তাই ঘোষাল-গিন্নী বিধান দিচ্ছেন সপসপে করে ভেজানো ন্যাকড়ায় রোগীকে আষ্টেপৃষ্টে মুড়ে তার উপর জোর জোর করে পাখার বাতাস লাগাতে। সেই বাতাসে ন্যাকড়া শুকিয়ে উঠলেই আবার তাতে জলের আছড়া।

রোগী জ্ঞানশূন্য, অতএব সেবিকারা বাক্‌বিন্যাসে ভয়শূন্য। ঠিক এই অবস্থায় আর এই এই লক্ষণে কার জানাশোনা কটি রোগীর স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে তারই হিসেবনিকেশের সঙ্গে সঙ্গে পাখা চলছিল উদ্দাম বেগে। নীলাম্বর বাঁড়ুয্যে অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ "বুক

কেমন করছে" বলে পাশের ঘরে গিয়ে শুয়েছেন, সদু তাঁর চোখেমুখে জল দিচ্ছে, এমন সময় এলোকেশীর গলায় মরাকান্না উঠল।

যাঁরা খোদ রোগীর ঘরে বসে, তাঁরা বুঝলেন, "মাগী আর পারছে না, চেপে থেকে থেকে বুক ফেটে যাচ্ছে!"

যাঁরা এ বাড়ির বাইরে আছেন, তাঁরা উঠি তো পড়ি, পড়ি তো মরি করে ছুটে এলেন। নীলাম্বর "যাঃ সব্বনাশ হয়ে গেল" বলে চৌকি থেকে ধড়মড়িয়ে নামতে গিয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলেন, আর সদু তাঁকে তোলার পরিবর্তে চলে গেল ও-ঘরে, তবে একটু দাঁড়িয়েই চলে এসে সান্ত্বনা দিতে বসল মামাকে।

এলোকেশীর কাছে যাওয়া কর্তব্য ছিল, কিন্তু কোন্ কর্তব্যটা করবে? সে তো আর চতুর্ভুজা নয়।

এলোকেশী ঢেঁকিঘরে বসে কাঁদছেন!

সমাগতা মহিলারা সেইখানেই জমায়েত হলেন এবং এই হঠাৎ-কান্নার কারণ অবগত হয়ে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন!

কয়েকজন এ কথাও বললেন, "পায়ের ধুলো দাও নবুর মা, তোমার একটু পায়ের ধুলো দাও, মাথায় ঠেকাই, যদি তাতে তোমার মতন সহ্যশক্তি জন্মায়। ওই দজ্জাল বৌ নিয়ে এই অবধি ঘর করছ তুমি!"

অনৈকা আক্ষেপ করে বলেন, "আমি ভাবছিলাম আজ ভরসন্ধ্যেয় তোমার বৌকে নিয়ে চণ্ডীতলায় গিয়ে মায়ের পায়ে তার শাঁখা-সিঁদুর জমা দিয়ে "এয়োৎ বাঁধা রাখা"র মান্নতি করে আনব। তোমার তো মাথার ঠিক নেই, পাঁচজনে না দেখলে চলবে কেন? কিন্তু যে বৌ তোমার, বলতে তো ভরসা হচ্ছে না!"

অপরা ফিসফিস করে, "বলো না দিদি বলো না! আমি বলি নি ভেবেছ? 'হাত বাঁধা'র কথা বলেছিলাম! কিন্তু সদুর কাছে না কি বলেছে নবুর বৌ, আমি ডান হাতের বদলে বাঁ হাতে ভাত খেলে আমার স্বামীর পরমায়ু ফিরবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করি না। উচিতমত ওষুধ না পড়লে কি অসুখ সারে?"

"অ্যাঁ! এই কথা বলেছে?"

"তাই তো বলল সদু। বলল, ওই নিয়ে আর বৌকে পেড়াপিড়ি করতে যেয়ো না খুড়ি, মানুষের মান-মর্যাদা তো রাখতে জানে না। হয়তো তোমার মুখের ওপরই 'না' বলে বসবে।"

"সাধে কি আর বলছি, নবুর মার পাদোদক খেতে হয়?"

কথাটা এলোকেশীর কানে যায়। তিনি বুকটা আর একবার চাপড়ে, আর একবার সেই চিরপরিচিত সুরের কান্নাটি কেঁদে ওঠেন।

"ওরে নবু রে—ওরে আমার সোনার গোপাল রে, তুই থাকতেই তোর বৌ আমাকে কী পায়ে দলছে ত্থাখ রে!"

যাঁরা রোগীর সেবা করছিলেন, তাঁরা সেবা ফেলে ছুটে আসেন।

হলটা কি?

এই দুঃসময়ে "পাহাড়ে" বৌ কী না কি করে বসল!

তা সে যা করে বসেছে তা চরম!

শাশুড়ীর মুখের ওপর বলেছে, "মানুষটাকে দশজনে মিলে কুপিয়ে কুপিয়ে না কেটে, একেবারে মা চণ্ডীর কাছে বলি দিলেই হত! মানুষটাও উদ্ধার পেত, দশজনেরও খাটুনি কমত!"

স্বামীর কথা নিয়ে যে-বৌ এমনি করে গলা তুলে শাশুড়ীর সঙ্গে কথা বলতে পারে, সে-বৌ তা হলে না পারে কি!

"ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দাও, ঝেঁটিয়ে বিদেয় করে দাও—" চাটুয্যে গিন্নী দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন, "ওই ডাকাতের আওতাতে আওতাতেই ছেলে তোমার তুষ হয়ে গেছে নবুর মা! নইলে অমন ডবকা ছেলে, হঠাৎ এমন পিচেশ পাওয়া রোগেই বা ধরবে কেন?"

"তবু আমার নবু ওই বৌ-অন্ত প্রাণ চাটুয্যে-দিদি! বৌয়ের ভয়ে কাঁটা!"

দুটো অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য না থাকলেও কথাটা বলেন এলোকেশী।

"তা ভগবান তেজ ভাঙছেন! অবিশ্যি তোমার মাথায়ও মুগুর মারছেন। কিন্তু ওই তো বিধাতার বিধান। একের পাপে আরের দণ্ড! তবু এও বলব, ওর দুঃখে শেয়াল-কুকুর কাঁদবে! পথের শত্তুর 'আহা' করে যাবে।"

এঁরা অধিকাংশই এলোকেশীর খাতক! গোপনে সুদী কারবার করে থাকেন এলোকেশী। ওঁদের অনেকেরই সোনাটা রুপোটা এলোকেশীর সিন্দুকে পচছে!

অবশ্য পাড়ায় স্পষ্টবক্তা ন্যায়দর্শীও একেবারে নেই তা নয়। কিন্তু তেমনদের সঙ্গে এলোকেশী ভাব 'চটিয়ে' রেখেছেন। তবু নবকুমারের 'মরণ-বাঁচন' অসুখ শুনে দেখতে আসছেন তাঁরা, ন্যায্য কথা দু-একটা বলেও যাচ্ছেন।

যেমন ভজুর পিসি বলে গেছলেন, "হ্যাঁ গা, বৌয়ের বাপের বাড়ি খবর দিয়েছ?"

এলোকেশী বাঁকা মুখে জবাব দিয়েছিলেন, "কেন, সেখানে খবর দিয়ে আবার কি হবে?"

"ওমা, তাদের হল গে জামাই! মুখের ওপর বলছি না, তবে ভগবানের মারের ওপর তো কথা নেই! একটা এদিক-ওদিক কিছু হয়ে গেলে জবাবটা কি দেবে?"

"জবাব?"

এলোকেশী মনোকষ্ট ভুলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, "কেন আমি কি তাদের উঠোনে বাস করি? আমি কি তাদের জমিদারির প্রজা? আমি কি তাদের খাতক? আমি কি কাঠগড়ার আসামী? যে জবাবদিহি দিতে হবে? কি বলব এখন আমার দুঃসময় চলছে, তাই! নইলে তোমায় উচিত কথা শুনিয়ে দিতাম কায়েত-ঠাকুরঝি!"

সনতের জ্যেঠী একদিন বলেছিলেন, "নবুর শ্বশুর তো শুনেছি নামকরা কবরেজ,

জামাইয়ের অসুখে খবর দিচ্ছ না কেন ?"

এলোকেশী গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, "আমার তো দশটা পাইক-পেয়াদা নেই দিদি, যে হুট বলতে খবর দেব। বলে ছেলের ব্যামোতেই চোখে সরষে ফুল দেখছি। বেশ তো, তোমরা পাঁচজন আছ, খবর দাও না। বলে পাঠাও, 'এস তুমি! তোমার জামাইয়ের উচিত চিকিচ্ছে করে যাও।"

এরপর আর কে কথা কইবে ?

কিন্তু এলোকেশী কি সত্যিই এত মন্দ যে, নিজের ছেলের কল্যাণ-অকল্যাণ দেখেন না ?

না, তা নয়।

আসলে এলোকেশী এ বিশ্বাস রাখেন না বৌয়ের বাপ ধন্বন্তরী! তা ছাড়া এটাও মনের মধ্যে কাজ করছে, যদি সত্যিই তা হয়, বৌয়ের বাপের গুণপনাতেই যদি তাঁর ছেলে সেরে ওঠে, সে অপমানের জ্বালা এলোকেশী জুড়োবেন কিসে ?

আর বৌও কি তা হলে আরও সাপের পাঁচ পা দেখবে না ? ছেলের প্রাণের জন্য শত সহস্রবার তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মাথা খুঁড়ছেন এলোকেশী, কিন্তু বৌয়ের তেজ-দর্পটা কিছু খর্ব হোক, এটাও প্রার্থনা। দুটোর সামঞ্জস্য বিধান হয় না, কারণ 'মরা স্বামী' বেঁচে উঠলে তো দবদবার আর শেষ থাকে না মেয়েমানুষের। তেমন হলে বড় কেউ মায়ের পুণ্যবলের কথা তোলে না, তোলে পরিবারের এয়োতের জোরের কথা।

আবার সেই 'বেঁচে ওঠাটা'ই যদি বৌয়ের নিজের বাপের গৌরবে হয়! উঃ! রক্ষে করো! নবু তার নিজের বাপের পুণ্যে তরবে! নিত্য একশ আট তুলসী দেওয়া কি ব্যর্থ হবে ?

হায়! এলোকেশীর ছেলের একশ বছর পরমায়ু হয়ে যদি বৌয়ের হাড়ির হাল হওয়া সম্ভব হত! তা হবার উপায় নেই। এলোকেশীর প্রাণের পুতুলই যে বৌয়ের অহঙ্কারের মাটি।

কিন্তু সত্য এ নাটকের কোন অঙ্কে ?

সে কি একবারও স্বামীসেবার পুণ্য অর্জন করে না ?

নাঃ, সে পুণ্য অর্জনের সৌভাগ্য তার হয় না। কারণ গুরুজনদের সামনে গিয়ে তো আর সে বরের গায়ে-পায়ে হাত বুলোতে বসবে না। ঘরে ঢুকবেই বা কোন্ লজ্জায় ?

রাত্রে ? সে তো শ্বশুর-শাশুড়ী দুজনে ছেলেকে বুক দিয়ে আগলে পড়ে থাকেন। আর সদু তাঁদের খিদমদগারি করে। সেখানে সত্য কে ?

তা ছাড়া তার কোলে বাচ্চা ছেলে। ছমাসও হয়নি। আর তার গলাতেই সংসার!

স্বামীসেবার একটি অংশ তার ভাগে আছে। সেটা হচ্ছে ঔষধের অনুপান প্রস্তুত। বহুবিধ জিনিস নিয়ে ছ্যাচা, বাটা, গুঁড়ানো, সেদ্ধকরা, ইত্যাদিতে অনেকটা সময় ব্যয়

হয় তার।

কবরেজ আবার ঔষধে ফল হচ্ছে না দেখে অবিরতই অনুপানে ত্রুটি আবিষ্কার করছেন। তেজী সত্য এসব সময় শুকনো চোখে ঠায় খাড়া থাকে। শুধু রান্নাঘরের কোণে যখন একা মুখ নিচু করে কাজ করে, আর রাত্রে যখন ছেলে দুটো ঘুমিয়ে পড়ে, তখন বাঁধমুক্ত করে অশ্রুর সাগরকে।

নবকুমার যদি সত্যিই না বাঁচে!

তোলপাড় হয়ে ওঠে আকাশ পাতাল পৃথিবী। যে মানুষটা সত্যর মনের জগতে একটা অবোধ অজ্ঞান নাবালকের দরে গণ্য ছিল, সে যে তার এত বড় আশ্রয় এ কথা এখন টের পেল সত্য? যখন সে মানুষটা যেতে বসেছে?

সত্য কেন তাকে কেবল বকেই এসেছে? কেন শুধুই ভালবাসে নি? কেন কেবল হেসে কথা বলে নি?

ঠাকুর, ওকে এবারের মত বাঁচিয়ে দাও, সত্য ওকে শুধু ভালবাসবে। ও বোকামি করুক, ভীরুতা করুক, ছেলেমানুষি করুক, কোন দোষ ধরবে না সত্য!

কিন্তু ও কি বাঁচবে?

মাকে অবহেলা করেছিল সত্য, মা বাঁচেন নি। আর স্বামীকে অবহেলা করে পার পাবে?

তখন না হয় বুদ্ধি ছিল না, মা কী বস্তু বোধ জন্মায় নি, কিন্তু এখন? এখন কী জবাব আছে?

সারারাত ঠায় জেগে বসে থাকে সত্য, কান খাড়া করে। হঠাৎ বুঝি কোন সময় সেই ভয়ঙ্কর শব্দটা ওঠে! মাঝে মাঝে পা টিপে টিপে গিয়ে এ-জানলা ও-জানলা করে মরে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। রাত্তিরে রুগীর ঘরের জানলা কে খুলে রাখবে? একে তো "সান্নিপাতিক-জ্বর বিকার"—হাওয়া লাগলেই বিপদ। তা ছাড়া রাত্তিরে জানলা খোলা দেখলে অপদেবতায় উঁকি মারবে না? "হাওয়া বাতাস" লাগবে না? আর, ভাবতে বুক কাঁপলেও না ভেবে উপায় নেই, পথ খোলা দেখলে যমদূত ঢুকে পড়বে না? এলোকেশী কি সেই আসার পথ খোলা রাখবেন?

অতএব সত্য কানকে তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর করে তোলে।

কিন্তু এতেই কি সত্যর সকল কর্তব্য শেষ হয়ে গেল? আর কোন করণীয় নেই তার স্বামীর সম্পর্কে? ওঁরা মা বাপ, তা ঠিক! কিন্তু ওঁরা যদি অবোধ হন? তবে সত্যই বা কি কম অবোধ? এক মাস হতে চলল জ্বর চলছে নবকুমারের, দিন দিন বাড়ছে বৈ কমছে না, অথচ উচিত মত একটা ওষুধ পড়ল না তার পেটে!

আর সত্য নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছে।

সত্যর ভগবান কি এর পরও ক্ষমা করবেন সত্যকে?

এলোকেশীর সেই কান্নার পর এলোকেশীকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন মহিলারা। "কখনো

কোন দোষ করো নি, ঘাট করো নি, কারুর অহিত করো নি, পুত্রশোকের জ্বালা তোমায় কেন দেবে ভগবান ?"

আবার সু-পরামর্শও দিচ্ছিলেন পরক্ষণে। "বলতে নেই, ছেলের যদি কিছু হয় নবুর মা, তো তুমি এক দোর দিয়ে ছেলেকে বিসর্জন দেবে, আর দোর দিয়ে ওই হারামজাদীকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে। যে বৌ শাশুড়ীকে অতবড় কথা বলে—"

"ও বাতাসীর মা, শুধু কি ওই কথা বলেছে ? বলি তবে শোন। রাতে বাইরে যাব বলে হঠাৎ দোর খুলে দেখি ঝপ্ করে কে দুয়োরের কাছ থেকে সরে গেল। ভয়ে হাঁকপাঁক করে চেঁচিয়ে উঠেছি "কে কে" বলে, চেঁচিয়ে উঠে দেখি না আমারই অবতার। রাগের চোটে মুখ দিয়ে কু-কথা বেরিয়ে গেল, বললাম, দোরের গোড়ায় কী করছিলি রে হারামজাদী ? তুক না তাক ? বলল কি জান ?—'ছেলে মিত্যুশয্যেয়' তবু তোমার জিভের ধার কমে না ? কেমন মা তুমি ?'

শ্রোত্রী মহিলা সঙ্গে সঙ্গে সবলে নিজের গালে ঠাঁই ঠাঁই করে দুটো চড় কষিয়ে বলে ওঠেন, 'ওমা আমি কোথায় যাব ! ও নবুর মা, সে বৌয়ের মুখ তুমি নাথি দিয়ে ভেঙে দিলে না ?"

এই শাস্তিমূলক ব্যবস্থার জবাবে "উদারচরিতানাম" নবুর মা কী বলতেন কে জানে, সহসা অন্য এক ঝড় এসে লাগল ! দেখা গেল গোয়ালের পাশের দরজা ঠেলে ঢুকে নাপিত-বৌ চুপি চুপি রান্নাঘরের দিকে এগোচ্ছে। অর্থাৎ সত্যর সন্ধানে যাচ্ছে।

বৌয়ের সঙ্গে নাপিত-বৌয়ের কিসের শলা ? মুহ্যমান এলোকেশী গলা তুলে হাঁক দিলেন, "ওদিকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে ?"

চতুর নাপিত বৌ বুঝল ধরা পড়েছে। অতএব মিছে কথা বলে চাপা না দিয়ে এদিকে এসে চুপি চুপি বলে, "বৌমা যে আমায় তেনার বাপের কাছে পাঠিয়েছেল গো, তার বাত্রাটা দিতে—"

কথা শেষ করতে পারে না সে। এলোকেশী রুদ্ধশ্বাসে বলেন, "কার কাছে পাঠিয়েছিল ?"

"ওনার বাপের কাছে গো ! ভারী মস্ত কবরেজ তো ! পত্তর লিখে আমার হাত দে পাঠিয়েছেন, জামাইয়ের বিত্তান্ত জানিয়ে। এসে চিকিচ্ছে করতে—"

"তুই সে-কথা আমায় না জানিয়ে, স্বাধীনে চলে গিয়েছিলি ?"

নাপিত-বৌ নরম হবার মেয়ে নয়। যেই দেখলে ধমকের পথ ধরেছে গিন্নী, সেও সতেজে বলে, "স্বাধীন পরাধীন বুঝি নে ! বৌ-টো সোয়ামীর ভাবনায় ধড়ফড়াচ্ছে দেখে মায়া হল—"

"মায়া ! মায়া হল ? তুই আর ভূতের কাছে মামদোবাজী করতে আসিস নে নাপতে-বৌ ! বিনি মজুরিতে তুই পরের জন্যে একটা হাই তুলিস না, আর তুই যাবি মায়ায় পড়ে—"

"বিনি মজুরিতে, তা তো বলি নি—" নাপিত-বৌ বেজার মুখে বলে, "তা করলে আমার

চলবেই বা কেন ? নেয্য মজুরি দিয়েছে। গিয়েছি—"

"দিয়েছে! বৌ তোকে নেয্য মজুরি দিয়েছে ?" এলোকেশী ক্ষেপে ওঠেন, "সে কোথায় পাবে শুনি ? তা হলে সে আমার বাক্স থেকে চুরি করতে শিক্ষে করছে। আর তুই তার মন্ত্রী হয়ে—"

সহসা পিছনে বজ্রপাত হয়।

এতগুলো গিন্নী সম্বন্ধে অবহিতমাত্র না হয়ে সত্য বলে ওঠে, "নিচু ঘরের মতন কথা বলো না। নাপিত খুড়ীকে আমি রাহাখরচ বলে আমার মল জোড়াটা দিয়েছি!"

মল জোড়াটা! পাথর হয়ে যান মহিলারা!

শাশুড়ীকে না বলে-কয়ে গায়ের গয়না দানছত্র! মুহুর্মুহু মূর্ছা গেলেও বোধ করি এই প্রবল আঘাতের বেগ রোধ হবে না।

এত বড় দুঃসাহস কেউ কল্পনাও করতে পারেন না।

এলোকেশী বুকে হাত চাপড়ে বলে ওঠেন, "ছাখ, তোমরা ছাখ! দেখে বল আমায় ধরে ঝাঁটা মারবে কিনা, বৌকে আমি নিন্দে করি বলে! ওরে বাবারে, আমি কী করব রে—"

সত্য সেদিকে দৃকপাত না করে নাপিত-বৌয়ের দিকে তাকিয়ে শান্তভাবে বলে, "বাবা কি চণ্ডীমণ্ডপে ছিলেন ?"

"ওমা শোন কথা!" নাপিত-বৌ গালে হাত দিয়ে বলে, "তিনি আবার কই ? তেনার হাতে নাকি কোন্ মরণ-বাঁচন রুগী, তাকে ফেলে আসতে পারল না। ওষুধ পাঠিয়ে দেছে। এসেছে তোমার বড় ভাই—তার হাতেই ওষুধ আর তোমার নামের পত্তর আছে!···ওমা ও কি ও কি, বৌ যে পড়ে গেল গো! ওমা ই কী কাণ্ড!"

প্রবল একটা কোলাহল উঠল বাঁধ হারিয়ে ফেলা সেই ছড়িয়ে পড়া নদীটুকু ঘিরে।

"ভিরমি লেগেছে···ভিরমি!···ভিরমি না ভিটকিলেমি···মস্ত বড় একটা অপকম্ম করে ফেলে, এখন ধরা পড়ে—"

নদীকে ঘিরে ঢেউ ওঠে অসংখ্য।

দীক্ষাগুরু নিপাতে তিন দিন অশৌচ শাস্ত্রীয় বিধি।

বিদ্যারত্ন রামকালীর তথাকথিত মন্ত্রদীক্ষার গুরু ছিলেন না, আর রামকালীও ওই ধরণের শাস্ত্রীয় বিধি যে ঠিক অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন তা নয়। তবু বিদ্যারত্নের মৃত্যুর পরের দিন রামকালী সমস্ত কাজকর্ম পূজাপাঠ পরিত্যাগ করে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন বারমহলে।

তিন দিন ঔষধরূপী নারায়ণে হস্তক্ষেপ করবেন না, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি করবেন না, অন্নগ্রহণ করবেন না।

বিগত কয়েকদিন রোগীর বাড়িতে দিনে রাত্রে যমের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হয়ে ফিরে এসেছেন। মুখে সেই পরাজয়ের কালি-মাড়া ছাপ। চিন্তা করছেন এই অবস্থায় জামাতা-গৃহে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কারণ চিকিৎসা করা থেকে যখন বিরত থাকতে হবে। ঔষধ এখন স্পর্শও করবেন না। মনে করছেন আগামী পরশু স্নানশুদ্ধির পর—

চিন্তায় বাধা পড়ল।

দেখলেন তাঁর পালকি ফিরছে। অর্থাৎ হয় রাসু, নয় রাসুর খবর। রাসুকে বলে দিয়েছিলেন, সত্য উদ্বিগ্ন হয়ে খবরটা দিয়েছে বটে, তবে যথার্থই রোগ কঠিন কিনা সেটা রাসু অনুধাবন করে শীঘ্রমধ্যে হয় নিজে ফিরে আসবে, নয় পালকি পাঠিয়ে দিয়ে ঘটনার গুরুত্ব জানিয়ে দেবে।

ঈষৎ কম্পিত বক্ষে অপেক্ষা করেন রামকালী, পালকি শূন্য না পূর্ণ দেখা পর্যন্ত।

না শূন্য নয়।

রাসু নামছে! যাক ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। রাসু এসে নতমুখে প্রণাম করতে উদ্যত হতেই রামকালী পিছিয়ে গিয়ে বলেন, "থাক্ থাক্, এ সময় প্রণাম নিষেধ। কি রকম দেখলে?"

রাসু আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলে, "ভাল নয়।"

ভাল নয়!

সহসা রামকালীর মনশ্চক্ষে একটা মূর্তি ভেসে ওঠে! নিরাভরণ শুভ্র মূর্তি। শিউরে ওঠেন রামকালী, নিস্তেজ স্বরে বলেন, "ঔষধটায় ফল হল না?"

"ঔষধ প্রয়োগ করা হয় নি—" রাসু জলদগম্ভীর স্বরে বলে, "সত্য ফেরত দিয়েছে।"

ফেরত দিয়েছে?

সত্য রামকালীর ঔষধ ফেরত দিয়েছে! রাসু ওই দিশেহারা মুখের দিকে না তাকিয়েই হাতের পেটিকাটি আস্তে নামিয়ে রেখে বলে, 'হ্যাঁ! আপনার পত্র নেয় নি, পড়ে নি।'

রামকালী ব্যাকুল ভাবে বলেন, 'তোমার সঙ্গে দেখা করতে দেয় নি?'

'না না, তা দিয়েছে! সত্যও অসুস্থ ছিল। আমি গিয়েছি মাত্র, ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়েছিল নাকি! পরে সুস্থ হয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, 'বাবার যখন আসা সম্ভব হল না, চিঠি থাক্ বড়দা, ও আর পড়ে কি করব! আর ওষুধও তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমার অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে। যদি-সতীমায়ের কন্যে হই, সেই পুণ্যেই আমার শাঁখা লোহা বজ্জর হয়ে থাকবে!'

জীবনে বোধকরি এই প্রথম রামকালী হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন, কথা খুঁজে পান না। এরপর কি আর 'স্নান-শুদ্ধ' হয়ে যাত্রা করবেন রামকালী, সত্যর কথা অবোধের কথা ভেবে?

তা' সেই অবোধ সত্য তো তাহলে একথাও বলে বসতে পারে, 'আবার তুমি এলে কেন বাবা, তোমার ওষুধ যখন খাওয়াচ্ছি না।'

বত্রিশ

ঐ তল্লাটে এ ইতিহাস এই প্রথম।

সায়েব ডাক্তার ডাকার ইতিহাস।

ভবতোষ মাস্টার, নিতাইচরণ, আর নীলাম্বর বাঁড়ুয্যের কুলমজানি পুতবৌ, এই ত্রেরো-স্পর্শের যোগে এ ইতিহাসের সৃষ্টি। খবর শুনে যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল, যে যে বয়সে ছিল, সে সেই বয়সেই রয়ে গেল।

বাঁড়ুয্যের লক্ষ্মীছাড়া রণচণ্ডী বৌয়ের গুণপনা জানতে কারও বাকী ছিল না, শুধু ভেবে পেত না বৌকে ওরা এখনো ঘরে ঠাঁই কেন দিচ্ছে! গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে কেন দিচ্ছে না!

বলাবলি করেছে সবাই, 'ভেতরে কোনও রহস্য আছে···বাপের এক মেয়ে তো! আর বড়মানুষ বাপ। নির্ঘাত বাপ কোন কড়ার করে বিয়ে দিয়েছে।···বৌকে বাপের বাড়ি খেদিয়ে দিলে বোধ করি সেই বামুন 'বভ্যি'র বিষয়সম্পত্তিগুলো নবা পাবে না। তা নয় তো, সমস্যা সমাধানের সবচেয়ে সোজা উপায়টা ত্যাগ করে বাঁড়ুযোগিন্নী গালাগালি শূলোশূলি বুক চাপড়া-চাপড়ির ঘুরপথ ধরে মনের ঝাল মেটায় কেন!'

বৌ বিদেয় করে দেওয়ার নাটকটা বার বার ঠিক জমে ওঠার মুহূর্তেই ভেস্তে গিয়ে গিয়ে ইদানীং সবাই হতাশ হয়ে গিয়েছিল এবং নিত্য নতুন একটা ঢেউয়ের যোগানদার হিসেবে সত্যকে বেশ এক রকমের পছন্দই করতে শুরু করেছিল।

আলোচনার একটা বড় খোরাক, আপন আপন ঘরের বৌঝিকে সুশিক্ষা দেবার সুবিধার্থে একটা কুদৃষ্টান্ত, এটাও একটা লাভের অঙ্ক বৈকি।

কিন্তু নবুর জরবিকারে পড়া অবধি, নবুর বৌয়ের সমালোচনার উপযুক্ত ভাষাও আর খুঁজে পাচ্ছিল না কেউ। বেদে পুরাণে, যাত্রা নাটকে, এমন জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ তো কেউ কখনো দেখে নি, শোনে নি।

কাজেই ভাষাও সৃষ্টি হয় নি ওর জন্যে।

তবু এত দূর বুঝি কেউ দুঃস্বপ্নেও কল্পনা করে নি। বৌ নাকি নবুর বন্ধু নিতাইয়ের সঙ্গে আড়ালে দেখাসাক্ষাৎ করে গলার দশভরির হারগাছা বিক্রী করিয়ে, ভবতোষ মাস্টারকে দিয়ে ব্যবস্থা করে কলকাতা থেকে সায়েব ডাক্তার আনিয়েছে!

আবার ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গেও কথা কয়েছে!

সায়েব ডাক্তারের চিকিৎসায় নবু বাঁচুক আর মরুক সেটা এখন চিন্তনীয় বিষয় নয়, চিন্তনীয় হচ্ছে—বাঁড়ুয্যে সম্পর্কে অতঃপর কিংকর্তব্য?

ব্যাপারটা তো আর এখন গিন্নীদের এলাকায় নিবদ্ধ নেই, সমাজের মাথার মণি পুরুষদের মাথা টলিয়েছে। নবুর বৌ শাশুড়ীর সঙ্গে গলা তুলে কোঁদল করে, শ্বশুরের সামনে কথা কয়ে বসে, অথবা দজ্জালজনোচিত আরও বহুবিধ অকাণ্ড করে, এ তাঁরা এতাবৎ

গৃহিণী মারফত শুনে এসেছেন, কিন্তু তাতে বৌটা সম্পর্কে বিরক্ত হওয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না।

কিন্তু এখন আর "মেয়েলি কাণ্ড" বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। এখন "জাত যাওয়ার" প্রশ্ন উঠেছে। হতে পারে বাঁড়ুয্যে কর্তা সমাজের মাথা, কিন্তু মাথা বলেই তো আর সবাইয়ের মাথা হাতে কাটবার আবদার চলে না?

'বাগদিনীর ছোঁয়াচ'টা হাসাহাসির মধ্যে দিয়ে একরকম মেনে নেওয়া হয়েছে, আর ওটা এমন সৃষ্টিছাড়া নতুনও কিছু কথা নয়, কিন্তু ঘরে দোরে যদি সায়েব ঢোকে, ঘরের বৌ যদি পরপুরুষের সঙ্গে কথা কয়, সেটা মেনে নেবে, সমাজ এত নখদন্তহীন হয়ে যায় নি!

চণ্ডীমণ্ডপে বৈঠক বসে, এবং পাঁচ মাথা এক হয়ে এই স্থিরীকৃত হয়, প্রথমে নীলাম্বর বাঁড়ুয্যেকে চাপ দেওয়া হবে পুতবৌকে ত্যাগ করবার জন্যে, তারপর যদি সে তাতে রাজি না হয়, বা না পেরে ওঠে, অবশ্যই পতিত করতে হবে নীলাম্বরকে!

সমাজে বাস করা তো আর ছেলেখেলা নয়? ওই মুমূর্ষু রোগীটা সত্যিই যদি সাহেব ডাক্তারের ওষুধ খেয়ে বাঁচে, বাঁচতেও পারে, ওই লালমুখোদের ওষুধে ভেলকি খেলে শোনা যায়, ঈশ্বর-করুন বাঁচুকই, ওকে একটা অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করিয়ে মহাপ্রসাদ খাওয়াতেই হবে।

আর ওই ভবতোষ মাস্টারটা!

ওটাকে জলবিছুটি দিয়ে গ্রামের বার করে দেবার কথা, কিন্তু শয়তানটা ডাক্তারের সঙ্গেই গট্ গট্ করে গাড়িতে গিয়ে উঠে কলকাতায় লম্বা দিল।

ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে এসেওছে ডাক্তারের সঙ্গে!

তা ওর আর বাস ওঠাবার প্রশ্ন কোথায়, নিজেই তো প্রায় বাস উঠিয়ে কলকাতায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে। পিসিটা আছে, তাই কালেকস্মিনে আসে।

আসামী বলতে হাজির শুধু নিতাইটা।

তা আপাতত ওকেও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সায়েব ডাক্তাররূপী আগুনটিকে ল্যাজে বেঁধে এনে লঙ্কাকাণ্ড ঘটিয়ে সরে পড়েছে।

এখন আগুনের কাজ আগুন করছে।

•

আগে ঘুণাক্ষরে কেউ টের পায়নি।

কোন্ ফাঁকে যে এসব যোগাযোগ করেছে সত্য, ঈশ্বর জানেন! গ্রামে এত জোড়া চোখের ওপর দিয়ে যেন ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দিল!

লোকে দেখল গ্রামের পথে ঘোড়ার গাড়ী।

নীলাম্বর দেখলেন সে গাড়ি তাঁর দরজায় থামল। আর তা থেকে নামল এক বাঘা সাহেব।

বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল নীলাম্বরের। সন্দেহ নেই এ গাড়ি কালেক্টরের বা ম্যাজিস্টারের, নিশ্চয় কোন শত্রু নীলাম্বরের নামে কিছু লাগিয়ে ভাঙিয়ে এসেছে, আর সেই বাবদ হাতকড়া এসেছে নীলাম্বরের জন্যে।

কেন আসবে, কি সূত্রে আসা সম্ভব, এসব কথা ভাববার ক্ষমতা থাকে না নীলাম্বরের, খেয়াল থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে কে নামছে দেখবার। হাঁউ-মাউ করে গিয়ে প্রায় আছড়ে পড়েন তিনি সায়েবের সামনে।

ওদিকে পাড়ায় ঘরে ঘরে বেতার-বার্তা। নীলাম্বরের দরজায় ঘোড়ার গাড়ি থেকে সায়েব!

আইন-আদালত ছাড়া চট্ করে কারুর মগজে কিছু আসে না, এবং সকলে একবার করে জানলা একটু ফাঁক করে দ্যাখে আর বলাবলি করতে থাকে, "একেই বলে বিপদ একা আসে না! ওদিকে ছেলে শুধছে, এদিকে এই কাণ্ড!"

নীলাম্বরের বাড়িতেও-উঁকি-ঝুঁকি চলতে থাকে।

কিন্তু সহসা একজনের চোখে পড়ল সায়েবের গলায় নল ঝুলছে।

"ডাক্তার···ডাক্তারি নল ঝুলছে গলায়!" একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

ডাক্তার! সায়েব ডাক্তার এনেছে নবুর জন্যে! তলে তলে এই চালাকি খেলেছে নীলাম্বর, অথচ কারুর সঙ্গে কোন পরামর্শ নেই?

এ যেন প্রতিবেশীর গালে আচমকা একটা থাপ্পড় বসিয়ে দেওয়া! আবার সায়েবের পায়ে ধরে কাঁদতে বসেছে!

হ্যাঁ, প্রায় পায়েই পড়েছিলেন নীলাম্বর, "ও সায়েব, আমি কিছু জানি না, আমি কোনও দোষে দুষী নয়। ঘরে আমার ছেলে মরছে—"

সায়েব যে ভারী গলার আশ্বাস দিল, "ভয় না আছে। রোগী ভাল হইয়া যাবে—", তাও তাঁর কানে ঢুকল না।

কানে ঢুকল ভবতোষ মাস্টারের কথা।

"এ কী, এ রকম করছেন কেন? কলকাতা থেকে ডাক্তার এসেছেন, নবকুমারের চিকিৎসার জন্য।"

নীলাম্বর তাকিয়ে দেখলেন।

নিতাইকেও দেখলেন।

মুহূর্তে অনুভব করলেন, কোথাও একটা কিছু ষড়যন্ত্র ঘটেছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সেই ষড়যন্ত্রের নায়িকা হিসেবে সত্যর চেহারাটাই চোখের উপর ভেসে উঠল।

কিন্তু কি করে কী হল?

তা সে যে করেই হোক, এখন টুঁশব্দ চলবে না। বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঘরে চোরের মত ঢুকলেন নীলাম্বর।

সত্য নিশ্চল প্রস্তর-প্রতিমার মত দাঁড়িয়েছিল সেই রুগীর মাথার কাছে বাগানের দিকের জানলায়। কপাটটা এমনভাবে আড় করে রেখেছিল, যাতে সে নিজে ঘরের মানুষদের দেখতে পায়, ঘরের মানুষরা তাকে দেখতে পায় না।

ভবতোষ মাস্টারের সঙ্গে সঙ্গে যখন তার চাইতে প্রায় হাতখানেক লম্বা দশাসই গড়ন লাল টকটকে মানুষটা ঘরে ঢুকল, কেন কে জানে বুকটা কেঁপে উঠল সত্যবতীর। তার পর হঠাৎ দু চোখ ভরে জল উপচে এল।

দৃশ্যতঃ হাতজোড় করল না, মনে মনে নম্র প্রণামে বলল, "বাবা, তোমার আসপদ্দাওলা অবাধ্য মেয়েটাকে মাপ করো। দূরে থেকে আশীর্বাদ করো যেন তার হাতের নোয়া সিঁথের সিঁদুর বজায় থাকে।...বুঝেছি তোমার বুকে দাগা দিয়েছি, কিন্তু আমি তো তোমারই মেয়ে। তেজ বল, অহঙ্কার বল, তোমার স্বভাব থেকেই তোমার মেয়েতে বর্তেছে।"

তারপর মার মুখখানা মনে করতে চেষ্টা করল। বলল, "মা, তোমার নামে দিব্যি গেলে বাবার ওষুধ ফেরত দিয়েছি, তোমার নামে যেন কলঙ্ক না পড়ে।"

কালী দুর্গা চণ্ডী শিব, এত সব জানে না সত্য, জীবনের সাক্ষাৎ দেবতাদের কাছেই বার বার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে।

সায়েব ডাক্তারের ওষুধ ধন্বন্তরী হোক।

আবার তার চির-কৌতুহলী চিত্ত ওই ভয়ঙ্কর গম্ভীর মুহূর্তেও হঠাৎ অজান্তে কখন নেহাৎ ছেলেমানুষের মত কৌতুহলী হয়ে ওঠে। বিস্মিত পুলকে দৃষ্টি বিস্ফারিত করে দেখে ডাক্তার কিভাবে রোগীর বুকে পিঠে নল বসাচ্ছে, আর সেই নলের দুটো মুখ নিজের কানে ঢুকিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

একটু পরে শুনতে পেল, ভারী ভারী একটা গলা উচ্চারণ করছে, "ভয় না আছে। ভাল হোয়ে যাবে।"

ম্লেচ্ছকে দেবতা ভাবলে কি পাপ হয়?

তারপর রঙ্গমঞ্চের সমারোহ মিটল।

যারা ডাক্তারকে নিয়ে এসেছিল তারা তার সঙ্গেই সরে পড়ল। আর উদ্যত বজ্র হাতে নিয়ে দু-দুটো মানুষ নিশ্চেতনের মত নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রইলেন।

বাঁড়ুয্যে আর বাঁড়ুয্যে-গিন্নী।

মাটির পুতুলের মত বসে আছেন দুজনে। বুঝতে পারছেন না, এই অবস্থায় ঠিক কোন পথে চলা বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

না, বজ্র বোধ করি ওঁদের মাথায় পড়েছে।

নবুর কথা ভুলে গেছেন ওঁরা!

অপেক্ষাকৃত সচেতন ছিল সছু।

সে চলে যাবার আগে নিতাইকে হাতছানি দিয়ে ডেকে, ডাক্তার কি কি নির্দেশ দিয়ে গেল তা ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে যেতে বলেছিল এবং সেই ফাঁকেই ঝপ করে বলে বসেছিল, "টাকা কে দিল রে? মাস্টার?"

নিতাই মাথা চুলকে বলে, "না, মানে ইয়ে—ব্যাপারটা কি জান সছুদি, বৌঠান হঠাৎ সেদিন ঘাটের পথে ডেকে কেঁদে পড়ে "

সছু থামিয়ে দেয়, ঈষৎ কঠিন সুরে বলে, "বৌ যার-তার কাছে কেঁদে পড়বার মেয়ে নয়। ভনিতা রেখে সত্যি কথাটা বল। ঝপ করে বল।'

নিতাই অতএব সত্যি কথাই বলে।

ঘাটের পথে নিতাইয়ের হাতে গলার হার খুলে দিয়ে বলেছে সত্য, 'আমার যেমন স্বামী, তোমারও তেমনি বন্ধু। সেই বুঝে কাজ করবে। কলকাতায় গিয়ে এই হার বিক্কিরি করে সায়েব ডাক্তার নিয়ে এস।' ওপর হাতের তাগাজোড়াটাও খুলে দিতে চাইছিল, নিতাই নিবৃত্ত করেছে।

রোগীর ঘরে কেউ নেই।

সত্য আস্তে আস্তে এসে বিছানার কাছে দাঁড়িয়েছিল, সছু ঢুকতে এসে ফিরে গেল। মনে মনে বলল, "বাঁচে যদি তোর পুণ্যেই বাঁচবে বৌ! বেহুলা মরা স্বামী নিয়ে স্বর্গ পর্যন্ত ধাওয়া করেছিল, সাবিত্রী যমরাজের পেছনে ছুটেছিল। যুগে যুগে তারা সকলের পুজো পাচ্ছে।"

একটু পরে আবার যেতে গিয়ে শুনতে পেল বৌ শাশুড়ীর কাছে এসে নরম গলায় বলছে, "সায়েব ডাক্তারের ওষুধ তো তোমরা সর্বদা ছুঁতে পারবে না, রুগীর ভারটাই বরং আমাকে দিয়ে রান্নাঘরটা তুমি —"

এলোকেশী নড়ে চড়ে শুকনো গলায় বলে ওঠেন, "তা এখন তুমি যা বলবে তাই শিরোধায্য করতে হবে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নিচেই তুমি! তা রান্নাঘরের ভার না হয় বাঁদী নিল, তোমার ছেলেদের ভার কে নেবে?"

সত্য আরও নম্র গলায় বলে, "ঠাকুরঝির কাছেই তো বেশী বেশী থাকে ওরা।"

"থাকে বলে গলায় চাপাতে হবে?"

জগতে সবই সম্ভব। সছুর দিকে টেনেও কথা বলেন এলোকেশী! সছু পরবর্তী কথা শোনবার জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর শুনতে পায় বৌয়ের আরও নরম গলা, "ঠাকুরঝি তো ওদের প্রাণতুল্য দেখেন। গলায় চাপা ভাববেন কেন মা?"

কিন্তু সত্যর এই নরম গলাটা কেন সছুর চোখে জল এনে দেয়? কেন যেন মনে হয় সত্যর গলায় এই নরম স্বর একেবারে মানায় না। ওর সেই জোরালো গলাটাই ভাল। অনেক ভাল।

তেত্রিশ

সাহেব ডাক্তারের হাতযশে, কি সত্যর শাঁখা লোহার পুণ্যে, অথবা নবকুমারের নিজেরই পরমায়ুর জোরে বেঁচে গিয়েছিল নবকুমার। কিন্তু ভিতরে ভিতরে কেন কে জানে সত্যকে সে নিজের জীবনদাত্রী বলেই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে সেই থেকে।

অতএব সে জীবনটা নিয়ে সত্য যা করতে পারে করুক। যে দেশে অসুখ করলেই সাহেব ডাক্তার পাওয়া যায়, মৃত্যুভয় বলে বিভীষিকাটাই থাকে না, সত্য যদি নবকুমারকে সেই দেশে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, সেই চাওয়াটাকে আর হাস্যকর অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয় না নবকুমার।

কাজেই সত্যর কাজ কিছুটা সহজ হয়ে এসেছে। হয়তো এই জন্যেই লোকে বলে থাকে, 'ভগবান যা করেন মঙ্গলের জন্যে'। নবকুমারের এই মারাত্মক রোগটাও শেষ অবধি সত্যর জীবনে, অন্ততঃ সত্যর মতে, পরম মঙ্গল ডেকে এনেছে। ছেলেদের 'মানুষ' করতে চায় সত্য, মানুষের মত মানুষ। আর সে মানুষ হতে হলে জগৎটাকে দেখতে হয়।

অবশ্য তারপরও কি আর কাঠখড় পোড়াতে হয় নি? অনেক হয়েছে। অবশেষে আস্তে আস্তে মেঘ কেটে সূর্যকিরণের আভাস দেখা যাচ্ছে।

ভবতোষ মাস্টারের চেষ্টায় নিতাই আর নবকুমারের এক-একটা চাকরি যোগাড় হয়েছে কলকাতায়। নিতাইয়ের রেলি ব্রাদার্সে, নবকুমারের সরকারী দপ্তরে।

অতএব ওদের এখন এক পা রথে এক পা পথে। নবকুমার অবশ্য মা বাপের কাছে নিজে প্রস্তাব করে নি, করতে পারে নি, সত্যকেই বলতে হয়েছে। তবে কথা বন্ধ করেছেন তাঁরা ছেলে বৌ দুজনের সঙ্গে।

এলোকেশী আজকাল খাওয়া শোওয়া ব্যতীত বাড়িতে থাকেন না বললেই হয়। আর নীলাম্বর সন্ধ্যার দিকে হরিসভায় যেতে শুরু করেছেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত সদু সত্যর উপর একটু খাপ্পা ছিল। কিন্তু সত্যর সাহেব ডাক্তার ডাকা-রূপ অসাধ্য সাধনের পর থেকে সদুও যেন কেমন মহিমাস্তব্ধ!

মাঝে মাঝে নিজের জীবনের খাতাটাও বুঝি উল্টে দেখতে শুরু করেছে আজকাল সদু। সদু যদি ওই রকম নির্ভীক হতে পারত! পারলে হয়তো সদুর জীবনটা এমন বরবাদ হয়ে যেত না। হয়তো বিপথগামী স্বামীকে সুপথে টেনে এনে সুখে সংসার করতে পারত। কিন্তু সত্যর মত সত্যের শক্তি সদুর নেই। সত্যর মত বলতে জানে না সদু, 'মনে জ্ঞানে যে কাজে দোষ দেখব না, পাপ দেখব না, সে কাজে নিন্দের ভয় করব কেন? নিন্দে সুখ্যাতির ভয়ে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকাও তো এক রকম স্বার্থপরতা। কিসে লোকে আমায় নিন্দে করবে, আর কিসে আমায় সুখ্যাতি করবে এই চিন্তায় যদি স্বামী-পুত্তুরের ভালটি পর্যন্ত না দেখি, সেটা তো ঘোর স্বার্থর কাজ।'

সদু উঠে পড়ে লেগে স্বামীকে শোধরাতে পারত, তা পারে নি সদু, ভয় খেয়েছে। সদু

মামার বাড়িতে এসে অকারণ মামা-মামীকে বাঘের মত ভয় করে মরেছে। ন্যায়-অন্যায় কথাটি কখনো বলতে পারে নি। সদু ভীতু।

সত্য সাহসী।

তাই সত্য আজ ডোবার ঘোলা জল থেকে মুক্ত হয়ে সাগরে তরী ভাসাতে গেল।

পাড়াপড়শীর ঘরে সত্যর বয়সী যেসব বৌ-ঝি আছে, তাদের মধ্যেও সত্য একটা আলোড়ন এনেছে বৈ কি! তাদের দিনরাত্রির চিন্তার অনেকখানি দখল করে রেখেছে সত্য।

কী আশ্চর্য!

কী বিস্ময়!

কী অলৌকিক!

ঠিক তাদেরই মত একটা মেয়েমানুষ স্বামীপুত্র নিয়ে কলকাতায় 'বাসা'য় যাচ্ছে! আর কিসের কবল থেকে? না এলোকেশীর মত ভয়ঙ্করীর কবল থেকে। ওদের স্বামীরা এখন কিছুদিন যাবৎ দাম্পত্যসুখের মাধুর্য থেকে বঞ্চিত। কারণ সেই নিভৃত নির্জনে তাদের স্ত্রীরা এখন অনবরত নবকুমারের সাহস ও প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছে।

হতভাগ্য স্বামীরা নবকুমারকে 'স্ত্রৈণ' 'মেয়েমানষের বশ' ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেও বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না।

তবে বৌগুলোর অসুবিধে এই—সত্যর সঙ্গে একবার নির্জনে দেখা করে স্বামীদের স্ত্রৈণ করে তোলবার মন্তরটা শিখে নেবে এ উপায় নেই! বাঁড়ুযোগিন্নীর বৌয়ের সঙ্গে মেশার ব্যাপারে তাদের প্রতি কড়া নিষেধ আছে, আর 'ঘাটে' আসার সময় শাশুড়ী পিসশাশুড়ী, কি-বড় ননদ, নিদেনপক্ষে একটা পুঁচকে ননদও পাহারাদার থাকে।

অতএব মন্তর শেখা হয় না।

অবশ্য ওপরওলাদের শুনিয়ে তারা সত্যকে ছিছিক্কার দেয়। যে মেয়েমানুষ বুড়ো শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবারূপ মহৎ কর্মে জলাঞ্জলি দিয়ে ছেলেদের 'ভাল ইস্কুলে পড়াব' ছুতো করে 'বাসা'য় যায়, সে মেয়েমানুষকে শত ধিক দেবে না আর মেয়েমানুষরা?

কিন্তু দিক।

সত্যর কানে এসব আসেও না।

এলেও সত্যর 'কানের ভিতর দিয়া মরমে' পশে না। সে তখন শুধু যাবার প্রস্তুতি-সাধনে যত্নবতী।

এই সময় কথাটা একদিন পাড়ল সত্য।

হয়তো সেটাকেও ওই প্রস্তুতি হিসেবেই ধরেছে সে। অথবা এক অনিশ্চিতের পথে পা বাড়াবার আগে জন্মের শোধ জন্মভূমিকে দেখবার বাসনা তাকে প্রবলভাবে পেয়ে বসে। কারণটা যাই হোক, কথাটা পাড়ে সত্য, 'যাবার আগে একবার ওখানে ঘুরে আসব।'

'ঘুরে আসতে ইচ্ছে করছে—' অথবা 'ঘুরে আসলে ভাল হয়' কি 'ঘুরে আসা কর্তব্য,'

এসব ভাষার ধার দিয়ে যায় নি সত্য।

ঘুরে আসব!

তার মানে ব্যাপারটা স্থির সিদ্ধান্তের কোঠায়। এখন ব্রহ্মার ব্যাটা বিষ্ণু এলেও সে সিদ্ধান্তের রদ হবে এ আশা নেই কারো।

এলোকেশী বিরস মুখে বলেন, 'যাবে ভাল কথা। তা আমাকে বলতে এসেছ কেন? শুধোচ্ছ? নাকি অনুমতি নিচ্ছ?'

হ্যাঁ, কথা আবার কইছেন এলোকেশী বৌয়ের সঙ্গে। তার কারণ কথা কওয়াই তাঁর রোগ। মুখ বুজে দু দণ্ড থাকা তাঁর কোষ্ঠীতে নেই। 'কথা বন্ধ করব' ভেবেও কয়ে ফেলেন।

সত্য তার বড় বড় চোখ দুটো একবার তুলে তাকিয়ে দেখে বলে, "নাঃ সে মিথ্যে রঙ্গর দরকার দেখি না। যাব যখন মনস্থ করেছি, যাওয়ার ব্যবস্থাই করতে হবে। জানানটা দিলাম, ঠাকুরকে বলবেন পঞ্জিকাটা একবার দেখে দিতে।"

এলোকেশী স্ব-স্বভাবে এসে পড়েন।

ভেঙিয়ে উঠে বলেন, "বাপ উদ্দিশ করে না। বাপের বাড়ি যাবে কোন্ সুবাদে?"

"বাপকে একবার পেন্নাম করতেই যাব।" সত্য আকাশের দিকে তাকিয়ে উদাস মুখে বলে, "মা-বাপেরই কর্তব্য আছে, সন্তানের নেই?"

"তা বেশ কোর্তব্য করো। যেও বাপকে পেন্নাম করতে। আমার ছেলে বিনি "আভ্যানে" যাবে না তা বলে রাখছি।"

সত্য উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "এমন এক-একটা অনাছিষ্টি কথা বল তুমি! তোমার ছেলেকে তুমি আটকাবে তো আমি এতখানি রাস্তা যাব কি পাড়ার লোকের সঙ্গে?"

"তোমার আবার সঙ্গ!"

এলোকেশী পিচ্ করে একটা পিচ্ ফেলেন। "ডাকাতে তোমায় দেখে ভয় পাবে মা!"

"পেলেই মঙ্গল!" সত্যও কথায় ইতি টানে, "তবু লোকসাক্ষী একটা বেটাছেলে সঙ্গে থাকা ভাল! আর বাবাকে পেন্নাম করা তো বাবার জামাইয়েরও কাজ।"

"ইল্লিমারি টুস্কি! আরও কত শুনব। বলে, রাখালি কত খেলাই দেখালি! শ্বশুর আবার কবে কার গুরুঠাকুর হল, তা তো জানি না।"

"মেয়েমানুষের যদি এত হয় তো বেটাছেলের একেবারেই বা হবে না কেন, তাও তো জানি নে মা! মা-বাপ উভয় পক্ষেই গুরুজন।" বলে এবার উঠেই যায় সত্য।

জানত এই রকমই হবে।

তাই আর অনুমতি চাওয়ার প্রহসনটা করতে চেষ্টা করে নি।

প্রবলের জয় অবশ্যম্ভাবী।

পঞ্জিকা দেখে যাত্রার দিন দেখাও হয়, এবং শুভ মুহূর্ত অনুযায়ী "যাত্রা" করে স্বামী-

পুত্রকে নিয়ে পাল্‌কিতে গিয়ে ওঠেও সত্য। বিশেষ কোনও বাধা আর আসে না। হালই ছেড়ে দিয়েছে তারা।

পাল্‌কি সত্যর শ্বশুরবাড়ির গ্রাম ছাড়ায়, পাল্‌কির দরজা সরিয়ে মুখ বাড়ায় সত্য।

নবকুমার বলে, "ঘোমটা খুলে মুখ বাড়াচ্ছ কেন? কে কোথায় দেখে ফেলবে।"

সত্য পুলক-কম্পিত স্বরে বলে, "দেখলেই বা! আর তো এখন আমি শ্বশুরবাড়ির বৌ নই?"

"বলি মেয়েছেলে তো বটে?"

"বলছি কি তা নয়? তবে মুখে তো লেখা নেই বৌ কি ঝি? দেখ না ওখানে গিয়ে কিরকম গাছকোমর বেঁধে দস্যিবিত্তি করে বেড়াই।"

বড় ছেলে "তুড়ু"র এসব আলোচনা হৃদয়ঙ্গম হবার বয়স হয়েছে। সে সহসা বলে উঠে, "য্যাঃ! তুই আবার গাছকোমর বাঁধবি কি?"

"আবার তুই!" সত্য তীব্র ভৎর্সনায় বলে ওঠে, "কত দিন বলেছি, মাকে তুই বলতে নেই। তুমি বলতে হয়। তবু—"

সহসা কথার মাঝখানে হেসে ওঠে নবকুমার, "হয়েছে! খুব শাসন হয়েছে! বড্ড একটা মানুষ ও, তাই সুশিক্ষে দেওয়া হচ্ছে। আমি তো বুড়ো বয়েস অবধি মাকে তুই বলেছি।"

সত্যর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে। বলে, "তুমি যা যা করেছিলে বুড়ো বয়স অবধি, তার দিষ্টান্ত তুমি অন্য সময় ছেলের কানে ঢেলো। আমি যখন একটা শিক্ষাদীক্ষা দিতে আসব, তখন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাগড়া দিতে এস না।"

"বাবাঃ! কী হল? কিসে যে কি হয় তোমার বোঝা দায়।"

নবকুমার বোঝে একটু বেকায়দা হয়ে গেছে। ক্ষণপূর্বের সেই পুলকোচ্ছল লাবণ্যময়ী মূর্তি অন্তর্হিত হয়ে গেল ওই কাঠিন্যের আড়ালে! তাই আপসের সুর ধরে সে। সত্যি সত্যবতীর ওই চাপল্য, ওই লাবণ্য, ওই আহ্লাদে আলো হয়ে ওঠা মুখ কী অপূর্ব! কিন্তু বড় ক্ষণস্থায়ী। মুহূর্তে মেঘে ঢাকা পড়ে যায়।

আর যায় নবকুমারেরই বোকামিতে। অথচ নবকুমার কিছুতেই বুঝতে পারে না কিসে কি হয়ে যায়, কিসে কি হয়ে যেতে পারে।

সত্যবতীর নাগাল কোন দিনই কি পাবে সে?

কিন্তু সত্যর মুখের মেঘ কাটাতে পেরেছে নবকুমারের আত্মজ।

তুড়ু ইত্যবসরে মায়ের কোল ঘেঁষে বসে বলছে, "মামারবাড়ি গিয়ে ভাল ছেলে হতে হয়, না মা? না-না, সব বাড়িতেই ভাল ছেলে হতে হয়। শুধু মামারবাড়ি গিয়ে আরো বেশী বেশী ভাল হতে হয়। তা আমি তো সেসব জানিই, কিন্তু ওই খোকা বোকাটা? কিচ্ছু জানে না, মামারবাড়ি গিয়ে শুধু অ্যাঁ-অ্যাঁ করে কাঁদবে।"

ছেলের ওই অ্যাঁ-অ্যাঁ ভঙ্গীতে হেসে ফেলেছে সত্য।

না, অন্তত এই পথটুকুতে তেমন ভয় নেই নবকুমারের। মেঘ স্থায়ী হবে না। বুঝি গতির মধ্যেই আছে এক অপূর্ব পুলকের স্বাদ। তাই মুহূর্তে মুহূর্তে কিশোরীর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সত্য।

"ওগো দেখ দেখ, ওই মাঠে কী কালো গরুটা! ঠিক যেন গয়ার পাথরবাটি।...তুড়ু দেখ, দেখ, ওই পুকুরটায় কত পদ্ম ফুটেছে! ছোটবেলায় আমরা ওই পদ্ম গাদা গাদা তুলতাম।...মামারবাড়ি চল্, দেখাব তোকে সেই পুকুর।...আচ্ছা হ্যাঁ গো, ওই গাছটা কি বল তো? ঠিক ধরতে পারছি না। পাতাগুলো বেশ কেমন নতুন ধরনের।...ওমা ওমা কী চমৎকার বুনো ফুল বুনো ফুল গন্ধ এল! ঠিক আমাদের ওখানের মতন!"

নিজের খুশিতে নিজের সঙ্গেই কথা বলে চলেছে সত্য, স্বামী-পুত্র উপলক্ষ মাত্র।

নবকুমার হাঁ করে চেয়ে থাকে সেই মুখের দিকে।

এতদিন ঘর করছে, দু-দুটো ছেলের বাপ হল, এমন প্রকাশ্য দিনের আলোয় এত স্পষ্ট করে কবে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতে পেরেছে তার লাবণ্যময়ী স্ত্রীর মুখের দিকে!

"বাসা"য় যাওয়ার ভয়টা একটু কমে এসেছে, এখন বরং একটু একটু রোমাঞ্চময় উন্মাদনা! সেখানে গুরুজনের রক্তচক্ষুর ভয় নেই, নেই পাড়াপড়শীর গুরুভয়।

শুধু নবকুমার আর সত্য!

চাকরির ভয়টা খুব জোর আছে। তবে ভবতোষ মাষ্টার প্রচুর ভরসা দিয়েছেন। বলেছেন, নবকুমার যা ইংরিজি জানে, তার সিকি ইংরিজি শিখেও সাহেবের অফিসে কাজ করছে কত লোক। নবকুমার ঢুকতে না ঢুকতে 'সাহেবে'র নেকনজরে পড়ে যাবে নির্ঘাত! আর বলেছেন, গ্রামে পড়ে থেকে জমি জমার উপস্বত্বে জীবন কাটানোর ইচ্ছেটা এযুগে অচল ইচ্ছে।

কলিকাতায় গিয়ে দুটো কামিজ করাতে হবে, আর একজোড়া সু-জুতো। এ নইলে তো আর অফিসে যাওয়া যাবে না!

ভবতোষ তাদের জন্যে একটা বাসাও ঠিক করে রেখেছেন না কি। নিজে তিনি মেসে থাকেন, কিন্তু নবকুমারের তো তা চলবে না! সে যখন 'ফ্যামিলি' নিয়ে যাচ্ছে। নিতাইটার মন্দ কপাল! ওর বৌকে বাসায় আনতে পারবে না। নিতাইয়ের মামা বলেছেন, বৌ কলকাতার বাসায় গেলে তার হাতে আর তাঁদের খাওয়া চলবে না।

এত বড় শাস্তির ভয় তুচ্ছ করে বরের সঙ্গে বাসায় যাবে, এত সাহস নাকি নিতাইয়ের বৌয়ের নেই।

অতএব নিতাইকেও নবকুমারের হাঁড়িতে জায়গা দিতে হবে। বৌটাকে যদি আনতে পারত নিতাই! বেশ দুটো বৌতে থাকত একসঙ্গে। হোক বামুন-কায়েত, কেউ কারুর ভাতের হাঁড়ি নাড়তে না যাক, দুজনে একত্রে বসা, গল্প করা, চুল বাঁধা, পান সাজা, এসব

তো করতে পারত।

তা হবার জো নেই।

বেচারী নিতাইটাকে তাদেরই একটু যত্ন-আত্তি করতে হবে।

ভবতোষ বলেছেন খুব খাসা বাড়ি। তিন-চারখানা ঘর, মস্ত দরদালান। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর, উঠোন, কুয়োতলা! জলের কলও নাকি আছে! বাড়ির ভেতরে নয়, দরজার কাছে। থাক। তার জল খেয়ে জাতজন্ম না খোওয়ানোই ভাল। কুয়োর জল যখন আছে!

সে যা হয় হবে।

প্রধান কথা ভাড়া। বড্ডই গায়ে লাগবে। বাপের কাছ থেকে তো আর টাকা চাইতে যাবে না নবকুমার।

কিন্তু ভবতোষ বলেছেন, কলকাতায় ও-রকম বাড়ি দশ টাকাতেও সহজে মেলে না, নেহাৎ বাড়িটা ভবতোষের এক বন্ধুর বাড়ি বলেই আট টাকায় পাওয়া যাচ্ছে।

হোক।

নবকুমার তো তেমনি মাইনেও পাচ্ছে আটান্ন টাকা! এত বড় মোটা মাইনের চাকরের পক্ষে ওতে কাতর হওয়া ঠিক নয়।

যাক তাই হোক!

তা বলে নিতাইয়ের প্রস্তাব সে নেবে না। নিতাই বলেছে, ভাড়ার ভাগ দেবে। না, ছিঃ! নবকুমারের এত বন্ধু নিতাই, তাই কখনো নেওয়া যায়?

কিন্তু কে জানে সেখানে সত্যর মেজাজ কেমন থাকবে? এখানে তো ক্ষণে রুষ্ট, ক্ষণে তুষ্ট, সেখানে যতই হোক, নিতাই একটা পর ছেলে! সত্য যদি তার সামনে মেজাজ দেখায়?

নাঃ, তা বোধ হয় করবে না।

সেদিকে সভ্য আছে।

এখন কবে সেই দিনটি আসে! যবে সেই অজানা অচেনা দরদালানে বসে দুই বন্ধু অফিসের 'ভাত' খাবে! আর সত্য এলোচুল দুলিয়ে কোমরে কাপড় জড়িয়ে ছুটোছুটি করে রান্না করবে! পরিবেশন করবে!

এ সমস্তই সম্ভব হবে সত্যর শক্তিতে।

বিগলিত প্রেমে সত্যর দিকে তাকিয়ে দেখে নবকুমার।

কিন্তু সত্যর তখন দৃষ্টি লক্ষ্যভেদী, নাসারন্ধ্র স্ফীত, সমস্ত চেতনা একাগ্র। সহসা চেঁচিয়ে ওঠে সে, "ওই তো, ওই তো, জটা-দাদাদের বাড়ির চিলেকোঠা, ওই গাঙ্গুলী-কাকাদের উঠোনে বাজপড়া নারকোল গাছটা—ও বেহারারা, ডান দিকে ডান দিকে—"

পথ দেখিয়ে দেওয়ার ভার যে সে নিজে নিয়েছে।

পাল্‌কি নামাতেই একটা বিরাট চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠেছিল, তারপর জানা হতেই আকাশ থেকে পড়ল সবাই। না বলা না কওয়া এমন করে মেয়ে কেন উপস্থিত? এমন তো হবার কথা নয়!

কী মূর্তি নিয়ে নামছে?

কে ফেলে দিয়ে যেতে এসেছে?

ওগো না গো না!

ষড়ৈশ্বর্যময়ী রাজরাণীর বেশে এসেছে সে কার্তিক-গণেশের হাত ধরে, ভোলানাথকে সঙ্গে করে!

মন কেমন করছিল তাই দেখতে এসেছে বাপকে, বাপের বাড়ির সবাইকে। এসেছে জন্মভূমি দেখতে।

বারবাড়ির কলরোল মিটিয়ে অন্দরমহলের দিকে এগোলো সত্য, চারিদিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে।

আর যেই ভেতর-বাড়ির উঠোনে পা ফেলল, তুমুল একটা কান্নার রোল উঠল।

বিলাপধ্বনি মিশ্রিত রোল।

আলাদা করে বোঝবার উপায় নেই গলা কার। ঐকতান বাদন! বাড়ির সকলের সঙ্গে পাড়ার মহিলারাও যোগ দিয়েছেন অনেকে।

কিন্তু নতুন কার জন্যে বিলাপ? ভুবনেশ্বরীর ঘটনা তো অনেক দিনের হয়ে গেছে।

না বিশেষ কারও জন্যে বিলাপ নয়, আর সদ্য শোকের কাতরতাও নয়। খানিকটা সত্যর আবির্ভাবে আনন্দাশ্রু, আর বাকীটা সত্যর এই দীর্ঘ অনুপস্থিতিকালের মধ্যে সংসারে যা যা শোকাবহ ঘটনা ঘটেছে, তারই ফিরিস্তি জানিয়ে নতুন করে বিলাপ-ক্রন্দন।

এই ক্রন্দনরোলের মাঝখানে দিশেহারা সত্য ছেলে দুটোর হাতে ধরে উঠোনের একধারেই দাঁড়িয়ে থাকে, আর বারবাড়িতে নবকুমার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি মেলে উৎকর্ণ হয়ে বসে থাকে। সামনে শ্বশুর বসে, কিন্তু তাঁকে প্রশ্ন করবে এত বুকের পাটা নবকুমারের নেই। সেই যে প্রণাম করে ঘাড় হেঁট করে বসেছে, বসেই আছে।

তা ছাড়া তিনি তো—দেখা যাচ্ছে—নির্বিকার। বাড়ির মধ্যে এত বড় ক্রন্দনরোল যখন ওঁকে তিলমাত্র বিচলিত করতে পারছে না, তখন ব্যাপারটায় গুরুত্ব নেই বলেই মনে হচ্ছে।

নবকুমারও পাড়াগাঁয়ের ছেলে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে এলে কান্নাকাটির ঘটনা তার একেবারে অজানা নয়, তাই ক্রমশঃ সে নিশ্চিন্ত হয়, আর রোলটাও আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে আসে।

ঈষৎ নড়েচড়ে রামকালীই কথা বলেন।

"কখন বেরিয়েছ?"

"আজ্ঞে—!"

নবকুমার চমকে তাকায়।

রামকালী তাকিয়ে দেখেন। একটি স্বাস্থ্যবান সুকান্তি পুরুষের দেহে এখনো যেন একখানা লাজুক কিশোরের মুখ। সুন্দর সুকুমার, কিন্তু বুদ্ধির ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে মনে মৃদু আক্ষেপের হাসি হাসেন। একে স্নেহ করা যায়, ভরসা করা যায় না। হয়তো এই জন্যেই ভগবান সত্যকে অমন দৃঢ় মজবুত করে গড়েছেন, ও লতার মত আশ্রয় চাইবে না, বনস্পতির মত আশ্রয় দেবে।

একটা নিঃশ্বাস পড়ল।

মনে করলেন সত্যর কপালে চির দুঃখ। রামকালীর মেয়ে রামকালীর ললাটলিপিই পেয়েছে। কত দুঃখী রামকালী! কত সুখী ছিল ভুবনেশ্বরী!

আগে স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি রামকালী এমন করে কখনো ভাববেন। নিজেকে কখনো দুঃখীর কোঠায় ফেলবেন।

নবকুমারের ওই তটস্থ সুরের "আজ্ঞে" শুনে রামকালী মৃদু হেসে আর একবার বলেন, "কতক্ষণ বেরিয়েছ?"

"আ—আজ্ঞে, সেই প্রাতঃকালে দুটো ফেনাভাত খেয়েই—"

কথাটা বলেই বোধ করি নিজের বেকুবিটা বুঝতে পারে নবকুমার, "প্রাতঃকাল"কে আরও মোক্ষম করে বোঝাবার জন্যে ওই ফেনাভাতের প্রসঙ্গটা না আনলেই হত! প্রাতঃকালই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু মুখের কথা হাতের ঢিল।

রামকালী ব্যস্ত হয়ে বলেন, "সে কি! এতটা সময় লেগেছে? তা হলে তো— না না, আর বসে থাকা নয়। শীঘ্র হাতমুখ ধুয়ে—"

নবকুমার এবার কিঞ্চিৎ স্পষ্ট গলায় বলে, "না না, ব্যস্ত হবেন না। পথে পাল্কি নামিয়ে আহার হয়েছে। সঙ্গে জলপান ছিল।"

"তা হোক। বেলা পড়ে এসেছে। ওরে কে আছিস?"

একসঙ্গে অনেকগুলো নানা বয়সের ছেলে এসে দাঁড়ায়। অর্থাৎ এরা আশেপাশে উঁকিঝুঁকি মারছিল, শুধু সামনে আসতে ভরসা পাচ্ছিল না।

রামকালী বলেন, "অন্দরে গিয়ে বল গে, বাবাজীর হাতমুখ ধোওয়ার ব্যবস্থা করতে।"

"হাতমুখ" ধোওয়াটা একটা সাঙ্কেতিক শব্দ। মূল অর্থ—জলখাবারের ব্যবস্থা করা। ওরা দু-একজন ব্যস্ত হয়ে চলে যায়, দু-একজন দাঁড়িয়ে থাকে। আর কে একজন খপ করে বলে বসে, "জামাইবাবুর কী মজা! কেমন কলকাতায় বাসায় গিয়ে থাকবে!"

রামকালী ঈষৎ চমকে ওঠেন।

ভাবেন এটা আবার কি কথা!

সত্য তো ঘোমটা ঢাকা অবস্থায় একটা প্রণাম করেই ভেতরে চলে গেছে, নবকুমারের

সামনে বাপের সঙ্গে কথা বলে নি, তা ছাড়া ছিল পাড়া-পড়শীর হুল্লোড়।

নবকুমার মেয়েদের মত লজ্জার ভান করে বসে আছে। রামকালী ঈষৎ কৌতুকের স্বরে বলেন, "কলকাতার বাসার কথা কি বলছে?"

প্রশ্নটা নবকুমারকে।

নবকুমার উত্তর না দিয়ে পারে না। তাই আস্তে আস্তে বলে, "হ্যাঁ, সেই রকমই স্থির হয়েছে।"

"শুনে সুখী হচ্ছি। এখন কলকাতায় উন্নতির নানাবিধ পন্থা হয়েছে। কোনও কর্মের চেষ্টা হয়েছে নাকি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। মাস্টারমশাই একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।"

রামকালীর জামাতা! তাই কর্তব্যবোধেই প্রশ্ন করেন রামকালী, "কোথায়?"

'ইয়ে, আ—আজ্ঞে সরকারি দপ্তরে।"

"সুখের কথা। তা কোথায় থাকবার ঠিক করেছ? মেসে?"

"আজ্ঞে না। বাসায়। মাস্টারমশাই বাসাও ঠিক করে দিয়েছেন।"

রামকালী অবশ্য বেতন কত তা জিজ্ঞেস করেন না, শুধু সামান্য চিন্তিত স্বরে বলেন, "তা হলে তো পাচকেরও ব্যবস্থা করতে হবে। একা বাসা নিয়ে—"

নবকুমার আর বেশীক্ষণ লজ্জা বজায় রাখতে পারে না, পুলক গোপনের উচ্ছ্বসিত আভা মুখে মেখে বলে ওঠে, "পাচকের দরকার হবে না। তুড়ু-খোকার মা, ইয়ে আপনার মেয়েই তো যাচ্ছে।"

"আমার মেয়ে! সত্য! সত্য কলকাতার বাসায় যাচ্ছে!"

নবকুমার থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। বুঝতে পারে না রামকালীর এই স্বরটা ঠিক কোন্ ভাবব্যঞ্জক। একটু যেন বিচলিত মনে হল না?

হ্যাঁ, কিঞ্চিৎ বিচলিত হয়েছেন রামকালী।

অনেকদিন আগের একদিনের কথা মনে পড়ে গেছে।

বালিকামূর্তি নিয়ে সত্য ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। আর তার সামনে ভেসে উঠেছে আর একখানা ভয়ব্যাকুল মুখ। সেই মুখের সামনে আঙুল তুলে বলছে সত্য, "তোমার যে এত ভয় কিসের মা! এই তুমি দেখে নিও, কলকাতায় আমি যাব, যাব, যাব!"

সত্য তার প্রতিজ্ঞা রাখছে, কিন্তু তা দেখে গর্বে আনন্দে বিস্ময়ে পুলকে কে মুগ্ধ হবে?

নিঃশ্বাস গোপন করে বললেন, "সাহস করতে পারছ সুখের বিষয়। তা তোমার মা তাপিতার ব্যবস্থা?"

"দিদি আছে। পড়শীরা আছে।"

"হুঁ! তা ওঁরা আপত্তি করলেন না?"

এবার আর নিজেকে সংবরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে নবকুমারের। প্রায় একগাল হেসে ফেলে বলে, "আপত্তি কি আর তাঁরা না করেছেন? কিন্তু আপত্তি টিকলে তো? 'এ' ধুয়ো ধরল ছেলেদের ভাল ইস্কুলে পড়ানো চাই। বুদ্ধির রাজা তো!"

ওর ওই উদ্ভাসিত মুখের দিকে তাকিয়ে সহসা ওর ওপর ভারী একটা স্নেহ অনুভব করলেন রামকালী। অন্দরে পাঠিয়ে দিলেন নবকুমারকে।

অন্দরের অবস্থা তখন হাস্যমুখর। সত্যর ছেলেদের নিয়ে ঠাট্টা-আমোদ চলছে দিদিমা সম্পর্কীয়দের। সত্যকে ঘিরে বসেছে বাড়ির বাকী সবাই।

রাসুর নতুন বৌ, শিবজায়ার আইবুড়ো নাতনীরা, রাসুর দুই ভাদ্রবৌ আর ভাগ্নী দুটো, এবং পড়শীবাড়ির নবীনা-প্রবীণার দল। মোক্ষদার বেশী কথা বলার ক্ষমতা আর নেই, তবু আসরের একপাশে বসে আছেন দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। শুধু সারদা এ আসরে অনুপস্থিত। সারদার মরবার সময় নেই।

তার ঔদাসীন্যের কাছে সত্যর নতুনত্ব, অপূর্বত্ব, বৈচিত্র্যের বহুমুখিত্ব, সব কিছুই পরাস্ত মেনেছে।

কিন্তু আর সবাই তো সারদা নয়, তাই প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে, নিজে আর কাউকে কোনও প্রশ্ন করবার সময় পাচ্ছে না সত্য। অথচ সে তো নিজেকে দেখাতে আসে নি, সবাইকে দেখতে এসেছে।

কিন্তু কৌতূহল যে সকলেরই অদম্য। দু-দুটো ছেলে হয়ে গেল, তারা ডাগরটি হল, যোগাযোগ তো নেই। ওরা অবিশ্যি ছেলেদের অন্নপ্রাশনে বলে পাঠিয়েছিল, কিন্তু রামকালী তো তখন তীর্থে ঘুরছেন। তবে ফিরে এসে তো কই—?

কিন্তু এতদিন কেন আসে নি সত্য, আর এখন এমন হট করে এল কেন, এ প্রশ্ন চাপা পড়ে গেল। এখন প্রশ্ন কলকাতার বাসা! সেইখানেই সহস্র কৌতূহলের প্রশ্ন। কে সাহস দিল সত্যকে? কে দেখবে সেখানে সত্যকে? শ্বশুর-শাশুড়ী বেঁচে থাকতে বরের সঙ্গে বাসায় যাবার পরিকল্পনাটা তার মাথায় এলই বা কি করে, আর তাঁদের অনুমতিই বা পেল কোন্ অলৌকিক সাধনার জোরে?

তা ছাড়া—

গেলে জাত যাবে কিনা, ম্লেচ্ছর জল খেতে হবে কিনা, জুতো মোজা পরতে হবে কিনা, বরের সঙ্গে "ল্যাণ্ডো ফেটিং" চড়ে গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে যেতে বাধ্য হতে হবে কিনা, ইত্যাদি বহুবিধ খাপছাড়া প্রশ্ন তো আছেই।

অনেক প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিয়ে ক্লান্ত সত্য একসময় বলে ওঠে, "বাব্বাঃ। নিজের পাঁচালীই গাইলাম এই অবধি, তোমাদের খবরাখবর কিছু শুনতে দাও?"

মোক্ষদা ক্লান্ত আর্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন, "আমাদের আবার খবর! যারা মরে নি তারা

এখনো বিধাতার অন্নজল ধ্বংসাচ্ছে এই খবর।"

"বাঃ, ও কি কথা ?"

"ঠিক কথাই বলেছি সত্য! চিরটাকাল তোকে 'মুখ' করেছি, ভেবেছি হাড়ির হাল হবে তোর। এখন দেখছি তুইই টেক্কা মারলি! তুইই দেখালি! বেশ করেছিস, এ মতলব করেছিস। এখন সবাই বলছে ইংরিজি বিত্তের জয়জয়কার। ছেলে দুটোকে যদি কলকাতায় ইংরিজি ইস্কুলে দিতে পারিস্ —"

শিবজায়া সম্প্রতি বিধবা হয়েছেন এবং কিছুক্ষণ আগে গগনভেদী চিৎকার করে সত্যকে বুঝিয়েছেন, সত্যর মা পরম পুণ্যবতী ছিল, মরে পুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গেছে এবং জগতে যে যেখানে শাঁখা নোয়ার গৌরব নিয়ে এখনো টিকে আছে, তারা যেন এইবেলা সেই গৌরব বজায় থাকতে পৃথিবী থেকে সরে পড়ে। এতক্ষণ শিবজায়া মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়েছিলেন পোড়ামুখ কাউকে দেখাবেন না বলে।

কিন্তু চির-প্রতিদ্বন্দ্বিনী মোক্ষদার এই বাক্য শুনেই তাঁর নির্বেদ ভঙ্গ হল। মুখের কাপড় সরিয়ে বলে উঠলেন, "বললে ভাল ছোটঠাকুরঝি! জন্ম গেল ছেলে খেয়ে আজ বলছে ভান। বলি একাল, সেকাল, সবাইয়ের বাংলা 'সমসক্রিত'য় চলল, বেশী বিদ্বান হল তো ফার্সি, আর এখন ওই মেলেচ্ছ ভাষা না শিখলে আর—"

"ফার্সিটাও মেলেচ্ছ ভাষা সেজবৌ!"

"ও মা শোন কথা! জন্মকাল 'ফার্সি'র কথা শুনে এলাম, কই কখনো তো শুনিনি মেলেচ্ছ ভাষা!"

সত্য এবার কথা বলে, "থাক্ পিসঠাকুমা, ওসব জাত থাকা জাত যাওয়ার গপ্পো। ও তোমার যা যাবার সে যাবেই। তাকে কে রুখতে পারবে ? ও কথা ছাড়। তোমার এমন হাল হল কি করে তাই বল ? এত তীর্থধর্ম করে হাওয়া বদল করে এসেছ, শরীর তো ভাল হবার কথা।"

"আর ভাল !"

মোক্ষদা জিভে একটা শব্দ করেন। "আমার ভাল একেবারে সেই যমরাজ এলে তবে। বর তো কখনো চোখে দেখি নি, ওই যম বরের চতুর্দ্দোলাতে চড়েই যাব! তবে একালে ভাল আর কজন আছে ? এই সেবারও যে গাঁ দেখেছিস সে আর নেই। মানষের দেবদ্বিজে ভক্তি যাচ্ছে, গুরুলঘু জ্ঞান যাচ্ছে, মানুষ মনিষ্যত্ব সব ঘুচছে। দেখবি, ঘুরে ঘুরে দেখবি তো ? দেখিস সুখ পাবি না।"

দিন সাতেক থাকার পর ফিরতি পথে অনবরত সেই কথাই ভাবতে চলে সত্য। ভাবে আর মনে মনে বলে, 'দেখেছি পিসঠাকুমা, দেখে বুঝেছি তোমার কথাই ঠিক। সুখ পেলাম

না! সেই আগের গাঁ আর নেই। নেই আগের সুখ আনন্দ তৃপ্তি।'

এবারও ছেলেবেলাকার খেলার জায়গাগুলোয় গিয়ে গিয়ে বসে দেখেছে সত্য, চেষ্টা করেছে আগের দিনের সুর বাঁধতে, কিন্তু পারে নি। শেষ পর্যন্ত সেটা হাস্যকর হয়ে উঠেছে। ছেলেদের দেখাবে বলে ফট করে একদিন গাছে চড়তে গিয়েছিল, ছেলেরাই এমন হাঁ হাঁ করে উঠল যে নেমে আসতে হল। সেই সাঁতারের পীঠস্থান বড় দীঘিতে গিয়ে সাঁতার দিয়েছে, সুখ পায় নি। নোনা আতা আর নোড় কুড়োতে গিয়ে কেমন যেন পাগলামি মনে হয়েছে, তবু কুড়িয়ে এনে ছেঁচে আচার করবে বলে রেখে দিয়ে ফেলে রেখেছে। বুঝেছে সুখ পাবে না ওতে।

সুখ তো সবটা নিয়ে।

সেই সবটা, সম্পূর্ণটা, অখণ্ডটা কোথায়? কোথায় সেই আগের সঙ্গী-সঙ্গিনীরা?

আর কোন্‌খানে সুখ পাবে সত্য? এর মাঝখানে কোথায় খুঁজে পাবে রামকালী চাটুয্যের সেই মাঠবেড়ানো দস্যি মেয়েটাকে? যাকে খুঁজে পাবার জন্যে এত তোড়জোড় করে আসা।

আর সেই মেয়েটার মা, তার ছায়াও কি থাকতে নেই? সব মুছে ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

বদলে গেছে।

সব বদলে গেছে।

সত্যর সেই চেনা জগৎটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সত্যর আসনটি। সত্যর জন্মভূমির মাটিতে সত্য এখন আগন্তুক, বহিরাগত। এখন এখানে চোখের সামনে অন্যায় ঘটতে দেখলেও চুপ করে যেতে হয়, মনে হয়, 'থাক! দু দিনের জন্যে এসে আর—' বেপরোয়া দুঃসাহসে বলতে পারা যায় না, 'এ বাপু তোমাদের অন্যাই।'

নইলে এ ক'দিনে দেখলও তো কম নয়। অনেক অন্যায্য ঘটনা ঘটছে এখন সংসারে। তার কারণ বাবাই যেন কেমন একটু উদাসীন হয়ে গেছেন। আগে পাড়ার ছেলেদের এতটুকু বেচাল করবার জো ছিল না, এখন বাড়ির ছেলেরাও, ওই সামনেই যা ভয় করে। আড়ালে সমীহর বালাই নেই।

পাড়াতেও কতই দেখল।

জটাদার বৌ এখন গলা তুলে শাশুড়ীর সঙ্গে ঝগড়া করে। আর জটাদা নাকি বৌয়ের কাছে জোড়হস্ত। সত্যর মামাবাড়িতে ভাইয়ে ভাইয়ে হাঁড়ি ভেন্ন হয়ে গেছে। দুবাড়িতে দু দিন নেমন্তন্ন খেতে হয়েছে সত্যকে। তুষ্টু গয়লা পক্ষাঘাত হয়ে বিছানায় পড়ে, তুষ্টুর বৌ কেঁদে কেঁদে লোকের দোর-দোর ঘুরছে, কিন্তু কেউ আর ওর কাছে ঘি-দুধ নেওয়ার গা করছে না, টাল-বাহানা করে অন্যের কাছে নিচ্ছে। বলে কিনা 'তুষ্টুর বৌয়ের পাতা দই? মুখে করা যায় না। তুষ্টুর বৌ আবার ঘি তৈরি করতে শিখল কবে?'

জিনিস একটু যদি নীরেসই হয়, তা বলে চিরদিনের লোকটার দুঃখু-কষ্টর সময় দেখবে না ? মানুষ আর জন্তু জানোয়ারে তবে তফাত কি ?

লুকিয়ে দুটো টাকা দিয়ে এসেছিল সত্য তুষ্টুকে, তুষ্টুর চোখ দিয়ে জল পড়েছিল। বলেছিল, 'বাপের মতন মনটি ! কবরেজ মশাই আছেন, তাই এখনো বেঁচে আছি।'

কুমোর-জেঠা, কামার-খুড়ো, ধোপাপিসি, কারুর সঙ্গে দেখা করতে বাকি রাখে নি সত্য, কিন্তু আগের মত কেউ সহাস্যে বলে নি, 'এসেছিস ? আয় বোস।'

আসন পেতে দিয়ে বলেছে, 'আসুন দিদিঠাকরুন, বসুন।'

আশ্চর্য, একসঙ্গে সবাই কি করে বদলে গেল ?

বদলায় নি শুধু গ্রামটা। বদলায় নি গাছপালা, মাঠ, বন, দীঘি পুকুর। এরাই শুধু উচ্ছ্বসিত আনন্দে স্বাগত জানিয়েছে, মাথা নেড়ে নেড়ে, কোলাহল করে। আবার বিদায়কালে তারাই বিষণ্ন বিধুর দৃষ্টি মেলে মৌন বেদনার মত তাকিয়ে থেকেছে।

এরাই শুধু বদলায় নি।

কিন্তু ওদের কাছে আর কতটুকু আশ্রয় ? আশ্রয় চাই হৃদয়ের কাছে, প্রাণোত্তাপের কাছে। কোথায় সেই উত্তাপ ? সকলেই ভাল করে যত্ন করেছে, আর বলেছে, 'ওরে বাবা দু দিনের জন্যে এসেছে !' কেউ বলে নি, 'তুই যে আমাদের চিরদিনের।'

সত্যর মা বেঁচে থাকলে কি অন্য রকম হত না ? মার কাছে কি সত্যর সেই শৈশবটি সোনার কৌটোয় তোলা থাকত না ? সত্য এসে দাঁড়ালে মা সেই কৌটোটি খুলে ধরে হাসি মুখে বলত না, 'এই দেখ ! কিছু হারায় নি তোর। সব আছে। আমি তুলে রেখেছি।'

তা হলে হয়তো সত্যর সেই পুতুলের বাক্সটাকেও এসে দেখতে পেত সত্য। মা বলত, 'এই দেখ তোর হাতের কাপড় পরানো এই তোর 'বড়বৌ মেজবৌ নবৌ', সেবারে এসে যেমন রেখে গিয়েছিলি তেমনিই আছে।'

হ্যাঁ, ঠাকুমার শ্রাদ্ধে এসে সেবার নিজের ফেলে যাওয়া পুতুলবাক্স সাজিয়ে ছিল সত্য, তারপর তো তার নিজেরই জীবনের মধ্যে এল পুতুল ভেঙে যাওয়ার ঘটনা।...মাটির পুতুলের কথা আর কে ভেবেছে ?

সত্য হয়তো মার ছেলেমানুষিতে হাসত। তবু সুখ পেত। 'মা না থাকলে বাপেরবাড়ি এসে সুখ নেই !' নিঃশ্বাস ফেলে ভাবল সত্য। অতবড় সংসারের মধ্যে সেই মানুষটাকে, অনেকের মধ্যে একজন মাত্র ছাড়া আর তো কোনদিন কিছু ভাবে নি। হঠাৎ আজ ধরা পড়ছে সেই একজন ছাড়া সমস্ত 'অনেকই' অর্থহীন।

তবু ওরই মধ্যে পিসঠাকুমার কাছে দু দণ্ড বসলে প্রাণটা ঠাণ্ডা হত ! কিন্তু সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ মানুষটার এত দুরবস্থা হয়েছে যে দেখলে প্রাণটা ফাটে।

সত্য বলেছিল, "অতিরিক্ত খেটেখেটেই তুমি এমনি করে দেহ ভেঙেছ পিসঠাকুমা !

তোমার সেই শরীর স্বাস্থ্য, এই ক বছরে এমন হয়েছে?"

মোক্ষদা ধিক্কারের হাসি হেসে বলেছেন, "অতিরিক্ত যদি না খাটব তো সেই ভূতের মত আকাঁড়া গতর নিয়ে করতাম কি বল্? ভেতরের ভূতই রাতদিন ছুটিয়ে মারত।"

"আর এখন যে সেই ভূত তোমাকেই জীর্ণ করে ফেলল।"

"মরুক গে! যে কদিন পৃথিবীর অন্নজলের বরাত আছে গড়িয়ে গড়িয়ে বাঁচবই। তারপর যে পারবে সে মুখে এক নুড়ো আগুন দিয়ে চিতেয় তুলে দেবে। যার ছেদ্দায় আসবে সে একমুঠো পিণ্ডি দেবে। যার জন্যে একটা দিন অশৌচ পালবার কেউ নেই, তার আবার বাঁচা-মরা!"

সত্য ব্যথিত হয়ে বলেছিল, "বাবাই তোমার সব করবেন পিসঠাকুমা!"

মোক্ষদা উদাস কণ্ঠে বলেছিলেন, "তা অবিশ্যি করবেন। রামকালী মহৎ মানুষ, হয়তো মায়ের মতন করেই পিসির ছেরাদ্দ করবেন, তবু মনে মনে তো জানবেন যা করছি, বাহুল্য করছি, ভিক্ষে দিচ্ছি।"

আশ্চর্য!

মোক্ষদাকে দেখে আগে কি কেউ কখনো ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছে এ সংসার মোক্ষদার নিজের নয়! এখানে মোক্ষদার জন্যে তেরাত্তির অশৌচ পালবার মতও কেউ নেই! মোক্ষদা মরলে যে তার মুখে আগুন দেবে, পিণ্ডি দেবে, সে দয়া করেই দেবে! মোক্ষদার প্রাপ্য পাওনা বলে দেবে না!

অত দাপট তবে কোন্ 'ভিতে'র ওপর খাড়া ছিল? না কি কোথাও কোনও ভিত ছিল না বলেই, ফোঁপরা দাপটটা অত বড় করে তুলে ধরতেন মোক্ষদা? জানতেন হাতটা একটু শিথিল হলেই, মুহূর্তে ভূমিসাৎ হয়ে যাবে ফাঁকা ইমারত।

ভাবতে ভাবতে -

ছেলে দুটোকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বসল সত্য। এরাই জোর, এরাই ইমারতের ভিত!

সারদাকে বুঝতে পারে নি সত্য।

নাগালই পায় নি সারদার।

অবিশ্যি সারদাই সর্বদা খাইয়েছে মাখিয়েছে, যত্ন করেছে। সত্য ছেলেবেলায় যা যা খেতে ভালবাসত সেগুলি মনে করে করে রেঁধে দিয়েছে, হেসে হেসে বলেছে, "বুঝলি তুড়ু, তোর দাদামশাইয়ের সংসারে এ হেন জিনিস মজুত থাকতে তোর মার রুচি পছন্দ ছিল পুঁই মেটুলি ভাজা, শশাপাতার বড়া, তেতো পুঁটির টক।"

কিন্তু সত্য যখন বলতে গিয়েছিল, "যাই বল বৌ, খুব মহত্বটা দেখিয়েছ তুমি! নতুন বৌ বলছিল, তুমি এক প্রকার দেবী—" তখন কেমন কঠিন হয়ে উঠেছিল সারদা। ভয়ানক

তীক্ষ্ণ একটা হাসি হেসে বলেছিল, "তোমার তো বুদ্ধি-সুদ্ধি আছে ঠাকুরঝি, পরের মুখে ঝাল খাচ্ছ কেন ?"

বুদ্ধি-সুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণ থাকা সত্ত্বেও কথাটার নিহিতার্থ ঠিক ধরতে পারে নি সত্য। আর সর্বদাই লক্ষ্য করেছে, পুরনো অন্তরঙ্গতার দরজা কিছুতেই খুলতে রাজী নয় সারদা।

আর বড়দা ?

তার সঙ্গে তো কথাই কইতে ইচ্ছে হয় নি সত্যর। বড়দা যে ওই গিন্নীবান্নি সারদার স্বামী, অতবড় দুটো ছেলের বাপ, তা যেন খেয়ালেই নেই বড়দার। যেন নতুন বৌয়ের নতুন বর। তার কথা নিয়েই সত্যর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ফষ্টিনষ্টি। ছিঃ।

কারো সঙ্গেই যেন কথা কয়ে সুখ হয় নি।

অবিশ্যি বিদায়কালে সকলেই ব্যাকুলতা দেখিয়েছে, চোখের জল ফেলেছে, আবার কবে দেখা হবে বলে হা-হুতাশ করেছে। কেউ কেউ ডাক ছেড়েও কেঁদেছেন, কিন্তু সত্যর নিজেরই যেন ভেতরের শিকড় ছিঁড়ে গেছে। তাই নিজেও সে চোখের জল ফেললেও, যে প্রাণ নিয়ে এসেছিল, সে প্রাণটা নিয়ে ফিরছে না।

রামকালী তো চিরদিন সকলেরই দূরের মানুষ, শুধু দুঃসাহসী সত্যই পারত সেই দূরত্বের বর্ম ভাঙতে! কিন্তু সে দুঃসাহসিক আবদার সত্য নিজেই আর করতে পারে নি।, সময়ও পায় নি। সর্বদা নবকুমারকেই কাছে কাছে রেখেছেন রামকালী। আর সত্যকে টেনেছে মেয়েমহলে। তবে নবকুমারকে যে রামকালী ভালবেসেছেন ওইটাই পরম তৃপ্তি।

আসার সময় বাপকে প্রণাম করে স্বামীর উপস্থিতি ভুলে রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছিল, "তুমি তোমার এই দুঃসাহসী আসপদ্দাওলা মেয়েকে ক্ষমা করেছ বাবা, সেই সাহসেই বলছি, আমি তোমার এক সন্তান, যেন সময়কালে সেবাযত্নের অধিকার পাই।"

রামকালীর গলাটা কি একটু কেঁপে উঠেছিল ?

চারিদিকের হা-হুতোশের শব্দে সেটা ধরতে পারে নি সত্য। শুধু কথাটাই শুনতে পেয়েছিল। মেয়ের মাথাটা ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলে উঠেছিলেন রামকালী, "চিরকালের পাকা বুড়ী! বাবার জন্যে তো খুব সুব্যবস্থা দিচ্ছিস! সেবার পাত্র হবই বা কেন রে ?"

এ কথার আর উত্তর দিতে পারে নি সত্য, সেই গভীর একটু স্নেহস্পর্শে ভেতর থেকে উথলে কান্না এসেছিল তার। কাঁদতে কাঁদতে আর কান্না চাপতে চাপতে পাল্কিতে উঠেছিল।

পাল্কিতে উঠেও তাই কথা কইতে পারে নি অনেকক্ষণ।

হঠাৎ একসময় নবকুমার বলে উঠল, "তোমার বাবা আমাদের এই তুচ্ছ জগতের মানুষ নয়!"

চকিত হয়ে স্বামীর দিকে তাকাল সত্য।

বাতাস লেগে লেগে ততক্ষণে গালের জলের ধারাটা শুকিয়ে উঠেছে, চোখটা জল শুকিয়ে

ভারী থমথমে হয়ে রয়েছে।

নবকুমার আবার বলল, "সেকালের রাজা-রাজড়াদের সব যেমন ভাব ছিল, তেমনি ভাব। ভয়ও যত করে ভক্তিও তত আসে। এমন বাপ পাওয়া পরম পুণ্যি!"

সত্যর মুখের কাছে একবার আসে, "তবু তো তুমি দেখছ ভাঙা রাসের ঠাকুর! আগের মানুষকে যদি দেখতে! এখন মন ভেঙেছে, শরীর ভেঙেছে।" কিন্তু এই বেদনা-বিধুর চিত্তে অত কথা বলতে ইচ্ছে হয় না। শুধু আস্তে বলে, "মা থাকতে তো দেখলে না! মাকেও দেখলে না! এই আক্ষেপটা রয়ে গেল।"

মনে মনে বলে, দেখ, কেন আমি বাপের গরবে গরবিনী।

কিন্তু তবু মেয়েসন্তান।

বাপের সে গরব শুধু মনের মধ্যে তুলে রাখবার। সে গৌরবে অধিকার নেই, ভোগের দাবি নেই। ছেড়ে চলে যেতে হয়েছে, ছেড়ে থাকতে হবে। সেই গৌরবের ছায়ায় বসে জীবনকে ধন্য করবার উপায় নেই, জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করবার পথ নেই। ভগবান! কেন এই পোড়া সমাজ গড়েছিলে?

সমাজের ব্যাপারে ভগবানকেই দোষ দেয় সত্য। তার পর বাইরের মৌন প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে মনে বলে, "বিদেয় নিচ্ছি তোমাদের কাছে। হয়তো বা জন্মের শোধ। পা বাড়াচ্ছি অকূলের দিকে। এখন দেখি জিতি কি হারি। রামকালী চাটুয্যের মেয়ে, যদি হারেও, তবু হার মানবে না।"

বারুইপুর ফিরে এসেই কলকাতায় যাওয়ার তোড়জোড়। যাত্রাকালে মা বাপ কেউই কথা বললেন না, ঠিক যাত্রাকালে তো বাড়ি থেকে বেরিয়েই গেলেন, যা কিছু করলো সদু।

কিন্তু আশ্চর্য, নবকুমার যেন এই বিরাট লোকসানটাকে আর লোকসান বলে মনে করছে না। রামকালীকে দেখে এসে পর্যন্ত 'বাপ' সম্পর্কে যে একটা উঁচু ধারণা তার জন্মেছে, তার সঙ্গে নীলাম্বরের এই মেয়েলি সংকীর্ণতা যেন বড় বেশী দৃষ্টিকটু লাগলো তার। ইচ্ছে হচ্ছিল মা বাপের এই দুর্ব্যবহারের প্রসঙ্গ নিয়ে সত্যর সঙ্গে কিছু আলোচনা, অর্থাৎ নিন্দাবাদ করে, কিন্তু সত্যর ভয়েই সাহস করল না। এগিয়ে চলল নতুন জীবনের দিকে।

ছোট গল্প
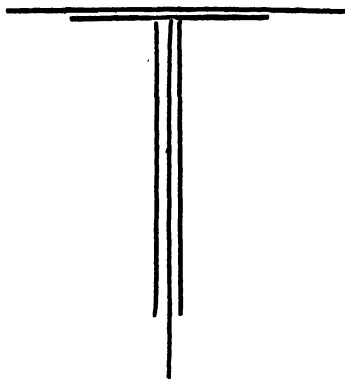
জল আর আগুন

এই লইয়া মায়ের সঙ্গে সরযুর নিত্য কলহ। শোকের অত বাড়াবাড়ি তাহার অসহ্য লাগে। মেয়ে বিধবা হইল বলিয়া, বিমলা নিজে সধবা মানুষ, বিধবার আচার পালন করিতে চায় কোন হিসাবে ?

"মেয়ে ত কারুর বিধবা হয় না"—সরযু রাগিয়া বলে—"তোমারই এই নতুন হ'ল ? অনাসৃষ্টি আদিখ্যেতা দেখলে গা জালা করে"।

মেয়ে হইয়া মায়ের মুখে মুখে এমন কটু কথা শুনাইয়া দেওয়া খুব সঙ্গত না হইলেও বাড়াবাড়ি বিমলার সত্যই আছে। অল্পবয়সের মেয়ে বিধবা হওয়া অল্পশোকের ব্যাপার নহে, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে সেও পান ছাড়িবে, নিরামিষ ধরিবে, শাড়ী পরিতে চাহিবে না, আলতা সিঁদুর দিতে গেলে কাঁদিয়া হাট বাধাইবে, এই বা কেমন কথা ?

মুখটা সরযুর বরাবরই আলগা, রাগিলে—গুরুজন বলিয়া কিছু রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেনা, বলে, জামাই ম'লে যে মানুষে হবিষ্যি করে—এই প্রথম দেখছি—খুব যা'হোক কীর্ত্তি-রাখা কাজটা করছো মা—তা' বসে বসে আর সেই ভালমানুষের ছেলের অকল্যাণগুলো নাই করলে—চোখে সহ্য হয় না বাবু।

"ভালমানুষের ছেলে—" অর্থে সরযুর বাবা জিতেন। এক সৃষ্টিছাড়া দেশে পড়িয়া থাকে, সামান্য কয়টি টাকার বন্ধনে। বৎসরান্তে একবার বাড়ী আসা, তা'ও কদাচিৎ ঘটিয়া উঠে।

খেয়ার কড়িও তো সামান্য নয় !

মেয়ের মুখের কাছে বিমলা দাঁড়াইতে পারে না, চুপ করিয়া থাকে, নিজের "কীর্ত্তি রাখা কীর্ত্তি" গোপন করিতে পারিলেই বাঁচে যেন, তবু সরযুর এই শ্রীহীন সজ্জাহীন মূর্ত্তি চোখের সামনে রাখিয়া চুলে চিরুণীটা দিতেও তাহার বাধে।

মাছের ঝোলের বাটী লইয়া খাইতে বসেই বা কোন্ প্রাণে। অথচ নিরামিষ ভাত গলা দিয়া নামিতে চাহে না বিমলার।

তখনো শেষের ভাত কয়টী লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে দেখিয়া সরযু খানিকটা কুলের আচার আনিয়া পাতে ফেলিয়া দিয়া তীব্রস্বরে কহিল– ফের যদি তুমি এই ছাই পাঁশ খেতে আসবে মা, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। আমিই যদি তোমার গলার কাঁটা হয়ে থাকি, দাওনা বিদেয় করে। আপদের শান্তি হোক। শ্বশুরের ভিটেখানা তো আমার তার সঙ্গে চিতায় ওঠেনি—বেশ থাকবো গিয়ে।

বিমলা বামহাতে চোখের জল মুছিয়া কাতর স্বরে বলে—তুই আমার আপদ ? কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করিস কি করে সরো ?

—তা বৈ আবার কি! আমার জন্যে তোমার খাওয়া ঘুচলো, পরা ঘুচলো, দিনে রাতে স্বস্তি নেই, আপদ কাকে বলে আর? বলিয়া ভিজাচুলের রাশ পিঠের উপর ছড়াইয়া সরযূ রৌদ্রে পিঠ দিয়া পা মেলিয়া বসে।

উঠানের দুয়ার ঠেলিয়া চৌধুরীগিন্নী আসিয়াদাঁড়াইলেন নাতি কোলে করিয়া।

ছেলেটাকে কোল হইতে নামাইয়া হাসিয়া কহিলেন—মায়েঝিয়ে কি হচ্ছে গো—ঝগড়া?

ভদ্রমহিলাকে সরযূ দেখিতে পারে না আদৌ, কিন্তু মানাইয়া চলা চাইতো, কথার উত্তর না দেওয়াই বা কেমন হয়? মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলে—ঝগড়া কি দুঃখে হ'তে যাবে, হচ্ছে শাসন।

শাসন?

পৃষ্ঠবল বাড়িয়া যাওয়াতে বিমলার মুখ খোলে—নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে চব্বিশ ঘণ্টাই ওই হচ্ছে, মেয়ের শাসনে শাসনে আমি তো দিদি চোর হয়ে আছি।

ঘরের কথা পরের কাছে বিশদভাবে বলা সরযুর দুই চোখের বিষ, কথাটা ফিরাইবার চেষ্টায় ছোট ছেলেটাকে লইয়া টানাটানি করিতে থাকে কাঁদাইবার ফিকিরে।

কিন্তু অপরের 'ঘরের কথা'র মত উপাদেয় বস্তু পরের পক্ষে অল্পই আছে, কাজেই উক্ত বস্তুর আঘ্রাণ পাইয়া চৌধুরীগিন্নী হৃষ্টচিত্তে গুছাইয়া বসিয়া সস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন—কেন্ লা মাকে এত শাসন কিসের? সরোবালা—কি রে?

ভারী বিরক্ত হয় সরযূ, গম্ভীরভাবে বলে—নাঃ বিশেষ কিছু নয়, আমার ভালমানুষ বাবাটীর দফা নিকেশের চেষ্টায় উঠে পড়ে লেগেছেন বলেই বাধ্য হয়ে দু'কথা বলতে হয়।

—দেখলে দিদি কথার ছিরি, মেয়ের যা' মুখে আসবে তাই বলবে। বিমলা আশান্বিত দৃষ্টিতে তাকায় যেন সুবিচারের প্রার্থনায়।

এক্‌নজর বিমলার পাতের পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলিয়া চৌধুরীগিন্নী দুই চোখ কপালে তোলেন—আলোচালের ভাত কেনরে মেজবৌ? আঁশ হেঁসেলে বুঝি খাসনা আর! আহা মরে যাই, মুখে কি রোচে? কপালের গেরো—তা'তেই মেয়ে বকছে? তা' বকবে বইকি! বড় হয়েছে বোধশোধ হয়েছে তো, আপনার কপাল পুড়িয়ে খেয়ে ব'সে থাকলো, এখন বাপ-ভাইয়ের কল্যেণ অকল্যেণ দেখাই দরকার। ফেলার মা আমায় বলছিল কাল—চুলটা সুদ্ধু আর বাঁধিসনে নাকি, নরুন পেড়ে ধুতি সার করেছিস—? বোঝা গেল, লোক মুখে বার্ত্তা পাইয়াই তিনি সঠিক তদন্ত করিতে আসিয়াছেন।

বিমলা ছল্‌ছল্ চোখে বলে—মেয়ের পানে একবার তাকিয়ে দেখ দিদি, কপালের লেখা খণ্ডাবার নয় বুঝলাম, তাই বলে এই বয়সে অমনিতরো বেশভূষা কে করে বলো মা-বাপের বুকের ওপর? মা হয়ে কোন্ প্রাণে আমি—

কথাটা মিথ্যা নহে। সরযূর বয়সের মেয়ে কেহ কখনো স্বামী যাইতে না যাইতে সাদা থান ধরে না।

ময়লা মোটা একটা সেমিজের উপর আধময়লা সাদা থান। অঙ্গে অলঙ্কারের আভাস মাত্র নাই।

লালিত্য লাবণ্য কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

চাহিয়া দেখিয়া সতৃপ্ত স্নেহঢালা স্বরে চৌধুরীগিন্নী উত্তর দেন—তা' ভাই পারলেই ভালো, কথায় বলে "ভগবানের মার দুনিয়ার বার—" ওই করতেই থাকলো যখন, প্রেথম থেকে অব্যেস করা ভাল বই মন্দ নয়। গোবিন্দর মেয়েটা দেখনা, হাতভর্ত্তি সোনার চুড়ির গোছা, এতখানি চ্যাটালো পেড়ে শাড়ী পরণে—ভাল দেখায় কি? অতটা আবার ঠিক নয়—তবে হ্যাঁ মায়ের প্রাণে দাগা লাগে বৈ কি। তা' তুই বাছা খাওয়া দাওয়া নিষ্ঠেকাষ্ঠা করিস্ খাসা করিস্, ও হতচ্ছাড়া কাপড়খানা এখুনি থেকে ধরিস্‌নে মা—বলিয়া আঁচলের কোণটা তুলিয়া শুষ্কচোখের কল্পিত অশ্রুটুকু ঘসিয়া ঘসিয়া মুছিতে থাকেন।

সরযূ ব্যঙ্গহাস্যে ঠোঁটটা ঈষৎ বাঁকাইয়া বলে—তবে কি পরবো "এতখানি চ্যাটালো পেড়ে শাড়ী?"

উপহাসটা চৌধুরীগিন্নী বুঝিতে পারেন কি না বুঝিতে দেন না—অন্যকথার অবতারণা করেন, বলেন—জীতু ঠাকুরপো চিঠিপত্তর দেয়নি মেজবৌ? কই একবার তো এলনা? কি জানি—মনকে কেমন করে বুঝিয়ে রাখতে পারে মানুষে—এই কাণ্ডখানা ঘটে গেল! তোর বাপের কথা বলছি সরো—বলিয়া সরযূর নিকট সায় পাইবার আশাতেই বোধকরি সাগ্রহে তাকান।

কন্যার বিবাহ দিয়া জিতেন গত ফাল্গুনে সেই যে গিয়াছে, এ যাবৎ আর আসে নাই। নিদারুণ সংবাদ পাইয়া হা হুতাশ, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়া, ইত্যাদি যাহা করিবার সবই করিয়াছে পত্রের মারফৎ—তবে আসার কথা স্বতন্ত্র। পতিবিয়োগবিধুরা কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে না আসিলে যদি বা চলে, চাকুরী গেলে একদিনও চলিবে না।

সরযূ উঠিয়া দাঁড়াইয়া চুলগুলা জড়াইতে জড়াইতে বলে—পান দেব জেঠিমা?

—পান? তা দিবি তো দে দুটো—একটু দোক্তাও অমনি আনিস্ মা! হ্যাঁ, ননী বলছিল খবরের কাগজে নাকি লিখেছে—কি ছাই নামটা মনেও থাকে না—তোর বাবা যেখানে থাকে লো, ভয়ানক নাকি কলেরা হচ্ছে, যাকে ধরছে আর রাখছে না, মরে মরে দেশ ওজাড় হয়ে গেল। শুনে তো ভেবে মরি, ভয়ে হাতপা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপ্‌তে লাগলো—চিঠিপত্তর ঠিকমত আসছে তো জীতু ঠাকুরপোর? মা দুর্গা ভাল রাখুন, আহা!

বিমলার হয়তো বুদ্ধি তেমন ধারালো নয়, কিন্তু সরযূ জানে কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

এ চৌধুরীগিন্নীর একপ্রকার চিত্তবিলাস, মিথ্যা ভয়ের সৃষ্টি করিয়া করুণাবিগলিত সহানুভূতি প্রকাশ করা।

রোগী দেখিতে আসার ছলে তাহারই শিয়রের গোড়ায় বসিয়া বসিয়া বর্ণনা করিতে থাকেন—উক্ত রোগ কিভাবে মারাত্মক মূর্ত্তি ধরিয়া কতজনকে শেষ পর্য্যন্ত শেষ পরিণতির মুখে ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছে তাহারই কাল্পনিক ইতিবৃত্ত।

চৌধুরীগিন্নী বলিয়া নয়—অনেকেরই এ সব থাকে।

হয়তো বিমলাও বোঝে মিথ্যা—তবু মনটা তাহার দমিয়া যায় নাকি? শঙ্কিত হয় না আপনার অন্যায় আচরণের জন্য? উঠিয়া গিয়া অলক্ষিতে যদি একতিল সিঁদুর ছোঁওয়ায় সিঁথিতে, একাদশীর দিন লুকাইয়া এক টুকরা মাছ ভাজিয়া মুখে দেয়-- বিশেষ দোষ দেওয়া যায় কি তাহাকে, ভণ্ডামী বলিয়া?

এমনি করিয়া দিন কাটিতে থাকে। সরযূ ভাবে—দোহাই তোমাদের, এমন অহরহ আমার দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সহানুভূতি করিতে আসিও না তোমরা! দুই দণ্ডের জন্য আসিয়া যে আমাকে একেবারে মাটী করিয়া দিয়া গেল, তাহার জন্য কাঁদিয়া মাটী ভিজাইবার সখ আমার নাই। বেশ কাটাইব আমি বর্ত্তমানের হালকা স্রোতে গা ভাসাইয়া, ভুলিব আমার অতীতের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের আশা। শুধু তোমাদের "আহা—উহু"-গুলা একটু কম খরচ করো।

বিমলা ভাবে—সন্তান যে কী বস্তু বুঝিলে না তো, চিরদিনের মত ভাগ্যের মাথা খাইয়া বসিয়া থাকিলে! সে সৌভাগ্য ঘটিলে বুঝিতে, কেন বিমলার চোখের জল শুকায় না, কেন তাহার আহার নিদ্রা ঘুচিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বদা মতবিরোধ ঘটে বলিয়া অন্তরঙ্গতা কমিয়াছে না কি? পাগল! তাই কি হয়? মনের কথা বিমলা বলিবে কাহার কাছে? স্বামী পর্য্যন্ত কাছে নাই যাহার?

আপনার মনের মত মনের কথাই সে কহিতে জানে। বলে—তোর ছোটখুড়ির আক্কেলখানা দেখ্‌লি সরো, ছেলেপুলে নিয়ে ঘরে দোর দিয়ে শুতে গেল--চোখে তো দেখলে—এই দেড় মণ তেঁতুলের ঝোড়া নিয়ে বসলাম আমি?

যেন দেড় মণ তেঁতুল এই দণ্ডেই কাটিয়া তোলার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে, বিমলা কাটিবেও সমস্তগুলা!

সরযূ আর একখানা বঁটী সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একপাশে বসিয়া পড়ে নিঃশব্দে।

বিমলা ব্যস্ত হইয়া পড়ে, বলে—তোকে তো বলিনি বাছা, যা একটু গড়িয়ে নিগে, সকাল থেকে খাট্‌ছিস-- 'ছোটবৌর' কথা বলছি, এতটুকু বাড়তি কাজে পাবার জো নেই।

সরযূ কি এখনি ক্লান্ত হইয়া পড়িল না কি? কথার উত্তর দিবার ইচ্ছা হয় না কেন তাহার? কণ্ঠস্বর এমন ম্লান নিস্পৃহ কেন?

—যাক গে মা, ছেলেগুলোকে নিয়ে না ঘুম পাড়ালে সারাদিন দস্যিপনা করবে তো? বাড়ীটা তবু একটু ঠাণ্ডা হ'ল।

- ঠাণ্ডা গরম বুঝিবার ক্ষমতা বিমলার নাই, অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলে—তুই তো

তোর খুড়ির কোন দোষ দেখিস না—ছেলে দুরন্ত বলে গেরস্ত বুঝবে ?

—আঃ যেতে দাও না মা, গেরস্ত বলতে তো তুমি আর আমি, একটু না হয় বুঝলামই।

—হুঁঃ ওই আস্কারাতেই তো গেল আরো। অমন ধারা বেয়াক্কেলে মেয়েমানুষ অন্য সংসারে যদি পড়তো, তাহলে—

"অন্য সংসারে পড়িলে" কি যে অশেষ দুর্গতি ঘটিত, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলার বদলে কথার পিঠে ড্যাস্ টানিয়া দিয়া অনুমানকে আরো বিস্তৃত করিবার সুযোগ দেয় বিমলা।

কিন্তু সরযূ আর কথার উত্তর দিবে না। কথা—কথা—কথা! কথা কহিবার জন্য অজস্র সময় আছে—অজস্র সময় থাকিবে। শুধু যখন স্তব্ধ মধ্যাহ্নে দূর গাছের অন্তরালে ক্লান্ত করুণ ভঙ্গীতে ঘুঘু ডাকিতে থাকে, কার্নিশের পায়রাগুলা একটানা ছন্দে বৃথা বকিয়া মরে, তখন সময় সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ গভীরতায় ডুবিয়া যাইতে চাহে সরযূ, ভুলিয়া যাইতে চায় সরযূ বলিয়া কেহ ছিল, আজও আছে, হয়তো সুদীর্ঘকাল থাকিবে।

কিন্তু বিমলা কি ভুলিতে দিবে ?

মেয়ের গম্ভীর মুখ দেখিলেই তাহার প্রাণ কেমন করে, অন্যমনস্ক করিতে চায় নানা কথার অবতারণা করিয়া।

রাত্রে বিছানায় শুইয়া মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিতে চাহে বিমলা সাংসারিক ব্যবস্থার। পরামর্শ করে—কাঁচা আমের আচার না করিয়া মোরব্বা করিলে অধিকতর উপাদেয় হইবে কিনা।

প্রশ্ন করে, আগামী কাল কি কি রান্না হইবে। নিতান্ত চিন্তাকুল স্বরে—ভারী যেন সমস্যায় পড়িয়াছে এমনভাবে বলে, কাল তো তেরোদশী, বেগুন খেতে থাকলো না—সজনে ডাঁটার কি গতি হয় বল্‌তো ?

যেন কৃষ্ণা ত্রয়োদশীর ক্ষীণ নক্ষত্রালোকিত মৌন আকাশের পানে চাহিয়া চাহিয়া বেগুনবিহীন সজিনাখাড়ার ভাবী দুর্গতির কথাই চিন্তা করিতেছে সরযূ।

ডাকিয়া ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায় বিমলা এক সময় নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে—ছোট থেকে এক রকমে গেল, বিছানায় পড়ল কি ঘুম! ঘুমটুকুই যাই রেখেছেন ভগবান তাই রক্ষে।

সত্যই কি বিছানায় পড়িবামাত্রই ঘুম আসে সরযুর ?

অত স্থির হইয়া ঘুমায় মানুষ ? নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত পড়ে না ?

*　　*　　*　　*

সহসা একদিন অপ্রত্যাশিত একখানা চিঠি আসে জিতেনের—ছুটীর দরখাস্ত করিয়া করিয়া অবশেষে মিলিয়াছে এতদিনে, আসিবে আজকালের ভিতরে।

উচ্ছ্বসিত আনন্দে ছুটিয়া আসিয়া সরযূ বলে—ওগো ছোটখুড়ি, বাবা আসছেন আমার, ছুটী মঞ্জুর হয়েছে তিন হপ্তার।

ছোটখুড়ি মুখ তুলিয়া বলে—কি ভাগ্যি ? চিঠি এল বুঝি ?

মুখ তোলে বিমলাও দপ্ করিয়া একবার জ্বলিয়া ওঠে না কি সে মুখ? আনন্দ উপচাইয়া পড়ে না দুই চোখে? চিঠিখানার জন্য অধীর আগ্রহে হাত বাড়াইতে ইচ্ছা হয় না?

কিন্তু আনন্দ প্রকাশ করিবে সে কোন্ মুখে?

তাই হাতের কাজ ফেলিয়া মুখে কাপড় চাপা দিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া ওঠে।

স্বামীর উদ্দেশে বিনাইয়া বিনাইয়া বলে—পোড়া মুখখানা তাঁহাকে কোন্ লজ্জায় দেখাইবে বিমলা?

সাত রাজ্য অন্বেষণ করিয়া যে মাণিকটী সে বিমলার আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিল, সে মাণিক বিমলা রাখিতে পারে নাই, হারাইয়া গিয়াছে আঁচলের গ্রন্থি খুলিয়া।

ব্যস্ত ছোটবৌ পাখা লইয়া বাতাস করিতে আসে।

শুধু সরযূই পারে না সায় দিতে।

—ভালো জ্বালা হয়েছে বাবা! এলাম একটা সুখবর নিয়ে, দিলেন অমনি মড়াকান্না জুড়ে। কান্না তোমাদের আসেও তো! কেনা গোলাম যেন, ডাকলেই হল, চোখ তো নয়—নুনের নৌকো। বলিয়া বিরক্ত হইয়া সরিয়া যায়।

এ কথা সরযূ বলিতে পারে, নিজের তাহার কান্না আসিতেই চায় না।

* * * *

ভীতসঙ্কুচিত জিতেন বাহির দুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিতান্তই যখন সাহস সঞ্চয় করিয়া ঢুকিয়া পড়ে—সরযূ তখন রোয়াকে পা মেলিয়া বসিয়া দ্বাদশীর জলযোগ করিতেছে।

পিতাকে দেখিবামাত্র হাতের ঘটীটা সশব্দে মাটীতে বসাইয়া চীৎকার করিয়া বলে—ও বাবা তুমি এখন এলে? আমরা মনে করেছি সন্ধ্যের গাড়ীতে আসছো।

আহা গো আরটু আগে যদি আসতে বাবা—পাঁপর ভাজাগুলো সব শেষ করলাম।

বৃহৎ একটা পাষাণভার নামিয়া যায় জিতেনের বুক হইতে। ভারী কৃতজ্ঞ হয় মেয়ের কাছে। সত্য বলিতে গেলে—তাহার শোকের চাইতে দুর্ভাবনাটাই হইয়াছিল অধিক। প্রথম সম্ভাষণটা তাহার বিষম একরকম হৈচৈ কান্নাকাটির মধ্য দিয়া ঘটিবে, এই আশঙ্কা লইয়া সারা গাড়ী আসিয়াছে সে দারুণ উৎকণ্ঠায়। শুধু কতদূর গড়াইবে সেটা, ইহাই কল্পনা করিয়া উঠিতে পারে নাই।

তাহার পরিবর্তে কন্যার নিকট চিরপরিচিত কলকণ্ঠের সম্ভাষণ পাইয়া বাঁচিয়া যায় বেচারা।

হাতের মোটটা এক পাশে নামাইয়া সস্নেহে বলে—সব খেয়ে ফেললি বুড়ি! ছেলের জন্যে একটু রাখলি না বুঝি?

—কি করি বাবা, যে পেটের জ্বালা, কাল থেকে কিচ্ছু খেতে দেয়নি,—ছেলেটেলের কথা কি মনে থাকে? বলিয়া ঢিপ্ করিয়া একটা প্রণাম পিতার পায়ের কাছে ঠুকিয়া রান্নাঘরের

উদ্দেশে রওনা হয়।

বাঁচিয়া যায় জিতেন, কিন্তু ভারী আশ্চর্য্য লাগে, অবাক হইয়া যায় সে।

ছেলেমানুষের মত এখনো সরযূ সারাদিন তাঁহার কাছে কাছে ফিরিবে, অনাবশ্যক, অবান্তর সব প্রশ্ন করিবে, কি আনিয়াছে দেখিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবে, অনুযোগ করিবে অন্যান্য বারের মত সে দেশের টাটকা ক্ষীরের পেড়া না আনায়—এতটা সে আশা করিতে পারে নাই।

শুধু সন্ধ্যাবেলা পাকা গিন্নীর মত রান্নাঘরে আসিয়া মাকে ঠেলিয়া দিয়া বলে—সরো বাছা সরো, আমার ছেলের জন্যে দুচারখানা ভাল ভাল রান্না করি আমি।

নিতান্তই হাসিয়া ফেলিতে হয় বিমলাকে, বলে, আর আমি বুঝি ছাই ছাই রাঁধবো তোমার আদুরে ছেলের জন্যে?

—বিশ্বাস কি, পরের মেয়ে বৈতো নয়? আহা মরে যাই, ভাত চড়ানো হয়েছে—কেন গা দু'খানা গরম লুচি ভেজে দিতে গতরে কুলাবে না বুঝি! হয়েছে থাক, আমি যা পারি করছি—ওঠ, ওঠনা শিগ্‌গির।

অগত্যা হাত ধুইয়া উঠিয়া পড়ে বিমলা।

অন্যমনস্কভাবে দাঁড়াইয়া থাকে দুয়ারের কাছে।

সরযূ যেন ভারি রাগিয়াছে, তাড়া দিয়া বলে বসে বসে চোখ দিতে তো বলিনি বাবু, ওতে আমার কাজ খারাপ হয়, যাও পালাও আমি আপন মনে করি।

তবু বিমলা দাঁড়াইয়া থাকে কেমন যেন বোকার মত।

আপন মনে বকিতে থাকে সরযূ—বাবাঃ দু' বছর পরে কত কষ্টে মানুষটা বাড়ী এল, তা' বড়মানুষের মেয়ে দেমাকে কথাই কইছেন না! মা, তোমার বাবা-বুড়ো কি ছিল গা? নবাব না বাদশা? সেই থেকে আমার বাবা যে একলাটী বসে রয়েছেন—তার কি! ছোট-খুড়ি আর দিন পেলনা বাপের বাড়ী যাবার, খোকারা বাড়ী থাক্‌লেও দুটো কথা কয়ে বাঁচতেন। যাও না গো বড় মানুষের মেয়ে, গরীবের ছেলেকে শুধিয়ে এস একবার, কি খাবেন রাত্রে—ভাত না লুচি?

বিমলা কেমন অসহায় দৃষ্টিতে তাকায় মেয়ের মুখপানে, বলে—তুই জেনে আয় না।

—আমি! ও বাবা, কত কাজ আমার এখন, নড়বার জো নেই। বলিয়া ভারী একটা মজার কথা মনে পড়িয়াছে এমনভাবে সহসা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠে—ও মা শুনছো, বাবা কি বলছিলেন তখন? বলছিলেন—"ওটীকে রাখা রয়েছে বুঝি খোকার জন্যে—কত করে দিতে হয় রে!" যা ছিরিছাঁদ হয়েছে তোমার, ভাবা আশ্চর্য্য নয়। হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়ে সরযূ।

বিমলা একবার আপনার পানে চাহিয়া ম্লানভাবে উত্তর দেয়—খোকার ঝি হ'লাম তার আবার কি!

না বাবু, খোকার ঝিকে 'মা' বলতে পারব না। নাও ধরতো এটা, তবু ভদ্রলোকের মেয়ে বলে বিশ্বাস হোক।

আঁচলের ভিতর হইতে চওড়া পাড়ের ধোপদস্ত একখানি শাড়ী বাহির করিয়া ফেলিয়া দেয় সরযূ মায়ের কাঁধের উপর।

শাড়ীখানা হাতে লইয়া নিতান্ত ক্ষুন্নভাবে বলে বিমলা—তুই যেন আমায় পাগল পেলি সরো! বলে বটে, তবু পরিয়াও ফেলে আধময়লা নরুন পাড় ধুতিখানা বদল করিয়া।

এমন বাধ্য হইল বিমলা কবে! কই রাগিয়া তিরস্কারও করিল না, কাঁদিয়াও হাট বাধাইল না!

শুধু সরযূর হাতে সিঁদুর কৌটা দেখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—আর সং সাজাসনে সরো, আজ আমিই কোথায়—ক্রন্দনের উচ্ছ্বাসে কথার শেষ করিতে পারে না বিমলা।

চোখের জলকে বড় ভয় সরযূর, বাসনপত্র লইয়া এমন ঝন্ ঝন্ শব্দ সুরু করিয়া দেয়, ভারী যেন ব্যস্ত, তাকাইবার অবকাশ নাই।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একসময় সরিয়া যায় বিমলা, অস্ফুটস্বরে বলিতে বলিতে—যাই দেখি শরবৎই খেতে চাইবেন হয়তো এত গরমে—

যেন নিতান্তই প্রয়োজনে পড়িয়া বাধ্য হইয়া যাইতে হইল স্বামী সন্দর্শনে।

সত্যই কি এত বুড়া হইয়া গিয়াছে বিমলা? এমন নিস্পৃহ? এতটুকু ঔৎসুক্য নাই তাহার স্বামীর জন্যে? সুদীর্ঘকাল পরে প্রবাসী স্বামী যাহার ঘরে ফিরিয়াছে?

* * * *

কিন্তু সেই যে গেল বিমলা ফিরিয়া আসিবার লক্ষণ নাই। হাতের কাজ সমস্ত শেষ হইয়া গেল সরযূর।

কাজ সারিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতেই এক ঝাপটা বাতাস আসিয়া সহসা যেন এলোমেলো করিয়া দেয়।

এত বাতাস এতক্ষণ ছিল কোথায়?

সরযূকে কেহ জানাইয়া যায় নাই তো? চঞ্চল বাতাসে সদ্যফোটা বেলফুলের মৃদুগন্ধ ভাসিয়া আসে, পায়ের কাছে জ্যোৎস্না আসিয়া পড়ে। দ্বাদশীর চাঁদ এত উজ্জ্বল? ভারী সুন্দর আর নূতন লাগে সরযূর।

পাড়ায় কাহারা নূতন একখানা গানের রেকর্ড কিনিয়াছে, বোধকরি আশপাশের লোকের ধৈর্য্য পরীক্ষাকল্পে, এবং দিনে-রাত্রে, সকালে-সন্ধ্যায়, চলিতেছে তাহারই একাগ্র সাধনা। তবু এই চন্দ্রালোকিত আকাশের নীচে বসিয়া সে সুর নূতন ঠেকে, কান পাতিয়া শুনিতে ইচ্ছা হয়।

বৈশাখের বাতাসে এত মাদকতা কেন?

বসিয়া থাকিতে থাকিতে নেশা ধরিয়া যায় যে! যুগ-যুগান্ত এমনি বসিয়া থাকা যায় না?

ভাসিয়া আসা গানের সুরে কান পাতিয়া ?

নাঃ, সরযূ অত ভাবপ্রবণ মেয়ে নয়, নিতান্তই সাংসারিক মানুষ সে—উনান নিভিয়া গেলে গরম লুচি ভাজিয়া খাওয়ান চলেনা এ জ্ঞান তাহার আছে।

কিন্তু বিমলা করিল কি ? কোথায় গেল সে ? দালানের ওপারে বাবার ঘরের পানে চাহিয়া দেখে—অনুজ্জ্বলশিখা লণ্ঠনটা দুয়ারের বাহিরে ঘুমন্ত প্রহরীর মত বসিয়া আছে একপাশে, ঘর অন্ধকার।

বাবার জন্য ভারী মন কেমন করে সরযুর—আহা হয়তো এতক্ষণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, কত আর জাগিয়া বসিয়া থাকিতে পারে মানুষ একা একা !

সরযূ নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে, আর বিমলা—অবুঝ বিমলা বোধকরি কোথায় পড়িয়া অকারণ অশ্রুব্যয় করিতেছে।

হাঁ, কিসের যেন শব্দ আসিতেছে—চাপাকান্নার মত ! উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন রোধ করিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা। মাকে লইয়া আর পারা গেল না, খোঁজ না করিলেই নয়।

দালান পার হইয়া ঘরের দুয়ারের কাছাকাছি আসিবামাত্র সহসা থমকিয়া দাঁড়ায় সরযূ, দাঁড়ায় মুহূর্তমাত্র, পরক্ষণেই দ্রুতপদে ফিরিয়া আসে, প্রায় ছুটিয়া।

ভূতে তাড়া করিল নাকি সরযূকে ?

ভূত ? না চাপা কান্না চাপা হাসি হইয়া পিছন পিছন তাড়া করিয়া আসিতেছে তাহাকে।

চাপা হাসি-নয়, উচ্ছ্বসিত হাসি চাপিবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

চুপি চুপি গলার আওয়াজ--কে-যেন কাহাকে ছাড়িতে চাহে না, ধরিয়া রাখিবে বলিয়া শাসাইতেছে—

উত্তরে বুঝি শাসিত ব্যক্তি ছাড়াইয়া লইবার সৌখিন চেষ্টায় হাসিয়া সারা।

এই স্বর কি সরযূ চেনে ? শুনিয়াছে কোন দিন—কোন সময় ? বড় বেশী পরিচিত বলিয়া মনে হয় না ?

না—না, সরযূ চেনেনা, কোনদিনও শোনে নাই। অপরিচিত কণ্ঠস্বর ভয় দেখাইয়াছে সরযূকে, তাই বুঝি ছুটিয়া পলাইয়া আসিল ঊর্দ্ধশ্বাসে ?

কিন্তু সরযুর মত হিসাবি মেয়ের কি ভুলিয়া যাওয়া উচিত ছিল রান্নাঘরের কপাটে শিকল তুলিয়া দিয়া গিয়াছে ? ধাক্কা লাগিয়া কপাল কাটিলে কাহার দোষ ?

আচ্ছা এখন তো সরযূ ইচ্ছা করিলেই কাঁদিয়া লইতে পারে খানিকটা। হাসিয়া হাসিয়া বড় বেশী ক্লান্ত হইয়াছে যে বেচারা ! কাঁদিবার উপযুক্ত ভাল কারণ একটা তো পাওয়া

গেল! কাটিয়া রক্ত পড়িলে কাঁদেনা মানুষ?

কিন্তু চোখের জল যাহার আসিতেই চাহেনা, তাহার উপায় কি?

হাসিয়া ফেলা ছাড়া করিবে কি সে?

এই মনে করিয়া হাসিতে থাকে সরযু—কপাল ভাঙ্গিয়া গেলে অনায়াসে সহ্য করা যায়, অসহ্য হয় এতটুকু ধাক্কায়!

রাজুর মা

কাঠের পার্টিশনের ওপিঠ হইতে দেখিতে পাওয়ার কথা নয়, কিন্তু পাওয়া যায়। পশ্চাদ্‌পদ হইবার মেয়ে রাজুর মা নন্‌, লোহার শিক তাতাইয়া কাঠের দেওয়ালের গায়ে মৌলিক একটি জানালা তিনি অনায়াসেই করিয়া লইয়াছেন।

দালানের মাঝামাঝি পার্টিশন দিয়া বাড়ীখানা দুই ভাগ করা, অথচ দালানেই বলিতে গেলে ইন্দিরার সমস্ত সংসার। দুই খানা ঘরের বড়টিতে ইন্দিরার দাদা তাঁহার বিশাল দেহ, অগাধ বই, আর সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র লইয়া কায়েমী হইয়া আছেন। ছোট ঘরখানায় ইন্দিরা দাদার মেয়ে মিলিকে লইয়া শোয়। ছিমছাম পরিষ্কার ঘর। ইন্দিরার পাতলা ঝরঝরে অনাড়ম্বর পরিচ্ছদে সজ্জিত চেহারার সঙ্গে এই ঘরখানির যেন আশ্চর্য্য একটা সাদৃশ্য আছে, শিশির তো তাই বলে। এই ঘরখানিকে অকারণ জিনিস-পত্রে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে ইন্দিরার ভারী মায়া হয়। তা ছাড়া ঘর ভরিয়া জঞ্জাল জড় করিতে দাদার মনে কোন বিকার নাই বলিয়াই পারে!

এই তো সেদিন—আমের দরুণ বড় টুকরীটা দাদার ঘরে টেবিলের তলায় দেখিয়া চক্ষু কপালে তুলিতেই দাদা হাসিয়া বলিয়াছিল—'জানিস্‌না ইন্দু, ভারী কিন্তু আরাম! চেয়ারে বসে পা ঝুলিয়ে ঝিঁঝি ধরাতে হয় না, দিব্যি পা ছড়িয়ে দিয়ে বসা যায়। আঃ থাক্‌ না, থাক্‌ না, টেবিলের তলা থেকে কে ওকে দেখতে পাচ্ছে?

সে যাত্রা একটা বেতের মোড়া আনিয়া দিয়া তবে রক্ষা পাওয়া যায়। দাদা মোটা মানুষ, আরামের জন্য না করিতে পারে এমন কোনো উদ্ভট কাণ্ড নাই। মনে করিয়া এটুকু তাহার আগেই করা উচিত ছিল ভাবিয়া লজ্জিত হয়। আহা বেচারা দাদা, বৌদি থাকিলে কি এই বয়সে এমন হইয়া যাইত?'

দাদা, বোন, আর মিলি এই তো সংসার। দালানের একপাশেই ইন্দিরার হাতের পরিপাটি করিয়া সাজান ভাঁড়ার। পাশে শেলফে চায়ের সরঞ্জাম, তরকারীর ঝুড়ি, জলের

কুঁজা, মাজা বাসন। জালের আলমারীতে ফলমূল, দুধ, খাবার টুকিটাকি সব। পূবের জানালা ঘেঁসিয়া যে বেতের টেবিলটা পাতা, তাহারই কাছে চেয়ার টানিয়া আনিয়া তাহারা চায়ের আসর জমায়। আর সিঁড়িতে উঠিয়াই ডানহাতি কোণের জায়গাটায় তোলা উনুন জ্বালিয়া ইন্দিরা রান্না করে—কড়ার গায়ে খুন্তি বাজাইয়া গান করে। ডাল ভাত চড়াইয়া দেওয়ালে পিঠ ঠাসিয়া কিসের সব মোটা মোটা বই পড়ে।

ইহারই সামনাসামনি রাজুর মার অভিনব জানালা। কাজেই এদিকের জীবন-যাত্রার অনেকখানি ছবিই ওপিঠের অধিবাসিনী-যুগলের দৃষ্টিগোচর হয়। মা আর মেয়ে—একখানি ঘর ও দালানের বাকী অংশটুকু লইয়া ইহাদের কাজ-কারবার, শুধু জল আনিতে হয় নীচে নামিয়া। এ অংশে জলের কল নাই, নাই বলিয়াই ভাড়া সস্তা। তিনতলার ইতিহাস এইখানেই শেষ, একতলা ও দোতলার সবটা জুড়িয়া বাড়ীওয়ালা নিজে তাঁহার 'রাবণের গোষ্ঠী' লইয়া রাজত্ব করেন। করুন, তাঁহার জানালায় উঁকি দিবার প্রবৃত্তি আমাদের নাই, রাজুর মার মত কৌতূহলী স্বভাব কিছু আর সকলের নয়।

কিন্তু কৌতূহল হইবার কথাও। পার্টিশনের গায়ে চোখ রাখিয়া রাজুর মা একাগ্রচিত্তে যাহার উপর নজর রাখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, বিধবার আচার আচরণ তাহার নয়, অথচ আপনাকে বিধবা বলিয়া পরিচয় দিতে তাহার আপত্তি নাই।

প্রথম যেদিন সামনের অংশটা ভাড়া লইয়া তাহারা উঠিয়া আসিল, রাজুর মা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই তত্ত্ব লইতে আসিলেন এবং তাঁহার অভিজ্ঞ চক্ষুতে মেয়েটার "পোড়া কপালের" খবর গোপন রহিল না!

রাজুর মত নিখুঁত বিধবা না হোক—রাজুর মার শিক্ষাই আলাদা, পনের বছরে বিধবা হইয়া কে আর মাথা মুড়াইয়া হাত খালি করিয়া, একখানি থানে লজ্জা নিবারণ করিয়া জীবন কাটাইতে পারে? তা নয়, তবু ইন্দিরার উল্টাইয়া বাঁধা চুলের বোঝা, সাদাসিধা সেমিজের উপর সরু কালাপাড় শাড়ী, আর একগাছি করিয়া সোনার সরু তারের মত চুড়ি দেখিয়া রাজুর মার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।

এখনকার দিনে অবশ্য অনেক 'হাতি হাতি' মেয়ে আইবুড়োই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাদের বাঁকাসিঁথি, রকমারী শাড়ী, আর 'ভাবন' দেখিলে অষ্টাঙ্গ জ্বালা করে। এ মেয়েটার পরণ-পরিচ্ছদ দেখিলে তবু চক্ষু জুড়ায়।

তাই প্রথম দৃষ্টিতেই সহানুভূতিতে গলিয়া গিয়া রাজুর মা আপ্যায়িত করিয়া বলিয়াছিলেন—ও হরি মধুসূদন! বলি, 'ইরি মধ্যেই পোড়া কপাল পুড়িয়ে বসে আছো! আমার রাজুর মতনই অদেষ্ট দেখছি! বলি কতদিন এমন ধারা হয়েছে?'

'পোড়া কপাল'ও পুড়িয়া গেলে অবশিষ্ট কি থাকে ইন্দিরা অবাক হইয়া একটু ভাবিয়া লইয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিয়াছিল—কি জানি, কবে মনে নেই তো। হবে একদিন।

হাসির কথা নয়, তবু হাসি যেন ইন্দিরার একটা রোগ, অল্পবয়সী বিধবা মেয়ের মুখে

হাসিটা তেমন মানায় না। এই তো রাজুর মার রাজু, স্বামী তাহার যেদিন হইতে মরিয়াছে, হাসিও তাহার সেইদিন হইতে একেবারে ঘুচিয়াছে। বৈধব্যের কথা উল্লেখ করিলে আজো তাঁহার মুখখানি করুণ হইয়া আসে।

আর এ মেয়ে হাসিয়া গান গাহিয়া স্ফূর্তি করিয়া সারা বাড়ীতে যেন বিদ্যুৎ ছড়াইয়া বেড়ায়।

স্বভাব যে তাহার ভাল নয় এ বিষয়ে এতদিনে আর মায়ে মেয়েতে মতভেদ নাই। কিন্তু ঘরে যাহার পাহাড়ের মত বড়ভাই বসিয়া, এমন ধারা বাচালতা সে করে কোন সাহসে, সেইটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। ভাই বা কেমন যে নির্ব্বিবাদে সহ্য করে বসিয়া বসিয়া—অসহ্য হয় রাজুর মার বেহায়া ছুঁড়ির কীর্ত্তিকলাপ দেখিয়া, তাঁহার সর্ব্ব শরীর জ্বলিয়া ওঠে। কিন্তু চটাইবার সাহস হয় না, অবস্থা তাহাদের তো রাজুর মার মত দুর্দ্দশাগ্রস্ত নয়! যখন-তখন এটা-সেটা চাহিলে মেলে, টাকাটা-সিকেটা ধার লইয়া ভুলিয়া গেলে চাহিবার কথা তাহারও মনে পড়ে না। কাজেই মাতা-কন্যার ঘরে বসিয়া টিপ্পনি কাটা ছাড়া আর কিছু করিবার বড় জো নাই।

কাঠের দেওয়ালে পাহারা তাঁহারা মায়ে-ঝিয়ে পালা করিয়া নিয়মিতই দেন। আজও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। লুচি ভাজার গন্ধে বিরক্ত হইয়া রাজুর মা ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিবার একটা ব্যর্থ প্রয়াস করিয়া কহিলেন, রান্না বুঝি আজ "এস্‌টোভেই" হচ্ছে, হ্যাঁ গা ইন্দু?

হঠাৎ গলার আওয়াজে চমকাইয়া উঠিয়া ইন্দিরা বলিল, কে, মাসীমা? হ্যাঁ, এবেলাটা ষ্টোভেই সেরে নিই, ভারী তো রান্না!

রাজুর মা সহজে কথা থামাইতে চাহেন না, বলেন, ভাত আর তাহলে হয় না? ওই ময়দাতেই? তা সত্যি বাছা, কার নেগেই বা ভাতের ন্যাঠা করবে, মনিষ্যির মধ্যে তো ভাইটি আর মেয়েটা! তোমার কিছু আর রেতে ভাত চলবে না, ময়দার পাট করতেই হবে। বোলো না মা, বোলো না, পোড়া কপালের অনেক জ্বালা!

ইন্দিরা তৎক্ষণাৎ জবাব দেয়—যা বললেন মাসীমা, সেই জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরছি।

রাজুর মা উৎসাহিত হইয়া বলেন—তা ভাই তো তোমার অপারগ নয় বাছা, বামুন একটা রাখলেই পারে? শরীর তো তোমার ভাল নয়, আঁশ নিরিমিষ্যি, কুটনো বাটনা, সবই তো ওই একহাতে।

ইন্দিরা খিল্‌খিল করিয়া হাসিয়া ওঠে—হায় হায়, মাসীমা, আবার বামুন রাখবে? কলিকালে কি কেউ কাউকে অমনি ভাত দেয়, এত বড় মেয়েকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াবে কে?

বলিয়াছি যে, হাসি তাহার রোগ, এমন কথাগুলি চোখের জল মুছিতে মুছিতে ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলে তবেই না তাহার যথার্থ স্বাদ পাওয়া যাইত?

রাজুর মা কেমন যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়েন। কিন্তু অপ্রতিভ হইয়া চুপ্ করিয়া যাইবেন বিধাতা পুরুষ এমন করিয়া তাঁহাকে গড়েন নাই। কথা পাল্টাইয়া বলেন, তা যা বলেছ বাছা, মাছ কি 'এস্‌টোভেই' হবে? না কি এবেলা আর ও পাট হয় না—নিরিমিষই হবে?

ইন্দিরা তেমনি অপরূপ ভঙ্গীতে হাসিয়া ওঠে -কোথায়? নিরিমিষ কিসের? আমার তো আবার মাছ নইলে খাওয়াই হয় না।

রাজুর মা শিহরিয়া সচকিতে কহেন—আ আমার পোড়া কপাল! অ হাবা মেয়ে, বামনের ঘরের 'বিধবা'—তামাসায় ছলেও অমন কথা মুখে আনতে নেই বাছা! মহাপাপ, মহাপাপ, কত জন্মের পাতকের ফলে এ জন্মের এই দুর্গতি, আর পাপ বাড়াস্‌নে বাছা!

ইন্দিরা এবার একটু গম্ভীর হইয়া বলে—তামাসা নয় মাসীমা, মাছ আমি বরাবরই খাই।

রাজুর মা অবিশ্বাসের ভান করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে থাকেন, কিন্তু তখনকার মত কথা আর তাঁহার জোগায় না।

রাজুর কাছে আসিয়া ফিস্‌ফিস্ করিয়া বলেন—শুন্‌লি রাজু, শুন্‌লি, 'আসপদ্দার' কথাটা? নিজের মুখে স্বীকার করা শুন্‌লি, ধন্যি বলি বুকের পাটা! এঁ্যা! হে মা কালী, ওপর থেকে দেখছো মা, বাম্‌নের ঘরের বিধবা হয়ে যে মুখে মাছ খায় সে মুখে ওর পোকা পড়ুক।

রাজু হাতের খুন্তিখানা মাটিতে ঠুকিতে ঠুকিতে বলে—তুমিও যেমন মা, স্বভাবই যখন ভাল নয় তখন আর খাওয়ার বিচার—

মা কাংসকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া ওঠেন—অমন কথা মুখে আনিস্‌নে রাজি! স্বভাবচরিত্তিরের কথা কেউ তো আর চাক্ষুস দেখতে যাচ্ছে না। সোমত্ত বয়সে অমন কত কি হয়। তাই বলে সত্ত সত্ত মাছ ভেঙে মুখে দেবে? তিনকুল নরকে পতিত হবে না? ঘোর কলি, ঘোর কলি, কালে কালে কতই দেখবো!

রাজু একখানা আংটাবিহীন কড়ার ভিতর উল্টাইয়া উল্টাইয়া পরোটা ভাজিতেছিল, জননী তাহার দিকে একবার বিষদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলেন—

দিনকে দিন কি কুড়েই হচ্ছিস লা? করছিলি কি এতক্ষণ? শুকনো 'কাট' দুখানা পরোটা ভাজতে রাত যে তোর দুপুর বেজে গেল, দুখানা বেগুনও তো ভাজিসনি দেখছি, ও ছাই গলা দিয়ে নাববে কি করে?

রাজু অবাক হইয়া বলে—বেগুন আবার কোথা? ওবেলাই তো লাউডাঁটার চচ্চড়ি অমনি হ'ল।

রাজুর মা বিরক্ত হইয়া বলেন—থাকবে আর কোথা থেকে? শনির 'দিষ্টিতে' যে সর্ব্বস্ব উড়েপুড়ে যাচ্ছে মা, আমায় এখনো খাওনি কেন তাই শুধু ভাবি।

এরকম তিরস্কার রাজুর গা সওয়া, প্রতিবাদ সে করে না। করিলে মার কাছে টি‘কিতে পারিত না। নিঃশব্দে দুইখানা উঁচু উঁচু পাথরের খোরায় দুইগোছা পরোটা রাখে, ঘর হইতে এক বাটি আখের গুড় বাহির করিয়া আনে, একসেরি ঘটি দুইটা ভরিয়া নেয়, খুরসী পি‘ড়িখানা মায়ের দিকে আগাইয়া দিয়া নিজে মাটিতেই বসিয়া পড়িয়া আহারে মন দেয়।

পার্টিশনের অপর দিকে তখন ভারী একটা মজার ব্যাপার ঘটে। লুচিভাজা শেষ করিয়া ইন্দিরা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে সেগুলা একটা বড় পিতলের কৌটায় ভরিয়া তুলিতেছিল, পিছন হইতে সি‘ড়ি দিয়া উঠিয়া আসিতে আসিতে শিশির বলিয়া বসে—বাঃ, বেশ মেয়ে, রান্না ঘরে একলা একলা দিব্যি হাত চলছে?

ইন্দিরা চমকিয়া তাকাইয়া বলে—ও আবার কি?

শিশির গম্ভীর ভাবে বলে, না তাই বলছি, সাধারণ মেয়েরা অবশ্য করেই থাকে, তা করুক, তা বলে তোমার মত একজন বিদুষী ভদ্রমহিলার পক্ষে—সমাজে রাষ্ট্র হয়ে পড়লে মুস্কিল আর কি!

ইন্দিরা তাড়া দিয়া বলিয়া উঠে—আহা, ঠাট্টা করবার আর বিষয় খুঁজে পেলেন না। যাও তোমার সঙ্গে কথা নেই।

—কেন, চুরি ধরে ফেলেছি বলে?

—আঃ, আবার ওই রকম গেঁয়োমী? নিজের দোষ ঢাকতে এখন যা তা কতকগুলো বকা হচ্ছে, না? খুব তো এলে আটটার সময়? অত করে বলে দিলাম কাল—

শিশির হাসিয়া বলে, সবে তো আটটা কুড়ি, এতেই ফাইন ধরবে না কি?

—ধরা উচিত, এক মিনিটে রসাতল হয়ে যেতে পারে জানো, কুড়ি মিনিট তো

রসভঙ্গ হয়। ওদিক হইতে রাজুর মা ‘ভারীগালে’ শুধান, হ্যাঁ মা ইন্দু, দাদা বুঝি তোমার ‘সকালোই’ বাড়ী এলো?

ক্লাব হইতে ফিরিতে দাদার একটু রাতই হয়।

ইন্দিরা চালাক মেয়ে, ‘ছিদ্ররহস্য’ তাহার অজ্ঞাত নয়, প্রশ্নের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতেও দেরী হয় না, হাসির একটা ঝিলিক্ তাহার মুখে চোখে খেলিয়া যায়, কিন্তু গলাটা ভারী করিয়া বলে, কই মাসীমা, দাদা কি আর সহজে ফিরবেন? যার নাম সেই রাত দশটা।

রাজুর মা পরম অমায়িক ভাবে বলেন—ঘরে যেন কার গলা পেলাম বাছা তাই শুধুচ্ছি।

শিশির কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিল, ইন্দিরা ঠোঁটে আঙ্গুল ঠেকাইয়া চুপ করিবার ইঙ্গিত করিয়া বলে, উঁহু, একলাই আছি মাসীমা, মিলিটাও আজ সন্ধ্যা বেলাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মাসীমা অস্ফুট স্বগতোক্তি করেন, তাতেই তোমার এত বাড় বেড়েছে মা!

ইন্দিরাকে দেওয়ালের সহিত আলাপ জমাইতে দেখিয়া শিশির চটিয়া সি‘ড়ির দিকে

আগাইতেছিল, ইন্দিরা ফিরিয়া হাসিমুখে কহিল—কি পালাচ্ছ না কি? ভারী সাহস দেখছি যে।

—তা কি করবো? তোমার অমূল্য সময় যদি বাজে খরচ করতে না পারো, বসে বসে ভাঁড়ারের শিশি-বোতলগুলো গুনতে হবে না কি?

ইন্দিরা সিঁড়ির রেলিঙে হাত রাখিয়া বড় সুন্দর একটু হাসিল।

শিশিরের যাইবার লক্ষণ বিশেষ দেখা গেল না, কিন্তু কণ্ঠস্বর সমান গরম রাখিয়া কহিল, হাসছো মানে? ভাবছো যেতে পারি না?

—কই যাও তো?

—যাই না যাই আমার ইচ্ছে, তা বলে মনে কোরো না, তোমার জন্যে থাকছি।

—আমি তো তাইই ভাবছি।

—ইস্ নিজেকে অত প্রাধান্য দিও না। আমি এসেছিলাম, তোমার দাদার কাছে।

—দেখতেই পাচ্ছ দাদা নেই, চলে যাও তবে!

—তোমার কথায় না কি? এই বসলাম, কি করে তাড়াও দেখি?

ইন্দিরাও হাসিয়া সিঁড়িতেই বসিয়া পড়ে। খুব যে সান্নিধ্য বাঁচাইয়া বসে তাহাও নহে।

শিশির বলে, কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল? আমাকে যে বেমালুম উড়িয়ে দিচ্ছিলে বড়!

—ওঃ একটা হাসির ব্যাপার, বলবো এখন পরে। শোন, এস্রাজ শুনবে? নতুন একটি গৎ শিখেছি।

—নাঃ থাক্, তোমার সাদা কথা, এস্রাজের সুরের চাইতে আমার কিছু কম ভালো লাগে না।

—উঃ এতদূর? চিকিৎসা করাতে হয়।

কতদিন আর জ্বালাবে? দাদার সঙ্গে তো দেখাই হয় না? মিলিটা কোথায়? তোল না একটু ক্ষ্যাপাই—

—থাক, ঢের হয়েছে, নিজেই তো ক্ষেপে রয়েছ।

—যা বলেছো। এক এক সময় মাথাটা বিগড়ে যায়। আচ্ছা—সব সময়ে সাদা শাড়ী পর কেন? আমি কিন্তু তোমায় ডুরে শাড়ী ছাড়া কিছু পরতে দেব না।

—আর কি? পরলে তো? ডুরে শাড়ী পরা দেখলে আমার মনে হয় একটা সাপ গায়ে জড়িয়ে ধরেছে।

—তোমার যত সব উদ্ভট কল্পনা। হ্যাঁ, আমায় যে কি একটা বই দেবে পড়তে বলেছিলে? ভুলে গেছ? বেশ, আমিও আর কিছু দিচ্ছি না।

ছোট ছোট সব সাধারণ কথার ফাঁকে ফাঁকে দৃষ্টি হইয়া আসে নিবিড়। কণ্ঠস্বর যে কখন মৃদু হইয়া আসে টেরই পায় না। তুচ্ছ কথাতেই যে কত মধু সঞ্চিত থাকে, যাহারা যেমন তুচ্ছ কথা কহিতে জানে তাহারাই শুধু বুঝিতে পারে।

ও পিঠের কথা ইন্দিরার মনেও থাকে না।

ইন্দিরার থাকে না—কিন্তু কলিযুগ যদি সত্যযুগ হইত, সকন্যা রাজুর মার ধিক্কারে মা ধরিত্রী দ্বিধা হইয়া যাইতেন, সন্দেহ নাই। অথচ কলিযুগ এমনি নিরীহ জীব যে, মা বসুমতী দ্বিধা হওয়া তো দূরের কথা, আকাশ হইতে একটা বজ্রপাত হইয়াও এই নির্লজ্জ মেয়েটার মুখের হাসি ঘুচাইয়া দিতে পারিল না।

গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া হাতের ঘটি-গামছা নামাইতে নামাইতে রাজুর মা কন্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলেন—বাড়ীওলা গিন্নির দেমাকটা একবার দেখেছিস রাজি? সেদিনকের সেই 'বচসা'র পর থেকে তো আর মাগীর চৌকাঠ ডিঙোইনে—গঙ্গা নেয়ে ফিরচি, দেখি না—মাগী হন্ হন্ করে যাচ্ছে; 'ভদ্দরতাই' করে বললাম, বলি দিদি যে? মা গঙ্গার আজ দেখি বড় ভাগ্যি? মুখখানা বিষ ক'রে থাকল, কথাই কইলে না। আমার বলে গরজ বড় বালাই, সেধে আবার ছুঁড়ির কথা তুললাম, জানলি রাজু? বলি, অমন ধারা ভাড়াটে রেখে গেরস্তর পাপ বাড়াবেন না দিদি, এই যে বুকের ওপর বসে অনাচার করছে, এটা কি ভাল? বলে কি জানিস- বলে, ভাড়াটের সঙ্গে টাকার সম্বন্ধ, মাস চুকতেই টাকাটা ফেলে দেয়, সে-ই ঢের, ঘরে বসে কে কি করছে না করছে জানার দরকার কি? শুনলি একবার ঠ্যাকারের কথা? ছোটনোকের পয়সা হলেই এমনি ধারা হয়। আমি বামুনের মেয়ে হয়ে প্রাতঃস্নান করে মাগীর সঙ্গে ডেকে কথা কইলাম, তা একটু নত হওয়া নেই? গোছা ভর্ত্তি চুড়ি হাতে দিয়ে ধরাকে সরা দেখছেন; এত তেজ কি ধর্ম্মে সয়! এখনো দিনরাত হচ্ছে। হরি মধুসূদন! তুমি দেখছো। মেয়ে-মানুষের তেজ পদ্মপত্রে জল।

রাজু একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, আমাদেরও মা ছ মাসের ভাড়া বাকী পড়েছে।

রাজুর মা বিরক্ত হইয়া কহেন, তুই আর "নেই আঁকড়ে" কথা কসনে রাজু! বাড়ী ভাড়া নোকে অমন ছ'মাস এক বছর ফেলে রাখে। মাস চুকতেই দেবার ক্ষ্যামতা কিছু সকলের থাকে না। ঘরে বসে রোজগার করতে তো শিখিনি। তা হলেও বা একটা উপায় হোত। চিরটা কালই দৈন্যদশায় কাটলো। মুখপোড়া বিধাতার বিচারও তেমনি, নইলে তুমিই বা কেন সাত সকালে তিনকুল খেয়ে আমার বুকে এসে বসবে?

ন্যায্য কথা বলিতে গেলেই কেমন করিয়া যেন আপনার দুর্ভাগ্যের খোঁটা আসিয়া পড়ে। বেচারা কাজের ছুতা করিয়া পলাইতে পথ পায় না। কিন্তু মনে স্বস্তি থাকে না। মা যে তাহার হাঁড়ী মুখ করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিবে তাহাও ভাল লাগে না।

ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলে, জানো মা, হলদে বাড়ীর ওই নীচের তলার ভাড়াটেদের বৌটাকে শাশুড়ী-ননদে মিলে কাল কি খোয়ারটাই করলে, আহা মারতে শুধু বাকী রাখলে! বুড়ির যা শাসন, বলে কি—আসুক আজ নবনে, তোকে যদি না জুতো খাওয়াই তো আমার নাম নেই।

রাজুর মা কৌতূহল আর চাপিয়া রাখিতে পারেন না, কহেন—কখন লা? আমি কোন চুলোয় ছিলুম, কই দেখলাম না তো! যেন এমন একটা মুখরোচক বস্তুর পরিচয় না পাওয়া রাজুর মার পক্ষে একপ্রকার ক্ষতি।

—তুমি? তুমিও যেই ভাগবত কথা শুনতে বেরুলে—সন্ধ্যে জেলে ধুনো দিচ্ছি আর বাঙাল বুড়ির চীৎকার কানে এল, বৌকে কি শাপ-শাপান্ত, বাব্বাঃ!

—কি হয়েছিল কিছু বুঝলি? বৌটাকে তো হাবাগোবা ভালমানুষ বলে মনে হয়, করেছিল কি?

—কি জানি মা, ভাল বুঝতে পারলাম না, নাকছাবি নাকছাবি করছিল তো বারবার। হারিয়ে টারিয়ে ফেলে থাকবে। তা সে যাই করুক, অত যন্ত্রণা দেওয়া কিন্তু ভাল নয় বাপু, পাঁচটা বাড়ীর লোক কাতার দিয়ে দাঁড়াল বুড়ির গলার জোরে, ছিঃ।

অল্পবয়সী বৌঝির 'খোয়ার' শুনিলে রাজুর মার, কেন জানিনা, বড় আনন্দ হয়। একমুখ হাসিয়া বলেন, তা অপ্‌চো নষ্ট করলে শাউড়ী, ননদে অবিশ্যি শাসন করবে। সোনার সামগ্রী হারালে কি আর টাটে তুলে ফুল চন্দন দে পূজো করবে? তারপর কি হল? ছোঁড়া এসে কি বল্‌লে টল্‌লে? মার-ধোর করলে বোধ হয়।

তা আর কিছু শুনিনি মা, বিষ্টি এল বলে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম কিনা। বরটা যে কখন এল টের পাইনি। সন্ধ্যে বয়ে যাচ্ছিল, আহ্নিক করতে বসলাম।

রাজুর মা বিরক্তিতে মুখ বাঁকাইয়া বলেন, তোর যে কেমন এক দশা! কি হ'ল শেষটায় জানতে হয় তো? আহ্নিক তো পালাচ্ছিল না বাছা! এমন আশ্চয্যি—কোন চুলোয় যদি বেরিয়েছি তো অমনি—আ মোলো, আবার যে বিষ্টি এল চড়বড়িয়ে—মুখপোড়া আকাশ, দিনরাত্তির কেঁদে কেঁদে মরছেন। মুখে কেউ নুড়ো জেলে দেয় না!

—ও মা ঘুঁটে ক'খানা যে বাইরে পড়ে—বলিয়া রাজু ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

মা হরিনামের মালা গাছটি হাতে করিয়া বোধ করি হরিনামের উদ্দেশ্যে 'ছিদ্রপথে' আসিয়া দাঁড়ান।

ঠিক তেমনি সময়ে ভিজিতে ভিজিতে এক গা জল লইয়া শিশির আসিয়া হাজির। ইন্দিরা বঁটি পাতিয়া কুটনো কুটিতে বসিয়াছিল, তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বলে, এ কি কাণ্ড? ভিজে যে নেয়ে গেছ?

শিশির চুলের জল ঝাড়িতে ঝাড়িতে উঁচু গলায় বলিয়া ওঠে, তোমার পরম পূজনীয় দাদাটি গেলেন কোথায়? ডাকো তাঁকে।

ইন্দিরা হাসিয়া ফেলে, সকাল বেলা দাদা তোমার ঘরে আগুন দিয়ে এল নাকি? হ'ল কি? এই নাও তোয়ালে, মাথাটা মোছ তো আগে, কাপড় এনে দিচ্ছি, বদলে ফেল, ছিঃ ছিঃ, কি ভীষণ ভিজেছ!

শিশির মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলে, আর থাক, যথেষ্ট আত্মীয়তা হয়েছে। ডাক দাদাকে, আমি আজ একটা বোঝাপড়া করতে চাই।

—কি মুস্কিল, দাদার তো এখন অর্দ্ধেক রাত। ততক্ষণ বরং শুকনো কাপড় পরে একপেয়ালা গরম চা খেয়ে তাজা হয়ে নাও, তারপরে সম্মুখ সমরে অগ্রসর হ'য়ো।

—কেন, আমি কি তোমার এক পেয়ালা চায়ের লোভে টালা থেকে টালিগঞ্জে ছুটে আসছি ?

ইন্দিরা মুখখানা ভাল মানুষের মত করিয়া বলে—তা'হলে ?

তা' হলের উত্তরে হয়তো অনেক কিছু বলিবার ছিল, নীরেন আসিয়া চেঁচামেচি বাধাইয়া তোলে—আরে, এ কি ? রাত দুপুরে ভদ্রলোকের বাড়ী চড়াও হয়ে—চোখ রাঙানো ? মানে কি ? মিলিটা তো ভয় পেয়ে—

শিশির বিস্ফারিত চক্ষে বলে—রাত দুপুরে !

—না তো কি ? এই বাদলার দিনে এসময়ে কোন্ ভদ্রলোক বিছানা ছেড়ে উঠেছে ? ছিঃ ছিঃ, কাঁচা ঘুমটাই মাটি করে দিলে।

নীরেন হতাশভাবে একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়ে, বলে—অনেক সাধনার জিনিস হে, বোঝ না তো মর্ম্ম ?

—দাদা, দাদা, তুমি আর বোলো না, তোমার সাধনার জিনিস নয়, সাধা জিনিস ! ইন্দিরা উচ্ছ্বসিত হইয়া হাসিয়া ওঠে।

—তাই তো বলছি রে, ছেলেবেলা থেকে সাধনা করে করেই না এখন সাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু শিশির ভিজে কাকটি হয়ে কেন ? ইন্দু একটা কাপড়-জামা দে। মিলি, তোয়ালে আনো।

—এই তো দাদা, সব হাতে করে দাঁড়িয়ে আছি, বাবু যে নেবেন না ! ভীষণ রাগ ! ঘুম ভেঙ্গে ছুটে এসেছেন, তোমায় বিনা নোটিশে ছমাসের ফাঁসি দেবেন।

নীরেন হতাশভাবে চারিদিকে তাকাইয়া বলে, অপরাধ ? যেন ঘরের দেওয়ালে অপরাধ খুঁজিয়া পাইবে।

শিশির চুলের মধ্যেকার জলকণাগুলি ইচ্ছাকৃত অসাবধানে ইন্দিরার গায়ে ছিটাইতে ছিটাইতে সব্যঙ্গে বলে—আজ্ঞে, অপরাধ আপনার কেন ? আমারই। বলি মশায়, পরের বৌ আটকে রেখে দিনরাত ঘুমের সাধনা করাই বা কেমন ভদ্রতা ?

ইন্দিরার হঠাৎ যেন ঘরের ভিতর কি একটা কাজ পড়িয়া যায়। উঠিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না।

নীরেন বিস্মিত হইয়া বলে—পরের বৌ আটকে ? এবং পরক্ষণেই কথাটা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিশিরের পিঠে ভীষণ দুইটা থাবড়া মারিয়া উচ্চহাস্যে ঘর ভরাইয়া তোলে।

মেয়েমানুষের হাসি তো অসহ্য, পুরুষের হাসিও রাজুর মার গায়ে বিষ ছড়াইয়া দেয়—

ঠোঁট উল্টাইয়া বলেন, কিসের সুখে যে লোকে দিবে-রাত্তির ঘর ফাটিয়ে হাসে তাও জানিনে। কথায় বলে 'উচ্চহাসি সর্বনাশী'। হরি মধুসূদন, হরি মধুসূদন, যত হাসি তত কান্না!

ইহার পর যে সব কথাবার্ত্তা চলিতে থাকে—তাহার সাড়ে তের আনা রাজুর মার অবোধ্য। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বিরক্ত হইয়া সরিয়া আসেন—ঝাঁটা মার না অমন কথার মুখে।

এবং সরিয়া আসিয়া কম্বলের আসনখানি বিছাইয়া এবার বোধ হয় সত্যসত্যই পূজায় মন দেন।

ও অঞ্চলের আরো যে কি হইল রাজুর মার অগোচর! রাজু ছুটিয়া আসিয়া বলে, ও মা শুনেছ কাণ্ড?

মা তাহার তখন পূজাপাঠ সারিয়া একবাটি চালভাজা লইয়া গুছাইয়া বসিতেছে। বলে, একটা কাঁচা লঙ্কা দে তো রে রাজু, তোর যে আবার চালভাজা মুখে রোচে না, খা না এক মুঠো, বর্ষার দিনে লাগবে ভালো।

—আচ্ছা রাখো দু'টি। শোনো তাহলে বলি মা, মেয়েটাকে তো আমরা বিধবা বলে ঠিক করে রেখেছি! শুনছি না কি বিয়েই হয় নি এখনো। কি ঘেন্নার কথা মা,—ছি ছি, না-হক কতদিন ছাইভস্ম বলা হয়েছে তার ঠিক নেই। আমার কিন্তু মাঝে মাঝে সন্দেহ হ'ত বাপু!

সন্দেহ যে রাজুর মারও না হইয়াছে তাহা নয়, কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই সে সন্দেহকে আমল দেন নাই। রাজুর চাইতে যে মেয়ে বড় বই ছোট হইবে না, তাহার যে আজও সম্মুখে উজ্জল ভবিষ্যৎ পড়িয়া আছে এই কি মনে স্থান দিবার মত কথা।

অপ্রসন্ন মুখে বলেন, এ সুখবরটি কানে ধরে তোমায় বলে গেল কে?

রাজু মাতার অপ্রসন্নতাটুকু লক্ষ্য করিল না, সহাস্যে কহিল, সব যে শুনলুম নিজের কানে। ওই ছেলেটার সঙ্গেই নাকি অনেক দিন থেকে বিয়ের ঠিক। ভাজ হঠাৎ মারা যাওয়াতে—কে ক'চি 'মাওড়া' মেয়েটাকে দেখে তাই বলে বিয়ে করতে পারছিল না। এখন বড় হয়েছে, কোন বোর্ডিংএ নাকি ভর্ত্তি করে দেবে। কথার ভাবে ভঙ্গিতে সবই বোঝা গেল। আসছে মাসেই না কি বিয়ে!

রাজুর মা নিঃশব্দে মুঠা মুঠা চালভাজা গিলিয়া একঘটি জল সাবাড় করিয়া ঘটিটা সশব্দে মাটিতে ঠুকিয়া বলেন, তবে আর কি শিগ্গির যাগি গে!

রাজু অপ্রতিভ হইয়া বলে, না, তাই বলছি—শুনলাম কি-না! হলে কিন্তু বেশ মানায়, না মা? মেয়েটাও যেমন খাসা দেখতে, ছেলেটারও তেমনি চেহারা। বেশ সাজন্ত হবে।

সহসা রাজুর মা জলিয়া উঠিয়া বলেন—হবে তা তোর কি লা? দিনরাত পরের কথায় তোর কিসের কাজ? হাতের নোয়া ঘুচিয়ে যেন চারখানা হাত বেরিয়েছে। পূজা নেই, আহ্নিক নেই, দুদণ্ড ঠাকুরদেবতার নাম নেই, খালি পরচর্চা, লোকের সুখ ঐশ্বয্যি দেখে

দাঁত বের করে হাসতে লজ্জা করে না? বেহায়া ছুঁড়ি কোথাকার! দূর হ, আমার সুমুখ থেকে দূর হ। একটা সাতছেলের মা বুড়োমাগীর বিয়ে না 'নিকে'—তাই নিয়ে আদিখ্যেতা করতে এসেছে! যমেও নেয় না তোকে?

বিদ্রোহ করিতে রাজু জানে না। অন্যায় তিরস্কার তাহার গা-সহা। সামনে থাকিলে উত্তরোত্তর বাড়িবে বই কমিবে না জানিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যায়।

মাতা কন্যার গমন-পথের পানে বিষদৃষ্টি হানিয়া রুদ্ধ চাপাগলায় দাঁতে দাঁত ঘসিয়া বলেন, সোমত্ত মেয়ে মা-বাপের বুকের ওপর শুধু-হাত নেড়ে বেড়ানোর চেয়ে কুলে কালী দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভাল। দিনরাত চক্ষুশূল হয় না।

রাজু শিহরিয়া ভাবে, রাগিলে মার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। থাকে নাই বটে। গুম হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজুর মা দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া উঠিয়া পড়েন। পায়ের ধাক্কায় একটা নিমিলিত-নয়না বিড়াল-বালা সচকিতে ছুটিয়া পলায়। জলের ঘটিটা কাৎ হইয়া গড়াইয়া যায়, চালভাজার বাটিটা ছিটকাইয়া 'হেন্‌শেলে' আশ্রয় লয়। সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া সযত্ন-রোপিত টবের তুলসী চারার গোড়া খুঁড়িয়া খানিকটা মাটি লইয়া পার্টিশনের গায়ের সাধের জানালায় লেপিয়া দিয়া আসেন এবং কিছু যেন সান্ত্বনা পাইয়া টানিয়া টানিয়া সনিঃশ্বাসে বলেন,—গেরস্ত ঘরের মেয়ের নিত্যি নতুন 'নীলে-খেলা' আর চোখে দেখা যায় না। হরি নারায়ণ! হরি নারায়ণ! বামুনের ঘরের মেয়ে হই তো রাত পোয়াতেই এ পাপপুরী ত্যাগ করে তবে আর কাজ।

বলিয়াছি যে, রাজুর বুদ্ধি শুদ্ধি অল্প, মায়ের ব্যবহারের অর্থ বোঝা তাহার সাধ্য নয়। বিধবা মেয়ের লীলাখেলা হাসিয়া হাসিয়া উপভোগ করিতে যাঁহার বাধে না, কুমারীতেই বা তাঁহার এত আপত্তি কিসের, বেচারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না, বোকার মত ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া থাকে।

ধাঁধার উত্তর

বাড়ী হইতে এ পথটুকু এক রকম ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বাসে চড়িয়া বসিয়া জগদীশ নিঃশ্বাস ফেলেন, ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় লইয়া।

নিঃশ্বাস ফেলেন—অবসাদের নয়, ঔদাস্যের। নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবেন—

আর নয়, আগামী মাস হইতে কাজটা ছাড়িয়া দিয়া তবে আর কথা। এই মাসের এই কয়টা দিন—ব্যস,—ভাবেন নয়, দৃঢ়সঙ্কল্পই করেন মনে মনে।

যথেষ্ট হইয়াছে আর কেন? কাহার জন্তই বা খাটিয়া মরা? তা'ছাড়া এ বয়সে খাটিয়া খায় কে? বিশ্রামের দাবী তিনি করিতে পারেন।

ভুল করিবেন—যদি মনে করেন, বয়সের ভারে ঝুঁকিয়া পড়া বৃদ্ধ জগদীশ সাবধানে আর ধীরে ধীরে গাড়ীতে উঠিয়া বসিয়া নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন শ্রান্তি মোচনের—অথবা এই সামান্ত পথটুকু দ্রুত তালে অতিক্রম করিয়া আসিতে হাঁপাইতে হইতেছে তাঁহাকে।

শালের খুঁটির মত মজবুত শরীর জগদীশের, সত্তরটি শীত, গ্রীষ্ম, হিম-জল সহিয়াও সোজা আর সতেজ। 'কাল' এই দীর্ঘকালের সাধনাতেও তাঁহার মেরুদণ্ডে ঘুন ধরাইতে সক্ষম হয় নাই।

ভুল করিবেন—যদি মনে করেন, আজীবন অবিশ্রান্ত খাটিয়া খাটিয়া মনে আসিয়াছে ক্লান্তি আর বৈরাগ্য; কর্ম্মবিমুখ চিত্ত শেষ জীবনটায় বিশ্রামের জন্য লালায়িত।

খাটিবার ইচ্ছা এবং সামর্থ্য তাঁহার যুবক পুত্রদের অপেক্ষা বেশী বৈ কম নয়।

"জন্‌সন্ এণ্ড কোম্পানীর" ঘানিতে আট দশ ঘণ্টা অক্লান্ত ঘুরিয়া আসার পর, অবলীলা-ক্রমে প্রত্যহ দুই মাইল পথ হাঁটিয়া বাড়ী আসেন জগদীশ।

আসেন অবশ্য সখের খাতিরেই। পথ-খরচার ওই পয়সা কয়টি বাঁচাইয়া সংসারের কোন মহৎ উপকার সাধিত হইবে এমন দুরবস্থা জগদীশের নয়।

পঞ্চাশটি টাকার বিনিময়ে একদা যে দাসত্বের সুরু হইয়াছিল, উনপঞ্চাশ বৎসরের নিখুঁত কর্ম্মকুশলতা ও নিরীহ বশ্যতার গুণে ক্রমবর্দ্ধমান গতিতে তাহা পদমর্য্যাদায় ও অর্থ-গৌরবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে অনেক দূর।

তা' সখের খাতিরে করিতে হয় অনেক কিছু। নয়টা বেলায় 'জন্‌সন্' কোম্পানীর হাজিরা খাতায় সই দিবার আগেই বাজারে হাজিরা দিতে হয় প্রত্যহ।

প্রত্যেকটি জিনিস নিজের হাতে নাড়িয়া-চাড়িয়া, বাছিয়া বাছিয়া কেনা—এক দুর্দ্দান্ত সখ।

তাহারও আগে—

ছোট ছোট নাতি-নাতনীগুলিকে লইয়া পার্কে চরাইয়া আনা আর এক সখের কাজ।

আলস্য জগদীশের কোনখানেই নাই, না শরীরে, না মনে।

মনে করিতে পারেন, বৃদ্ধ জগদীশের অর্থোপার্জ্জনের দায়িত্ব আর প্রয়োজন মিটিয়াছে।

কৃতী পুত্রদের ভরসায়—অনায়াসেই ত্যাগ করিতে পারেন প্রতি ত্রিশটি দিন অন্তর গোছাকতক করিয়া নোটের মায়া—মনে করিলে ভুলই করিবেন—

কারণ পাঁচটি পুত্র জগদীশের কৃতবিদ্য বটে, তবে কৃতী কেহই নহেন।

লোকের কাছে বলিতে মুখোজ্জল, বাহির হইতে শুনিতেও ভাল—বড় ছেলে ওকালতী করে, মেজ ডাক্তার, সেজ (দেশের একটা বড় অভাব দূর করিতে) সাবানের ফ্যাক্টরী খুলিয়াছে এবং ন' আর ছোট যেদিক হইতে যতগুলা পাশ করা সম্ভব সবগুলা করিয়া রাখিয়া,

একজন খবরের কাগজে প্রবন্ধ লিখিতেছে ও একজন ন্যাট্রলজি শিখিতেছে। ওই পর্য্যন্ত—

বিরাট সংসারটি কিন্তু খাড়া হইয়া আছে, এই শালের খুঁটির ঠেকোয়।

চাকুরী ছাড়িয়া দিবার সাধু সঙ্কল্প জগদীশের সংসারের উপর অভিমানে ও রাগে।

জব্দ করিয়া দিবেন জগদীশ সকলকে।

আশ্চর্য্য কাণ্ড! অথর্ব্ব অনড় বসিয়া-খাওয়া বাপ নয় যে, সংসারের বাড়তি আবর্জ্জনার সামিল হইয়া যাইবেন। এখনও ছেলেদের ট্রামবাসের ভাড়ার জন্য বাপের কাছে হাত পাতিতে হয়, তবু জগদীশ মর্ম্মাহত হইয়া দেখেন বাপের উপর যেন উহাদের স্পষ্ট অবজ্ঞা।

কথা কয় বাঁকাইয়া, হাসে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে, অর্দ্ধেক সময় উহাদের হাসি-কথার অর্থই বোধগম্য হয় না। আত্মজ বলিয়া একান্ত আপন বলিয়া চিনিবার যো নাই, কে যেন উহারা, কোথা হইতে মানুষ হইয়া আসিয়াছে, পরিণত বয়স ও মন লইয়া, আপনাদের বিদ্যাবুদ্ধির অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া।

আসিয়াছে এবং দয়া করিয়া যে জগদীশের বাড়ীতে রহিয়া দুইবেলা অন্ন গ্রহণ করিতেছে সেও শুধু তাঁহাকে কৃতার্থ করিতে, এমনিতরো ভাবখানা উহাদের।

ডাকিলে সাড়া দেয় না। কথা কহিলে উত্তর দেয় বিরক্তিপূর্ণ। তাহাদের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিলে চটিয়া ওঠে, উপদেশের উত্তরে চোখ গরম করিয়া কড়া কথা শুনাইয়া দেয়।

যেন উহাদের কথায় কথা কহা জগদীশের অনধিকার চর্চ্চা, ধৃষ্টতা।

অপমানিত জগদীশের চোখে জল আসিয়া পড়ে। তবু ছাঁটিয়া ফেলিতে পারেন কৈ, তাহাদের ভাল-মন্দ সুখ-দুঃখের চিন্তা?

বার্দ্ধক্যের চিহ্ন শুধু এইখানেই ধরা পড়ে। কথার মূল্য যেখানে কাণা কড়াও নয়, সেখানেও কথা কহা চাই—মতামতের তোয়াক্কা কেহ না রাখিলেও জাহির করিতে হইবে।

মেয়েকে কলেজে পড়ানর দারুণ অনিচ্ছা জগদীশের, ছেলেদের ইচ্ছার কাছে হার মানিল।

বুড়ো ধাড়ী মেয়ে ভাইদের প্রশ্রয়ে আহ্লাদে আটখানা হইয়া জগদীশের মুখের উপর দিয়া কলেজে পড়িতে যাইতেছে।

কিন্তু কেন?

প্রতিনিয়ত জগদীশ আপনাকে আপনি প্রশ্ন করিয়া করিয়া ক্ষত-বিক্ষত হইতে থাকেন।

কেন তাঁহার মূল্য কমিয়া গেল? কবে কোন্ সূত্রে? কেমন করিয়া হারাইয়া গেল মান-সম্ভ্রম প্রতিপত্তি? মূর্খ বলিয়াই কি এত অবহেলা? কিন্তু জগদীশের বিদ্যাবুদ্ধির অল্পতায় উহাদের ক্ষতি হইয়াছে কিছু? কি ত্রুটি করিয়াছেন তাঁহার পিতৃ-কর্ত্তব্যের! যে শিক্ষার অহঙ্কারে তাঁহাকে তুচ্ছ করিতেছে -তাহার রসদ যোগাইল কে?

শুধু ছেলেরা বলিয়া নয়, অনেক চিন্তা মনের ভিতর পাক দিতে থাকে জগদীশের—মেয়েরা, বৌরা পর্য্যন্ত এখন আর আগের মত তাঁহার সুখ-সুবিধার জন্য ত্রস্ত-সন্ত্রস্ত নয়, ঢল নামিয়াছে অন্যদিকে। কেবলমাত্র জগদীশের জন্যই ন'টার মধ্যে অফিসের ভাতের দরকার

হয়, সেও একপ্রকার অপরাধের সামিল।

গৃহিণীর কথা বাদ দেওয়াই ভাল, সে আর বলিয়া কাজ নাই।

বাড়ীতে একটা ভালমন্দ জিনিস আসিলে তিনি চাকর-বাকরদের জন্য পর্য্যন্ত টুকিয়া টুকিয়া ভাগ করেন, মনে থাকে না শুধু কর্ত্তার কথা।

এই ত সেদিনের ল্যাংড়া আমগুলা—অসময়ের জিনিস চড়া দাম দিয়া বাছিয়া বাছিয়া কেনা! সকালে তাড়াতাড়িতে ত খাইবার সময় নয়, রাত্রে আহারে বসিয়া খোঁজ করিতেই গৃহিণী অম্লান-বদনে জবাব দিলেন—সে আবার এখনও বসে আছে, ও বেলাই উঠে গেছে।

দোষ জগদীশের, অথবা তাঁহার বয়সের, বার্দ্ধক্য না ধরুক, তবু বয়স হইলে এটা-সেটা খাইবার ইচ্ছাটা একটু বাড়ে বৈকি।

চুপ করিয়া যাওয়ার বদলে জগদীশ সক্ষোভ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলেন—আট্ আটটা বড় বড় আম সব উঠে গেল? কে খেল এত?

আঃ গৃহিণী কি ঝঙ্কারটাই দিলেন সেদিন! বুড় হ'চ্ছ না বুদ্ধি-সুদ্ধির মাথা খাচ্ছ—পাঁচটা ছেলেপুলের ঘরে ও ক'টা আবার কতক্ষণের? তাই কি বাছারা প্রাণ ভরে খেতে পেয়েছে, কুটি কুটি ভাগ করতে করতে আধখানা বই আস্ত কুলায় না। তোমার যেন বয়স হয়ে হয়ে বাড়ছে দিন দিন।

নিতান্তই নাকি দৃষ্টিকটু, আর কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়—তাই ভাত ফেলিয়া উঠিতে পারেন না জগদীশ, কিন্তু আহার্য্যবস্তু গলা দিয়া নামিতে চাহে না।

গত জীবনটা কি স্বপ্ন? খাইবার জন্য সাধ্য-সাধনা করিয়া মাথার দিব্য দিত অন্য কেহ?

পরে অবশ্য গৃহিণী এক সময় বুঝাইয়া দিয়া দোষস্খালন করিতে আসিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—কি করি বল, পষ্ট দেখলাম তোমার কথা শুনে মেজ বৌমা মুখটিপে হেসে সরে গেলেন, আমারও কেমন মেজাজটা গেল চড়ে। এতখানি বয়সে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটছ দিনরাত্তির, এখন একটু যত্ন-আত্তি, ভাল-মন্দ খাওয়া-দাওয়ার দরকার বুঝি না কি? কিন্তু ছোটলোকের মেয়েরা আপনারা ত হুঁস করবেই না, আমি করতে গেলে উল্টে উপহাস্তি। কলিতে সবই উল্টো কিনা—ক্ষুদে ক্ষুদে বৌ সব এখুনি আমার নাকের সামনে চব্বিশ ঘণ্টা বরেদের হাতে হাতে, মুখে মুখে ঘুরছেন, অথচ—

আরও বিস্তর কথা গৃহিণী বলিয়া থাকিবেন, জগদীশ কান দিবার প্রয়োজন বিবেচনা করেন নাই।

ক্রোধে সর্বশরীর জলিতেছিল তাঁহার।

সব ব্যাটা বেটীদের জব্দ করে ছাড়ব জগদীশ ভাবেন—কাহার দৌলতে এত নবাবী একবার খেয়াল হয় না? গলায় পড়া শত্তুর হইলে বোধকরি গলাধাক্কা দিত।

'মরিয়া' হইয়া একদিন সাধ মিটাইয়া উচিত কথা শুনাইয়া দিবার সাধ হয়, কিন্তু উহাদের মুখোমুখী দাঁড়াইলেই যেন সাহস লোপ পায়।

রুদ্ধ আক্রোশের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চাকরী ছাড়িয়া দিবার সাধু সঙ্কল্প করেন জগদীশ, প্রত্যহ দুই বেলা। করেন, যতক্ষণ বাড়ীতে—

"জনসন" কোম্পানীর চৌকাঠ ডিঙাইলেই, প্রতিজ্ঞা আপনি শিথিল হইয়া আসে, অস্পষ্ট হইয়া আসে স্ত্রী-পুত্র ঘর-সংসার। কোম্পানীর বড়বাবু ছাড়া তাঁহার যে আর কোনও সত্তা আছে তাহা স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।

নিভিয়া যায় মনের জ্বালা। দেখেন কোথাও কিছুই ত ব্যতিক্রম ঘটে নাই। এখনও ত্রস্ত কেরাণীকুল ঘাড় হেঁট করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, সাহেবরা পর্য্যন্ত পরামর্শ চায়। "আগামী মাস" সুদূর অনিশ্চয়ে গড়াইয়া পড়ে, চাকুরী ছাড়িয়া দেওয়া আর হয় না।

মনটা আবার হালকা ঠেকে, ভারী ভাল লাগে ছোট ছোট শিশুগুলিকে লইয়া খেলা দিতে, আদর করিতে। মনে পড়িয়া যায় আপনার ছেলেদের শৈশবকাল।

অবিকল 'বাচ্চু'র মত দেখিতে ছিল বিনয়—রং, গড়ন, মুখ।

মণ্টুর চেহারায় আদল আসে বিজয়ের।

অকস্মাৎ নূতন করিয়া বাৎসল্য রসে মন ভরিয়া ওঠে।

পাঁচটি ভাই একত্রে আহারে বসে, মুখ দেখিলে বুক জুড়াইয়া যায়—স্নেহবিগলিত জগদীশ ব্যস্ত হইয়া বলেন—ও কি হল বিনয়! এখুনি খাওয়া হয়ে গেল তোমার? ক'খানাই বা খেলে?...ঠাকুর, বড় দাদাবাবুকে আর দু'খানা লুচি দিয়ে যাও—গরম দেখে এন।

বিনয় প্রতিবাদ করে না, শুধু ঠাকুরের পানে চাহিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করে।

লেখা পড়া শিখিয়াছে বিস্তর, বুদ্ধিবৃত্তি স্থূল নয়, গুরুজনের মান বাঁচাইয়া অপমান করিবার আর্ট উহাদের আয়ত্ত।

আহত হন জগদীশ, কিন্তু প্রকাশ করেন না। ঠাকুরকে তাড়া দিয়া বলেন—সঙের মতন দাঁড়িয়ে আছ কেন ঠাকুর, পাতে ফেলে দাও না! কেমন সব ফ্যাসান হয়েছে যে তোমাদের—কম খাওয়া! আরে এই ত খাবার বয়স, তোমাদের বয়সে আমরা দশ-বার গণ্ডা লুচি হাসতে হাসতে খেয়েছি—

—সে হয়ত আপনি এখনও পারেন, তাই বলে সেটা এমন কিছু বাহাদুরী নয় যে সকলকেই পারতে হবে—বলিয়া জলের গ্লাশে হাত ডুবাইয়া উঠিয়া পড়ে বিনয়, গরম লুচি দুইখানা পাতে ফেলিয়া।

অবাক হইয়া তাকাইয়া থাকেন জগদীশ খাইতে ভুলিয়া। উদ্যত ফণা সর্প লইয়া ঘর করা কি এর চাইতে বেশী কঠিন? সর্বদা যাহারা ছোবল মারিবার জন্য উদ্‌গ্রীব?

কথাটা অবশ্য মিথ্যা নয়, এখনও জগদীশ খাইতে-দাইতে ভালই পারেন! জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে খাইতে বসিয়া অনেক সময় লজ্জায় পড়িতে হয় তাঁহার জন্য।

অল্পাহার যেন এখনকার এক ফ্যাসানে দাঁড়াইয়াছে, মোটা হইয়া পড়িবার ভয়ে ভাবিয়া ভাবিয়াই শুকাইয়া উঠে বেচারারা।

ডাক্তার বিমল যখন-তখন অধিক ভোজনের অপকারিতা লইয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়ায়। অসুখ করিতেই জানেনা জগদীশের, তবু সেদিন সামান্য কি পেটের গোলমালের ছুতায় অনায়াসে মুখের উপর বলিয়া বসিল—অসুখ করা বিচিত্র কি, বুঝে সমঝে খাওয়া-দাওয়া ত করবেন না? কি বলব বলুন? অথচ—বুঝিয়া সমঝাইয়া চলিয়াও বাবুদের দুই বেলা ইসবগুল আর পাতিলেবুর প্রয়োজন হয়!

কিন্তু ওসব যুক্তি-তর্কে কান দিবার ফুরসৎ কাহার আছে?

হঠাৎ প্রত্যেকেই চমকাইয়া উঠে বিজয়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে—ঠাকুর, আবার আমাকে একগাদা আলু দিয়েছ, সরিয়ে নিয়ে যাও বাটী, কতদিন বলেছি আমায় আলু বাদ দিয়ে তরকারি দেবে! আলু বাদ দিয়া আলুর দম দেওয়া কতদূর সম্ভব ঠাকুর বেচারা বোধ করি তাহারই উত্তর খুঁজিতে থাকে। জিনিসটা জগদীশের বিশেষ প্রিয়। মৃদুস্বরে বলেন—দিয়ে ফেলেছে, আজকের মতন খেয়ে নাও—ভাল হয়েছে রান্নাটা, ফেলা যাবে!

—ফেলা যাবার ভয়ে খেয়ে ফেলতে হবে? পেটটা কি ডাষ্টবিন্? বলিয়া বিরক্ত বিজয় বাটীটা বাম হাতের উল্টা পিঠ দিয়া ঠেলিয়া দেয় খানিক দূর।···নিয়ে যাও ঠাকুর, এঁটো হয়নি। বসে বসে কতকগুলা আলু খেতে হবে—কোন মানে হয় না।

জগদীশ আর কথা খুঁজিয়া পান না এবং অন্য কোন কাজের অভাবে অন্যমনস্কভাবে এমন একটা কাজ করিতে থাকেন যাহার কোন মানে হয় না। বসিয়া বসিয়া কতকগুলা আলুই খাইতে থাকেন, বোকার মত।

কারণ ঠাকুরটা আলুর দমের বাটীর আর কোন সদ্‌গতি খুঁজিয়া না পাইয়া তাঁহারই পাতের গোড়ায় বসাইয়া দিয়া গিয়াছে—বাবুর প্রিয়বস্তু বলিয়া।

সকালবেলা পার্ক ফেরৎ আসিয়া বসিতেই গৃহিণী আসিয়া কহিলেন—দেখ বাজারে আজ আর যেও না—ক্ষেতুর শ্বশুর-বাড়ী থেকে বড় বড় ইলিশ দিয়ে গেল দুটা—আনাজ-পাতিও রয়েছে চারটি।

মনের জন্য শরীরটাতেও তেমন 'জুত' ছিল না, গায়ের জামা খুলিয়া খাটের উপর বসিয়া পড়িয়া আলস্য ত্যাগ করিতে করিতে জগদীশ উত্তর দেন—যাক্‌গে ভালই হয়েছে, আমারও বেরুতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, বেলাও হয়ে গেছে। নীচে যাচ্ছ—নন্টুকে বল ত একখানা খবরের কাগজ দিয়ে যেতে।

গৃহিণী থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলেন—খবরের কাগজ! সে ত আর নেয় না, বন্ধ করে দিয়েছে।

নেয় না কি আবার! দুখানা করে কাগজ আসে বাড়ীতে দেখতে পাই।

আসতো বটে—গৃহিণী স্বর নামাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া বলেন—কি না কি বলেছ তুমি খবরের কাগজের কথা, তাই অভিমান করে ছেড়ে দিয়েছে।

কি বলিয়াছেন জগদীশ! কাগজের কথা! আকাশ হইতে পড়িতে হয় যে।

—আমি আবার কখন কি বললাম? বলবার হুকুম আছে আমার কিছু?

—জানিনে বাবু, বৌমারা কি যেন বলাবলি করছিল—দু'খানা ক'রে কাগজ নেয় ব'লে কি খোঁটা দিয়েছ তুমি। ছেলেপুলের বয়স হ'লে একটু সমীহ ক'রে কথা কওয়াই উচিত।

কি আশ্চর্য্য! বলে কি ইহারা? খোঁটা দেওয়ার মানে কি? অপরাধের মধ্যে সেদিন বলিয়াছিলেন—হ্যাঁরে, কাগজগুলো ভাঁজসুদ্ধ অমনি ঝাড়ুর আগায় যায়—পড়িস্ কই?

বিদ্রূপ-হাস্যে উত্তর দিয়াছিল বিভাস—কেন, হেয়ার অয়েলের য়্যাড্ভার্টিসমেণ্টগুলো পর্য্যন্ত পড়ে দাম উসুল ক'রে নিতে হবে?

সুবিধামত উত্তরের অভাবেই বোধ করি জগদীশ আম্‌তা-আম্‌তা করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছিলেন—তা নয়, সে কথা হচ্ছে না, পড়বার সময় নেই, দু'খানা করে নেবার দরকার কি, তাই বলছি।

এই ত কথা! ইহাকে যদি খোঁটা দেওয়া বলে, মুখ সেলাই করিয়া ফেলাই উচিত জগদীশের— কথা কহিলেই দোষের দাঁড়ায় যখন। ছেলেদের বয়স হইলে সমীহ করিয়া চলা উচিত, উচিত নাই শুধু বাপের বেলায়।

আর একদিন অমনি অযথা ফ্যান ঘুরানর কথায় কি যেন বলিতে গিয়া কি বিপদ! বড়-বৌমা চাকর ডাকিয়া পাখার ব্লেডই খুলিয়া রাখিলেন!

হঠাৎ জগদীশ মেজাজের ওজন হারাইয়া চীৎকার করিয়া উঠেন—

—বটে, সমীহ ক'রে চল্‌তে হবে? কেন শুনি? বলি পেটের ছেলে না জ্ঞাতি শত্রু সব? মন থেকে বিষ তুলে বদনাম দিচ্ছে শুধু শুধু? কী আমি ব'লেছি কবে? রাশ রাশ পাশ করে বিদ্যে হয়েছে অনেক—একটা বুড়োর মাথায় কাঁঠাল ভেঙে চল্‌ছে তা হুঁস্ নেই, এতটুকু উনিশ-বিশে ষোলআনা রাগ। কেন আমি তোয়াক্কা ক'র্‌ব ওদের? জব্দ করে দিতে পারি তা জান?

গৃহিণী সদ্যকাচা কাপড়ের শুচিতা ভুলিয়া কর্ত্তার মুখে হাত চাপা দিয়া বলেন—চুপ চুপ সর্বনাশ, কর কি?

রোষে-ক্ষোভে কাঁদ কাঁদ হইয়া যান জগদীশ, মুখ সরাইয়া ভাঙা গলায় বলেন—কেবল চুপ চুপ, কি চোর দায়ে ধরা প'ড়েছি আমি? বসে খাচ্ছি কারুর ঘাড়ে-পড়া হ'য়ে?

গৃহিণী বিষণ্ণভাবে বলেন—বসে খাওনা সেই ত জ্বালা। বসে খাওয়ারই ত কথা, ভগবানের উল্টো বিচার—তুমি এখনও মুখে রক্ত তুলে খাটছ, আর জোয়ান-জোয়ান ছেলে ওরা—মূখ্যু নয়, বদমায়েস নয়, গাড়ী গাড়ী বিদ্যে ক'রে বসে খাচ্ছে, সেই ঘেন্নায় বাছাদের মনের ভেতর আগুন জ্বলছে। মা আমি, বুঝি ত সব! সেদিন বিয়ের কথা তুলতে বিজু বল্লে—আমরা ত তোমাদের ঘাড়েপড়া বিধবা মেয়ে, বিয়ে আবার কি? যে চালে মানুষ

হ'য়ে এসেছে, তাই চল্‌ছে বটে, কিন্তু মনে কি ওদের সুখ আছে একতিল? তাতেই খরচ-পত্তরের কথা এতটুকু তুললেই ওদের গায়ে লাগে, অপমান হয়। বাজারও এমনি হতচ্ছাড়া পড়েছে! তুমি একটা মোটে পাশ ক'রে দিন কিনে নিয়েছিলে, আর ওরা এই এতো পাশ ক'রে ঠায় ঠায় বসে আছে।

বাক্যহারা জগদীশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকেন। যে প্রশ্ন অবিশ্রাম তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে থাকে, এতদিনে যেন তাহার উত্তর মিলিয়াছে। কারণ মিলিয়াছে দুর্বোধ্য ব্যবহারের। অক্ষমতার লজ্জা, যাহার খায়, তাঁহাকেই ছোবল মারিতে শিখায়।

গৃহিণী বুঝিয়াছেন কতকটা, তবু কিছু হয়তো বাকী আছে। শুধুই কি আত্ম-ধিক্কার? উহারই ভিতর লুকাইয়া নাই কি চাপা ঈর্ষা, পিতার উপর?

পুণ্যভূমি

সকালে উঠিয়াই রাঁধুনীর খোঁজে বাহির হইয়াছি।

গৃহিণীর কষ্ট তো আর চোখে দেখা যায় না। এতগুলি "কৃষ্ণের জীবের" ভার একলা মানুষের পক্ষে বাস্তবিকই সহজ নহে।

চাকর-বাকরের পাট নাই, ঠিকা ঝি একটা দুই বেলা আসিয়া বাহিরের কাজগুলা করিয়া দিয়া যায় মাত্র। বাকী সমস্তই তাঁহার ঘাড়ে।

ইহার উপর আবার 'শুচিবাই'। কাজেই মাজা বাসনগুলা আবার মাজিতে হয়, রান্নাঘরটাও ধুইয়া নিতে হয় বৈ কি।

"লোকেদের বাড়ীর" মত এঁটো-কাঁটায় একসা হইবে না কি? ছিঃ!

ইহার কল্যাণে কৃষ্ণের জীবগুলারও দুর্গতির অন্ত নাই! তা কপালে দুর্গতি না থাকিলে কি আর একটা ঘরে একপাল আসিয়া ভীড় বাড়াইত?

মোট সংখ্যা ভদ্রসমাজে উল্লেখযোগ্য নয় বলিয়াই চাপিয়া গেলাম। কিন্তু সত্য বলিতে কি, সব কয়টি যখন একত্র আহারে বসে, অথবা দুইখানা ঘর জুড়িয়া ঘুমায়, দেখিলে হঠাৎ নিজেরই অবাক লাগে। অবিমৃষ্যকারিতা সম্পর্কে চেতনা আসিতে বড় দেরী হইয়া যায়।।

কিন্তু বর্ত্তমান যুগের নারী হইলেও, প্রেয়সী এ বিষয়ে ঠাকুরমা দিদিমাদের অনুকরণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। বলেন—"মানুষের তো হাত নেই, ভগবানের দেওয়া। ভগবান না দিলে মাথা খুঁড়লে একটা ছেলে মেলে?" কিন্তু তিনি যখন সেই 'ভগবান দত্ত' দেবদূতগুলিকে "শূয়োরের পাল" বলিয়া অভিহিত করেন (ব্যবহারও তাহার চাইতে উঁচুদরের কিছু করেন বলিয়া মনে হয় না), তখন বলিতে ইচ্ছা হয়—হে ভগবান, দান করিবার বেলায় যদি মাথার ঠিক রাখিয়া একটু হিসাব করিয়া চলিতে!

করেই বা কি ? কোলের মেয়েটার বারোমাস সর্দ্দি-কাশি, জ্বর তো লাগিয়াই আছে। তার উপরের ছেলেটা কেমন যেন্ নেলা-খেপা মত, তিন চার বছর বয়স হইল, আজও দাঁড়াইতে গেলে পড়িয়া যায়, কথা কহিতে পারে না। একটা অমানুষিক দুর্ব্বোধ্য চীৎকারে ক্ষুধা-তৃষ্ণা বুঝাইতে চায়—কখনো কৃতকার্য্য হয়, কখনো প্রহার লাভেই প্রয়োজন মিটাইয়া লয়।

মাতৃস্নেহ ফল্গুধারার মত কোথায় যে প্রবাহিত হয় কে জানে, উপর হইতে ধূ ধূ বালি ছাড়া বড় কিছুই চোখে পড়ে না।

যে কয়টা ভাল ছিল, সম্প্রতি মামার বিবাহে হরিপুর ঘুরিয়া আসিয়া খাসা ম্যালেরিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে। বুঝুন ব্যাপার !

বলিতে গিয়া বিপদ। "কেন কলিকাতায় কি রোগ নাই ? হরিপুরের সকলে কি মরিয়া গিয়াছে ?" ইত্যাদি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে হয়।

বিশ্বসংসারের অপবিত্রতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে করিতে সর্ব্বদাই যেন কেমন একটা বিদ্রোহী ভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে মহিলার।

মনোজগতের কোথায় কি বিপর্যায় ঘটিলে এ রোগের সৃষ্টি হয়, সেটা মনোবিজ্ঞানের কথা—কারণ হয়তো থাকিলেও থাকিতে পারে, আমি কিন্তু দেখি অকারণ জল ঘাঁটিয়া হাতে পায়ে হাজা, অযথা স্নানের অত্যাচারে চুলগুলো প্রায় সকলেই বিদায় লইয়াছে। তীক্ষ্ণ কণ্ঠ ও তীব্র দৃষ্টি যেন দিন দিন প্রখরতর হইয়া উঠিতেছে।

গায়ে জামা সেমিজের বালাই নাই, দিনের অধিকাংশ তো ভিজা কাপড়েই কাটিয়া যায়। বেশ-ভূষার বিশেষত্বের মধ্যে কেশবিরল সিঁথায় চওড়া করিয়া সিঁদুর পরা ! হাতে চুড়ির সহিত গাছ আষ্টেক-দশ 'লোহা'।

এতগুলো লোহা পরিবার হেতু কি জিজ্ঞাসা করিয়া একদিন ধমক খাইতে হইয়াছে। এ কথা না কি বলিতে নাই। স্বামী বেচারার পলাইবার পথে বেড়ী দেওয়াই যদি লোহা পরিবার প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে সেটা সংখ্যায় যত বেশী হয় ততই বোধ করি মঙ্গল।

অস্থিচর্ম্মসার দেহখানা ও কাঁকড়ার দাঁড়ার মত দুইটা হাতের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই। বিশ্রাম অবশ্য রসনারও নাই। অতটুকু একটা যন্ত্র হইতে কেমন করিয়া এমন অনর্গল শব্দ বাহির হইতে পারে সেটাও কম বিস্ময়ের কথা নয়। পাখীর মত সরু গলায় মোটা শিরা দুইটা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠে, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হয় এই চীৎকারেই গেল বুঝি ছিঁড়িয়া ! আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই হয় না।

তিনি যে একদা পরের ঘর হইতে আসিয়া এ সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন আমি অবশ্য সে কথা বহুকাল ভুলিয়াছি, তাঁহারই কৃপায় এ সংসারে কিঞ্চিৎ মাত্র স্থান পাইয়াছি ভাবিয়া কৃতার্থ বোধ করি। তিনি কিন্তু পূর্ব্ব কথা বিস্মৃত হন নাই এবং দুইবেলা তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে ত্রুটি করেন না। নিত্যকার মত আজও—এ সংসারে আসিয়া পর্য্যন্ত দাসীবৃত্তি করিতে

করিতে কেমন করিয়া তাঁহার ইহ-ও-পর উভয়কাল মাটি হইল—এই কথাটি তারস্বরে ঘোষণা করিতে মাত্র অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ব্যয় করিয়া সবেমাত্র ঘরের বাহিরে পা দিয়াছেন, হতভাগা ছেলেটা-ক্ষুধার 'বাহানা' লইয়া আঁচল ধরিয়া টানিল।

রাগে পিত্ত জ্বলিয়া গেল। যথাযথ সময় ক্ষুধা-তৃষ্ণা পাইতে কি উহাদের লজ্জাও হয় না? আশ্চর্য্য!

বাড়ীর আবহাওয়া দেখিয়া ক্ষুধা বোধ কর, তা না। দুষ্কর্ম্মের ফল পাইতে বিলম্ব হইল না—"দিলি তো হতভাগা ছুঁয়ে, আঁস্তাকুড় ধাঙড় কোথাকার!" সঙ্গে সঙ্গে দুইটা সশব্দ চাপড়। স্পর্শ দোষ ঘুচিয়াই গিয়াছে যখন, তখন আর বাধা কি!

কর্ম্মফল উহাদের!

যাক এখন আর তাহার জন্য কিছুমাত্র বিকার বোধ করি না। বাহান্নর সহিত পঁয়ষট্টির ব্যবধান লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, বরং "ভগবানের হাত" নামক অদৃশ্য বস্তুটাকে মানিতে শিখিয়া পর্য্যন্ত বেশ আরামেই আছি। নগদ চার পয়সা খরচ করিয়া একখানা 'মোহ-মুদ্গর' কিনিয়াছি। অবসর সময়ে মনঃসংযোগের চেষ্টা করি। এমনি একবার বইখানা হাতে লইয়াছি, সেজ মেয়ে 'ফুটি' ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া কহিল, বাবা শিগ্‌গির এসো, ফেন পড়ে মার পা পুড়ে গেছে—ভী-ষণ পুড়ে গেছে।

মুক্তকচ্ছ হইয়া ছুটিলাম।

কিছুক্ষণ পূর্ব্বে "কা তব কান্তা" গোছের যে উচ্চ চিন্তাটা মনের ভিতর আনাগোনা করিতেছিল, নিমেষের মধ্যে উধাও হইয়া গেল।

'ভীষণ'টা এদের কথার মাত্রা। ভাল লাগিলেও বলে 'ভী-ষণ ভালো'। 'ভীষণ'টা বাদ দিলেও মন্দ পোড়ে নাই দেখিলাম।

সহানুভূতি দেখাইতে গেলে প্রায়শঃ বিপরীত ফল ফলিতে দেখি, সে পথ মাড়াইলাম না।

প্রাথমিক প্রতিবিধানের পর কিছু ধাতস্থ হইয়া তিনি যখন তাঁহাকে বিস্মৃত হইয়া থাকার অপরাধে যমুনা দেবীর ভ্রাতাকে সখেদ অনুযোগ করিতেছিলেন—

নম্রভাবে প্রস্তাব করিলাম—একটা বামুন রাখলে হয় না?

গৃহিণী খেদ ভুলিয়া কঠোর দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বামুন রাখবে, পয়সা ধরছে না?

পয়সা জিনিসটা কখনো কাহারো না ধরিতে শুনি নাই, কাজেই উত্তর দিবার কিছু ছিল না। সবিনয়ে কহিলাম—সে যেমন করে হোক চলে যাবে, তোমারও তো বাঁচা দরকার!

—কে বললে দরকার? দরকার নেই। শীর্ণ নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া গৃহিণী পুনরায় কহিলেন, বামুন রেখে তো ভারীই সুবিধে, মুখপোড়ারা আচার বিচারের কিছু জানে? ছিষ্টি সংসার এঁটো-কাঁটা করে আমার মাথাটা থাক্ আর কি? মনে নেই সেবার?

মনে ছিল না—বিলক্ষণভাবে মনে পড়িয়া গেল। এ ধৃষ্টতা আগেও করিয়াছি। গৃহিণী

জ্বরে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন, চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া একটা আনকোরা 'উড়ে' ধরিয়া আনিয়াছিলাম। সে সাপ্-ব্যাঙ যাহা রাঁধিয়াছে অম্লান বদনে গলা দিয়া নামাইয়াছি।

গৃহিণী প্রথম দিন পথ্য করিয়াই তাহাকে 'পত্রপাঠ' বিদায় দিলেন ও মন্তব্য প্রকাশ করিলেন—পেটে সর্ব্বদা যাহাদের খাণ্ডব দাহনের আগুন জ্বলিতে থাকে, তাহারাই এই উৎকট পাঁচন বিনাবাক্যে গলাধঃকরণ করিতে পারে। তাঁহার অগ্নি অত প্রবল নয়।

তাহার পরদিন সকালে চিন্তাকুলচিত্তে বাহির হইতেছি একটা 'করিৎকর্ম্মা' লোকের সন্ধানে—দেখি দশ বছরের মেয়ে 'পানি' গামছা পরিয়া রোয়াকের উপর তোলা উনুন জ্বালিয়া ভাত চড়াইয়াছে ও তদীয়া জননী রান্নাঘরের ভিতর একটা উঁচু টুলে দাঁড়াইয়া ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া কড়ি বরগার গায়ে গোবরজল নিক্ষেপ করিতেছেন।

বিনাবাক্যে ফিরিয়া আসিয়া পরিত্যক্ত লেপখানা গায়ে দিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলাম।

ঘটনাটা স্মরণ হইতে একটু কঠিনভাবে কহিলাম—ওসব বাই একটু কমাও তো এবার—মরবে না কি? তা' ছাড়া দু'মাস বাদে আবার ছুটি নিতে হবে তো?—কারণ তাঁহার আবার 'সেবাসদনে' যাইবার সময় সন্নিকট হইয়া আসিতেছিল।

কথাটার উল্লেখে ভদ্রমহিলা চটিলেন—হাত মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিলেন—আহা মরে যাই, ভারী আমার ছুটি দেনেওয়ালা! ভারী একটা নতুন কাণ্ড কি না—বরাবর যেমন চলেছে তেমনই চলবে।

মানে—আট বৎসর বয়স হইতেই বড় মেয়েটাকে মাঝে মাঝে সংসার চালাইতে হয়।

এবার কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া মেয়েটার হালে হাল নাই। কহিলাম—পানিটার এবার যা অবস্থা, তাতে—

—তবে আর কি? 'সোমত্ত মেয়ে' ঘরে রেখে আমি নিশ্চিন্দি মনে হাসপাতালে গিয়ে বসে থাকবো? বলতে লজ্জা হ'ল না একটু?

উঁচু করিয়া খোঁপা বাঁধা, আধ ময়লা একটা ফ্রক গায়ে, তিন বছরের ভাইটাকে কোলে লইয়া রোগাকাঠি 'সোমত্ত মেয়েটা' ত্রিভঙ্গ মূর্ত্তিতে কাছেই দাঁড়াইয়া ছিল। চাহিয়া যেন লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

বিরক্তি গোপন থাকিল না, কহিলাম—তবে বামনী রাখো?

—হ্যাঁ বামনী রাখবো বই কি, নিজের তাহলে বড় সুবিধে--

—তবে গোল্লায় যাও—বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

মনে হইল, দূর ছাই মরুক আপনার দুর্ব্বুদ্ধি লইয়া, আমার গরজ কি?

কিন্তু গরজ আছেই।

'মোহ-মুদ্গর'টা ধাতস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত থাকিবেও।

এত কষ্ট চোখে দেখা যায় না। সেই পোড়া ফোস্কার ঘা, তাহার উপর আগুন তাত!

বামুন খুঁজিয়া আনা নিত্যকর্ম্মের মধ্যে দাঁড়াইল। আনি বটে, রাখিতে পারি না।

কাহারও চেহারা দেখিলে না কি হাতে খাইতে প্রবৃত্তি হয় না, কাহারও লম্বা টেমি দেখিলে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায়।

কাহাকেও দেখিলে ব্রাহ্মণত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। "এক পয়সায় যখন পৈতা মেলে, হাড়ী বাগ্‌দীর ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে কতক্ষণ?" এ কথার উত্তর আমাকেই যোগাইতে হয়।

বুড়া ধরিয়া আনিলে বলেন—ঘাটের মড়া, হাঁড়ি নামাতে গিয়ে মরে যাক আর কি! বালক দেখিলে বলেন—দুধখেগো ছেলের ভারী অভাব কি না, তাই ওর জন্যে এবার ঝিনুক বাটি ধুতে বসি।

মোট কথা তাঁহার শুদ্ধান্তঃপুরে প্রবেশলাভের অধিকার আজ পর্য্যন্ত কেহই পায় নাই।

বাহিরের রোয়াকে পা ঝুলাইয়া বসিয়া ভাবিতেছিলাম—কি ভাবিতেছিলাম কে জানে—

নবীন আসিয়া রোয়াকের একপাশে বসিল। নবীন বামুনের ছেলে, আমাদের পাড়ায়—"বিশুদ্ধ হিন্দু-চপ্" "পবিত্র পাঁটার ঘুগনি" "পটোল ভাজা" ও "পলতার বড়া" ফেরি করিয়া বেড়ায়।

ছেলে বুড়ো সকলেই তাহার খদ্দের।

কহিলাম—কি নবীন, ব্যবসা কেমন চলছে?

—আজ্ঞে আপনাদের দয়ায় ভালই। একটা ভারী মুস্কিলে পড়েছি বাবু! দেশ থেকে একটা মেয়েলোক এসে ধরে পড়েছে, চাকরী করে দিতে হবে। ভাল ব্রাহ্মণের মেয়ে, দুঃখী বিধবা কোথায় যে রাখি, কি যে করি। অথচ আমারও আবার দেশে না গেলেই নয়, ধান-পান সব যেতে বসেছে। আপনার শুনেছিলাম রাঁধবার লোকের প্রয়োজন, দয়া করে যদি রাখেন তাই বলছি।

'মেয়েলোকে'র প্রয়োজন নাই স্পষ্ট করিয়া বলিলাম না। কহিলাম—কাজ পারবে?

—আজ্ঞে তা আর পারবে না? বাঙ্গালীর মেয়ে—সত্যি কথা বলতে কি বাবু দেশে ঘরে ওর রান্নার তারিফ ছিল খুব। ভাই ভাজ ভাত দেয় না, তাই এসেছে সহর বাজারে দুটো অন্নের চেষ্টায়।

—বয়েস কত?

—আজ্ঞে তা' অনেক—বলিয়া নবীন জিনিসটাকে একটা অনির্দ্দিষ্ট অনুমানের উপর ছাড়িয়া দিল।

কহিলাম—বেশ, বাড়ীর ভেতর নিয়ে যেও। যদি পছন্দ হয়।—হইবে না-ই জানিতাম।

আধঘণ্টার মধ্যে নবীন রাঁধুনী লইয়া হাজির। দেখিয়া তো চক্ষু স্থির। গৃহিণী আপত্তি করিলে দোষ দেওয়াও যায় না।

গৃহিণী কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—এই বাম্‌নী? খুঁজে খুঁজে আর লোক পেলে না?

কথার উত্তর যোগাইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। উদ্ধার করিল নবীন, হাত জোড় করিয়া আগাইয়া আসিয়া কহিল—আশা করে এসেছে, নৈরাশ করবেন না মা, আপনিও ব্রাহ্মণ কন্সে, মাতৃতুল্য, মায়ের কাছে মেয়ে থাকবে তার আর ভাবনা চিন্তের কি আছে ?

গৃহিণী অবশ্য আড়ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আধুনিক মেয়েদের মত বেহায়া তিনি নন্, ধোপা নাপিত, মুদি গোয়ালা, সকলকেই পুরুষোচিত সম্মান দিয়া থাকেন। নবীন কিন্তু ঘোমটা অগ্রাহ্য করিয়া আরো কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল—মনে দ্বিধা করবেন না মা! রেখে বুঝবেন, মেয়ে আপনার কেমন। মা বাপ আপনারা, পেটের মেয়ে দু'দিন বাপের ঘরে এসে ঠাঁই পাবে না মা ?

মনে হইল পিতৃকন্যার সম্বন্ধ পাকা করিয়া লইতে নবীনের নিজের গরজও কম নয়।

উত্তরে গৃহিণী যাহা জনান্তিকে বলিলেন, আমাকে আর উচ্চারণ করিবার ক্লেশ স্বীকার করিতে হইল না। নবীন একতলায় থাকিলেও তাহার শুনিতে পাওয়ার বাধা ঘটিত না।

নবীন সে কথার উত্তরে সোৎসাহে কহিল—কেন মা, আপনার ঘরে কি খ্যাংরা নেই ? মুড়ো খ্যাংরা ? এতটুকু বেচাল দেখলে দেবেন ঠিক করে, হুঃ !

আফিসের বেলা হয় দেখিয়া চলিয়া গেলাম। একটা শক্ত-পোক্ত লোক পাইলে সংসারের সুবিধা যথেষ্ট, কিন্তু ওকালতী করিয়া বিপদ বাড়াইলাম না। থাকিবে না, বাড়ার ভাগ আমাকে ছেলেপুলের সামনে নাহ'ক কতকগুলা কটুকথা শুনিতে হইবে।

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী আসিয়া দেখি জগতে অঘটনও ঘটে। যাহা কোনদিন দেখিয়াছি কি না সন্দেহ—গৃহিণী কোলের মেয়েটাকে কোলে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। নিম্নতন কয়টি শান্তির অবতার হইয়া কাছে বসিয়া আছে। অদূরে সংসারতরণীর নূতন মাঝি বঁটি পাতিয়া কুটনা কুটিতেছে।

নবীন মিথ্যাই এতদিন ফেরিওয়ালাগিরি করে নাই, গছানো বিদ্যাটা শিখিয়াছে বেশ দেখিতেছি। একটা শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উঠিয়া গেলাম। দেখি গৃহিণী নবীনা প্রেয়সীর মত পিছনে পিছনে উঠিয়া আসিয়াছেন। একগাল হাসিয়া কহিলেন—খাসা মানুষটা, খাসা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক আমাদের মতন আচার-বিচার। কাজের ব্যবস্থাও দিব্যি, জান গা ?

মনে হইল, কোথা হইতে একটা মলয় বাতাস আসিয়া গায়ে লাগিল।

কিন্তু দাম্পত্য ধর্ম্মের সনাতন নীতি রক্ষার্থে মুখের উপর তাচ্ছিল্যের ভাব টানিয়া আনিয়া কহিলাম—হ্যাঁ, এখন রান্নাটা অখাদ্য না হ'লে তবে! গৃহিণী ভ্রূভঙ্গী করিয়া একটু হাসিলেন। বোধ হয় কিছু বলিতে উদ্যত ছিলেন, দ্বারের পাশে "শান্তির বাতাস" আসিয়া দাঁড়াইল। দুই হাতে ধূমায়মান দুই পেয়ালা চা। গৃহিণী হাত বাড়াইয়া পেয়ালা দুইটি লইয়া কহিলেন,—মরণ আর কি, আমার আবার বাবুর মতন ওপরে চা আনা কেন ? রান্নাঘরের কোণে

বসে কাঁসার ঘটি করে তো খেয়ে মরি। তা' এনেছো যত্ন করে, দাও।

রাঁধুনী রহিয়া গেল। বাড়ীতে আজকাল সর্ব্বদাই শান্তির বাতাস বহিতেছে। রাঁধুনীগিরী করিয়াই কর্ত্তব্য সারে না—মেয়েটা বাড়ীর লোকের মত সকল কাজ করিয়া বেড়ায়। কাজেই ঝামেলা কম বলিয়া গৃহিণীর চীৎকারও কতকটা সীমাবদ্ধ।

ছেলেগুলা ফর্সা জামা পরিতে পায়, দিবারাত্রি ক্ষুধার আবেদন জানায় না। মাঝে মাঝে তেল সাবানও জোটে দেখিতে পাই। আমাকেও—অফিসের বেলা হইলে করুণ মিনতিভরে ভাত চাহিয়া আধজলন্ত ভাতের সহিত জলন্ত মুখের মুখনাড়া খাইতে হয় না। পরিপাটি করিয়া প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন না চাহিতেই মেলে।

কাপড়খানা আলনায়ই পাওয়া যায়, ঘরের কোণে জড়ো করা কাপড়ের স্তূপ হইতে বহুকষ্টে সংগ্রহ করিতে হয় না।

যেখানেই চোখ পড়ে, লক্ষ্মীশ্রী ফিরিয়াছে মনে হয়। বেশী বলিয়া সন্দেহভাজন হইতে চাহি না। মোট কথা—মেয়েটার গুছাইয়া সংসার করিবার হাত আছে বোঝা যায়।

গৃহিণী আনন্দে গদগদ হইয়া বলেন—বামুন-মেয়ে কিরকম যে ছেলে ভালবাসে—ক'দিনে এমনি বশ করে নিয়েছে, মনে হবে যেন ওর হাতেই মানুষ। নাওয়া, খাওয়া, আঁচানো, জামা পরানো, সব—"বামুনদিদি"। রোজ গল্প শোনা চাই—পেয়ে বসেছে একেবারে। বামুন-মেয়েরও শরীরে আলিস্যি নেই বাবু, "খোকাখুকু" বলতে অজ্ঞান।...তাঁহার মুখে অপরের গুণকীর্ত্তন, অনভ্যস্ত কাণে মধুবর্ষণ করে। দুইবেলা ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কিন্তু 'ভগবান' নামক জীবটি কৃতজ্ঞতায় ভুলিবার মত কাঁচা ছেলে নয়।

সেই কথাই বলিতেছি—

অফিস হইতে ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে যথেষ্ট। শীতের রাত। বাড়ী গিয়া গরম চায়ের পেয়ালাটা কেমন মোলায়েম সম্বর্দ্ধনা করিবে, তাহাই চিন্তা করিতে করিতে দ্রুত আসিতেছি। বাড়ী ঢুকিয়াই কিন্তু কেমন একটা বিপরীত ভাব লক্ষ্য করিলাম।

কোলের মেয়েটা অতীত প্রথানুসারে দালানে পড়িয়া কাঁদিতেছে। নেলাখেপা ভাইটিকে কোলে লইয়া তাহার দিদি বিরস মুখে জানালা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঘরগুলা অন্ধকার, বোধ হয় সন্ধ্যা পড়ে নাই।

রান্নাঘরে উঁকি দিতেই ব্যাপার বুঝিলাম, গৃহিণী আজ অন্নপূর্ণা।

বামুনমেয়ের বোধ করি অসুখ, আহা মানুষের শরীর তো—রোগ হইবে না এমন কি লেখাপড়া আছে!

মৌখিক ভদ্রতা করিয়া বলিলাম—তুমি রাঁধছো যে? বামুনমেয়ে কোথায়?

গৃহিণী সংক্ষেপে কহিলেন—যমের বাড়ী।

স্থানটা বিশেষ সুবিধাজনক নয়, পথ জানা নাই যে ডাকিয়া আনিব—

অগত্যা কিছু বলা দরকার বোধে বলিলাম—তা' তুমি আর এই শরীরে—আজ না হয় থাকতো ?

'অন্নপূর্ণা' সবিনয়ে শুধাইলেন—শরীর খারাপ বলিয়া বসিয়া থাকিলে এই রাবণের গোষ্ঠীর পিণ্ড সিদ্ধ করিবে কে ?

তা' বটে। এত বড় সমস্যাটা ভাবিয়া দেখি নাই। কিন্তু যে করিত আসলে তাহার হইল কি ?

ছেলেমেয়েগুলার কাছে সদুত্তর পাইলাম না। শুধু জানিতে পারা গেল, বামুনদিদি কাঁদিতে কাঁদিতে কাপড চোপড় লইয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিতে গিয়া 'ফুটি'টা নিজেই কাঁদিয়া বাঁচে না।

বেশীক্ষণ অবশ্য অন্ধকারে থাকিতে হইল না।

গৃহিণী মুখ খুলিলেন—বামুনের মেয়ে হয়ে এমন দুষ্প্রবৃত্তি এঁ্যা ? আঁশ বঁটি দিয়ে কেটে দু'খানা করলে তবে উচিত শাস্তি হয়। নব্‌নে মুখ-পোড়াকেও বলি—'বিয়ে করবো, ঘর সংসার হবে' বলে লোভ দেখিয়ে—এখন যে সরে পড়লি, একি ধর্ম্মে সইবে ?

মনে মনে ভাবিলাম,—সহিবেনা আবার, খুব সহিবে। বৃথাই কি নবীন এই পুণ্যভূমিতে জন্মাইয়াছে ? ধর্ম্ম এখানে সর্ব্বংসহা। হতভাগী বামুন মেয়ে! দূর হউক তাহার কথা। গৃহিণীর গায়ের ঝাল মিটে নাই, তখনো বঁকিতেছিলেন --আচ্ছা দেখবো দেশের ভাত ক'দিন খাস্—এ পাড়ায় কি আসতে হবে না ? এত বড় জোচ্চুরী করে পার পাবি ?

তা' নূতনত্ব সে বিশেষ কিছু করে নাই। অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে ভাই-ভাজের দুর্ব্যবহারে কষ্ট পাইতেছিল, হয়তো মমতাবশতঃই আনিয়'ছিল চাকরী জুটাইয়া দিবে বলিয়া। তাহার পর সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিয়াছে এবং সেইটুকুই নবীন চাপিয়া গিয়াছে।

তা' নিতান্ত পাষণ্ডের মত ব্যবহারও সে করে নাই, অনাথা স্ত্রীলোককে দেখিয়া শুনিয়া একটা ভবাযুক্ত "বাপের বাড়ীতে" রাখিয়া গিয়াছে।

সে যাক—মেয়েটা কয়দিনের সেবা যত্নে এমন আপনার করিয়া লইয়াছিল যে, এতদূর অধঃপতনের সংবাদেও "বঁটিকাটা" করিবার প্রস্তাবটায় তেমন সায় দিতে পারিলাম না। বরং এই শীতের রাত্রে, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় কোথায় বসিয়া কাঁদিতেছে ভাবিয়া মমতা হইল। না বলিয়া পারিলাম না---এই পৌষমাসের রাত্রে না তাড়ালেই হ'ত। দিনের বেলা দেখে শুনে কোথাও চলে যেত—একটা রাতে কি আর ক্ষতি হ'ত তোমার ?

গৃহিণী খুন্তি ফেলিয়া সদর্পে কহিলেন—কেন ? কিসের জন্যে ? একটা রাতই বা রাখবো কেন ? আমার পুণ্যের সংসারে ও সব পাপ একদণ্ডও রাখবো না, পৌষমাস তো বয়ে গেল, ও জঞ্জাল ঝেঁটিয়ে বিদেয় করলেও পাপ নেই।

সত্য বটে, বলিবার কিছু নাই।

ভাঙ্গন

বাজারের থলেটা রান্নাঘরের রোয়াকে নামাইয়া রাখিয়া প্রফুল্ল মানসীকে উদ্দেশ করিয়া সহাস্যে কহিল—সামনের বাড়ীতে যে লোক এসে গেল—

মানসী স্বামীর সাড়া পাইয়াই বাহিরে আসিয়াছিল। হাতে খুন্তি, আঁচলখানা কোমরে জড়ানো, কপালের উপর ঘামে-ভেজা দুই চারিগাছি চুল, রাঙামুখ, আগুনতাতে আরও রাঙিয়াছে।

দরিদ্রের সংসার—নিজের উপর অযত্নের অন্ত নাই, অবহেলায় হয়তো অনেক ম্লান হইয়া গিয়াছে, তবু দেখিয়া অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে সুন্দরী বলিয়া দাবী করিবার অধিকার তাহার আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

প্রফুল্লর বিমুগ্ধ দৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া মানসী মৃদু স্মিতহাস্যে কহিল—হ্যাঁ গো, আমি তো তাই বলছিলাম, অতবড় বাড়ী শুধু শুধু পয়সা খরচ করে রং করছে না—নিশ্চয় ভাড়া হয়েছে। আচ্ছা কত ভাড়া হবে বাড়ীটার?

—কম পক্ষে শ' আড়াই তো বটেই—প্রফুল্ল ভুরু কুঁচকাইয়া অনুমানের ভঙ্গি করে।

—বাব্বাঃ, এত ভাড়াও দিতে পারে লোকে, শুনলে গা কর্‌কর্ করে। তা পরের কথাই বা বলবো কি! তোমরাও তো এককালে—যাক্‌গে, কে এলো কে জানে, খুব বড়লোক নিশ্চয়ই।

—বড়লোক তো বটেই। 'ভুবনগড়ের মুখুয্যে' ওরা—মস্তবড় জমিদার। বয়স বেশী নয়, ছোকরা, আমাদের থেকে ছোটই হবে—ফাইন চেহারাখানা কিন্তু, গাড়ী থেকে নামলো দেখলাম।

মানসী কৌতুক ও কৌতূহল মিশ্রিত স্বরে কহিল—'ভুবনগড়ের মুখুয্যে' বললে? তোমাদের বয়সী! কি নাম শুনেছ কিছু?

—নাম, অবনী বলছিল 'নীরেন মুখুয্যে' না কি—কেন বলতো, চেনা-শোনা আছে না কি?

মানসী দুষ্টামীর হাসি হাসে—চেনা নেই, তবে হ'লে হ'তে পারতো চেনা—সাংঘাতিক চেনা একেবারে! সমস্ত ঠিক, নেমন্তন্নর চিঠি ছাপতে যাচ্ছে, পত্তর আশীর্বাদ—হঠাৎ সম্বন্ধ গেল ভেঙে।

—তাই নাকি! ভাঙলো যে হঠাৎ? প্রফুল্লর স্বরে আগ্রহ লক্ষিত হইল না। বাজারের থলি হাতে, পথে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সে নবাগতের ঐশ্বর্য্যের বিপুলতা অনুমান করিতেছিল।

মানসী স্বামীর অনাগ্রহ লক্ষ্য করিল না। হাসিয়া কহিল—কানাঘুসো শোনা গেল, ছেলের না কি সেই বয়সেই পাখা উঠেছে। কে বললে জানো? আমাদের ওই নীলা

পিসীমা—দেখেছ তো তাঁকে? তিনি। ওঁদের কার কে হয় যেন ওরা। সত্যি মিথ্যে ভগবান জানেন, মার তো ধারণা, মিথ্যে ভাঙ্‌চি দিয়েছেন গায়ের জ্বালায়, কিন্তু বাবাকে জানো তো—এ সব বিষয়ে কি রকম কড়া!

প্রফুল্ল কপালটা কুঁচকাইয়া কহিল—কেন গায়ের জ্বালাটা কিসের?

—আহা এ আর বুঝছো না—মানসী ছেলেমানুষের মত মাথা দুলাইয়া বলে—তোমার যদি কোনো বুদ্ধি থাকে! উনি অত অত টাকা খরচ করে একটা মেয়েরও তেমন বিয়ে দিতে পারলেন না, আর বাবা গরীব গেরস্থ মানুষ, মেয়ের একটু কটা চামড়ার জোরে খামোকা জমিদারের বেহাই হয়ে বসবেন—এতে গায়ের জ্বালা না হ'য়ে পারে?

লীলা পিসী নামধারিনী ভদ্রমহিলার ঠিক কি হইয়াছিল বলা যায় না—অনেক দিনের ব্যাপার, বর্ত্তমানে নিরীহ প্রফুল্লর হঠাৎ কোথায় যেন একটু জ্বালা ধরিয়া যায়। এবং তাহারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ঈষৎ ব্যঙ্গ হাস্যে মুখ বাঁকাইয়া বলে—অদৃষ্ট তোমার! কোথায় 'বুইক কারে' চড়ে দু'বেলা হাওয়া খাবে—তা নয়, হাঁড়ি ঠেলতে ঠেলতে হাড় কালি! তোমার বাবার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না।

মানসীও সম্পূর্ণ সায় দিয়া স্বচ্ছন্দ গলায় উত্তর দেয়—যা বলেছ, এতটা রূপ আমার, আগুন-তাতে ঝল্‌সে ঝল্‌সে বাজে খরচ হয়ে গেল। কি বলো, হ'ল না?

ইতিমধ্যে উনানে-চাপানো কড়াখানা তারস্বরে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছিল। এক ঝলক হাসির সহিত কথাটা শেষ করিয়া মানসী ত্বরিত পদে রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িল, কথাটা স্বামীর মুখে কিরূপ ছায়াপাত করিল জানিয়া গেল না। করিতে পারে, এ সন্দেহ অবশ্য তাহার মনের কোণেও উদয় হয় নাই।

পরিহাসকে নিছক পরিহাস বলিয়া বুঝিবার মত বুদ্ধির অভাব প্রফুল্লর নাই, তবু কাঁচের বাসনে 'চিড়' খাওয়ার মত কোথায় যেন খচ্‌ খচ্‌ করিতে থাকে।

জমিদারের ঘরে না হউক মানসীর বাবা কন্যার বিবাহ ভালই দিয়াছিলেন। অবশ্য কন্যার 'কটা চামড়াই' মুখ্যতঃ দায়ী।

প্রফুল্লর বাপ তখন বাঁচিয়া। সরকারি চাকুরে, মাসে পাঁচ ছয় শত টাকা উপায় করেন। বড় ছেলে অমূল্যও মোটা-মাহিনায় কোন এক মার্চ্চেণ্ট অফিসে ঢুকিয়াছে। আর ছোট প্রফুল্ল টাটকা এম, এস, সি, পাশ করিয়া বিশ্বসংসারের উপর অবজ্ঞা দৃষ্টি হানিয়া প্রতিভাদীপ্ত নয়নে উজ্জল ভবিষ্যতের পানে তাকাইয়া আছে। সে রাজ্যে দাদার মার্চ্চেণ্ট অফিসের দেড়শত টাকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।

তবে অদৃষ্ট বলিয়া কথা—হয়ত মানসীরই ভাগ্যদোষ। বিবাহ হইল, স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দুইটি পুত্র জন্মাইতেও বিলম্ব হইল না, কিন্তু প্রফুল্লর উজ্জল ভবিষ্যৎ ঔজ্জল্য হারাইতে হারাইতে ক্রমশঃ মসীলিপ্ত হইয়া আসিল এবং এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় প্রফুল্লর

অবিবেচক পিতা একদা বিনা নোটীশে হার্টফেল করিলেন।

ছেলেরা, যে-বিষয়ে কখনো মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন অনুভব করে নাই, তাহাই সহসা মাথায় চাপিয়া বসায়, অন্ধকার চক্ষে দেখিল—পিতা জমার ঘরে প্রকাণ্ড একটা শূন্য ছাড়া কিছুই বসাইয়া যাইতে পারেন নাই—এমন কি বাড়ীখানি পর্য্যন্ত নিজের নহে।

তবে ভদ্রলোক একেবারে বেপরোয়াও ছিলেন না। বরাবর ব্যয়ের মাত্রাটা আয়ের ইঞ্চিখানেক উপর দিয়া চালাইয়া আসিয়াছেন। সেইটুকু সমান করিয়া লইতেই গাড়ীখানি গেল। অতঃপর চলিল টানা কষার ধূম।

কিন্তু কেবলমাত্র ব্যয় সংক্ষেপের জোরে পাঁচ ছয় শত টাকার ফাঁক পূরণ সহজ নহে। দেড় টাকা বাক্সের সাবানের পরিবর্ত্তে টার্কিস বাথ ব্যবহার করিয়া এবং জবাকুসুমের পরিবর্ত্তে নারিকেল তৈল মাখিয়াও অনেক বাকি থাকিয়া যায়।

অথচ, ছেলেরা তিন টাকা পাউণ্ডের জায়গায় আঠারো আনা পাউণ্ডের চা খাইতে খাইতে সনিঃশ্বাসে ভাবে, 'অনেক কৃচ্ছ্র সাধন করিলাম'। বধূরা তিনটা চাকরের একটা ছাড়াইয়া দিয়া ছেলেদের দুধের বোতল ধুইয়া লইতে লইতে সরোদনে বলে, 'বাবা কী কষ্টেই পড়িয়াছি'।

সমস্যা সমস্যাই থাকিয়া যায়, সমাধান বিশেষ হয় না।

কিন্তু ঈশ্বর নাকি অমর! তাই এই ভরা কলিকালেও মাঝে মাঝে তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

সংসারের এই ঘোরতর দুর্দ্দিনে মূর্ত্তিমতী সমাধান আসিলেন অমূল্যর বিধবা শাশুড়ীর মূর্ত্তি ধরিয়া। তিনি আসিয়াই কন্যার পরলোকগত "শ্বশুর মিন্‌সের" অবিমৃষ্যকারিতার উল্লেখ করিয়া এমনি কটুকাটব্য সুরু করিলেন যে, ছেলেদের নিঃসন্দেহ হইতে বিলম্ব হইল না, পিতা তাহাদের রাজার হালে মানুষ করিয়া শত্রুতা সাধিয়াই গিয়াছেন। তাহার পরই ভদ্রমহিলা কিছুমাত্র অর্থ সাহায্য না করিয়া কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে এমন সুচারু বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন, যাহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার রহিল না।

পরের অঙ্কে দেখা যায়, অমূল্য মার্চ্চেণ্ট অফিসের দুইশত টাকার কল্যাণে খাইয়া পরিয়া আছে মন্দ নয়! চল্লিশ টাকা বাড়ী ভাড়া দেয়, ঝি রাখিয়াছে, ছেলের বাহন স্বরূপ বাঁটুল একটি চাকরও রাখিয়াছে। বামুন রাখে নাই, রাখিবার প্রয়োজনও হয় নাই। স্নেহময়ী শাশুড়ী ঠাকুরাণী স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই গুরুদায়িত্ব ভার মাথায় বহিয়া কন্যার গৃহেই রহিয়া গিয়াছেন।

অমূল্য রান্নাঘরের কোণে পূর্ব্বকালের কার্পেটের আসন পাতিয়া শাশুড়ীর হাতের উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া-ভাজা আটার পরোটা খাইতে খাইতে বিগলিত চিত্তে রন্ধনকারিনীর অপূর্ব্ব গুণবত্তার তারিফ করে, এবং ইতিপূর্ব্বে যে এরূপ উপাদেয় বস্তু আস্বাদ করিবার সৌভাগ্য ঘটে নাই সেকথা অকপটে স্বীকার করিতে দ্বিধা করে না।

অমূল্যর স্ত্রীও মাতৃদেবীর নিপুণ কর্ণধারিত্বে কিরূপ ভরাডুবি হইতে উদ্ধার হওয়া গিয়াছে, তাহাই বিশদভাবে বুঝাইয়া বুঝাইয়া মহিমামুগ্ধ স্বামীকে স্তব্ধ বাক্যহারা করিয়া রাখে।

মোটের উপর তাহারা ভালই আছে।

এদিকে প্রফুল্ল দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া টাকা পঞ্চান্নর একটা কেরাণীগিরি সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। কপালজোরেই বলিতে হয় বৈ কি। বাইশটী টাকার বিনিময়ে আলাদা একখানি বাড়ী জুটিয়া যাওয়াও কম ভাগ্যের কথা নয়।

বাড়ী বলিতে অবশ্য একখানি ঘর, পাশে সরু এক ফালি ঘরের মত, দুই হাত লম্বা-চওড়া একটু রান্নাঘর এবং তদনুপাতে কিঞ্চিৎ রোয়াক।

তবু কলের জল লইয়া কাহারো সহিত কলহ করিতে হয় না, শ্যাওলাধরা ছাদের টুকরা টুকুতে উঠিতে ভাঙা নড়বড়ে কাঠের সিঁড়িও একটা আছে।

মানসীর দুর্দ্দশা দেখিয়া প্রফুল্ল নিজের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে কষ্ট অনুভব করিতেও ঘৃণা বোধ করে, এবং বাজারের থলি হাতে পথে বাহির হইবার সময় ময়লা মোটা শাড়ী-পরা কর্ম্মক্লান্ত মানসীকে দেখিয়া মনে বল সঞ্চয় করিয়া লয়।

আবার মানসীও চিরদিন সুখের ক্রোড়ে লালিত স্বামী বেচারার দুরবস্থার জন্য নিজেকেই অনেকাংশে দায়ী মনে করিয়া আপনার চেষ্টায় যথাসম্ভব স্বাচ্ছন্দ্য দিতে ক্রটি করে না। অহরহ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেওয়ার পরিবর্ত্তে অদৃষ্টকে মানিয়া ও মানাইয়া লইয়া তাহারাও মোটের ওপর ভালই আছে বলা যায়।

তবে এসব অনেক দিনের ঘটনা। এখন তাহাদের দুইটি ছেলেই স্কুলে পড়ে। প্রফুল্লর পঁচিশ টাকা মাহিনা বাড়িয়াছে। সন্ধ্যায় একটা টিউশানি করিয়াও কিছু হয়।

যে-স্মৃতি সদ্যক্ষতের মত গভীর বেদনাময় ছিল, এখন আর তাহাতে জ্বালা নাই। মনে মনে অতীত সৌভাগ্যের রোমন্থন করিতেও মন্দ লাগে না। এমন কি, কোন এক দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে বন্ধুমহলে গল্পচ্ছলে 'রাজার হালে' কাটানোর ইতিবৃত্ত শুনাইয়া দিবার লোভ দুর্ব্বার হইয়া উঠে প্রফুল্ল।

এই একটানা জীবন-ছন্দের মাঝে একটা বেসুরা আওয়াজ করিল সামনের বাড়ীর নূতন ভাড়াটিয়া। কেন বলা যায় না, একটা অকারণ তিক্ততায় মনটা প্রফুল্লর সকাল হইতেই বিরস হইয়া রহিল। অফিস যাইবার মুখে, ইহাদের ইতিমধ্যেই সাজাইয়া-ফেলা ড্রইংরুমের পানে তীব্র ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে গেল—মিথ্যা নিন্দা রটাইয়া অথবা অযথা জ্বালাতন করিয়া ইহাদের পাড়া হইতে দূর করিয়া দেওয়া একেবারে অসম্ভব কি না।

বাড়ীওয়ালার ভাগ্নে অবনীর সহিত তাহার হৃদ্যতা আছে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মানসী আজ অনেক দিনের পর ছাদে উঠিল। কাঠের সিঁড়িটা গত কয় দিনের ঝড় জলে আরো অমজবুত হইয়া গিয়াছে—সাবধানে ধরিয়া ধরিয়া ওঠে। ইচ্ছাটা অবশ্য নূতন প্রতিবেশী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা—স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক কৌতুহল। তা' ছাড়াও আর কিছু কারণ ছিল কি না কে বলিবে! মানসী নিজেই কি জানে?

বর্ষাকালের মেঘভাঙা রৌদ্রে মাথা পুড়াইয়া সারাদিনে অনেক কিছু তথ্যই সংগ্রহ হয়। ঠিক সামনের বড় বড় দক্ষিণ খোলা ঘর দুইখানা যে স্বয়ং গৃহস্বামীর ব্যবহারের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছে, সে-কথা মানসীকে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। সাজসজ্জা দেখিয়া বুঝিবার বুদ্ধি তাহার আছে। ভিতর দিকে আরো অনেক ঘর, ভাল দেখা যায় না। তিনতলার বড় ঘর দুইটি অধিকার করিয়াছেন একটি বর্ষীয়সী বিধবা। কর্ত্তার মা হওয়াই সম্ভব। ফরসা রং, চারহারা গড়ন। আধুনিক প্রথায় 'বব' ফ্যাসানে চুল ছাঁটা, চিকণের সেমিজ গায়ে, মিহি আদ্দির থান পরা। দ্বারে দারোয়ান। বিস্তর দাস দাসী।

এই কয় ঘণ্টার মধ্যেই রেডিওর সুব্যবস্থা হইয়াছে, এবং কাটফাটা দুপুর রৌদ্রে—"কুমারী অমুক দেবীর" একখানি কীর্ত্তন ভাঁজা সুরু হইয়াছে।

মানসী বিস্মিত হইয়া দেখে কোনোখানেই যেন নূতন উঠিয়া আসার চিহ্নমাত্র নাই। আসবাবপত্র এমনি সুবিন্যস্ত যে দেখিলে মনে হয় ইহারা বুঝি বহুদিনের বাসিন্দা। নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভাবে, বড় লোকের সবই ভাল।

ফ্যাকাসে ফরসা রোগা টিনটিনে একটা বছর সাতেকের মেয়ে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসিয়া পশম ও বোনার কাঁটা হাতে হতাশ নয়নে আকাশ পানে চাহিয়া বোধ করি দার্শনিক গবেষণাই করিতেছে। মানসীর ইচ্ছা হয়, ডাকিয়া দু'কথা শুধায়, কিন্তু রাস্তার এপার হইতে ডাকিয়া ওপারের প্রতিবেশিনীর সহিত আলাপ করা রুচিতে বাধে। তা' ছাড়া নিজের দৈন্যদশাগ্রস্ত বাড়ীখানাও কম বাধা নয়।

নীচে বিস্তর কাজ অপেক্ষা করিতেছে। সময় নষ্ট করিলে অসুবিধার অন্ত থাকিবে না—তবু কে যেন মানসীকে এই শ্যাওলা-পড়া ছাদের কোণটুকুতে আটকাইয়া রাখে। কী দেখিবার আশায় সে এমন উদ্‌গ্রীব হইয়া ঠায় রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকে, অনুমান করা কঠিন।

নামিয়া যখন আসে, হঠাৎ মনটা তাহার ভারী হাল্‌কা ঠেকে। হাতের কাজ হাওয়ার মত সারা হইয়া যায়। অনেক দিনের পর একটু বিশেষ করিয়া প্রসাধন করিতে সাধ যায়। ইচ্ছা হয়, প্রফুল্ল যদি সন্ধ্যা হইতেই বাড়ী আসিত! ইচ্ছা হয় · কিন্তু থাক্, সকল ইচ্ছা প্রকাশ করিতে নাই।

টিউশানি সারিয়া প্রফুল্ল যখন অনেক রাতে বাড়ী আসে, তখন অবশ্য এ চাঞ্চল্যের

কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। রাত্রে পরিবে বলিয়া যে ফিকা নীল রঙের শাড়ীখানি বাহির করিয়া রাখিয়াছিল, লুকাইয়া এক সময় বাক্সে তুলিয়া ফেলে। আহারে বসিয়া নানাকথার মধ্যে পাড়ার গল্পও হয়।

ঘর দুয়ারের বিবরণ দিতে দিতে মানসী নাক সিঁটকাইয়া বলে—মাগো, গিন্নিটা কী পাহাড়ে মোটা, তোমায় কী বলবো! একটি শ্বেত হস্তী বিশেষ। আবার চুলছাঁটার কায়দা কত, সাজের বাহারই বা কম কি! বড়মানুষের যেন সবই বিটকেল্। কিন্তু মজা দেখ, বৌটা আবার তেমনি রোগা—ঠিক একটি কাঠের পুতুল। ফরসা বটে, হ'লে হবে কি, কোনো যদি জৌলুস আছে! কাগজের মতন সাদা নীরক্তে রং, চুল তো নেই বললেই হয়, মাঠ-বেরোনা কপাল! সেই তিন গাছি চুল নিয়ে প্রকাণ্ড ড্রেসিং টেবিলের সামনে আঁচড়াতে বসা দেখে এমন হাসি পাচ্ছিল! অসুখ বিসুখ আছে নাকি কে জানে—নড়ছে, হাঁটছে, যেন শরীরে প্রাণ নেই এমনি নির্জীব ভাব। যাই বলো বাপু, অমন ঘর-সংসারে ওরকম বৌ মোটে মানায় না।

প্রফুল্ল এতক্ষণ নিঃশব্দে আহার করিতেছিল। এইবার মুখ তুলিয়া বলে,—ঠিক যেমন তোমায় মানায় না এই সংসারে।

মানসী নিজের ঝোঁকে বকিয়া যাইতেছিল, স্বামীর কথায় থতমত খাইয়া বলে—ও আবার কি কথার শ্রী!

—'শ্রী' না থাক সত্যি,—প্রফুল্ল বলে—সত্যিই মানসী, তোমায় দেখলেই মনে হয় যেন রাজার রাণী হবার জন্যে জন্মেছিলে কিন্তু একটা লক্ষীছাড়া হতভাগার হাতে পড়ে কেবল কষ্ট পেলে।

—হয়েছে, আর কবিত্বয় কাজ নেই। কী সব বড় বড় কথা, উঃ! মানসী লঘু পরিহাসের হাওয়ায় স্বামীর মনের মেঘখানা দূর করিয়া ফেলিতে চেষ্টা করে। কৃতকার্য্য হয় না।

প্রফুল্ল হাসে না—ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসির আভাস টানিয়া আনিয়া উত্তর দেয়—বড় কিছু করবার ক্ষমতা তো নেই, বড় বড় কথা কওয়া ছাড়া!

মানসী গভীর দৃষ্টিতে স্বামীর প্রতি চাহিয়া বলে—খুব পয়সা থাকলেই খুব সুখ হয়, না?

প্রফুল্ল এইবার মৃদু হাসে, বলে—'খুব' থাকলে 'খুব' হয় কিনা গ্যারান্টি দেওয়া শক্ত; তবে না থাকলে যে কিছু হয় না তা'তে আর সন্দেহ করবার নেই।

—তোমার মতন নিঃসন্দেহ হ'তে পারছি না—মানসী বলে, কেন আমরা কি সত্যিই খুব দুঃখে প'ড়ে আছি? তাতো কই মনে হয় না। একটা পয়সাওলা মাতাল গোঁয়ারের হাতে পড়লেই বুঝি—

—মনে হয় না সেটা তোমার মহত্ব—প্রফুল্ল মানসীর কথার মাঝখানেই বলিয়া ওঠে—

তবে এও সত্যি, সচ্চরিত্রতাই পুরুষের একমাত্র সার্টিফিকেট নয় মানসী, অক্ষমতাই কি কম অপরাধ ?

মানসী যথার্থই ক্ষুব্ধ হয়। ম্লান হইয়া বলে—তোমার আজ হ'ল কি বল তো? যত সব ছাইপাঁশ কথা মাথায় খেলাচ্ছো কেন ? এ সব অনাসৃষ্টি কথা পাচ্ছ কোথায়? একে তো দিনরাত খাটুনী, তা'র ওপর মন খারাপ করে শরীর মাটি করতে হবে না। চলো, শোবে চলো।

স্বল্প পরিসর ঘরখানি জুড়িয়া মেহগিনি কাঠের জোড়া-পালঙ্ক পাতা। সযত্নে পরিপাটি করিয়া পাতা ফরসা বিছানাটি যেন সাদর আমন্ত্রণ জানাইতেছে!

বিগত দিনের গৃহসজ্জার অনেক বস্তুই বিক্রয় হইয়া গিয়াছিল, বাকী যাহা—অমূল্যর কাছেই রহিয়া গিয়াছে। ছোট বাড়ী, নিতান্তই ছোট বলিয়া প্রফুল্ল কিছুই প্রায় আনে নাই।

শুধু মায়া কাটাইতে পারে নাই এই খাটখানির। এই খাটে তাহাদের ফুলশয্যা হইয়াছে। ইহারই কোলে শুইয়া তাহারা পরস্পরকে চিনিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, বিশ্বসংসার ভুলিয়াছে। তাহাদের নিবিড় প্রেমের মধ্যে ইহারও যেন কিছু অংশ আছে।··

আজও যখন অর্দ্ধেক রাতে চাঁদ ওঠে, গলির জানলার ভিতর দিয়া এক ফালি আকাশ উঁকি মারে, সরু একটু জ্যোৎস্নার রেখা বিছানায় আসিয়া পড়ে, বর্ত্তমানকে তাহারা হারাইয়া ফেলে—ফিরাইয়া পায় অতীতকে। আনন্দময়ী মানসী রহস্যময়ী হইয়া ওঠে। প্রফুল্লও আর জীবন-যুদ্ধে পরাজিত লাঞ্ছিত প্রফুল্ল নয়। মর্ত্ত্যের মানুষ দুইটি ইহারই কোলে শুইয়া স্বর্গের স্বপন দেখে।

*　　*　　*　　*

কিন্তু আজ বোধ করি প্রফুল্লকে ভূতে পাইয়াছে। তাহার স্বাভাবিক প্রফুল্লতা ফিরাইয়া আনিতে মানসীর সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। অবশেষে শেষ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপের মত অভিমান করিয়া মাটিতে নামিয়া শোয়।

চিরপ্রথা মত—অভিমানিনীকে ভূমিশয্যা হইতে তুলিয়া আনার কোন লক্ষণ না দেখাইয়া শুধু ঠাণ্ডা লাগার অজুহাতে উঠিয়া শুইবার অনুরোধ জানাইয়া প্রফুল্ল পাশ ফিরিয়া শোয় এবং এক সময় বোধ করি ঘুমাইয়া পড়ে।

অনেক রাতে মানসীর ঘুম ভাঙিয়া যায় শীতল মাটীর স্পর্শে। স্বামীর সস্নেহ আহ্বানের প্রতীক্ষায় জাগিয়া থাকিতে থাকিতে বেচারা কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। বর্ষার জোলো হাওয়ায় অল্প শীত করিতেছিল। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসিয়া থাকিয়া জানলার ধারে উঠিয়া আসে, হয়তো জানলাটা বন্ধ করিতেই আসে—কিন্তু করে না। আপনার অজ্ঞাতসারে সামনের বড় বাড়ীখানার পানে চোখ তুলিয়া চায়।

স্তব্ধ অন্ধকার বাড়ীখানার একটি মাত্র ঘর যেন জাগিয়া বসিয়া আছে।···নীলাভ

মৃদু আলো জ্বালা, যেন রূপকথায়-পড়া স্বপনপুরীর মত। দোদুল্যমান মশারীর ঝালরগুলি বৈদ্যুতিক পাখার পূর্ণবেগের পরিচয় দিতেছে।

হয়ত গৃহস্বামী অনুপস্থিত, হতভাগিনী বধূ নেটের মশারীর ভিতর পালঙ্কের গদীতে শুইয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া রাত্রি ভোর করে।...

উহার অসহায় অবস্থা কল্পনায় আনিয়া 'আহা' করিতে গিয়া অকস্মাৎ নিজেকে মানসীর আরও অসহায়, আরও দুর্ব্বল মনে হয়। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে মনের যে জোর লইয়া প্রফুল্লর কথা হাসিয়া উড়াইয়াছে, রাত্রির অন্ধকারে তাহাকে আর কোনোখানে খুঁজিয়া পায় না। মনে হয়, দীর্ঘদিন ধরিয়া কে যেন তাহাকে ঠকাইয়া আসিয়াছে।

জীবনের কি সত্যই কোনো অর্থ আছে? কোন অর্থ, কোন সার্থকতা? না শুধু অসহায় মানুষকে লইয়া বিধাতার একটা অর্থহীন রূঢ় পরিহাস? তাই লাঞ্ছিত মানুষ আত্মবঞ্চনায় বিধাতাকেও ঠকাইতে চায়?

কিন্তু ভিতরে ভিতরে অহোরাত্র যে ক্ষয় চলিতেছে তাহার পূরণ করিবে কে?

উত্তর দিবার কেহ নাই।

শুধু স্বল্প পরিসর সঙ্কীর্ণ ঘরখানা লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকের আধোছায়ায় আপনার কুশ্রী দৈন্য লইয়া তীব্র ব্যঙ্গে হাসিয়া ওঠে। চুন-বালি-খসা-ইঁট-বাহির-করা দেওয়াল চারিখানা নিঃশব্দে দাঁত মেলিয়া তাহাতে যোগ দেয়।

জানলাটা বন্ধ করিয়া দিয়া মানসী ক্ষণকাল কি ভাবে, তাহার পর পাশের ঘরে ছেলেদের বিছানার একপ্রান্তে জড়সড় হইয়া শুইয়া পড়ে। হঠাৎ এক সময় মনে হয় প্রফুল্ল মিথ্যা বলে নাই—অসচ্চরিত্রতা যদি অপরাধ হয়, অক্ষমতাও কম অপরাধ নয়।

* * * *

সেই রাত্রির পর অনেক রাত্রি কাটিয়াছে—অনেক রাত্রি, অনেক দিন। বহুদিন তাহাদের খবর রাখি নাই। খবর একদিন লইয়া আসিব আসিব করি, হইয়া উঠে না। মাঝে একদিন অবনীর মুখে শুনিলাম, তাহারা নাকি বাসা বদলাইয়াছে—উঠিয়া গেছে বালিগঞ্জে। অবস্থা ফিরিয়া গেল নাকি!

আজ সকালে খবরের কাগজের ভাঁজ খুলিয়া দেখি, প্রফুল্লর ফটো ছাপিয়াছে। প্রফুল্ল চট্টোপাধ্যায় অফিসের ক্যাস্ ভাঙিয়া উধাও হইয়াছে—তাহারই বিবৃতি সমেত ফটো।

বেশ ছিলাম

বেশ ছিলাম ; কপালে সইল না।

ফ্ল্যাট্ সিষ্টেমের কল্যাণে গৃহস্থ ভদ্রলোকে বাঁচিয়াছে। পরিবার লইয়া কলিকাতায় বাস করা এখন আর তেমন ব্যয়সাধ্য ব্যাপার নহে। দশ টাকা বারো টাকা মাসিক ভাড়া দিতে পারিলেই মাথা গুঁজিবার আশ্রয় মিলে। মেসের ভাত খাইয়া শরীরপাত করিতে হয় না, স্ত্রী-পুত্র দেশে পড়িয়া বারমাস ম্যালেরিয়ায় ভোগে না। আর কথার মধ্যে প্রধান কথা, দিনের পর দিন বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এগার টাকা আট আনায়--(দেড় টাকা লাইটের জন্য বেশী দিতে হয়)"—"লেনের এই বাসায় উঠিয়া আসিয়াছি দেশের বাড়ীতে চাবি দিয়া। "খোলার ঘর" নয় যে মর্য্যাদার হানি হইবে। কলি-ফিরান দেওয়াল, রঙ্ লাগান জানালা, খাসা সিমেণ্ট করা মেজে ; ছাদ করগেটের বটে, কিন্তু এমন কৌশল করিয়া সামনের আলশে গাঁথা যে বাহিরে হইতে বুঝিবার উপায় নাই।

ইলেকট্রিক লাইট পর্য্যন্ত রহিয়াছে, আর চাই কি ? গৃহিণী বলেন—লণ্ঠন মোছার কাজ গিয়েছে না বেঁচেছি, হাড় জুড়িয়েছে, দেওয়ালে হাত দিলেই আলো, সোনার দেশ!

খোলা উঠানে দাঁড়াইয়া স্নান করিতে হয়—কল-পায়খানা এক। তা হউক, সে তো ভিতরের কথা।

এই যে আমার পাশের ঘরের গোবর্দ্ধনের স্ত্রী, সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনী খাটে, জুতা সেলাই চণ্ডীপাঠ কিছুই বাদ যায় না। কিন্তু সন্ধ্যাবেলা স্বামী বাড়ী আসিলে যখন চওড়া পাড় স্কার্ট শাড়ী পরিয়া ভেলভেটের স্যাণ্ডেল পায়ে দিয়া বেড়াইতে বাহির হয়, তখন কে বলিবে সে জজবাবুর পুত্রবধুর চাইতে কিছু খাটো ?

গোবর্দ্ধনের চাকরী নাই, সে না কি চার-পাঁচটা টিউশানি করিয়া খায়। কিন্তু এ বিলাসটুকু তাহার না করিলেই নয়। হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া এক পেয়ালা চা ও দুই-খানা রুটি খাইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, আবার ফিরিয়াই ছোটে আপন ধান্ধায়। তাহোক তবু তো আছে ভাল! বৌ লইয়া বেড়াইবার বয়স আর নাই, তাকাইয়া তাকাইয়া ভাবি—আহা সোনার কাল হেলায় হারাইয়াছি।

আজও গোবর্দ্ধন নিত্যকার মত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। তাহার শিশুপুত্র গোবিন্দ চীৎকার করিয়া কান্না সুরু করিয়াছে, সে আর থামে না। বিরক্ত হইয়া বলিলাম, দেখ ত গা ব্যাপারটা কি ? ওরা ছেলেটাকে নিয়ে যায় নি কেন ?

গৃহিণী মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন, নিয়ে আবার কবে যায় ? রোজই তো পড়ে থাকে।

—কই, কাঁদে না তো কোন দিন ?

—ওই যে ও ঘরের তারিণীবাবুর মেয়ে বিমলা রাখে—

—তাহলে আজ ?

—কি জানি বাবু দেখি! জ্বালালে বাবা, গলা তো নয় ছেলের, যেন ঢাকের বাজনা।

বোধ হয় বাহিরে গিয়া গৃহিণী কিছু প্রশ্ন করিয়া থাকিবেন, তারিণীবাবুর স্ত্রীর কণ্ঠস্বর ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল—কেন গা, আমার মেয়ে তো কারুর ছেলে নেওয়া চাকরাণী নয় যে উনি বরের হাত ধরে হাওয়া খেতে বেরুবেন, আর ও 'নিত্য' ছেলে আগলাবে।···খবরদার বলছি বিম্‌লি, ছেলে যদি ছুঁবি তোরই একদিন কি আমারই একদিন। বুড়ো হাতী-মাগী যত ধিঙ্গি হচ্ছেন, আদিখ্যেতায় যেন গলে পড়ছেন। দিনরাত্তির 'বৌদি' 'বৌদি', ভারী আমার সাতকালের বৌদি রে—বলি অত কিসের? ফের যদি—কথায় ছেদ পড়িল ছেলেটার তীব্রস্বর সপ্তগ্রাম ভেদ করিয়া সহসা এমন উদ্দণ্ড হইয়া উঠিল, আশঙ্কা হইল গড়াইয়া উঠানে পড়িয়াছে। উঠিতেই হইল, উঁকি মারিয়া দেখি সন্দেহ অমূলক নয়, রাগ করিয়া গড়াইতে গড়াইতে ছেলেটা বোধ করি ইচ্ছা করিয়াই উঠানে পড়িয়াছে। মদীয় গৃহিণী তাহাকে তুলিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে 'হিমসিম' খাইতেছেন, কিন্তু ছেলেটার যে সেরূপ ইচ্ছা বিন্দুমাত্রও আছে তাহা মনে হয় না। চারিখানি হাত-পা ও একখানি মাত্র গলার সাহায্যে সে যেরূপ একটা ঘূর্ণি ঝড়ের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাতে তাহাকে তারিফ না করিয়া থাকা যায় না।

অদূরে সেই 'বিমলা' নামধারিণী 'বুড়ো হাতী মাগীটি' একটা খুঁটি ধরিয়া কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মা মিথ্যা বলে নাই, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স তাহার নিশ্চয়ই হইবে। আজও বিবাহ হয় নাই এবং চেহারা দেখিলে, হইবে বলিয়াও বিশ্বাস করাই শক্ত। কিসের প্রেরণায় যে মায়ের গালি খাইয়াও সে স্বেচ্ছায় ছেলেটাকে বহিয়া বেড়াইবার ভার লয় কে জানে।

বাড়ীতে আরও যে কয় ঘর বাসিন্দা ছিলেন সকলেই ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্মিলিত সমালোচনা যখন তুমুল আন্দোলনে পর্য্যবসিত হইয়াছে, রঙ্গস্থলে আসামী যুগল দর্শন দিল। গোবর্দ্ধনকে কিন্তু আদর্শ প্রেমিক বলিয়া মনে হইল না। এতগুলি উদ্যত বজ্রের নীচে অনায়াসে প্রেয়সীকে আগাইয়া দিয়া ফরসা জামাটা তারের উপর মেলিয়া আধময়লা একটা কোট গেঞ্জির উপর চাপাইয়া বাহির হইয়া গেল নিঃশব্দে নিশ্চিন্তে।

সকলেই দেখিলাম তারিণী গৃহিণীর পক্ষে। সত্যই তো বাপু, আট টাকা ভাড়া দিয়া একখানি মাত্র ঘরে যাহাকে থাকিতে হয়, আর দুই টাকা দিয়া একটু রান্নাঘর পর্য্যন্ত লইবার ক্ষমতা নাই, তাহার আবার এত সখ কিসের? হাওয়া খাইবেন? সায়েব বিবি নাকি? কথাটা বলিলেন উঠানের ওপারের ঘরের মোটাগিন্নী। গলা চিনি—দেখিতে পাইলাম না। ছ্যাচা বেড়ার দেওয়াল দেওয়া দেড় হাত চওড়া ও দুইহাত লম্বা যে মেটে ঘরটুকু 'রন্ধনশালা' নাম লইয়া মহিমান্বিত হইয়াছে তাহারই ভিতর হইতে কথাটা ভাসিয়া আসিল।

গোবর্দ্ধনের বৌ চালাক মেয়ে, সে একটিও কথার উত্তর দিল না। আঁচলের পিন্ খুলিয়া

ঘুরান শাড়ীর আঁচলটা কোমরে জড়াইল, জুতা জোড়াটা স্বস্থানে রাখিয়া আসিল। আর কিছু করিবার মত কাজ হাতে না থাকাতেই বোধ হয় উঠানে নামিয়া ক্রন্দনরত ছেলেটার পিঠে সজোরে কয়েক ঘা চড় কসাইয়া টানিতে টানিতে ঘরে ঢুকিয়া দুম করিয়া খিল লাগাইয়া দিল।

আন্দোলনটা আর ভাল করিয়া জমিল না। বিষ্ণুবাবুর বিধবা দিদি পুনরায় হরিনামের মালাসমেত হাতটি ঝোলায় ডুবাইয়া চক্ষু মুদিলেন। মোটাগিন্নীর খুস্তির আওয়াজ প্রখর হইয়া উঠিল। ভোলানাথের স্ত্রী ঘরে ঢুকিয়া আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজাইয়া দিল। ভোলানাথ এইমাত্র বাড়ী ফিরিয়াছে, হয় তো এটা তাহাদের রসালাপের সময়।

নন্দ বলিয়া যে ছোকরা মোটাগিন্নীর পাশের অংশটায় থাকে, সে আজ দুই দিন হইল পুত্রকলত্র লইয়া শ্বশুরবাড়ীতে একটা বিবাহ-উৎসবে গিয়াছে। তাহার দরজায় তালা ঝুলিতেছে। কাজেই ও অঞ্চলটা অন্ধকার। তারিণীগৃহিণীও আপন মনে গজ গজ করিতে করিতে এক সময় উঠিয়া রান্নাঘরে ঢুকিলেন। শুধু বিমলা মেয়েটা রোয়াকের ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়াই রহিল।

গৃহিণী আসিয়া বিমর্ষমুখে ঘরের মেজেয় পা ছড়াইয়া বসিতে, হাতের বইখানা মুড়িতে হইল, কহিলাম—কি গো, তোমার আবার কি হ'ল ?

—আমার ? নাঃ আমার আর কি হবে ?

এরকম স্থলে কথা বাড়াইতে নাই - পুনরায় বইয়ের পাতাটা খুলিয়া ধরিলাম।

গৃহিণী কিছুক্ষণ উসখুস করিয়া বলিয়া উঠিলেন—হ্যাঁ গা, এরা বারোমাস এমনি ক'রে কাটায় ?

বলিলাম—তা কাটায় বই কি।

—আচ্ছা একসঙ্গেই যখন থাকতে হ'বে তখন ঝগড়া ক'রে মরে কেন ?

ওরে বাবা, এ যে রীতিমত দার্শনিক প্রশ্ন, হাসিয়া উঠিলাম—একসঙ্গে থাকে বলেই তো ঝগড়া করে গো ! এই ধর না কেন তুমি যখন বাপের বাড়ী যাও, ক'দিন গিয়ে ঝগড়া করে আসি ? অথচ সামনে থাকলে··

গৃহিণীও হাসিলেন বটে কিন্তু মনটা তাঁহার ঠিক যে প্রকৃতিস্থ হইয়াছে তাহা মনে হইল না। কিছুক্ষণ পরেই আবার পূর্ব্ব কথার সূত্র ধরিয়া বলিলেন—হ্যাঁ গা, গোবর্দ্ধনের বৌ আর বেড়াতে যাবে না বোধ হয় ?

—কি জানি ? ছেলেটাকে নিয়েও যেতে পারে।

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—পাগল, ও কি ছেলে ? শয়তান ! যার কাছে যতক্ষণ থাকে, চুল ছিঁড়ে কাপড় টেনে মেরে ধরে কি কাণ্ড যে করে ! পথে বেরুলে রক্ষে আছে ? বিমলার মা তাই তো অত ক্ষেপেছে, বিমলার পরনের একখানা নতুন কাপড় না কি দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে দিয়েছে, আর খামচে গালের মাংসই খুবলে নিয়েছে এতখানি—বলিয়া হস্ত প্রসারিত

করিয়া দেখাইলেন। অবশ্য যতখানি দেখাইলেন ততখানি মাংস তুলিয়া লইলে গালের আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবার কথা নয়, তবু যা রটে তার কিছু তো বটেই।

অফিসের যে রকম হালচাল, কখনও যে মাহিনা বাড়াইবে এরকম আকাশ কুসুমের কল্পনা সজ্ঞানে করিবার কথা নহে, তবু মনের নিভৃততম প্রদেশে ক্ষীণ একটি আশার রেখা সযত্নে লালন করিতেছিলাম। এই তো একরকম চলিয়া যাইতেছে, আর যদি গোটা দশেক টাকা বেশী পাওয়া যায়, সম্পূর্ণ আলাদা একখানি ছোটখাট বাড়ী ভাড়া লওয়া অসম্ভব নয়, তাহা হইলে পিসিমাকেও আনা যায়। আহা বুড়ো মানুষ একলাটি---

মুখের উপর সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া যে ছোকরা সাঁ করিয়া চলিয়া গেল, তাহাকে কিছু কড়া কথা শুনাইব বলিয়া ফিরিয়া দেখি সস্ত্রীক গোবর্দ্ধন আমাকে চিনিতে না পারার ভান করিয়া তাড়াতাড়ি মোড় ফিরিল। থাক্ আর লজ্জা দিয়া কাজ নাই, পা চালাইয়া বাড়ীর দিকে ছুটিলাম। আজও ত বেড়াইতে বাহির হইয়াছে দেখিতেছি, কিন্তু ছেলেটার কি হইল? সন্দেহভঞ্জন হইতে দেরী হইল না, স্নেহময়ী জননী ছেলেটার অসদ্‌গতি করিয়া যায় নাই। ঘুম পাড়াইয়াছে, মাদুর বালিশ পাতিয়া সযত্নে শোয়াইয়াছে এবং জাগিয়া পড়িয়া যাইবার আশঙ্কায় একখানা গামছার একটা খুঁট পায়ে বাঁধিয়া অপর দিকের খুঁটটি জানালার গরাদেতে কসিয়া গিঁঠ দিয়া দিয়াছে। ক্ষুন্নিবৃত্তির উপায় স্বরূপ শিয়রের কাছে একটা থালায় করিয়া কয়েকখানি বাতাসা ও দুইখানা বিস্কুট পর্য্যন্ত রাখিয়া যাইতে ভোলে নাই। আহা! ইহাকেই বলে মাতৃস্নেহ!

ঘরে ঢুকিতেই গৃহিণী কহিলেন, দেখেছ গা, ছুঁড়ির আক্কেল? ঘুমন্ত ছেলেটার ঠ্যাঙে দড়ি দিয়ে ফেলে রেখে গেছে, ষাট্ ষাট্ কেন বাপু, দু'দিন বেড়াতে না গেলে কি সংসার রসাতলে যাবে? আর ক'দিন বা বেড়াবি? এই তো দুদিন পরে আবার একটা হবে—

চমকিয়া বলিলাম, তাই নাকি? চমকানিটা এমন সুস্পষ্ট যে গৃহিণীর চোখ এড়াইল না। বলিলেন—ওমা, তা আকাশ থেকে পড়ছ কেন? এই তো হবার বয়স? এ বছর আর বছর হবে বই কি, যে সময়ে যা!

তা সত্য, যে সময়ে যা। হইবে বই কি! অপ্রতিভ হইয়া গেলাম।

গৃহিণীকে কিন্তু চিন্তিত দেখিলাম, কহিলেন---বাপ-মা তো নেই বলে, এখানে যে হবে —একখানা তো ঘর!

বুঝিলাম "সব একাকার" হইবার আশঙ্কায় ভদ্রমহিলা এখনই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছেন। আশ্বাস দিয়া কহিলাম—পাগল, তাই কি হয়? 'সেবাসদন' আছে কি করতে?

সেবাসদনের বিশদ বর্ণনা করিয়া বুঝাইয়া দিবার পর গৃহিণী চুপ করিলেন বটে, কিন্তু মুখে হাসি ফুটিল না। গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—কি জানি বাবু ওসব ম্লেচ্ছপনা সাত জন্মে

দেখিওনি শুনিওনি। হিঁদুর ঘরের মেয়ে হয়ে হাসপাতালে—ছিঃ!

ছিঃটা এত সবেগে এবং সতেজে বাহির হইয়া আসিল যে প্রতিবাদ করিবার পথ রহিল না। "হতচ্ছাড়া দেশ!" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ইহারই মুখে 'সোনার দেশ' সম্বন্ধে মন্তব্য শুনিয়াছি—"যাই বল বাবু, থাকতে হয় তো এখানেই জন্ম জন্ম থাকতে হয়। ইহকাল পরকাল দু'কালের মঙ্গল, কালী, গঙ্গা, পাঠ, কেত্তন কী নেই? ওই মোটাগিন্নীদের সঙ্গে আজ গিয়েছিলাম পাঠ-বাড়ীতে—আহা প্রাণ যেন জুড়িয়ে গেল। তোমাদের দেশে কি ছাই আছে? কিছু নেই। মুখপোড়া দেশ।"

কয়দিন হইল বর্ষা নামিয়াছে। গৃহিণীর মুখেও মেঘ। কাপড় শুকাইবার জায়গা নেই, শোবার ঘরে কাপড় মেলিতে হয়, বিছানায় ঠেকিয়া কাচা কাপড়ের শুদ্ধতার আর কিছু বাকী থাকে না। বুড়ো বয়সে ম্লেচ্ছপানার দেশে আসিয়া জাত জন্ম যে আর কিছু থাকিবে না, মুখে চোখে সেই অনুযোগ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শুধু তাই নয়, বৃষ্টিতে উঠানের ড্রেন বুজিয়া জল থই থই করে এবং সেই জল না মাড়াইয়া কলে যাইবার উপায় নাই। বুঝিতেছি মেসের ভাত আবার কপালে নাচিতেছে। নিজের দিকে চাহিয়া যে একটু ক্লেশবোধ না করিলাম তাহা নয়। গৃহিণীর হাতে পড়িয়া বেশ একটু চেক্‌নাই ফিরিয়াছিল। তিনিও যে এই জন্যই কথাটা মুখে আনিতে পারিতেছেন না তাহা বুঝি। কিন্তু আমার শ্রী ফিরাইতে তাঁহার অবস্থা বিশ্রী হইয়া উঠিয়াছে। অবলা বঙ্গ ললনা, কঠোর বিরহজ্বালা অবলীলাক্রমে সহ্য করিয়া থাকে, কিন্তু সংসার জ্বালায় বেচারারা দুই দিনে শুকাইয়া ওঠে।

বলিলাম—দেখ বর্ষার সময়টা না হয় বাড়ী গিয়ে—শীত পড়লে আবার—

গৃহিণী শুষ্কমুখে কহিলেন,—তাই কি আর হয়? সংসার পেতে বসা হয়েছে যখন?

সংসারের মধ্যে তো ছেলেটা—দেখি বৃষ্টির পানে তাকাইয়া ম্লানমুখে বসিয়া আছে। বলিলাম, কি রে নান্নু, মুখখানা শুকনো কেন রে? নান্নু মুখ না ফিরাইয়াই কহিল—না তো বাবা।

মাথাটা নাড়িয়া দিয়া কহিলাম, বাড়ী যাবি নান্নু? ছেলেটার চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কয় ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

পরদিন বাড়ীওয়ালাকে নোটিশ দিলাম।

আবার মেসের ভাত খাইতেছি।

গালের অস্থি দুইটা পুনরায় যেন অস্তিত্ব জাহির করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। তা উঠুক, মাহিনা বাড়িলে অদূর ভবিষ্যতে কি করিব সেই আশায় মনে অসুখ নাই। পুরাণো

বাসার সকলের সঙ্গেই প্রায় দেখা হয়। ওইটাই একমাত্র পথ, দুইবেলা আনাগোনা করিতে হয়।

মোটাগিন্নী ও বিষ্ণুবাবুর বিধবা দিদি কলকণ্ঠে পথ সচকিত করিয়া তেমনি 'পাঠ' শুনিতে যান। গোবর্দ্ধন ইস্ত্রিকরা পাঞ্জাবী পরিয়া সস্ত্রীক হাওয়া খাইতে বাহির হয়। ভোলানাথ বাজার করিয়া ফিরিবার পথে ফুলকপি ও গলদা চিংড়ির ঠোঙাটা উঁচু করিয়া ধরিয়া ডাকিয়া সকলের সঙ্গে কথা বলে।

নন্দ ছোকরা তেমনই সকাল সন্ধ্যা ভাঙা হারমোনিয়মটা লইয়া মা সরস্বতীকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতে থাকে।

তারিণীবাবু গোবর্দ্ধনের ছেলেটাকে কোলের ভিতর চাপিয়া বসাইয়া ডাক্তারদের রোয়াকে 'দাবার ছক' সাজাইয়া খেলুড়ি আহ্বান করেন। অনুমানে বুঝি, গোবর্দ্ধন-দম্পতির সহিত কলহ আর নাই। ডাকিয়া বলেন, এই যে চাটুয্যে, এস না—একহাত হোক। কাজ আছে ছুতা করিয়া সবিনয়ে পাশ কাটাইতে কাটাইতে বলি—খবর ভাল তো বাড়ীতে? মেয়ের বিয়ের কিছু হল? অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টাইয়া তারিণীবাবু বলেন—কোথায়? যেতে দিন মশায়, যেতে দিন, আমি আর ও নিয়ে মাথা ঘামাইনে। ও যাঁর কাজ তিনিই করবেন, আমার কি সাধ্য? খেলবেন না তাহলে?

পাশ কাটাইয়া চলিয়া আসি। পথে বিষ্ণুবাবু গ্রেপ্তার করেন। বাসায় থাকিতে তেমন আলাপ কিছু হয় নাই. এখন কিন্তু পরম আত্মীয়ের মত হাত ধরিয়া টানিয়া জনান্তিকে বলেন —মেয়ের বিয়ের কথা বলছেন? হুঃ ও মেয়ের কি আর বিয়ে হয় মশায়, মিলিটারী মেয়ে—চেহারা তো বলে কাজ নেই। হ্যাঁ, সেদিন যে এক কাণ্ড হয়ে গেলে নন্দর সঙ্গে।

নিরুৎসাহেই বলি, কি রকম?

—কি জানি মশায়, নন্দর পরিবার তো বাপের বাড়ীই রয়েছে সেই ইস্তক। ও তো হোটেলে খায় জানি। একদিন বুঝি তারিণীবাবুর রান্নাঘরে একটু চায়ের জল চাইতে গিয়েছিল —কর্তার মেয়ে মুখের উপর কাঁচের গেলাস ছুঁড়ে মেরেছেন, কেটে একেবারে 'ওয়ার', রক্তে ভাসাভাসি। নন্দ যাই ভাল লোক, তাই থানা-পুলিশ করলে না।

মাগী গিয়েছিল গঙ্গা নাইতে, এসে ধেই ধেই করে নাচ। বলে নন্দ না কি ওর মেয়ের দিকে কুনজরে চেয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ! নন্দর পরিবারকে দেখেছেন তো আপনি? ছবির মতন চেহারা, সে যাবে ওই কালির দোয়াতের দিকে নজর দিতে! —রগড় আর কি?

চুপ করিয়া চাহিয়া থাকি, মুখে কথা জোগায় না।

বিষ্ণুবাবু আবার বক বক করিতে থাকেন—আপনার পোরশানটায় যে লোক এসে গেল এদ্দিন। বেশ ছিলেন, আবার দুর্ম্মতি হ'ল কেন বলুন তো? যাই বলুন, আপনার কিন্তু চেহারা খারাপ হয়ে গেছে। মেসের ভাত, আর পরিবারের হাত অনেক তফাৎ।

চলিতে চলিতে, আমার ঘরখানা নজরে পড়ে। যাহারা আসিয়াছে, সৌখিন বলিতে হইবে, জানালায় দরজায় জাপানী ছিটের পর্দ্দা ঝুলাইয়াছে। সামনের সেই একহাত চওড়া রোয়াকটায় মোড়া পাতিয়া এক ভদ্রলোক খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছেন।

চাহিয়া চাহিয়া একটা নিঃশ্বাস পড়িল। সত্যই তো বেশ ছিলাম। এই তারিণী-নন্দ-বিষ্ণু-গোবর্দ্ধন কি আর মন্দ আছে?

ব্যবধান

নবান্নর আগে যাইবার কথা নয়, তবু কার্ত্তিকের প্রথম হইতেই স্বর্ণময়ী যাই যাই করিতেছেন। দেশের বাড়ীতে কি যে রাজ্যপাট বহিয়া যাইতেছে তিনিই জানেন।

অথচ তারাশঙ্করের ইচ্ছা নয় যে এত শীঘ্র যান। শুধু যে ছেলে বৌয়ের সংসারে আদর যত্নের অবধি নাই বলিয়াই যাইতে মন সরে না সে কথা বলা অন্যায়, বাবু, টুকু ও বেবি ছবির আকর্ষণও বড় সোজা নয়। উহাদের লইয়া কোথা দিয়া দিনরাত কাটিয়া যায় বুঝিবার জো নাই। এই তো ক'দিন আসা হইয়াছে, ইতিমধ্যে কোন্ ফাঁকে আস্ত মাসটাই পার হইয়া গেল।

স্বর্ণময়ীর প্রাণটা এত কঠিন কেন? তারাশঙ্কর ভাবিয়া পান না— এই সব চাঁদমুখগুলির প্রলোভন জয় করিয়া কিসের টানে ফিরিবার ব্যস্ততা?

সন্ধ্যাবেলা সুধীর বাড়ী আসে, ছেলেরা কলরব করে, রান্নাঘরে ঠাকুর চাকরের সশব্দ কর্ম্মব্যস্ততার সাড়া পাওয়া যায়, রেডিওয় গান হয়—সারা বাড়ী বিদ্যুতালোকে ঝল্‌মল্ করিতে থাকে। এক কথায়, সবটাই সজীব চাঞ্চল্যপূর্ণ, জীবনের আনন্দে ভরপুর।

পাড়াগাঁয়ে এ সময়টায় অল্পবিস্তর শীত পড়ে। বেলা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের গাছপালা কুয়াশার উড়ানী মুড়ি দিয়া নিথর হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শব্দময় জগৎ ঝিঁ-ঝিঁ-র ডাকের ভিতর হারাইয়া যায়। মাঝে মাঝে মৃদু হিম বাতাসে গায়ের ভিতর কেমন যেন শিরশির করিয়া ওঠে।

লণ্ঠনের স্তিমিত আলোকে গায়ের কাপড় জড়াইয়া সেই ভগ্নপ্রায় দালানের এককোণে চুপচাপ বসিয়া থাকা—নিরানন্দ সন্ধ্যাবেলাটা মনে করিলেই প্রাণের ভিতর হু হু করিয়া ওঠে।

স্বর্ণময়ীর সেটা সন্ধ্যাহ্নিকের সময়। তা' না হইলেও শুধু কথা কওয়ার তাগিদেই কথা কহিবার সথ কাহারো নাই।

প্রয়োজনীয় কথা সারাদিনের একত্র বাসে নিঃশেষ হইয়া যায়। স্বর্ণময়ী মালাগাছটা হুকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ভাঁড়ারের দরজায় শিকল তুলিয়া দিয়া বাহিরে আসেন—

"বসে বসে তেলটা পোড়াচ্ছ কেন?" বলিয়া লণ্ঠনের শিখাটা ক্ষীণতর করিয়া দিয়া

আঁচল পাতিয়া দেয়ালের কোণে গুটিসুটি মারিয়া শুইয়া পড়েন।

রান্নার পাট এবেলায় নাই—তারাশঙ্করের জন্য দুইখানা রুটি গড়া আছে—স্বর্ণময়ীর ওবেলার ভাত তরকারিতেই চলিয়া যায়।

ক্ষুধার খাতিরে খাওয়া নয়, কাজ সারার জন্য একসময় উঠিতে হয় এই পর্য্যন্ত। একটু গড়িমসী করাই ভাল, একটানা লম্বা রাত্রির মাঝখানে তবু ছেদ পড়ে।

সকালের দিকে বাহির হইলে তবু দুই চারিটা লোকের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ বেলা আর কেহ বাড়ীর বাহির হইতে চায় না।

নিছক গল্প করিবার গরজে লণ্ঠনের তেল পুড়াইয়া বেড়াইতে বাহির হইবে, এতদূর উদারতা কাহারো কাছে আশা করা উচিতও নয়।

তা' ছাড়া আছেই বা কে দেশে! সংসার বলিতে যাহারা, সকলেই প্রায় দেশছাড়া।

অধিকাংশ ঘরেই দুই একটা বিধবা জীর্ণ ভিটা আগলাইয়া পড়িয়া আছে।

শুধু যাহাদের কর্ম্মস্থলে বাসা করিয়া থাকিবার সাধ থাকিলেও সাধ্য নাই, তাহাদেরই ঘরে শিশুকণ্ঠের কলধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, রঙীন শাড়ী শুকায়।

শনিবার বিকালের ট্রেণখানা আসার সঙ্গে সঙ্গে মৃতপ্রায় দেশটার নাড়ীতে জীবনের মৃদু স্পন্দন জাগে। রন্ধনশালা হইতে কুণ্ডলীকৃত ধূম উঠিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। বাতাসে সুগন্ধ ভাসিয়া আসিয়া রন্ধনশালার অপেক্ষাকৃত বিশেষ ব্যবস্থার সংবাদ জ্ঞাপন করে।

দুইবেলা উনান জ্বালিবার পাট ও-সব অঞ্চলে নাই বলিলেই চলে। শুধু প্রবাসী ব্যক্তিরা যেদিন বাড়ী আসে—

রবিবারের সারাদিনটা তবু দেশ বলিয়া মনে হয়। ঘাটে ঘাটে ছিপের আড্ডা বসে, নিজের নিজের বঁড়শি ও হুইলের চমৎকারিত্ব লইয়া তর্ক উদ্দাম হইয়া উঠে, পূর্ব পূর্ব বারের মত সাতসেরা মাছটা মুখে মুখে আধ মণে দাঁড়ায়।

'ক্লাব রুম' নামে খ্যাত নিতাই বক্সীর পোড়ো দালানের চাবিটা খোলা হয়, কলিকাতার গল্প শুনিতে উদগ্রীব শ্রোতার দল রোয়াকে আসিয়া ভীড় করিয়া বসে। সবই একদিনের ব্যাপার। সোমবার ভোরের ট্রেণ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাগ্রাম নিঃঝুম্ মারিয়া যায়, দেশের প্রাণ পাখীটা কৌটায় বন্দী করিয়া ইহারা লইয়া যায় না কি কে জানে।

তারাশঙ্করের সংসারের জোয়ার ভাঁটা নাই। ছেলে সুধীর বড় চাকুরী করে, অবসর অল্প। তা' ছাড়া স্ত্রী-পুত্র লইয়া কলিকাতায় বাসা করিয়া আছে। সপ্তাহান্তে বাড়ী যাইবার সুবিধাও নাই, ইচ্ছাই বা থাকে কেমন করিয়া?

ম্যালেরিয়ার অজুহাত দেখাইয়া বলিয়া কহিয়া সে-ই মা-বাপকে মাস তিনেকের জন্য আনাইয়াছে। কিন্তু একমাস যাইতেই স্বর্ণময়ী বাঁকিয়া বসিলেন।

তারাশঙ্কর স্বর্ণময়ীকে চেনেন, তবু চেষ্টা করিতে ছাড়েন না। বলেন—"এখুনি যাবার

জন্তে থেই থেই করলে সুধীর কি বল্‌বে? আশা করে নিয়ে এল, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে—বৌমার একটু আসান হয়—"

যুক্তিটা যে ভিত্তিহীন কথার সুরেই ধরা পড়িল।

—"হ্যাঁ আমার জন্তে তো ওদের সর্ব্বস্ব বয়ে যাচ্ছে" স্বর্ণময়ী মুখ বাঁকাইয়া বলেন—"তিনটে কুচো নিয়ে সংসার, বামন-চাকরে পাঁচটা, বাজে কথা ছাড়ান দাও, কোজাগরের আগে আমি যাবোই।"

—"আর এই যে এত করে পঞ্চুর বৌকে বুঝিয়ে দিয়ে এলে কোজাগর করবে বলে?"

—"এলাম তো এলাম! তোমার সহরে বসে সুখ করবার সাধ থাকে থেকো, আমায় গাড়ীতে তুলে দিলেই বেশ চলে যেতে পারবো।"

তারাশঙ্কর দমিয়া যান, অপ্রতিভভাবে বলেন—"তাই কি বলছি? আর দুটো দিন গেলে ম্যালেরিয়াটা একটু কমতো।"

—"ম্যালেরিয়ায় তো সবই করবে? বলে—জন্ম গেল ছেলে খেয়ে, আজ বলছে ডান! তুমি যাবে কি না তাই বল?"

স্বর্ণময়ীর উষ্মার কারণ বুঝিবার ক্ষমতা তারাশঙ্করের নাই। স্বর্ণময়ীর নিজেরই কি আছে? বৌ ছেলের সোনার সংসার দেখিয়া কি তাঁহার চোখ টাটায়? দুর্গা দুর্গা!

উহারা ভাল থাক্, সুখে থাক্, বাড়বাড়ন্ত হোক, তবু আড়ালে থাকাই ভাল। এত প্রাচুর্য্য, এত অপচয়, চোখের উপর বরদাস্ত করা যায় না।

যে স্বর্ণময়ী হিসাব করিয়া তেল খরচ করিতে একখানা তরকারীর উপর দুইখানা রাঁধিতে পারেন না, তাঁহার ছেলের বাড়ীতে বিদ্যুতের আলো জ্বলে, মাসে না কি দশ-বিশ টাকা!

এমন বিসদৃশ ব্যাপার মানাইয়া চলা কঠিন। অভ্যাসের বশে; ইহাদের এলোমেলো ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করিতে গিয়া বুঝিয়াছেন—অনেক সময় ভাল করিতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

তবু সত্যের খাতিরে বলিতে হয় সুধীরের বৌ, মেয়ে ভাল!

শ্বশুর শাশুড়ীর উপর সেবা যত্নের এতটুকু ত্রুটি হইতে দেয় না।

এতটুকু কাজে হাত দিতে গেলে হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসে—"এসব কেন মা, আপনি দুদিনের জন্তে এসেছেন, নাতি-নাত্নী নিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করুন। সেখানে খেটে সারা হ'ন। রাখুন রাখুন। একপাল লোক রয়েছে কি করতে?"

আহারের সময় নিত্য অনুযোগ করে—"দেখুন দিকিনি কি অন্যায়, আপনি বুড়ো মানুষ দাঁতে ব্যথা, রাত্রে ভাত খাবার কি দরকার? দুখানা ফুলকো লুচি খেলেই হয়, বেশী করে ময়ান দিয়ে ঠাকুর একখানা একখানা করে ভেজে দেবে। সেই তো দু'দিন বাদে নিজের ঘাড়েই পড়বে—এখানে যে ক'টা দিন আছেন—"

স্বর্ণময়ীরই মনের দোষ বলিতে হইবে বই কি—এতো আদরেও ভাল লাগে না, হাঁফ

ধরে। অস্বীকার করেন না তিনি, নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন না কেন মন টিঁকে না।

দোতলার ঝি নীরদা বিছানা পাতিতে পাতিতে সেই কথাই শুধাইতেছিল—"হ্যা গো মা, ঠাকুমা পালাই পালাই করতে লেগেছে কেন? এখানে কাচ্চাবাচ্চার ঘর, এ সব ফেলে দেশে পড়ে থাকা কিসের লেগে?" স্বর্ণময়ী পাশের বারান্দা দিয়া যাইতে যাইতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন—নিজের সম্বন্ধে আলোচনা শুনিলে কৌতূহল না হয় কাহার?

বৌ হাত উল্টাইয়া ঠোঁটের একটি বিশেষ ভঙ্গী করিয়া বলিল—'ভগবান বলতে পারেন পালাই পালাই কেন, ঠাকুর আদরে রয়েছেন, কোন অসুবিধেই তো নেই। সেখানে ঘর সংসারের মধ্যে তো তুটো ফুটো টিন আর চারটি ছাতা-পড়া হাঁড়ি কলসী, তারই ভাবনায় ঘুম হচ্ছে না'।

স্বর্ণময়ী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না, দ্রুতপদে সরিয়া যান। সত্য-কথা শুনিবার সৎ সাহস সকলের থাকে না।

ট্রেণে উঠিয়া তারাশঙ্কর উদাসভাবে বাহিরের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকেন। আসিবার সময় ছবিটা কেমন করিয়া দাতুর সঙ্গে "গাড়ী চড়ে" বেড়াইতে যাইবার বাহানা ধরিয়াছিল সেই কথাগুলি একটি একটি করিয়া মনে করিতে চোখের কোণটা ভিজা হইয়া আসে।

উহাদের বিষয় আলোচনা করিলে হয়তো হৃদয়ভার একটু লঘু হইয়া যায়, কিন্তু বিরহটা যখন নেহাৎ কাঁচা, প্রিয়ব্যক্তির নাম সহজভাবে লইতে ইচ্ছা হয় না। ত'ছাড়া স্বর্ণময়ীর জেদেই একরকম চলিয়া আসার জন্য তাঁহার উপর মনের ভাবটাও তেমন সুপ্রসন্ন ছিল না।

স্বর্ণময়ী অবশ্য চোখের জল মুছিতে মুছিতে গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন, "মায়া বাড়াইব না" বলিলেই বা মায়া ছাড়ে কই?

নূতন শীতের উড়ো হাওয়া হু হু করিয়া গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া স্বর্ণময়ীর চোখের জল শুকাইয়া গালের উপর একটা সুস্পষ্ট রেখা রাখিয়া গিয়াছে।

হাত মুখ, ঠোঁট, পাকা চুলের গোছা, সবই যেন শুকাইয়া রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

জানালাটা বন্ধ করিয়া দিবার জন্য স্বামীকে অনুরোধ না করিয়া গায়ের আঁচলটা পায়ের উপর টানিয়া দিয়া নিজের ধরনে গুটিসুটি মারিয়া শুইয়া পড়েন।

* * * *

আসিবার সময় সুধীর গম্ভীর মুখে আসিয়া প্রণাম করিল। থাকিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ করে নাই, হয়তো অভিমান করিয়াছে, হয়তো বিরক্ত হইয়াছে, মুখ দেখিয়া এখন তার মনের কথা ধরা যায় না।

কিন্তু কেন অনুরোধ করিল না? ছেলেবেলার মত কোল ঘেঁসিয়া বসিয়া ম্লান মুখে বলিল না কেন—"তুমি চলে গেলে ভাল লাগে না মা!". স্বর্ণময়ী মাঝে মাঝে বাপের বাড়ী যাইতে চাহিলে যেমন বলিত।

এই তো সেদিনের কথা—সময় কি এত দ্রুত চলে!

কিন্তু স্বর্ণময়ীই বা তেমন করিয়া কাছে টানিতে পারেন কই?

হয় না, আর হইবার নয়।

অলক্ষ্য অস্ত্রাঘাতে কে যে বসিয়া ভিতরকার যোগসূত্র ছিন্ন করিতে থাকে, বুঝিবার উপায় নাই। শুধু দৃষ্টির অন্তরাল হইলেই নিত্য সাহচর্য্যের ধুলিমলিন কাঠিন্য ঘুচিয়া অপূর্ব্ব কোমলতায় মন ভরিয়া ওঠে। তখন ছোট কথাও বড় হইয়া দেখা দেয়।

কথার ছলে কবে যে সুধীর ছেলেবেলার মত 'মৌরীশাকের ঝোল' ও 'মেতি পাতার বড়া' খাইতে চাহিয়াছিল, সেই কথা স্মরণ করিয়া এক ঝলক উষ্ণ অশ্রুস্রোত নিমীলিত নয়নের প্রান্ত বাহিয়া গড়াইয়া পড়ে।

আশ্চর্য্য! এমন প্রয়োজনীয় কথাও মানুষ ভুলিয়া যায়?

তারাশঙ্করের নিজেরও শীত বোধ হইতেছিল। জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া সোজাভাবে বসিতে স্বর্ণময়ীর পানে নজর পড়ে।

শোয়ার ধরনটা চিরদিন একরকম রহিয়া গেল। বুকের কাছে দুই হাঁটু জড় করিয়া, গালের নীচে একখানি হাত পাতিয়া—ছোটখাট মানুষটি, সহসা দেখিয়া বালিকা বলিয়া ভ্রম হয়।

কান্নার ধরনটাও অপরিবর্তিত আছে। শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনায়, বধূ-জীবনের নিরুপায় অসহায়তায়, বালিকা স্বর্ণময়ী যখন কাঁদিত এমনি করিয়া মুদিত চক্ষুর কোণ বাহিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িত!

ক্ষণপূর্ব্বের বিদ্বেষ বিরক্তভাব কাটিয়া একটু সস্নেহ করুণা জাগে।

সান্ত্বনা দিয়া একটা মিষ্ট কথা বলিবার ইচ্ছা হয়। কিন্তু দীর্ঘকালের অনভ্যাসে কণ্ঠস্বরে কোমলতার ছন্দাংশও ধরা পড়ে না। বলিবার উপযুক্ত মনের মত কোন কথা খুঁজিয়া না পাইয়াই বোধ করি একসময় বলিয়া বসেন, "যেতে ছাগল আসতে পাগল! সাধে কি আর বলেছে মেয়ে মানুষ—হুঁঃ!"

স্বর্ণময়ী অবশ্য ইহার জন্য নূতন করিয়া দুঃখ অনুভব করেন না, হয়তো বিপরীতটা ঘটিলেই চমক লাগিত।

কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ঘুচিয়া ব্যবধান এত বিস্তৃত হইয়া যায় কেন?

আপনাকে প্রকাশ করিবার সহজ সুরটি মানুষ কোথায় হারাইয়া ফেলে?

———

তাসের ঘর

কথাটা তুলিল তরঙ্গিণী সকালবেলা কুটনো কুটিতে বসিয়া। মমতা জলন্ত উনানে হাঁড়ি চাপাইয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল---চাল ধোওয়ার গামলাটা নিয়ে কুটনো কুটতে বসেছ ঠাকুরঝি! দাও দিকি চট্ করে।

ঠাকুরঝি কথাটায় কান না দিয়া আঙ্গুলের আগায় থোড়ের সূতা জড়াইতে জড়াইতে কহিল—দাদা কাল কত রাতে বাড়ী এল বৌ?

মমতা থমকিয়া কহিল—কই কাল তো আসেননি ভাই। বিয়ে বাড়ীর হাঙ্গামে খেয়ে দেয়ে ন'টার গাড়ী ধরা কি সহজ? ভোরের দিকে একটা ট্রেণ আছে বলছিলেন, তা'তেই বোধ হয়—

তরঙ্গিণী চোখে মুখে বিস্ময় ফুটাইয়া বলিল—দাদা আসেন নি কাল? বল কি বৌ! আমি যে নিজের কানে শুনলাম—

কি শুনলে?

ভারী ভারী গলার আওয়াজ, ভাবলাম ঠাণ্ডা লেগে গলা বসে গেছে বোধ হয়। রাত তখন তুটো আড়াইটে হবে, ফিরে গিয়ে হিমিকে বললাম 'তোর বাবা বোধ হয় বাড়ী এল—নারে হিমি?'

মমতার বড় মেয়ে হিমানী কাছে বসিয়া হেঁট মুখে শাক বাছিতেছিল, পিসির কথার উত্তরে সাড়াও দিল না, মুখও তুলিল না।

তাহার পানে এক নজর চাহিয়া অল্প বিরক্তভাবে মমতা বলিল—আজগুবি গল্পগুলো পরে হবে, এখন দাও তো গামলাটা. ভাতের জল ফুটে গেল।

ভাত সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ না করিয়া তরঙ্গিণী না-ছোড়ভাবে কহিল—তা ছাড়া পষ্ট দেখলাম যে বৌ, ভবানীর ঘরের দেওয়ালে তোমার জানালা থেকে ছায়া পড়েছে; তুজন মানুষের ছায়া—নারে হিমি? ও, ও উঠলো কিনা জল খেতে।

বারে বারে কন্যাকে সাক্ষ্য মানায় মমতার হঠাৎ খেয়াল হইল তরঙ্গিণীর ইহা নিছক কৌতূহল মাত্র নয়, খুঁচাইয়া জেরা করিবার মত। রাগে আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া যায়।

তবে বোধ করি ভূত দেখে থাকবে ঠাকুরঝি—দেখো রাম নামের মাতুলীটা হারিও না যেন—বলিয়া কঠিন মুখে রুষ্ট হাসি হাসিয়া গামলাখানা উঠাইয়া লইয়া গেল।

তখনকার মত কথাটা ওইখানেই চাপা পড়িল। সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া গেলে হয় তো গোল মিটিয়া যাইত, কিন্তু কথাটা 'পাঁচ কান' করিবার ইচ্ছা মমতার ছিল না। তরঙ্গিণীকে বলা আর 'দৈনিক আনন্দবাজারে' ছাপাইয়া দেওয়ার মধ্যে বড় বিশেষ প্রভেদ নাই। সময়ই বা কোথা? সেজ দেওর আটটায় ভাত খায়, হিমুর স্কুলের 'বাস' আসে সাড়ে আটটায়।

তাহার পর, পরে পরে চলিতে থাকে, সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ থাকে না।

স্কুলের ছেলে কয়টাকে চালান করিয়া দিয়া তবে ছুটি, তখন দুই দণ্ড পা মেলিয়া বসিয়া, চা খাওয়া, জল খাওয়া, গল্পগাছা করা চলিতে পারে।

প্রায় নয়টার সময় তরঙ্গিণীর দাদা সুধাংশু আসিয়া পৌঁছিল।

পকেট হইতে এক তাড়া 'প্রীতিউপহার' বাহির করিয়া ভগ্নির দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া কহিল —তরু, দেতো একটু তেল, নেয়ে নিই। খাওয়া আর হচ্ছে না—যাক দরকারও নেই, যা সাংঘাতিক রাত হল কাল বাপস্! ভদ্রলোকে যায় রেলের রাস্তায় নেমন্তন্নে? রাম বলো। কই গামছা?

আধ মিনিটে স্নান সারিয়া উপরে উঠিয়াই হাঁক পাড়িল—আমার কাপড় কোথা গেল? খোকা—বলতো আমার কাপড় কই?

মমতা রান্নাঘর হইতে মুখ বাড়াইয়া বলিল, খোকন, বলতো আনলাতেই তো আছে সরু মুগাপাড় ধুতিখানা—যা ব্যস্তবাগীশ মানুষ, দেখতে পেলে হয়।

লোভ হইল এই ছুতায় উঠিয়া গেলে হয় একবার, প্রায় আঠার উনিশ ঘণ্টা দেখা নাই, বিরহ লাগে বৈকি। কিন্তু লজ্জা করে, অল্প বয়সের চাইতে এখন বেশী বয়সের লজ্জার বাধা আরো দুর্লঙ্ঘ্য।

সুধাংশু অবশ্য ততক্ষণে আর একখানা কাপড় সংগ্রহ করিয়া নামিয়া আসিয়াছে।

অতঃপর আর আধ মিনিট ভাতের থালার সামনে একবার বসিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়।

কিন্তু বিধাতাপুরুষ ব্যক্তিটি রসিক। এই শান্তিপূর্ণ নিরীহ সংসারটির স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার উপর কটাক্ষপাত করিয়া তাঁহার সহসা বোধকরি রহস্য প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিল—

মমতার ছোটবোনের ভাসুরপো নিমাই ম্লানমুখে আসিয়া কহিল—বড় মাসীমা, মা বললেন আপনাকে এখুনি একবার যেতে—খুড়িমার বড্ড কষ্ট হচ্ছে।

মমতা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল—তাই নাকি! কখন থেকে রে নিমাই? খুব বুঝি বেশী কষ্ট হচ্ছে?

হুঁ বোধহয়। মা পাঠিয়ে দিলেন আপনাকে নিয়ে যেতে।

মমতার ছোট বোন সবিতার শ্বশুরবাড়ী এবাড়ী হইতে অধিক দূর নয়। তাহার বড় জা ভীরু স্বভাবের লোক, আগেই বলা ছিল সবিতার প্রসবকালে মমতাকে লইয়া যাইবেন।

ভিজা হাত গামছায় মুছিতে মুছিতে মমতা বলিল—তা'হলে একখানা রিক্শ ডাক্ না বাবা।

ছোটকাকা গাড়ী নিয়ে এসেছেন যে! আপনাকে নিয়ে গিয়ে ডাক্তার বাড়ী যাবেন। নিন তাড়াতাড়ি।

মমতা তরঙ্গিণীকে ডাকিয়া কহিল—তাহলে তুমি একবার এদিকে এসো ঠাকুরঝি, সবই

হয়ে গেছে, মোটা চালের ভাতটা হবে শুধু, আর চচ্চড়িটা চড়ান রইল, নামিও। মা বোধহয় আহ্নিকে বসেছেন, বোলো ব্যাপারটা···কখন ফিরতে পারি বলা যায় না। ভালয় ভালয় যাতে হয় তাই বল···কইরে নিমাই চল্ বাবা, দুর্গা! দুর্গা!

তরঙ্গিণী ভ্রাতৃবধূর গমন পথের পানে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া অস্ফুট স্বরে মন্তব্য করিল—'ঢলানি!'

অথচ কয়েক ঘণ্টা পূর্বে তরঙ্গিণী এমন উক্তি মুখে আনিবার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না।

বিজলী ছেলের দুধের বাটী লইতে আসিয়া রান্নাঘরে তরঙ্গিণীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল—বড়দি কোথা গেলেন ঠাকুরঝি?

ঠাকুরঝি নিজের জন্য ও মায়ের জন্য দুইটি বড় পাথরের গ্লাসে চা ছাঁকিতেছিলেন, মুখ না তুলিয়া কহিলেন—

এ সংসারে কে কখন আসে যায়, সব খবর তো রাখা দায় মেজবৌ! রাখলেও বিপদ।

'ভূত দেখার' উপহাসটা তখনো হজম হয় নাই।

বিজলী কথাটার তাৎপর্য্য না বুঝিলেও দাঁড়াইবার সময় ছিল না, ছেলে কাঁদিতেছে।

সুশীলাবালা আহ্নিকপূজা সারিয়া এতক্ষণে নীচে নামিলেন, তৃষ্ণার্ত্তের মত পাথরের গ্লাসের কাছে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন—বড়বৌমাকে দেখছিনে কেন তরি!

—বাবা, তোমার বড়বৌমার হিসেব দিতে দিতে গেলাম। বোনাই-বাড়ী গিয়েছেন গো, বুনের দেওর আদর করে গাড়ী করে নিয়ে গেলেন।

সুশীলাবালার নাকি মেয়ের চাইতে বৌয়ের উপর টানটা অধিক, এমনি একটা বদনাম ছিল; বিশেষ করিয়া বড়বৌমাকে যে অত্যন্ত সুনজরে দেখিতেন একথা মিথ্যা নয়।

শুধু তিনি বলিয়াই নয়—সদা হাস্যমুখী, নিরলস, কর্তব্যপরায়ণা বধূটিরও যেমন গুণের সীমা ছিল না, তেমনই ঘরে পরে এমন কেহ ছিল না যে, তাহাকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারে।

হাসিয়া গল্প করিতে, যত্ন করিয়া খাওয়াইতে, রোগের সেবা করিতে, তাহার জুড়ি ছিল না। লজ্জা সরমের হয়তো একটু কমতি ছিল, কিন্তু তাহার সরল নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কাছে 'বেহায়া' নামটা ঘেঁসিতে সাহস পাইত না।

কন্যার রাগে হাসিয়া ফেলিয়া সুশীলাবালা প্রশ্ন করিলেন—তোর তাই হিংসা হচ্ছে না? বোনের ব্যথা উঠেছে বুঝি? আহা তা যাবে বই কি, কথায় বলে···মা বোন। মা নেই, কাছের গোড়ায় বোন রয়েছে, যাবে না?

তবে আর কি, ধেই ধেই করে ছুটতে হবে যার তার সঙ্গে, তোমার আস্কারাতেই তো গোল্লায় গেল। বুকের পাটা কত!

খালি গ্লাসটা নামাইয়া একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে মাতা বলিলেন—অমন কথা বলিসনে তরু, বৌমা আমার লক্ষ্মী।

—কাজ নেই অমন লক্ষ্মীতে, লক্ষ্মীর গুণ জানলে আর—তরঙ্গিণী মুখখানা বাঁকাইল।

অতঃপর 'গুণ জানাজানি' হইয়া গেল, সারাদিন ধরিয়া অপরাধিনীর অনুপস্থিতির সুযোগে বাড়ীতে আলোচনার ঝড় বহিতে থাকিল। এবং বিজলী ভিন্ন প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বাস করিতে কষ্ট হইলেও করিতে দ্বিধাবোধ করিল না, বড়বৌয়ের স্বভাব চরিত্র সন্দেহজনক। দুর্ভাগ্যবশতঃ এমন অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গেল যাহার উপর আর কথা চলে না।

আঠার বৎসর যাবৎ মমতা যে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভালবাসা, সুনাম অর্জ্জন করিয়া আসিতেছে, মুহূর্ত্তের অবিবেচনায় তাহার ভরাডুবি করিয়া বসিল।

হিমাংশু বৌকে সাবধান করিতেছিল—'দিদি, দিদি', করে অত গলে পড়া চলবে না, বুঝলে? উনি যদি সাবধান না হন অগত্যা আমাকেই পথ দেখতে হবে।

বিজলী উত্তেজিত হইয়া বলিল, মাগো তোমরা বাড়ীশুদ্ধ সব পাগল হয়ে গেলে নাকি? এই কথা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হচ্ছে?

—প্রবৃত্তি হয় না ই বটে, তবে মেয়েমানুষকে বিশ্বাসও নেই।

বিজলীর মুখ রাঙা হইয়া উঠিল—তবে আমাকেও ঘাড় ধরে বিদেয় করে দাও না—বিশ্বাস কি, মেয়েমানুষ বৈতো নয়!

দরকার হলে তাও পারি, আমি দাদা নই!

অতিমাত্রায় পত্নীপ্রেমিক বলিয়া সুধাংশুর বরাবরই একটু অখ্যাতি ছিল।

বিজলী বিরক্তি গোপন করিতে পারিল না, কহিল—দাদার মতন হলে তরে যেতে। সে যাক, তোমার বোনটিও তো মেয়ে বই পুরুষ নয়, বিশ্বাস কি? যদি মিথ্যে করে বলে থাকে?

—লাভ তার?

—দিদির ওপর ওর চিরকাল হিংসে।

—কাপড়জামাগুলো হিংসে করে কুড়িয়ে এনেছে বোধ করি?

বিজলীর আর উত্তর জোগায় না।

রহস্যই বটে।

সবিতারও আক্কেল দেখ, আজিকার দিন ছাড়া আর দিন পাইল না। দিদি থাকিলে বিজলী কাঁদিয়া পায়ে ধরিয়া রহস্যের মূলসূত্র বাহির করিয়া ছাড়িত। কিন্তু তাহা হইবার নয়। যিনি জট পাকাইবার তিনি বসিয়া বসিয়া পাকাইতেছেন। কে ছাড়াইবে।

সুশীলাবালা কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন—আমি তখনি জানি ও মেয়ে একদিন কি সর্ব্বনাশ ঘটাবে। মেয়েমানুষ অত বাচাল! মাথার কাপড় ফেলে রাজ্যির লোকের

সঙ্গে পাটি পেড়ে গল্প, 'হ্যা হ্যা' করে হাঁসি, কে বা জানে আপন, কেবা জানে পর। যে আসছে তাকেই চা খাওয়ান, জল খাওয়ান, আদর উথলে পড়ে। মেয়েমানুষ অত লোকমজানে হওয়া কি আর সুলক্ষণ ?

মমতার ছেলেটার অনেক ভাগ্য তাই ম্যাট্রিক একজামিন দিয়া বড় পিসীর বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছে। হিমানীর সম্মুখে কেহ 'রাখিয়া ঢাকিয়া' বলিবার প্রয়োজন বিবেচনা করিল না।

যাহাকে লইয়া এই তুমুল আন্দোলন, সে বেচারী সারাদিন দুশ্চিন্তায় অনাহারে যমে-মানুষে টানাটানি করিবার পর শিশু ও প্রসূতিকে নার্সের হেফাজতে রাখিয়া গঙ্গাস্নানান্তে যখন বাড়ী ফিরিল রাত্রি তখন অনেকটাই হইয়াছে।

স্নানান্তে উহাদের বাড়ী হইতে আহার করিয়া তবে ফিরিবার কথা ছিল, ফিরিবার পথে মমতাই জোর করিয়া বাড়ীর দুয়ারে নামিয়া পড়িয়াছে। স্বামীর উপর সূক্ষ্ম একটু অভিমানের সহিত উৎকণ্ঠাও জাগিতেছিল। নিশ্চিত জানিত সুধাংশু আসিয়া খবরটা শুনিলে, সবিতার বাড়ী ছুটিবে। কি জানি, গত রাত্রের অনিয়মে শরীর ভাল আছে কিনা!

সবিতার সেই ছোট দেওর পৌঁছাইতে আসিয়াছিল, হাসিয়া কহিল—দেখছেন তো মমতাদি, বাড়ীতে আপনাকে কারুরই দরকার নেই। সকলেই খেয়েদেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোচ্ছে। বেশ হয়েছে, খেতে পাবেন না। সারাদিন জলস্পর্শ করলেন না—বৌদি ভারী দুঃখিত হবেন কিন্তু।

—রাগ দুঃখু করতে মানা কোরো ভাই, আমি একদিন গিয়ে চেয়ে খেয়ে আসবো, সবু ভাল হোক।

বাড়ীর চাকর আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিতেই নজর পড়িল বাহিরের ঘরে কে ক্যাম্প খাট পাতিয়া শুইয়া আছে। বিস্মিত হইয়া কহিল—শুয়ে কে রে সুবোধ ?

—আজ্ঞে বড়বাবু।

—বড়বাবু! সেকি নীচে কেন রে ?

কেন তাহা সুবোধও জানে না, বিছানা নামাইয়া আনার হুকুম তামিল করিয়াছে মাত্র। বুদ্ধি খাটাইয়া কহিল—আপনি আসবেন বলে বোধ হয়।

মর্ মুখপোড়া—মৃদু হাসিয়া ভিজা কাপড়খানা চাকরের হাতে দিয়া মমতা ঘরে ঢুকিল। অন্ধকারে আন্দাজি শায়িত ব্যক্তির পিঠে হাত রাখিয়া বলিল—আশা ছেড়ে দিয়ে বসে আছো বুঝি ? সেই জোগাড়ই হয়ে উঠেছিল আর কি—আসতে দেবে না কিছুতে। আমার তো আবার জানই, রাত্তিরে বুড়োটিকে ছেড়ে থাকতে পারিনে—লোকের ঠাট্টা তামাসায় কান না দিয়ে চলেই এলাম।

সুধাংশু পিঠটা সরাইয়া লইল মাত্র, কথা কহিল না।

মমতা ঈষৎ ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল—বুড়ো বয়সে অভিমান তো কম নয়! হয়েছে, ওঠ। একবার গেলে না ও-বাড়ী—কি কষ্টই পেলে 'সবিটা'—হলেন তো এক মেয়ের 'টিপি'—ভোগান্তির একশেষ।

এত কথার একটিও উত্তর না পাইয়া বিস্মিত মমতা বিছানার একপ্রান্তে বসিয়া স্বামীর হাতখানা কোলের উপর টানিয়া লইয়া সস্নেহস্বরে বলিল—কি হয়েছে গো, শরীর ভাল নেই?

—বিরক্ত কোরো না, বাড়ীর ভিতর যাও। হাত ছাড়াইয়া পিছন ফিরিয়া শুইল সুধাংশু।

মমতা আহত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। এত রাগের কারণ কি! আপনার লোকের বিপদে আপদে মানুষ যাইতে পাইবে না নাকি?

কিন্তু এ সব মান অভিমানের পালা লোকচক্ষে প্রকাশ করিয়া এ বয়সে খেলো হইবার মত স্বভাব তো স্বামীর নয়। ব্যাপার কি? আরো কোমল অনুনয়ের স্বরে কহিল—যাচ্ছি, কিন্তু তুমি সত্যই এখানে শোবে না কি? ওঠ ঘরে চল।

—ওঘরে ঢোকবার প্রবৃত্তি আমার নেই, তোমার সঙ্গে কথা কইবারও নয়, যাও সরে যাও।

অনাহারক্লিষ্ট শ্রান্ত শরীরে স্বামীর এরূপ অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর আচরণে মমতার চোখে জল আসিল, ধরা পড়িতে না দিয়া কহিল—অপরাধটা শুনতে পাই না?

—অপরাধের প্রমাণ ঘরে পুষে রেখে যে ন্যাকামির ভান করে, তার সঙ্গে তর্ক করবার রুচি আমার নেই। চালাকী শিখেছিলে বটে, তবে শেষরক্ষা হল না।

মমতার এতক্ষণে মনে হইল—তরঙ্গিণীর সকালবেলার জেরার সহিত ইহার সংযোগ থাকিতেও পারে। কিন্তু—ছিঃ-ছিঃ! মাতালের মত টলিতে টলিতে উঠিয়া অপরাধের প্রমাণ খুঁজিতে হঠাৎ চোখে পড়িল খাটের পাশে একখানা কাদামাখা অর্দ্ধমলিন খদ্দরের ধুতি ও তদনুরূপ একটি পাঞ্জাবী জড় হইয়া পড়িয়া আছে।···ব্যাধতাড়িত পশুর মত পুলিশের তাড়া খাইয়া যে ছেলেটা গতরাত্রে কয়েক ঘণ্টার জন্য এঘরে আশ্রয় লইয়াছিল, সে যে নিজেকে নিরাপদ করিতে এক ফাঁকে পরিচ্ছদগুলা বদলাইয়া লইয়াছিল সেই খবরটাই মমতার জানা ছিল না। হয়তো যখন বাহির করিয়া দিবার আগে কেহ জাগিয়া আছে কিনা দেখিতে গিয়াছিল—

স্তব্ধ অনড় মমতার কেমন করিয়া যে বসিয়া বসিয়া রাত্রি কাটিয়া গেল সে কেবল তিনিই জানিলেন, যিনি অলক্ষ্যে বসিয়া সকলের সুখ দুঃখের হিসাব লইতেছেন।

* * * *

রুদ্ধশ্বাস বিজলী শুনিতে শুনিতে চমকিয়া বলিল, বল কি দিদি, তোমার মামাতো ভাই! বোমার মামলার নেই নিখিলেশ! জেল ভেঙে পালিয়ে এসেছে?

—হঁ্যা।

বিজলী বড়জাকে দুইহাতে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিল—কেন তুমি চুপ করে থাকবে দিদি, কেন সবাইকে বলবে না বুঝিয়ে? শুধু শুধু নিজেকে শাস্তি দেবে?

মমতা শুষ্ক হাসি হাসিল—সে কাল হলে বলতাম মেজবৌ, আজ আর হয় না।

—কেন হয় না দিদি, ধর্ম্ম কি নেই? এই অবিচারটা স্বচ্ছন্দে চলে যাবে?

—তবে চল্ তোকে উকিল খাড়া করে, করযোড়ে ন্যায় বিচারের প্রার্থনা করিগে।

—এত দুঃখেও ঠাট্টা-তামাসা আসে দিদি? ধন্যি বটে, ভূতেই পেয়েছে তোমায়, বিনা প্রতিবাদে এই মিথ্যেটা মেনে নেওয়াই কি বুদ্ধির কাজ হ'ল?

—কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা সব সময় সহজ নয় মেজ বৌ! এতদিন যাকে পরম সত্য বলে জেনে এসেছি, দেখছি কি মিথ্যেই সেটা! আজ যদি মিথ্যেটাই সত্যি হয়ে দাঁড়ায় ক্ষতি কি?

—ক্ষতি তোমার মুণ্ডু—হিমুর মা তুমি বিনি দোষে এই অপমানটা সইবে?

—অপমান যা হয় তা আর ফেরে না বিজলী, কি বোঝাব ওদের? যদি বলে—"বিপদে পড়ে এখন একটা গল্প রচনা করে এলে", সে অপমান সইবে না।

বিজলী বোকা, বিজলী অবুঝ, চোখের জল তাহার সস্তা। বলে—তাই কি হয়?

কিন্তু হইবে না কেন, আঠার বছর ঘর করার পর মমতা সম্বন্ধে যাহাদের একথা বিশ্বাস করিতে বাধে নাই, ওটুকু তাদের কাছে খুব বেশী কি?

* * * *

যে হতভাগ্য ছেলেটা দুইদণ্ড আশ্রয় লইতে আসিয়া তাহার চিরদিনের আশ্রয় ভাঙিয়া দিয়া গেল, বিজলীর মত মমতা তাহার উপর রাগ করিতে পারে না।

যে ভঙ্গুর ঘরখানা নিয়তির একটি ফুৎকারে ধূলি গুঁড়ি হইয়া গিয়াছে, তাহার উপর মমতার আর মমতা নাই।

* * * *

যাইবার বেলায় সুধাংশু বলিয়াছিল—এরকম ভাবে চলে গেলে আমাদের মান সম্ভ্রম কোথায় থাকবে বুঝতে পারছো?

মমতা উত্তর করিয়াছিল—পারছি, কিন্তু ও জিনিসটা যে শুধু তোমাদের একলারই নেই, সেটাও ভুলতে পারছি না।

—মেয়ের বিয়ে দেওয়া দায় হবে তা জানো?

—হয়তো হবে—কিন্তু আমার নয়। এ সংসারের উপর আমার আর কোন দায় নেই।

মানুষের মন কঠিন হইলেও দুর্ব্বল বই কি! সুধাংশুর চোখে জল আসিতে চায় কেন?

—কোথায় যাবে ঠিক করেছ মমতা?

মমতা তাকায় নাই, মুখ ফিরাইয়া বলিয়াছিল—ঠিক কিছুই করিনি। এত বড় পৃথিবীটায় একটা মেয়ে মানুষের ঠাঁই হয় কিনা সেটাই একবার দেখবো ঠিক করেছি।

অমর (?)

আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—

'টাই' খুলিব বলিয়া ড্রেসিং টেব্‌লের সম্মুখে দাঁড়াইতেই টেবলের উপর চোখ পড়িয়া গেল।

সহসা আশ্চর্য্য হইয়া যাওয়ার অনেক ভাল ভাল তুলনা এ যাবৎ পড়িয়া এবং শুনিয়া আসিতেছি, সুবিধা মত একটি বাছিয়া লাগাইতে পারিলে হয়তো—আমার মনের ভাব অনুমান করিতে পারা আপনাদের পক্ষে সহজ হইত, কিন্তু ভাল ভাল বিশেষণ খুঁজিয়া মনের ভাব বুঝাইবার মত মনের অবস্থা এখন নয়।

সূর্য্য নির্দিষ্ট স্থানে উদয় হইয়া যথাস্থানে অস্ত গিয়াছে—পৃথিবী একই গতিতে চলিতেছে। নিত্যকার বাঁধা নিয়মের এতটুকুও ব্যতিক্রম কোনোখানে ঘটিতে দেখি নাই।

চোখ বুজিয়া বলিতে পারি, দুই মিনিট পরে ভৃত্য চায়ের পেয়ালা লইয়া ঘরে ঢুকিবে, রাত্রিকার আহারের বিষয় প্রশ্ন করিবে—এইমাত্র যে চানাচুরওয়ালাটা বিচিত্র সুরে গান গাহিতে গাহিতে গলির মোড়ে অদৃশ্য হইযা গেল, ঘণ্টাখানেক পরে আবার সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিবে, একই ভঙ্গীতে গান গাহিয়া।

সকালে মুখধোওয়া হইতে সুরু করিয়া সন্ধ্যায় পোষাক বদল করিতে আমার এক সেকেণ্ড আগে পর্য্যন্ত কল্পনাও করিতে পারি নাই, আমার জন্য এতখানি বিস্ময় অপেক্ষা করিতেছে সাদাসিধা একখানি চৌকা খামের মূর্ত্তি ধরিয়া।

আটাশ বৎসর পরে - হাতের লেখার পরিবর্ত্তন হয়না মানুষের।

অবিকল থাকিয়া যায়—প্রতিটি টান, রেখা, প্রত্যেকটি অক্ষরের গঠন ভঙ্গী।

কিন্তু আমিই বা চিনিয়া ফেলিলাম কেমন করিয়া? মাত্র এক মুহূর্ত্তের দৃষ্টিপাতে?

দৃষ্টির অনেক তারতম্য ঘটিয়াছে—চশমার পাওয়ার বদ্‌লাইতে হইয়াছে একাধিক বার। অতি পরিচিত ব্যক্তির নামও চট্ করিয়া মনে আনিতে পারিনা, অনেকবার দেখা মুখ হঠাৎ এক সময় নূতন ঠেকে, বার্দ্ধক্যের এই সব বিশেষ লক্ষণ অনেকদিনই দেখা দিয়াছে—অথচ, একমুহূর্ত্তে আটাশ বৎসরের বিস্মৃত স্মৃতির যবনিকা ঠেলিয়া কে যেন বলিয়া উঠিল—এ চিঠি মাধবীর।

হাঁ চিঠি লিখিয়াছে মাধবী।

খাম না খুলিয়াও বলিতে পারি—নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—মাধবীই লিখিয়াছে।

অধীর আগ্রহে খাম খুলিতে উদ্যত হইয়া, সরাইয়া রাখিলাম।

পোষাক বদল করিয়া অভ্যস্ত আরামে চেয়ারে বসিয়াছি। জানালাগুলা সব খোলা থাকা সত্ত্বেও পাখার রেগুলেটারটাকে শেষ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া দিতে ত্রুটি করি নাই।

ভৃত্য আসিয়া টেবিলে রাখিয়া গিয়াছে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা।

এইবার ধাতস্থ হইয়াছি বলা যায়।

হাঁ, ভাল কথা, এতক্ষণে একটা চমৎকার তুলনা মনে আসিয়াছে—কোথায় যেন পড়িয়াছিলাম—"মৃত ব্যক্তিকে কবর হইতে উঠিয়া আসিতে দেখিলে যেরূপ বিস্ময় বোধ হয়" ইত্যাদি - সেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল।

ভাবিয়াছিলাম—ব্যর্থ জীবনের দুঃসহ বোঝা নামাইয়া মাধবী মরিয়া বাঁচিয়াছে। ভাবিয়াছিলাম—কিন্তু থাক্, কি ভাবিয়াছিলাম, এখন আর নাই বলিলাম।

প্রমাণিত হইয়া গেল, এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া সে পৃথিবীর আলো বাতাসের উপসত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে।

শুধু তাই নয়, কিছুক্ষণ পরেই সশরীরে আসিয়া দেখা দিবে এই ঘরে—আমার সম্মুখে।

যদি খামের গায়ে অযথা একটা ছাপ বেশী না পড়িত নিজেকে প্রস্তুত করিয়া লইবার সময় পাইতাম, সময় পাইতাম, বসিয়া বসিয়া তাহার দেখা করিতে আসার অজস্র কাল্পনিক কারণ সৃষ্টি করিতে।

কিন্তু তাহা হয় নাই—সে এইমাত্র আসিয়া পড়িতে পারে—আধঘণ্টা—পনের মিনিট—হয়তো আরো কম।

"অখিল চ্যাটার্জি লেনের" সেই ষোল নম্বর বাড়ী হইতে মাধবী জানাইয়াছে—আমার সঙ্গে একবার দেখা করিতে চায়। যে বাড়ী ছাড়িয়া তাহারা চলিয়া গিয়াছিল দুই যুগেরও বেশী!

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে—উঠিয়া আলো জ্বালানো হয় নাই। সম্মুখে অবস্থিত আয়নার ভিতর আর নজর চলে না। চোখে পড়েনা মসৃণ টাকের নীচে বলী রেখাঙ্কিত কুঞ্চিত ললাট। ধরা পড়ে না সংখ্যার অনুপাতে পক্ক কেশের আধিক্য। সুইচে হাত লাগাইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অনায়াসে মনে করা যায়—আটাশ বৎসর পূর্ব্বে সতের নম্বর বাড়ীতে যে যুবক বাস করিত, আমিই সেই।

* * * *

অভিভাবকদের দৃষ্টি এড়াইয়া যে মেয়ে আমার দুয়ার গোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—সন্ধ্যার অন্ধকারেও তাহাকে চিনিতে ভুল হয়না।

অস্বীকার করিব না, বুকের রক্ত দ্রুততালে বহিতে থাকে, হাতের এত কাছে তাহাকে পাইয়া হাতে স্বর্গ পাই—তবু সাদর অভ্যর্থনার পরিবর্তে অন্যায় দুঃসাহসের জন্য তিরস্কারই করিতে হয়।

অভিমান করিবার সময় কই তাহার? উল্টা তিরস্কারই করে আমায়, বলে—পুরুষের নিশ্চেষ্টতাই মেয়েদের করিয়া তোলে দুঃসাহসী প্রগল্‌ভ।

ধিক্কার দেয় আমার অলস যৌবনকে।

পৌরুষের মর্য্যাদায় আঘাত লাগে—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া যাহাতে পিছাইয়া পড়িতেছিলাম, তাহার জন্য প্রস্তুত করিয়া লই আপনাকে, সেই মুহূর্ত্তে।

আর বিলম্ব করিবার সময়ও ছিলনা, পরদিনই তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবার কথা। ঠিক হইয়া গেল সেই রাত্রেই বারোটার সময় তাহাকে লইয়া এক বন্ধুর বাড়ী গিয়া উঠিব। বিবাহের আয়োজন পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকিবে, রাত্রির মধ্যেই বদল হইয়া যাইবে তাহার জাতি গোত্র দুইই।

পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কলিকাতায়—এরোপ্লেন ছিল না, রেডিও ছিল না, টকি ছিল না, অনেক কিছু ছিল না সত্য, তথাপি তখনও—"কড়ি ফেলিলে অর্দ্ধেক রাতে বাঘের দুধ মেলা" অসম্ভব ছিল না।

রাতারাতির মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের পুরোহিত জোগাড় করা—এমন কি বেশী?

চুলে তখনও পাক ধরে নাই, তাই ইহার ভিতর অনেক কাব্য, অনেক রোমান্স, অনেক নূতনত্ব দেখিয়াছিলাম—সমাজ সংস্কারের স্বপ্নও বাদ যায় নাই। কিন্তু সে কথা থাক। আশেপাশে কড়া পাহারা, মাধবীকে এঘরে এভাবে দেখিলে হয়তো ব্যাপার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইবে, তাই তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলাম—"কিন্তু আর নয়—পালাও।"

সে প্রায় অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করিল—"অত ভয় কেন তোমার?"

হাসিয়া ফেলিলাম।

তাহারই হিম শীতল কম্পিত অঙ্গুলি কয়টি তাহার ললাটে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম 'আর তোমার?'

এত সামান্য কথায় অত ভাঙিয়া পড়িবার কি ছিল? কেন সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল?

এই অগাধ অশ্রুর উৎস লুকাইয়াছিল কোথায়, সেই সদা হাস্যময়ী কিশোরীর ভিতর?

বিদায় লইবার সময় 'রাত্রি বারোটার' কথা তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলাম বার বার করিয়া।

* * * * *

কিন্তু বারোটা কি সে রাত্রে বাজিয়াছিল? মধ্যরাত্রির ঘন অন্ধকার কখন যে শেষরাত্রে গড়াইয়া পড়িয়া প্রভাতের আলোয় চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল, কে তাহার হিসাব রাখিয়াছে? সে রাত্রে—বিছানা ছাড়িয়া উঠি নাই, পরদিনও না—তাহার পরদিন—তাহারও পরদিন —

বত্রিশ দিন পরে যে দিন প্রথম উঠিয়া বসিয়া পথ্য করিলাম, খোলা জানালা দিয়া নজরে

পড়িল ষোলো নম্বরের বাড়ীতে আগাগোড়া মিস্ত্রী লাগিয়াছে।

বাড়ীর নূতন অধিকারী হয়তো মনের মত ছাঁচে নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে চায়।

কিন্তু তাহারা গেল কোথায়? কোথায় হারাইয়া গেল - ভীরু অভিমানিনী ভুল বোঝার বেদনা বহিয়া? কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা বৃথা জানিতাম, কারণ দীর্ঘকালের সখ্যতা সূত্রে আবদ্ধ দুটি পরিবারের মধ্যে ইদানীং বাক্যালাপ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

কেবলমাত্র অত্যন্ত সাধারণ একটি নামের ভরসায় বিশেষ পরিচয় বিহীন অতি সাধারণ একটি ব্যক্তিকে ছত্রিশ কোটী লোকের ভিতর হইতে বাছিয়া বাহির করার চেষ্টা সুস্থ মস্তিষ্কের লক্ষণ নয়—

কিন্তু মানুষের অনেক খেয়ালই পাগলামীর নামান্তর নয় কি?

অবশেষে স্থির করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলাম, সে মরিয়া বাঁচিয়াছে।

তাহার মত সেণ্টিমেণ্টাল মেয়েগুলাই সুইসাইড্ করিবার জন্য জন্মায়। · ··

হঠাৎ ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিতেই যেন ধাক্কা খাইয়া জাগিয়া উঠিলাম।

ভৃত্য আসিয়া সবিনয় নিবেদন করিল—একটি বিধবা স্ত্রীলোক বহুক্ষণ হইতে অপেক্ষা করিতেছে—আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হইবে বলিয়াই সে ডাকিতে আসে নাই।

বিধবা স্ত্রীলোক! আঃ আবার এখন কে আসিল জ্বালাইতে? নিশ্চয়ই কোন সাহায্য-প্রার্থিনী। শুনিতে থাকো বসিয়া বসিয়া তাহার নানাছন্দে ভনিতা করা করুণ দুঃখের কাহিনী। প্রতিকার করো তাহার।

'না' বলিবার উপায় নাই ঈশ্বর ইচ্ছায় যেই তুমি দুই পয়সার মুখ দেখিতে পাইলে ধরা পড়িলে চুরির দায়ে।

সঙ্গে সঙ্গে তোমার কষ্টার্জ্জিত অর্থে ভাগ বসাইতে আসিল অভাবগ্রস্থ আত্মীয়ের দল, আসিল অনাত্মীয় দুঃস্থ বিধবা, আসিল বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, দেশ ও দশ।

উপেক্ষা করিলে নিন্দায কান পাতা দায় হইয়া উঠিবে। ডাকিয়া আনা ভিন্ন উপায় কি।

স্ত্রীলোকটি ঘরে ঢুকিয়াই প্রথম কথা কহিল—"উঃ কি হাওয়া—", তাহার পর গায়ের আলোয়ানখানা টানিয়া তাকাইল উপর দিকে।

কী সাংঘাতিক! পাখাখানা এতক্ষণ পর্য্যন্ত ফুলস্পীডে ঘুরিয়া চলিতেছে? বন্ধ করিবার খেয়াল হয় নাই?

প্রথম ফাল্গুনের চাপা হিমটুকু তো উপেক্ষার বস্তু নয়, বাতের ব্যথাটা আবার চাগিয়া উঠিতে কতক্ষণ?

উঠিয়া পাখার সঙ্গে দক্ষিণের বড় জানালাটাও বন্ধ করিয়া দিলাম।

মাধবী! হাঁ, মাধবীই বটে। এই বিশাল পৃথিবীতে যে একদিন হারাইয়া গিয়াছিল!

যদি শুনিতে চাও, বলিতে পারি—যাহার জন্য কত ব্যর্থ রাত্রি তীব্র হাহাকারে বিনিদ্র কাটিয়াছে, কত দীর্ঘ দিন অশ্রুসিক্ত বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়াছে, এতদিন পরে সেই প্রিয়ার দেখা পাইয়া হাতে স্বর্গ পাইলাম!...

বলিতে পারি—অতীত স্মৃতির স্বপ্নময় দিনের মধ্যে হারাইয়া ফেলিলাম রুক্ষ কঠোর বর্ত্তমানকে।

দুইজনেই ভুলিয়া গেলাম—আটাশ বৎসরের ব্যবধান।...রুদ্ধশ্বাসে শুনিতে লাগিলাম—কেমন করিয়া ব্যর্থ প্রতিক্ষায় সে-রাত্রি ভোর হইয়াছিল মাধবীর, ক্ষুব্ধ অভিমানে কতবার সে সঙ্কল্প করিয়াছিল মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিবার।

বলিতে পারিতাম—কাঁদিয়া বলিয়াছিল সে, "একবার যদি জানিতে পারিতাম এ নির্ম্মমতা তোমার নয়—বিধাতার, ইতিহাস হইত অন্যরূপ।"

বলিতাম—টেবিলে মাথা রাখিয়া অনেক কান্নাই কাঁদিল মাধবী।

বলিতে পারিতাম—ষোলো নম্বর বাড়ী, তাহার কাছে স্বর্গের চাইতে বড়, তাই অনেক চেষ্টায় অনেক সাধনায় আবার আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে—অন্তরের মণিকোঠায় বিগত দিনকে ফিরিয়া পাইবার আশায়।

ভাল ভাল কথা সাজাইয়া করিতে পারিতাম অনেক কবিত্ব। সুখী আর সন্তুষ্ট হইতে তোমরা।

কিন্তু সত্য কথা শুনিতে চাহিলে শুনিতে হয় সেই ষোলো নম্বর বাড়ীর বর্ত্তমান মালিক মাধবীর স্বামীর ভাগিনেয়, বিধবা মাতুলানীকে আশ্রয় দিয়াছে নিতান্তই করুণার বশে।

শুনিতে হয় মাধবী আসিয়াছিল তাহার ছেলের একটি ভাল চাকরী করিয়া দিবার জন্য সুপারিশ ধরিতে।

বলিল—"আপনি তো কর্পোরেশানের একজন কেষ্ট বিষ্টু লোক, ইচ্ছে করলেই হয়।"

(ভালই করিয়াছে 'আপনি' বলিয়া, 'তুমি' বলিয়া আত্মীয়তা করিতে আসিলে বিরক্তই হইতাম)

"ইচ্ছা করিলেই" যে হইতে পারিত, সে কথা মিথ্যা নহে, কিন্তু সে ইচ্ছা আমি করিব কেন? লাভ কি আমার?

পাড়ার যোগীন উকিল যে তাহার ছেলের জন্য নিত্য দুই বেলা আনাগোণা করিতেছে—তাহার 'আনা' এবং 'গোণার' মধ্যে সারবস্তু আছে যথেষ্ট; নিঃসহায় বিধবা স্ত্রীলোকের অনুরোধ উপরোধের মত অসার পদার্থ নয়।

বুঝাইয়া দিলাম—ভাল চাকুরী নীচু ডালের ফল নহে যে, হাত বাড়াইলেই পাড়িয়া আনা চলিবে।

বুঝাইয়া দিলাম—পরের চিন্তায় মাথা ঘামাইয়া সময় নষ্ট করিবার মত সময় আমার কম।

ভারী ক্ষুব্ধ হইয়া ফিরিয়া গেল মাধবী, হয়তো অপমানিতও হইয়া থাকিবে, যদি মেয়েদের ভিতর অপমান বোধ বলিয়া কিছু থাকে! থাকিতে পারে—কিন্তু আমার কি তাহাতে? অনুতাপ করিবারই বা আছে কি?

কত লোকই তো অমন ফিরিয়া যায়।

যে ভিখারিণী, মণি অন্বেষণের আশায় শ্মশানের চিতাভস্ম ঘাঁটিতে আসিয়াছে, তাহার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? কি আসিয়া যায়—তাহার সম্মান অসম্মানে?

—

সামান্য ক্ষতি

ওরা চলে যেতেই অমল বাইরের ঘর থেকে চলে এসে সুজাতার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। সোজাসুজি তাকিয়ে বলে উঠলো, 'আচ্ছা মা, আমার বন্ধুরা এলেই তুমি অমন উঁকিঝুঁকি মারো কেন বল তো?'

সুজাতা ছেলের চটির ফটফট শব্দ শুনতে পেয়েই খুব উৎফুল্ল হয়ে এগিয়ে আসছিলো। মাঝখানে এই। এ সংঘর্ষের জন্যে অবশ্যই প্রস্তুত ছিলো না সুজাতা, তাই থতমত খেয়ে শুধু ছেলের ওই রাগ রাগ অপমান অপমান মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকে, কথা যোগায় না মুখে।

অমলই আবার বলে, 'শুধু আজ বলে নয়। অনেকবার লক্ষ্য করেছি। তুমি এ জানলা থেকে ও জানলা থেকে, যখন চলে যায় তখন বারান্দার কোণ থেকে কেবলই দেখো। কেন বল তো? আমি যতো সব বাজে ছেলের সঙ্গে মিশি এই তোমার ধারণা না কি?'

সুজাতা এতোক্ষণে আস্তে বলে, 'ওকথা বলছিস কেন অমু?'

'তুমিই বলাচ্ছো।'

অমল দালানের এদিক থেকে ওদিক হাঁটা চলা করতে করতে বলে ওঠে, 'এখন আমার মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলা থেকেই তুমি এই করেছো। কেবলই তুমি আমার ক্লাসের বন্ধুদের দেখতে চাইতে। বাড়িতে ডেকে আনতে বলতে, খাওয়ানো-টাওয়ানোর ব্যাপার করে কেবল গল্প করতে। তাদের ঠিকুজি কুলুজি, কোথায় কে আছে তার সন্ধান নিতে বসতে, তখন অতো মানে বুঝতাম না। এখন বুঝতে পারছি। তবে বলে রাখি মা, এভাবে পাহারা দিয়ে বেড়িয়ে ছেলে তৈরি করা যায় না।'

সুজাতা আহত মুখে বলে, 'আমি তোর ওপর পাহারা দিয়ে বেড়াই?'

'তাছাড়া আর কী?'

অমল উদ্ধত গলায় আবার বলে, 'না হলে আমার বন্ধুদের সম্পর্কে তোমার এতো কৌতূহল থাকবার তো অন্য কোনো কারণ নেই।'

সুজাতা তার এই কলেজে ওঠা, বড়ো হয়ে যাওয়া ছেলের রাগ রাগ মুখের দিকে তাকায়, একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আচ্ছা তোর বন্ধুরা এলে আমি আর দেখবো না।'

অমলের এখন মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু মন কেমন করে, অমল তাই একটু নরম হয়ে গিয়ে হেসে ফেলে বলে, 'তার মানে প্রমাণ হলো দেখতে।'

সুজাতারও এতে হেসে ফেলবার কথা। কিন্তু সুজাতা হাসে না। সুজাতা গভীর একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'প্রমাণ হলে কী আর করা যাবে?'

'এটা তো রাগের কথা হলো।'

'রাগ!'

সুজাতা ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখে। যে বয়সে কুশ্রী মেয়েরাও লাবণ্যময়ী হয়ে ওঠে, সেই বয়সটায় সুশ্রী ছেলেরাও যেন লাবণ্য হারায়। অমলের সেই লাবণ্যময় চেহারাটা কোথায় গেল? যা দেখে পথের লোকও ফিরে তাকিয়ে বলে যেত 'বাঃ খাসা ছেলেটি তো?'

অমলকে এখন ঈষৎ রূঢ় দেখাচ্ছে, অমলের ঠোঁটের উপরকার নীলাভ আভার রেখাটার ঘন কালো হয়ে আসাটা কারো চোখে পড়তে বাকি থাকছে না আর, বাকি থাকছে না গালের উপরকার অমসৃণতাটুকু!

অমল যেন বড় হয়ে যাচ্ছে।

সুজাতার বুক থেকে যেন একটা হাহাকার উঠলো। অমলকে এবার থেকে সমীহ করতে হবে। ভেবে চিন্তে কথা বলতে হবে অমলের সঙ্গে।

সুজাতা শান্ত গলায় বললো, 'তোর ওপর আমি কোনোদিন রাগ করেছি?'

অমল যদি ছোটো থাকতো, ঠিক এক্ষুণি ছুটে এসে মায়ের গলা ধরে ঝুলে পড়তো। মাকে হাসাবার জন্যে চেষ্টা করতো। কারণ মায়ের এই শান্তশীতল কণ্ঠস্বরটিকে অমলের বরাবরই বড়ো ভয়।

কিন্তু অমল তো আর এখন ছোটো নেই। তার মার গলা ধরে ঝুলে পড়লো না, তবে ঝুলে পড়া গলায় বললো, 'রাগ করবার স্কোপ পেলে তো? কেমন গুণনিধি ছেলেটি! কিন্তু মা সত্যিই বলে রাখছি তোমায়। ওই পাহারা দেওয়ার চেষ্টার ফল ভালো হয় না। শুধু তো আমি বলিনি। অজিতকে তো জানো? সে পর্যন্ত বললো আজ—এই তোদের বাড়িতে তো বলিস তোর মা ছাড়া আর কেউ নেই, তবে আমরা কথা কইলেই কে ওই জানলার খড়খড়ি ফাঁক করে দেখে বল তো? শুনে কেমন লাগে বল তো? কথার উত্তর দেওয়া গেল? বললাম শুধু, কই?'

সুজাতা, তখন অগ্রাহ্য ভরে বলে, 'বললি না কেন বাড়ির ঝি-টি হবে বোধ হয়।'

'চমৎকার, এমন নইলে পরামর্শ। যাক তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মা, ওরা সকলেই খুব ভালো ছেলে। তোমার ছেলেকে বকাবে না।'

এবার সুজাতা ঈষৎ বিরক্ত গলায় বলে, 'আমি কী বলেছি তোর বন্ধুরা খুব মন্দ ছেলে। বখা ছেলে।'

'মুখে বল নি! সেই ধারণার বশবর্তী হয়েই তো ছেলেটিকে আগলে বেড়াও।'

সুজাতা এক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে বলে, 'বলেছি তো আর দেখবো না আর বলা কেন?'

অমল একটু অবাক হয় বৈ কি। সুজাতার স্বভাবের এটা বিপরীত।

সুজাতা তর্ক করতে ভালবাসে এবং বলা বাহুল্য তবে জিততেও ভালবাসে। অমলের বাবা থাকতে অমল মা-বাবার এই তর্ক আর হারজিতের খেলা নিয়ে মাঝে মাঝে বেশ কৌতুক অনুভব করতো।

বাবা মারা যাবার পর মায়ের প্রকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন এসে গিয়েছিল এটা সত্যি, এবং কিছুটা স্তিমিতও হয়ে গিয়েছে মা, তবু ওই তার্কিক স্বভাবটির অবসান ঘটেনি। সেটি বেশী করে ধরা পড়ে, নিশিকাকা কি বাবলুমামা, ছোট মেসো কি অসিত-দা, এরা বেড়াতে এলে। এঁরা সকলেই প্রায় মার সমবয়সী, বাবার আমলে এঁদের নিয়ে প্রায় রোজই চায়ের আসর বসতো, তার সঙ্গে তর্কেরও।

সেই তর্ক প্রসঙ্গের যথেচ্ছ শাখায় বিচরণ করতো—সাহিত্য, রাজনীতি, শিল্প, সমাজ, সিনেমা, থিয়েটার, খেলাধূলো, দেশবিদেশের অগ্রগতি, নারীর অধিকার, ইত্যাদি প্রভৃতি সব। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাবাই হতেন প্রতিপক্ষ। কারণ ছুনিয়ার সব কিছুতেই বাবার প্রভূত অবজ্ঞা, আর মার সব কিছুতেই সশ্রদ্ধ নিষ্ঠা। আর বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে উঠে পড়ে লেগে মা তার সেই শ্রদ্ধাকে প্রতিষ্ঠিত করতে ভালবাসতো।

ওই কাকা-মামা-দাদারা, চট করে ছু'দল হয়ে যেতেন, কেউ মার সমর্থক, কেউ বাবার সমর্থক। অতএব তর্ককাল বেশ স্থায়ী হতো, চায়ের কেটলী একাধিকবার উনানে চাপতো।

অমল তখন ছোটো, তবু অমলেব মনে হতো মা'র এটা ছেলেমানুষী। ভক্তি আছে থাক না ; নিজের মধ্যে রেখে দাও না, অন্যকে তোমার সেই শ্রদ্ধেয় দেবতার পদপ্রান্তে মাথা নুইয়ে ছাড়াতে হবে তার কী মানে আছে।

বরং বাবার ওই ছুনিয়ার সব কিছুকে নস্যাৎ করার মধ্যে অমল বেশ একটি বলিষ্ঠ পৌরুষ দেখতে পেতো। এখন অবশ্য সেসব কথা ভাবলেও হাসি পায়।

বাবা বলতেন, 'কবিতা জিনিসটা পৃথিবীতে সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় জিনিস !'

বলতেন, 'স্নেহ ভালবাসা জিনিসটা স্রেফ সেন্টিমেণ্ট। মাতৃস্নেহ, পাতিব্রত্য, ও সব হচ্ছে নিছক সংস্কার মাত্র', ইত্যাদি—আর মা যেতো আগুন হয়ে।

কোনো কোনো সময় লেগে যেতো রাজনীতি সমাজনীতি নিয়ে 'ভালোমন্দের' দ্বন্দ্ব। মোটের মাথায় বাবার ওই সব কিছুকে অবজ্ঞা করাটা মা বরদাস্ত করতে পারতেন না।

অন্যেরা এই-গৃহযুদ্ধ উপভোগ করতো।

অমলের মনে আছে, একদিন বাবা হঠাৎ বলে বসলেন, 'কতকগুলো ছেলে-পুলেই হচ্ছে মানুষের পায়ের বেড়ি, উন্নতির বাধা, সুখের অন্তরায়। একটাই যথেষ্ট। যথেষ্টরও বেশী। একেবারে না হলেও ক্ষতি নেই।'

নিশিকাকা আর ছোটমেসো সঙ্গে সঙ্গে বাবার পক্ষে ভোট দিলেন, বললেন—যা বলেছো। বাকি জনেরা ঠিক অতোটায় পৌঁছতে পারলেন না, বললেন, 'একেবারে না থাকাটা খুব কষ্টকর, নেহাৎ একটা ? সেটাও খুব-সুবিধের নয়। কারণ ছেলেটেলে হচ্ছে সম্পত্তি স্বরূপ। ধনবলের থেকেও জনবলের প্রয়োজনীয়তা বেশী, আর সন্তান যতোখানি জনবল, এমন আর কে ?' ইত্যাদি।

বাবা আবার সে যুক্তি খণ্ডন করতে নজীর দেখাতে বসলেন, পাঁচ সাতটা ছেলে থাকতেও কে স্রেফ্ অভাজন, চার পাঁচটি ছেলেই কার মরে গেছে, ইত্যাদি। তবু মোটের মাথায় পুরো আলোচনাটাই হালকা চালে চলছিল, হঠাৎ কি যে হলো, সুজাতা ক্ষেপে উঠলো।

সে একটা অস্বাভাবিক ক্ষ্যাপামি! যেন বাবা মানুষ খুন করতে বসেছেন। আর যারা বাবার সমর্থক, তারা খুনের সহকারী।

সেদিন মায়ের তর্কের ক্ষমতা হারিয়ে গিয়েছিল। মা উত্তেজনায় অন্যরকম হয়ে গিয়েছিলো। এরপর নিশিকাকারা বাবাকে চোখ টিপলেন।

কিন্তু বাবা তো আর শুধু মাকে ক্ষ্যাপাবার জন্যেই ওই রকম বেপরোয়া মন্তব্য করতেন না। বাবা যথার্থই ওই ধরনের আত্মকেন্দ্রিক এবং নির্মম ধরনের ছিলেন। তবু বাবাই ছিলেন অমলের কাছে হীরো। বাবার ওই যে আত্মপ্রেম, ওই যে সব সময় নিজেকে সাজিয়ে গুছিয়ে ফিটফাট রাখা, নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতনতা, নিজেকে ঘিরেই সব কিছু চিন্তা, এগুলো শিশুমনে একটা মোহ বিস্তার করতো।

শৈশব, বাল্য পার হয়ে সবে কৈশোরে পদার্পণ করবে, দুম করে বাবা মারা গেলেন। অমল তখনো স্কুলবয়। তারপর থেকে শুধু অমল আর মা, মা আর অমল। মা বন্ধু, মা একসঙ্গে মা-বাবা।

তবু ওই তর্কাতর্কিটি আছে। আপন মতবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্যে উভয় পক্ষে লড়ালড়ি আছে, এবং জিতে যাবার পর ত্যাগ স্বীকারও আছে।

যেমন পূজোর সময় বেড়াতে যাওয়া নিয়ে মা যদি বললো, 'এদিক সেদিক তো সবই প্রায় দেখা হলো, চলনা এবার আসামের দিকে যাই।'

অমল বললো, 'পাগল হয়েছো, আসাম তো বাঙাল খেদা।'

'সেসব সেরে গেছে।'

'কে বললো তোমায়? ওই আনন্দেই থাকো। ও সব বস্তু সারে না। দিল্লী-আগ্রায় দশবার যাওয়া যায়।'

শেষ অবধি লড়ে অমল যখন পরাস্ত মানলো, তখন সুজাতা দিল্লী যাওয়ারই ব্যবস্থা করলো।

আবার অমল যদি কথা তুললো, 'সেবার কাশ্মীরে গিয়ে তো প্রায় কিছুই দেখা হলো না, আর একবার যাওয়া হোক।'

সুজাতা বললো, 'বারবার কাশ্মীর? রক্ষে কর বাবা, আমার অতো পয়সা নেই, কাছে পিঠে কোথাও যাওয়া হোক এবার।'

অমল বললো, 'এবারটা তাহলে বাদই দেওয়া হোক না, টাকা জমিয়ে আসছে বছর যাওয়া হবে।'

সুজাতা রেগে বললো, 'কেন? অতো রাগ কিসের? পুরী, কাশী এসব জায়গায় যায় না মানুষ?'

'হয়ে গেছে সেই যাওয়াটা।'

'তীর্থস্থানে বারবার যাওয়া যায়।'

'ঠিক আছে তাই যাওয়া হবে।'

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে কাশ্মীরের ব্যবস্থাই শুরু হয়ে গেল।

বছরে বছরে বেড়াতে যাওয়াটা যেন সুজাতার একেবারে অলঙ্ঘনীয় ব্রতের মতো। সুজাতার বড়দির বাড়িতে যেমন—ভাদ্র যেতে না যেতেই, ঠাকুর দালানে মিস্ত্রী লাগে, প্রতিমার কাঠামো বাঁধা শুরু হয়, নাড়ুর চাল গুঁড়োনো হয়, সুজাতার বাড়িতে তেমনি আশ্বিন পড়লেই বেডিং নামে, হোল্ডঅল্ নামে, সুটকেস বাক্স নামে, আর টাইমটেবল ওল্টানো শুরু হয়। দিদি বলে, 'আশ্চর্য বাবা, একবারও পূজোর সময় থাকিস না।'

সুজাতা হাসে। বলে, 'মন টানে বড়দি।'

এই মন টানাটা আজকের নয়। বরাবরের। আর নেশা ধরানোর গুরু অরুণেশ। অরুণেশের দুর্দান্ত নেশা ছিল ওই ভ্রমণে। বার দুই তিন তিনি বাইরে ঘুরে এসেছিলেন। ইয়োরোপ, আমেরিকায়।

আর সুজাতাকেও একবার জাপান ঘুরিয়ে এনেছিলেন। বছরটা খোদাই-করা আছে সুজাতার মনে। অমল সেবার জন্মালো। দু'মাসের ছেলেকে মায়ের কাছে রেখে সুজাতা বরের সঙ্গে জাপান-যাত্রা করেছিলো। সুজাতার আত্মীয় স্বজন আড়ালে কম ছি ছি করেনি, মা-ও বিরক্ত হয়েছিলেন, বলেছিলেন 'ভয় পাচ্ছি, যদি অসুখ-টসুখ করে।'

অরুণেশ হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেকথা, 'অসুখ আমরা থাকলে করবে না!'

আর আড়ালে সুজাতাকে বলেছিলেন, 'দেখছো কতো অসুবিধে? অন্যের কাছে সুযোগ নেওয়া', অন্যের কাছে ঋণী থাকা আত্মীয় বন্ধু সকলের কাছেই যেন কতো অপরাধী! তখন আমার কথাটি শুনলে, এত সবের কিছুই হতো না।'

সুজাতা বলেছিলো, 'আমি তো কতবার বলছি, আমি থাকি—'

অরুণেশ রেগে উঠেছিলেন, 'এ যাওয়াটা অফিসের কাজের সংক্রান্তে, খরচা দেবে কোম্পানী, এ হেন সুযোগ ছাড়ার কথা পাগল ছাড়া কেউ ভাবতে পারে না।'

সুজাতার মনের গড়ন আলাদা, সুজাতা প্রায় কাঁদতে কাঁদতেই রওনা দিয়েছিলো, আর যে তিন মাসকাল বেড়িয়েছিলো, নিশ্বাস ফেলে ফেলে।

অরুণেশ অবশ্য সে দিকে দৃষ্টিপাতও করেন নি, অরুণেশ এই ভেবে উৎফুল্ল ছিলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে যে সুখ-ঐশ্বর্য ভোগ করাচ্ছেন, তাঁর তিন কুলে কেউ এমন করে নি। বড় ভায়রা-ভাইয়ের অবস্থা খুবই ভালো, কিন্তু লোকটা বারোমাসে তের পার্বণ আর দোল দুর্গোৎসব করেই টাকাকড়ি অপচয় করে চলেছে।

অরুণেশের নিজের ভাই নিখিলেশ সেও কিছু কম নয়, কিন্তু তার উল্লাস শুধু বাড়ি গাড়ি আর টাকা জমানোর। আর অন্য সব আত্মীয়ই তো প্রায় মধ্যবিত্ত। স্ত্রীকে জাপান বেড়িয়ে

আনলো, এমন কে আছে? সুজাতার বিগলিত হওয়ার কথা ছিল, কথা ছিল কৃতজ্ঞ হয়ে থাকবার, তা নয়, কিনা কোনখানে একটুকরো মাংসের দলা ফেলে রেখে এসেছে বলে সারাক্ষণ দীর্ঘশ্বাস।

অরুণেশের বুদ্ধির অগম্য। তবে স্ত্রীর দীর্ঘশ্বাসে অরুণেশের উপভোগের কোনো ঘাটতি হয় নি। অরুণেশ একাই একশো। অরুণেশ নিজের মধ্যেই নিজে সম্পূর্ণ।

তা বলে স্ত্রীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন না ভদ্রলোক। নিজের তাঁর মরবার বয়েস হয়নি। তবু মরার পর দেখা গেল স্ত্রী-পুত্রের জন্যে যা ব্যবস্থা করে গেছেন তা বেশ ভালই। ইনসিওর করেছিলেন মোটা মোটা। একটা ফ্ল্যাটবাড়ি বানিয়েছিলেন ভাড়া দেবার জন্যে, তার আয়ও কম নয়। নগদও মোটা অঙ্কের।

অতএব সুজাতার আর সুজাতার ছেলের ভালভাবে খেয়ে-পরেও ওই বার্ষিক ভ্রমণটা ঠিক বজায় আছে। কোথা থেকে এসব করে গেছেন অরুণেশ এ চিন্তা এখন আর কেউ করে না।

সুজাতা একেবারে সেই সেকালের হিন্দু বিধবাদের মতো 'একাহারী শুদ্ধাচারী' না হলেও বেহেড্ও নয়। তবু সুজাতা যেখানেই যায় হোটেলে উঠে খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে ঘটিয়েও বলে, 'ওই আমার ভাল লাগে, বেশ পাঁচ জন মানুষকে দেখি-টেখি।'

অমল হাসে, বলে, 'মানুষ সম্পর্কে এখনো তোমার কী অপরিসীম কৌতূহল মা, দেখলে অবাক লাগে।'

'বা: তবে কিসের সম্পর্কে থাকবে শুনি?'

'কেন, বিশ্ব রহস্যে কতো কী কৌতূহলোদ্দীপক আছে।'

'সব কিছুরই মূল উদ্দেশ্য মানুষ, সেটি মনে রেখো বাবা। এই যে তোদের বিজ্ঞান-টিজ্ঞান এতো উন্নতি করছে, উদ্দেশ্যটা কী? হয় মানুষ বাঁচাবার, নয় মানুষ মারবার। হয় মানুষকে ষোলো আনা সুখ-সুবিধে দেবার, নয় মানুষকে একশো পয়সা অসুবিধে, অসুবিধেয় ফেলবার। মোটের মাথায় বলবো যা কিছু কাজ চলছে পৃথিবীতে, সবই মানুষের কথা ভেবে। তবু মানুষ সম্পর্কে কৌতূহল থাকবে না?'

'সে আলাদা কথা—' অমল হাসে, 'তবে তোমার ওই যাকে দেখবে তার ঘরসংসার, ছেলেপুলে, কত বয়েস, কোথায় আগে ছিলো, কোথায় পরে যাবে, ইত্যাদি কৌতূহল প্রশ্নগুলো জেরার মতো লাগে। ভাবি ওরা কী মনে করছে রে বাবা!'

'কেউ কিছু মনে করে না।' সুজাতা জোর দিয়ে বলে থাকে, 'তোর মতন সবাই নয়।'

'তোমার মতনও সবাই নয়।'

'নয় তো নয়। কেউ কোনোদিন তোর কাছে এসে বলেছে—তোমার মা এতো জেরা করেন কেন? বল, বলেছে কিনা। সত্যি কথা বলবি।'

'তা অবশ্য বলে নি।'

বলে হেসে ফেলেছে অমল।

সুজাতা যথারীতি হোটেলের ঘরে ঘরে ঢুকে ভাব করেছে, বাঙালী অবাঙালী দুই সুজাতার কাছে সমান আদরের। যাদের ভাষা বোঝেনা তাদের সঙ্গেও ইসারায় কথা চালায়, কটি ছেলে? কতো বয়েস? আগে কোথায় ছিলেন? ইত্যাদি।

অমল বলেছে, 'তোমার জ্বালায় আর পারা যাবে না। এবার থেকে তুমি একাই এসো মা তোমার সম্প্রদায় নিয়ে, আমি আর আসছি না।'

তবু আসে।

মাকে নেহাৎ মার 'সম্প্রদায়', যথা—বামুন দি, নিত্যানন্দ এবং সত্যর মা,এদের হাতে ছেড়ে দিতে মন সরে নি।

মা ছেলের এই অনাবিলতার মধ্যে আজ একটা ভুল বোঝাবুঝির আবিলতা এক ঝলক ছায়া ফেলে গেল।

অমল তার মার চিরাচরিত কৌতুহলকে পাহারা দেওয়া ভাবলো, সুজাতা তার ছেলের অভিমানকে রূঢ়তা ভাবলো। অতএব এটাও ভাবলো, ছেলে সাবালক হয়ে গেছে, তাই এমন কাঠিন্য।

•

অমলের সঙ্গে কথান্তরের পর সুজাতা নিজের ঘরে এসে বসলো। এতোক্ষণ যে 'দেশ-বিদেশের জল খাবার' শীর্ষক অমূল্য গ্রন্থখানি নিয়ে নতুন কোনো জলখাবার বানানো যায় কিনা অমলের জন্যে, তাই দেখছিলো, তা মনে রইল না আর।

সুজাতা বিছানায় পড়ে কাঁদতে লাগলো।

সুজাতা বহুদিনের ফেলে আসা পথে ঘুরতে লাগলো, আর সুজাতার এই ভেবে দারুণ যন্ত্রণা হতে থাকলো, কেবলমাত্র একটা ছেলে বলেই না অমলের এতো অহঙ্কার! জানে মার আমি বৈ আর গতি নেই। মার আমি ছাড়া আর কেউ নেই। অথচ থাকতে পারতো।

সুজাতা নিজের হাতে সেই 'দ্বিতীয়ের' ঐশ্বর্য ত্যাগ করেছে, সুজাতা কেবলমাত্র একজনের মা-ই থাকতে চেয়েছে। জীবন কি আশ্চর্য বস্তু!

একসময়ে যা অপরিহার্য, অপর সময়ে তা নেহাৎ তুচ্ছ। একসময়ে যা তুচ্ছ ফালতু, হয়তো অন্য সময়ে সেইটুকুর জন্যেই হাহাকার।

অনেকক্ষণ কেঁদে উঠে বসে সুজাতা। হঠাৎ সঙ্কল্পে দৃঢ় হয়। অমলের বন্ধুদের যদি সুজাতা দেখেই থাকে ভিতর থেকে জানলার পাখি খুলে, অন্যায়টা কী হয়েছে? পাহারাই যদি দেয়, তাতেই বা এতো আশ্চর্য হবার কী আছে? অমলের বাপ নেই। সুজাতাই একা অভিভাবক, সুজাতা যদি দেখে ছেলে কাদের সঙ্গে মিশছে, নিশ্চয়ই দোষ হয় না।

সুজাতা এবার থেকে আর খড়খড়ি তুলে দেখবে না। সোজা ভিতরে ঢুকে যাবে। কথা বলবে না। দেখি অমল কী বলে!

সুজাতা হঠাৎ লজ্জিত হলো, সুজাতার মনে পড়লো, অমল অনেক সময় বলেছে, 'আমার

বন্ধুরা এসেছে, এসো না মা। তোমায় দেখলে খুশি হবে।'

সুজাতাই যায় না।

বলে, 'দেখে খুশি হবার মত মা কি আর তোর আছে বাবা? এই তো সাজ সজ্জা!'

অমল চুপ করে গেছে।

অমলের চোখ জলে ভরে গেছে।

অমলের মায়ের সেই আগেকার মূর্তি মনে পড়ে গেছে। রাজেন্দ্রাণী মূর্তি।

দেখতে রাজেন্দ্রাণীই ছিলো সুজাতা।

হয়তো এখনো তার ভগ্নাংশ আছে। এখনো সরু পাড় ধুতি আর নিরাভরণ দেহের মধ্যেও রূপের দীপ্তি আছে রীতিমত।

কিন্তু সেই রূপ সম্পর্কে নিজের কোনো মূল্যবোধ নেই সুজাতার। যা কিছু মূল্যবোধ ওই ছেলে নিয়েই। মুখে না বললেও, মনে মনে জানে, এ হেন ছেলে জগতে দুর্লভ। সেই ছেলের ওপর দুরন্ত অভিমান, বিচলিত হবারই কথা। কিন্তু শুধু কি ওইটুকুই? সুজাতার মধ্যে যন্ত্রণার উপকরণ কি আর নেই?

বামুনদি এসে ডাকলো, 'বৌদিদি, ছেলের খাবারের জন্যে যে ছানা কাটাতে বলেছিলেন, হয়ে গেছে।'

ছানা!

সুজাতার মনে পড়লো ছানার পরোটা করে দেবে বলে তখন বইয়ের পাতা উল্টোচ্ছিল।

ইচ্ছে আর আগ্রহের সেই ঘরটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। যেন সেখানে কোনো আসবাব নেই, কোনো বসবার জায়গা নেই। কী নিয়ে তবে সেই ছানার পরোটা করতে বসবে সুজাতা?

ক্লান্ত গলায় বললো, 'থাকগে বামুনদি! তুমি ওই ছানাটা নিয়ে রাত্তিরের ছানার ডালনা করো।'

বামুনদি অবাক হলো।

এগিয়ে এসে বললো, 'শরীর খারাপ হলো না কি বৌদি?'

সুজাতা যেন হঠাৎ একটা অবলম্বন পেলো। সুজাতা বললো 'হ্যাঁ বামুনদি, ভীষণ মাথা ব্যথা করছে। তুমি আজ আর আমার জন্যে রান্না করো না।'

বামুনদি চলে গেল, খোকাকে বলতে গেল।

সুজাতা কি ছেলেমানুষের মত খাওয়ায় রাগ করলো? ছেলের সঙ্গে মান অভিমানের খেয়ালে তাকে জব্দ করবার একটা নতুন পন্থা আবিষ্কার করলো?

নাঃ, এতো হালকা সুজাতা নয়।

সুজাতা চিরদিনই বাইরে উচ্ছ্বাসময়ী হলেও ভিতরে গভীর। সুজাতা তার সেই মনের গভীরে গিয়ে বসতে নিজেই ভয় পায়। সেখানে একটা তীব্র যন্ত্রণা, সেখানে যেন অন্ধকার শূন্য

গহ্বরে একটা ফাঁসির দড়ি ঝুলছে, যেন একটা কাঠগড়ার সিঁড়ি খাড়া হয়ে রয়েছে। কোথা থেকে যেন অদৃশ্য বিচারক সুজাতার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ হাসি হাসছে।

বামুনদি দেখলো, খোকা তার এক বন্ধুর সঙ্গে গল্পে মশগুল। চলে এলো। ভাবলো, একটু বড় হলেই ছেলেগুলোকে যেন 'বন্ধু'তে পায়। ভূতে পাওয়ার থেকে কিছু কম নয়। একেবারে গ্রাস করে নেয়!

এই ছেলে এতো মা-মা করতো, ইস্কুল থেকে এসে মায়ে ছেলেয় গপ্‌পো আর ফুরোতো না। আর ওই পোড়া কলেজে উঠে পর্যন্ত কেবল বন্ধু আর বন্ধু। ওদের সঙ্গে এতো গপ্‌পো কিসের রে বাবা! বৌ তো হয়নি যে, বৌয়ের গপ্‌পো করবি।

তা কথাটা বামুনদির হয়তো মিথ্যেও নয়।

বিশেষ একটা বয়েস আছে ছেলেদের, যখন তারা 'বন্ধু'দের দ্বারা গ্রাসিত হয়, অনুশাসিত হয়। সেই বন্ধুর চোখেই জগৎ দেখে।

অমলের এখন সেই বয়েস।

অথচ হঠাৎ এমন করে বন্ধু নিয়ে মেতে ওঠার একটা অপরাধ বোধের সৃষ্টি হয়ে বসে, বাড়ির সম্পর্কে যথোপযুক্ত কর্তব্য করা হচ্ছে না। এমন একটা অন্তর্দাহী অনুভূতি কোথায় যেন কাঁটা ফোটাতে থাকে, তখনই আসে নিজের স্বপক্ষে যুক্তি খাড়া করবার চেষ্টা। মনে মনে চলে প্রতিপক্ষের লড়াই। বাড়ির লোকের সাধারণ প্রশ্নও মনে হয় ব্যঙ্গ প্রশ্ন। 'বন্ধুটি কে রে' বললে মনে হয়, হেয় করছে ওকে! অতএব আসে ঔদ্ধত্য, আসে রূঢ়তা রুক্ষতা। আর তখনই বাড়ির লোককে পর এবং সেই বন্ধুর দলকে আপন মনে হয়। অতএব বন্ধুর বাক্যালাপে বিগলিত চিত্ত। আর বাড়ির লোকের কথায় বিরক্ত চিত্ত হওয়াই অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়।

অমল হয়তো ঠিক এতোটা হয়ে ওঠেনি, অমলের মা-অন্ত প্রাণ, তবু অমল হঠাৎ ওই 'পাহারা' দেওয়া সন্দেহটায় রীতিমত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু সত্যিই কি ছেলেকে পাহারা দেয় সুজাতা?

নাঃ! দীর্ঘদিন ধরে সে নিজেকেই নিজে পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে, পাছে সেই ভয়ানক লুকনো ভয়ঙ্কর কথাটা অসতর্কে বলে ফেলে।

আবার সেই ভয়ঙ্করের জন্যেই অবিরত একটা নিরুপায় হাহাকারও বয়ে বেড়াচ্ছে।

'মাথার যন্ত্রণা' বলে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে বাঁচলো সুজাতা। সুজাতা বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়লো। তা নইলে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলো কেন?

স্বপ্নালোকে নিজেকে মৃত্যুশয্যাতেও দেখতে পারে। আর সেই দেখায় অবাকও লাগে না, সুজাতাও তাই অবাক হলো না। সুজাতা বিস্ময়হীন দৃষ্টি মেলে নিজেকে মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে থাকতে দেখলো।

দেখতে পেলো তাঁর চারপাশে—নার্স, ডাক্তার, আরো কতো মুখ।

তাদের মুখে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, মমতা।

কিন্তু সেখানে কি অরুণেশের মুখ ছিল? উদ্বেগে অস্থির। ঘর্মাক্ত ললাট।

ওই শয্যাশায়িতা—সুজাতা হয়তো জানে না। কিন্তু যে সুজাতা স্বপ্ন দেখছে, সে জানে ছিলেন না, অরুণেশ নামের সেন্টিমেণ্ট মুক্ত মানুষটা।

তিনি তখন জাপান যাবার তালে তদ্বির করে বেড়াচ্ছিলেন। কোম্পানী যে তাঁকেই পাঠাবার উপযুক্ত ব্যক্তি বলে বিবেচনা করবে, সেটা তো অমনি হতে পারে না। তার জন্যে তদ্বিরের দরকার।...সুজাতার দরকারের জন্যে তো তিনি প্রভূত ব্যবস্থা করে গেছেন। ডাক্তার, নার্স, নার্সিং হোম, টাকা। আবার কি দরকার?

সেই প্রায় অচৈতন্য সুজাতা মনে মনে ভেবেছিলো, ও যদি এসে শোনে আমি মোরে গেছি, বেশ হয় খুব হয়।

কিন্তু সুজাতার প্রার্থনা পূরণ হয়নি।

সুজাতা দিব্যি বেঁচে উঠেছিল।

কিন্তু সুজাতা খুব গভীর একটা অনুভূতির মধ্য দিয়ে অনুভব করেছিল, অরুণেশ তার জন্যে যতো ভালো ব্যবস্থাই করে যান, গোপন চিন্তায় একটা মৃত্যুই কামনা করেছিলেন তিনি।

সেই মৃত্যু সুজাতার জন্যে নয় বটে, কিন্তু সুজাতার স্বপ্নের, সাধের, আশার ভালবাসার অজাত মূর্তিটার জন্যে।

বিয়ের পর অনেক দিন ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে রেখে হঠাৎ যখন একদিন সুজাতার স্বপ্নের নীলপাখি ঘরের জানালায় এসে বসলো, ঠিক তখনই অরুণেশ ঠিক করেছেন সস্ত্রীক লম্বা লম্বা পাড়ি দেবেন।

মুক্ত জীবন, মুক্ত বাসনা।

'এইতো মানুষের কাম্য—' বলেছিলেন অরুণেশ, 'কাঁথা তোয়ালে ফিডিং-বটল এইসব নিয়ে জড়িয়ে থাকবার মধ্যে সুখটা কী আছে বলতে পারো? দেখছো তো চারদিকে? আমরা তার চেয়ে মন্দ আছি? যখন যা ইচ্ছে করছি, যখন যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছি—'

সুজাতা জেদ করেছিল।

সুজাতা বলেছিল, 'নিজেদের সুখের জন্যে ভয়ানক একটা পাপ করবে তুমি?'

'এই সেরেছে। এর মধ্যে আবার পাপ দেখলে কোথায় তুমি? জন্মালে তবে মৃত্যু? জীব হলে তবে তো তার হত্যাটা পাপ?'

'তবু তো প্রাণ। রাখলে তো থেকে যাবে?'

'আরে মানে ঠিক এ সময়টায়—থাক্ না আরো কিছুদিন? তুমি তো আর বৃদ্ধা হয়ে যাচ্ছো না?'

সুজাতা তর্ক তুলেছিল, 'আবার যে পাবোই এমন গ্যারান্টি আছে? একটা প্রাণ নষ্ট করা হাতের মধ্যে, কিন্তু একটা প্রাণ সৃষ্টি করা কি হাতের মধ্যে?'

তর্কে জিত হয়েছিল সুজাতারই। তবে এই শর্তে, একটিই যথেষ্ট।

তারপর তো ওই দৃশ্য।

সুজাতাকে ঘিরে অনেকগুলো উদ্বিগ্ন মুখ। সুজাতার চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে আসছে।... সুজাতা জীবন মৃত্যুর সীমারেখায় দাঁড়িয়ে আছে। সেই অস্ফুট চৈতন্যের মধ্যে সুজাতা ভাবছে ; ও যদি এসে শোনে আমি মরে গেছি, ওর সব ঝঞ্ঝাট নিয়ে চলে গেছি, বেশ হয়, ঠিক হয়।...আমি মরতে পড়েছি, আর এখন কি না ওর 'জরুরি কাজ'।

কিন্তু সুজাতার সেই অভিমান-সঞ্জাত কামনা পূরণ হলো না। অরুণেশ ফিরে এসে দিব্যি সুস্থ সুন্দর স্ত্রী-পুত্রের মুখ দেখতে পেলেন। তবে বিষণ্ণ স্ত্রী।

অন্যমনা অভিমানিনী স্ত্রী।

অরুণেশ বলেন, 'তোমার যে আর মানের পালা ঘুচছে না। আমি না থাকায় তোমার কোনো ত্রুটি হয়েছে? বল?'

সুজাতা তেমনি বিষণ্ণই থেকেছে, বিষিণ্ণ আর স্তিমিত।

বলেছে, 'তুমি না থাকাটাই ত্রুটি। লোকের কাছে কী রকম মুখ হেঁট হল বল তো? সবাই বলতে লাগলো, এতোদিন পরে হচ্ছে, কি জানি কেমন থাকে, আর এই সময়ই কি না ওর কাজ পড়লো?'

'কাজ কি গিন্নীর নার্সিং হোম যাবার ডেট বুঝে পড়বে?'

'ঠিক আছে—' সুজাতা বলেছে, 'আমি মুখ অন্ধকার করেই থাকবো, ব্যস্।'

'আমি থাকতে দিলে তো?'

বলে অরুণেশ তাঁর সাফল্যের ইতিহাস শোনাতে বসেছেন, কেমন করে তিনি সস্ত্রীক অতি আরাম সহকারে বেড়িয়ে আসার ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন স্রেফ্ কোম্পানীর পয়সায়।

'আমি কেমন করে যাবো?'

সুজাতা অবাক হয়েছিল, 'এইটুকু বাচ্চা নিয়ে যাওয়া যায়?'

'এইটুকুকে তুমি নিয়ে যাবে ভাবছো?'

বেদম হাসতে শুরু করেছিলেন অরুণেশ, 'সত্যি তোমার কোনোদিনই শৈশব ঘুচলো না। ওকে কোনো একটি আয়ার হাতে সমর্পণ করে তোমার মার হেফাজতে রেখে যাবে।'

'ও আমার দুধ খায়।'

'তার বদলে বোতলের দুধ খাবে। একই কথা।'

সুজাতার চোখে জল এসেছিল, তবু সুজাতা সামলে নিয়ে বলেছিল, 'একই কথা?'

'আমি তো কোনো তফাৎ দেখি না।'

'মা যদি রাখতে না চান?'

'তোমার মাকে তো এতো খারাপ লোক বলে মনে হয় না।'

সুজাতা আরক্ত হয়েছে। 'খারাপ ভালোর কথা হচ্ছে না। অতো ছোট বাচ্চার দায়িত্ব নেওয়া সোজা না কি?'

'কী আশ্চর্য! অতো ছোটো বলেই তো সহজ। 'মা মা' বলে কাঁদবার বয়েস হয় নি। দৌরাত্ম্যি করে বেড়াবার বয়েস হয় নি—'

'আমার মন কেমন করবে।'

'সেটাই হচ্ছে আসল কথা—' অরুণেশ বলেছিলেন, 'গোড়া থেকেই ধরেছি। কিন্তু মনের ওপর যদি কিছুটা কণ্ট্রোল না থাকলো তো কিসের মানুষ?'

সুজাতা চুপ করে গিয়েছিল। সুজাতা হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মনের ওপর কণ্ট্রোল নেই সুজাতার? সুজাতা কি চেঁচিয়ে বলে উঠবে ওর সেই ভয়ানক শক্তির কাহিনীটা?

মনের ওপর কণ্ট্রোলের সেই শক্তির?

কিন্তু......

পরে—অনেক পরে—একথা ভেবেছে সুজাতা, কাজটা যখন করেছিল সে, তখন কি ভেবেছিল খুব একটা শক্তির কাজ করছে?

নাঃ!

নিজেকে বিশ্লেষণ করে দেখে বুঝেছে সুজাতা তখন তা করেনি। বরং তখন খুব একটা বিপদের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবেই ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। যে সুজাতাকে বিপদমুক্ত করেছে, তাকে লুকিয়ে মোটা টাকা পুরস্কার দিয়েছে এবং যাতে না কর্তৃপক্ষের কানে যায়, তার জন্যেও ঢের আটঘাট বাঁধতে বলেছে।

তখন কি বুঝেছিল, ধীরে ধীরে তিলে তিলে সুজাতার ভিতরটা ক্ষইয়ে দেবে সেই তুচ্ছ একটা অদেখা জিনিস?

সুজাতা আবার স্বপ্নের ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল।

সুজাতা আচ্ছন্ন আচ্ছন্ন অবস্থায় বুঝতে পারলো বহুক্ষণ থেকে যে তীব্র একটা যন্ত্রণা সুজাতাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল, সেই যন্ত্রণাটা হঠাৎ যেন কমে গেল।

সুজাতা খুব মৃদু গলায় ফিসফিস শব্দ শুনতে পেলো।

তারপর অদ্ভুত একটা 'শব্দ' তার কানে এলো, 'টুইন'।

টুইন!

টুইন মানে কী?

সুজাতা সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেও চমকে উঠলো। সুজাতার মনে হলো ভয়ঙ্কর একটা বিপদের ধাক্কায় কোথায় যেন তলিয়ে যাচ্ছে সে।

'একটাই যথেষ্ট।'

বলে রেখেছে অরুণেশ।

এরপর কী বলবে অরুণেশ ?

ব্যঙ্গ হাসিতে সুজাতাকে বিদীর্ণ করে দিয়ে বলে উঠবে না কি, 'খুব খেল্ দেখালে বটে ? মুখের উপর উচিত জবাব দিলে আমায়। একটা বোটাতেই ডবল পাওনা উসুল করে নিলে।'

সুজাতার ভীষণ একটা লজ্জা করতে লাগলো।

মনে হতে লাগলো সত্যিই যেন ইচ্ছাকৃত কোনো কৌশলে অরুণেশকে জব্দ করে ফেলতে চেয়েই এমন একটা কাণ্ড করেছে সে।

একটাতেই যে নারাজ, তার ঘাড়ে সুজাতা দুটোর বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে।

তাছাড়া—এমনিতেও অন্য সবলের কাছেই যেন লজ্জা। প্রথম সন্তান কোলে আসার গৌরবের মধ্যে এ যেন একটা ছন্দপতন। যমজ ছেলে। একসঙ্গে একজোড়া। কেমন যেন গাঁইয়ার মতো।

সবাই বলবে, 'বাবা! যেমন এতোদিন পরে হলো, তেমনি পুষিয়ে নিলো।'

ভাবতে ভাবতে কখন যেন অদ্ভুত একটা ক্লান্তিতে চোখ জড়িয়ে গেল, কথা বলতে গেল, পারলো না।

তাপর যখন চোখ মেললো, যখন কথা বলতে পারলো, তখন কাছের নার্সকে প্রথম প্রশ্ন করলো, 'টুইন ?'

নার্স মাথা হেলাল।

'মেয়ে না ছেলে ?'

'দুটিই ছেলে। খুব 'লাকী' বলতে হবে আপনাকে।'

'আমায় দেখাবেন না ?'

'দেখাবো দেখাবো, তাড়া কি ?'

'ভাল আছে ?'

নার্স কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করে বললো, 'একটু তো উইক থাকবেই। টুইন বেবিরা তো কিছুটা কমজোরি হয়ই। তবে একটিকে বেশ ভালই মনে হচ্ছে,—ওকে দেখাবো। অন্যটিকে একটু বিশেষ ট্রিটমেণ্টে রাখতে হবে কয়েকদিন।'

সুজাতা হঠাৎ অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনার ভঙ্গীতে বলে উঠেছিল, 'শুনুন, আমার খুব কাছে সরে আসুন। বলুন তো ওর কি সত্যিই বাঁচবার সম্ভাবনা নেই ?'

'না না সে কি ?' ভয় পাচ্ছেন কেন ? আজকাল বিজ্ঞানের কতো উন্নতি হয়েছে। কিছুক্ষণ করে অক্সিজেন দিয়ে দিয়ে—'

'ভয় আমি সে জন্যে পাচ্ছি না সিস্টার।'

সুজাতা তেমনি উত্তেজিতভাবে বলেছিল, 'আমার একটিই যথেষ্ট। যদি বাঁচে আপনি ওকে নিয়ে নেবেন।'

'আমি ওকে নিয়ে নেব!'

নার্স হেসে ফেলেছিল।

'কী সব অদ্ভুত কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, হয়তো অদ্ভুতই। কিন্তু—' সুজাতা আস্তে বলেছিল, 'একটিই তো হবার কথা। তাই তো হয় মানুষের।'

'টুইনও হয়।'

নার্স হেসে বলেছিল, 'শুনেছেন অবশ্যই তিন চারটেও একসঙ্গে হয়। আমাদের এখানেই একবার একটি পাঞ্জাবী মহিলার একসঙ্গে তিনটি হয়েছিল।'

'সবাই বেঁচেছিল?' খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেছিল সুজাতা।

নার্স মৃদু হেসেছিল, 'দুটি বেঁচে গিয়েছিল। বেশ ভালই হেল্‌দি হয়েছিল।'

তিনটির দুটি বেঁচে গিয়েছিল। তার মানে আর একটি বাঁচে নি।

তার মানে এরকম বাঁচেও না অনেক সময়।

সুজাতা দুর্বল হাতটা বাড়িয়ে নার্সের শাড়ির কোণটা চেপে ধরেছিল, 'সিস্টার, আমি সত্যি বলছি, আপনি একটিকে নিয়ে নিন।'

'আমি নিয়ে কী করবো?'

নার্স হেসেছিল।

'আপনি না নেন, অন্য কাউকে দিয়ে দেবেন। কতো লোক তো এমন চায় ত। যাদের হয়-টয় নি—'

'তা চায় বৈ কি।'

সে অভিজ্ঞতা আছে নার্সের।

নিঃসন্তান মা-বাপ নার্সিং হোমে নাম ঠিকানা দিয়ে যায়। যদি কোনো কারুর প্রসব কালে মৃত্যু ঘটে, যদি তার বাড়ি থেকে ওই সদ্যোজাত বেবিটাকে নিয়ে যেতে না চায়—

না চায় এরকম কেসও আছে বৈ কি। বাপ বিলিয়ে দিয়ে যায়। বলে কে মানুষ করবে! বিচিত্র পৃথিবী! বহু বিচিত্র চরিত্র। আর সেই বিচিত্র চরিত্রেরা কতোই না কাণ্ড ঘটাচ্ছে! কিন্তু মা বেঁচে থেকে বিলিয়ে দিচ্ছে—বৈধ সন্তানের মা; এরকম ঘটনা বিরল।

'এরকম অন্যায় ইচ্ছে পোষণ করছেন কেন?' নার্স অবাক হয়ে গিয়েছিল, 'আপনাদের টাকা আছে, ভাল আয়া রাখবেন, দু'জনের জন্যে দুটো—।'

'না-না-না। একটাকে আপনি অপর কাউকে দিয়ে দিন।'

'তার মানে আমার হাতে দড়ি পড়ুক।'

'কে দড়ি পড়াবে?'

'আইন'।

'আইনে ফাঁকিও আছে।'

সুজাতা সেই দুর্বল শরীরেও তর্ক চালিয়েছিল, 'এমনও তো হয়, কারো বেবি নষ্ট হয়ে গেল জন্মবার সময়, তার সঙ্গে যদি বদলে ফেল—তার মা যাতে টের না পায়।'

'আপনার এই অদ্ভুত ইচ্ছেটাই আমার কাছে ধাঁধাঁর মতো লাগছে। তা ছাড়া, আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী আজই কারো এমন দুর্ঘটনা ঘটবে তারও তো কোনো মানে নেই।'

'আজ, কাল, দুদিন পরে. যাই হোক না। ওতো আধখানা, ওতো—' হঠাৎ ধড়ফড়িয়ে উঠেছিল সুজাতা, 'সিস্টার, আমার অন্য একটা বাচ্চা বেশ ভাল আছে তো?'

'তা' আছে। মানে—' হেসে উঠেছিল নার্স, বড়ো ছোটর হিসেবটাই বোধ হয় 'দশ আনা ছ' আনা'র হিসেবে। দশ আনাটি দিব্যি হাত পা নাড়ছেন।

'কই দেখালেন না?'

'দেখাবো, দেখাবো।'

'এখন দেখাতে নেই?'

'না। কাল সকালে।'

'সিস্টার, ও বাঁচবে তো?

'কী মুস্কিল। বলছি তো প্রথম জন বেশ হেল্‌দি। সেকেণ্ড বেবিটাই ভোগাচ্ছে।'

সুজাতা শিউরে উঠেছিল। বলেছিল, 'বাঁচবে না?'

'তা তো বলি নি, বলেছি—একটু ক্ষীণ প্রাণ।'

তারপর হেসে উঠে বলেছিল, 'আপনি তো ওকে বিলিয়ে দিতেই চাইছেন, থাকলো আর গেল আপনার কি?'

'ষাট ষাট! বেঁচে বর্তে কারো কাছে যত্নে আদরে থাকুক, সেটাই চাই।'

'আচ্ছা আপনি এতো কথা বলছেন কেন বলুন তো? চুপ করে ঘুমিয়ে যান। কথা বলা বারণ।'

'ঘুমোবো! শান্তিতে ঘুমোবো।'

সুজাতা আস্তে বলেছিল, 'আপনি আমায় কথা দিন।'

'দেখুন, আপনি তো আচ্ছা গোলমেলে মেয়ে! আমার দ্বারা এসব বে-আইনি কাজটাজ হবে না। এই আমার শেষ কথা।'

বলেছিল। 'শেষ কথা' বলেছিল তবু সেই বে-আইনি কাজটা তার দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিল।

সেই অক্সিজেন দিয়ে রাখা আধখানা শিশুটাকে বেশ মোটা টাকা নিয়ে বেচে দিয়েছিল নার্স একটি 'হাদেথলে' দম্পতির কাছে।

অনেকদিন আগে নাম ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিল তারা।

অনেক কৌশলে খবর করতে হয়েছিল নার্সকে, হাত করতে হয়েছিল জমাদারণীদের, ষড়যন্ত্র করতে হয়েছিল অন্য নার্সদের সঙ্গে। আর সত্যবদ্ধ করিয়ে নিতে হয়েছিল সুজাতাকে।

আপনার আত্মীয়রা দেখে গিয়েছিলেন, আপনার টুইন বেবি, এখন যদি হঠাৎ—'

'আপনিই তো বললেন, এরকম কেস্-এ সব বেবি বাঁচে না।'

'তার মানে সেটাই বলবো—আপনার আত্মীয়দের ?'

'তাছাড়া ?' সুজাতা মলিন মুখে বলেছিল, 'তাছাড়া বলবার আব কী আছে ?'

হ্যাঁ, মা হয়ে একথা বলেছিল সুজাতা।

'দশ আনা' অংশটুকুতেই তার বুক ভবে গিযেছিল। মনে হয়েছিল, 'বাকী 'ছ' আনাটা' যেন এব প্রতিপক্ষ। নার্স অনেক উপকার করেছে, তাঁকে ওর কাছ থেকে সরিয়ে দিয়ে।

আর একটা কথা—সুজাতা বলেছিল তার দুই কুলেব আত্মীয়দের কাছে অরুণেশ যেন ওই যমজের কথাটা জানতে না পারে। খামোকা একটা মনোকষ্ট পাওয়া। যতোই হোক পুত্রশোক তো বটেই।

প্রথম সন্তানটি, দেখইনি যখন আগে, সম্পূর্ণ আনন্দের সঙ্গে দেখুক। সম্পূর্ণ চেহারাটি দেখুক। ওর যেন এই ছেলেটাকে 'আধখানা' ভেবে মূল্যবোধ কমে না যায়।

নার্সিংহোমে বেশ কযেকদিন থাকতে হযেছিল সুজাতাকে। তাই নিদেশ ছিল অরুণেশের বাড়িতে এসে যত্ন ঠিকমতো হবে না।

চলে আসার সময় সেই নার্সকে তার প্রাপ্য টাকাব উপবে অনেক টাকা দিয়ে, আবার নিজেব গলার সরু হাবটা পরিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'আপনার উপকার জীবনে ভুলবো না। আর মনে রাখবেন, এ পৃথিবীতে একথা আব কেউ জানবে না। কেবল আপনি আর আমি।'

নার্স মনে মনে হেসেছিল। অন্তত আধ ডজন লোক তো জেনেই বসে আছে।

কিন্তু বললো না সেকথা। বললো, 'নিশ্চিন্ত থাকুন।'

অমলকে কোলে নিয়ে সুজাতা যখন বাড়ি ফিরলো, সুজাতা ভাবলো, খুব বাঁচাই বাঁচা গেছে। চাঁদের কোণার মতো একটা ছেলেই তো যথেষ্ট। এব পাশে এরই একটা শীর্ণ জীর্ণ ভগ্নাংশ, শুধু অস্বস্তিকরই হতো।

সুজাতা একথাও ভেবেছিল, হয়তো বাঁচতোই না। হয়তো বাড়ীতে আনার পর একটা বিশ্রী কিছু ঘটে যেতো, তার থেকে এ অনেক ভালো।

বরং বেশীই ভালো হলো।

সুজাতার বদান্যতায় একটা নিঃসন্তান দম্পতি সন্তান পেলো। তাঁদের কাছে নিশ্চয়ই খুব যত্নে থাকবে। বেঁচে-টেঁচে যাবে।

অরুণেশ এসব কিছু জানলেন না।

অরুণেশ রাজধানী থেকে ফিরে এসে সুস্থ সুন্দর স্ত্রী-পুত্রকে দেখে খুশি হলেন।

সুজাতা বললো, 'কোলে কর।'

অরুণেশ বললেন, 'রক্ষে করো বাবা। ওই টুকুনকে ? অসম্ভব! উঃ, এতো ছোট্ট একটা মানুষ, ভাবলে অবাক লাগে।'

সুজাতা মনে মনে হাসলো, তবুতো ছ' আনাটি দেখোনি। দশ আনাতেই অবাক লাগছে তোমার।

বললো, 'একটু বড়ো হলে কোলে নেবে তো? নাকি তাও নেবে না? রাগ করেই থাকবে?'

'এই আরে! এই সব ভেবে বসে আছো বুঝি? অতো কিছু নয়'—অরুণেশ বাচ্চাটার গালে আস্তে একটু আঙ্গুলের টোকা দিয়ে বলেছিল, 'আরো কিছুদিন বেড়িয়ে-টেড়িয়ে নেওয়ার পর হলে হয়তো আরো খুশি হওয়া যেতো। তা' দেখতে খুব সুন্দর হবে, না? অবশ্য বেদম রোগা! বাবাঃ, তোলো কী করে? মনে হয় না টুক করে হাত পা কটা ভেঙ্গে যাবে?'

'ধ্যেৎ! কী যে বলো।' বলে সুজাতা সাবধানে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিল ছেলের রোগা-রোগা হাত-পা। আর মনে মনে ভেবেছিল, মশাই দশ আনাটিতেই এই বলছো তুমি! ছ'আনাটিকে দেখলে কী বলতে তাহলে?

সেই থেকেই সর্বদা মনে মনে কথা বলার শুরু সুজাতার।

যখন মায়ের কাছে দু'মাসের ছেলে রেখে জাপান গেল, তখন মনে মনে বললো, ভাগ্যিস তখন বুদ্ধি করে সেই কাজটি করেছিলাম! না হলে কী হতো আজ? দু'টোকে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না কি? তার মানে যাওয়া হতো না। তার মানে অরুণেশ চিরদিন দুষতো।

কিন্তু ক্রমশই তো অমল হয়ে উঠছিল একেশ্বর সম্রাট। অমল অমল অমল! চোখের মণি, প্রাণের নিধি। উঠতে বসতে নড়তে চড়তে অমলকে দেখে বিভোর হয়ে থাকে সুজাতা।

তা' অরুণেশও কম গেল না।

অরুণেশের ভালবাসাটা আবার বেশী করে ধরা পড়তে লাগলো। কারণ অরুণেশের ভালবাসায় বহিঃপ্রকাশটা প্রবল। অরুণেশ প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিস এনে জোগায়, বাসনার অতীত খেলনা এনে জোগায়। কাজের ক্ষতি করে গাড়ি চড়িয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যায়, আর যথেচ্ছ স্বাধীনতা দেয় ছেলেকে।

সুজাতা চাইতো ছেলেকে অন্তত কিছু কিছু নিষেধ-বাক্য দিতে হয়। অরুণেশ বলতো, 'না। কোন দরকার নেই। ভালোমন্দ নিজেকে বুঝতে দিতে হয়।'

'ছোট্ট বাচ্চা সব নিজে বুঝবে? ভালোমন্দের জ্ঞান আছে ওর?'

'সেই জ্ঞান জন্মাবার জন্যেই তো নিজে বুঝতে ছেড়ে দিতে হয়।'

'ওতো আগুনেও হাত দিতে পারে।'

'একদিন দেবে। দ্বিতীয় দিন দেবে না।'

'তার মানে ওর যখন সিগারেট খেয়ে দেখতে ইচ্ছে হবে, অথবা মদ, ওকে ছেড়ে দিতে হবে বারণ না করে?'

'নিশ্চয় ! সেটাই তো শিক্ষার পরীক্ষা।'

সুজাতা রেগে যেতো।

বলতো, 'পরীক্ষাটা কার শুনি ? মনে হচ্ছে যেন আমারই।'

'তোমার আমার দু'জনেরই। এমন ছেলে যদি তৈরীই করে তুলি আমরা, যার ওই সব খারাপ ইচ্ছেগুলো হবে, তাহলে বুঝতে হবে, আমাদের তৈরীতেই ত্রুটি আছে।'

'শিক্ষাটা লোকে বিধিনিষেধ বাধা এইসব দিয়েই দেয়।'

'আমি ওটা মানি না। আমি মানি এমন নিখুঁত মন তৈরী করে দিতে হবে, যাতে মন্দ জিনিসগুলো মন্দই লাগবে ওর।'

বলাবাহুল্য বাবার এই উদারতার বাণী, এবং বেপরোয়া ছাড়পত্রে শিশুমনের নিক্তির কাঁটা বাবার দিকেই ঝুঁকতো, সুজাতা ভিতরে ভিতরে একটা গভীর শূন্যতা বোধ করতো।

অন্তত সুজাতার তাই মনে হতো।

সুজাতা ভাবতো ও আমার কাছ থেকে ছেলেটাকে ভাগিয়ে নিয়ে রেখেছে, ও আমাকে ছেলের সবটা পেতে দেয় নি। এটা ওর দুষ্টুবুদ্ধি; এটা ওর কৌশল। ছেলে মার থেকে বাপকে বেশী ভালবাসে, এমন ঘটনা বেশী ঘটে না জগতে। ও কৌশল করে এইটি ঘটিয়েছে। অমল বাবা বলতে অজ্ঞান হচ্ছে।

এর থেকে যদি—

হঠাৎ হঠাৎ মনে হতো সুজাতার, এর থেকে যদি দুটোই থাকতো। দশ আনাটা কেড়ে নিলেও, আমার ছ'আনাই থাকতো। আর তাকে আমি আমার মতো মানুষ করে ষোলো আনাই করে তুলতাম।

ওর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামতাম, ওকে হারিয়ে দিতাম। লোকে দেখতো আমারটাই বেশী ভালো।

ভেবেই আবার ঝাট ঝাট করে উঠতো সুজাতা, এ আমি কী ভাবছি, অমল কি আমার নয় ? ওই তো—আমার সবে ধন নীলমণি, আমার যথা সর্বস্ব, আমার অন্ধের চোখ, আমার রাত্তিরের আলো।

ভাবতো—

ছেলেমানুষী সখ করে অমলের সঙ্গে মিলিয়ে 'কমল' নাম রেখেছি বলে কি আর সত্যি কেউ হঠাৎ এসে পড়লে, তাকে অমলের মতো ভালো বাসবো ?

তা ভাবতেই পারে না সুজাতা।

অমলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তাকে সামনে দাঁড় করানর কথা অন্তরের মধ্যে।

শূন্যতাটা আর কিছুর জন্যেই নয়, ছেলে তেমন করে 'মা' বলে জড়ায় না বলেই এমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। মনকে এই বলে প্রবোধ দিতো সুজাতা।

কিন্তু সে আক্ষেপ তো ঘুচিয়েই দিয়ে গেলেন অরুণেশ।

অরুণেশের মৃত্যুর পর তো সম্পূর্ণ করেই পেলো ছেলেকে। ছেলেটাও বাবাকে হারিয়ে মায়ের কাছে এসে যেন আশ্রয় খুঁজতে এলো। তদবধিই তো মা আর ছেলে, ছেলে আর মা।

তবু কেন সেই অনুভূতিটা কোনখানে বসে বসে যেন কোন নদীর পাড়ের মাটি খুঁড়ে চলে।

ভাঙনের কাজ চলে তার কাজে।

সুজাতার একটা অন্তর ইন্দ্রিয় সর্বদা সজাগ হয়ে থাকে বহিঃপৃথিবীর দিকে। সুজাতা সর্বদা কেবল অমলের বয়সী ছেলেদের দেখে দেখে বেড়ায়।

ঠিক অমলের মতো দেখতো কোনো ছেলে কি হঠাৎ কোথাও চোখে পড়ে যেতে পারে না?

এক ছাঁচের মুখ, এক রকম বয়েস।

বাঙালী কি অবাঙালী, বড়লোক কি গরীব লোক, কে জানে কী তার পরিচয়! কে জানে কীভাবে সে গড়ে উঠছে! তীব্র একটা কৌতূহল যেন বেড়েই চলে। শুধু একবার যদি দেখতে পেতাম!

আমি তো আর চাইতে যেতাম না, মনে মনে ভেবেছে সুজাতা, শুধু একবার দেখতে পেলে জানতে পারতাম সে মরে যায় নি, সে আদরে যত্নে বড়ো হয়ে উঠছে।

লুকিয়ে একদিন সেই নার্সিং হোমে গিয়ে হাজির হলো সুজাতা।

অরুণেশ তখন বেঁচে।

অমল তখন বছর সাতেকের।

সেই নার্সের নাম করে খোঁজ করলো।

শুনতে পেলো সে এখন এখানে নেই, অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে গেছে।

সুজাতার বুকটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

তবে কি ধরা পড়ে গিয়েছিল সে? তাই কি চাকরী গিয়েছিল তার?

না না, তা নয়, অন্যত্র ভালো অফার পেয়ে চলে গেছে।

ফিরে এল।

কিন্তু সেই অন্যত্রটার চিন্তা গেঁথে রইলো মনে।

অরুণেশ মাঝে মাঝেই কোম্পানীর নানা কাজে বাইরে যেতো, আজ দিল্লী, কাল লক্ষ্ণৌ, পশু বম্বে, তর্শু মাদ্রাজ, দশ পনেরো বিশ দিন কাটিয়ে আসতো।

এমনি এক কুড়ি দিনের সুবর্ণ সুযোগ সুজাতাকে আবার চঞ্চল করে তুললো। সুজাতা গাড়ি আর ড্রাইভার নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

একবারের চেষ্টায় হয় না।

বারবার চেষ্টা করতে হয়।

কখনো শোনে ডিউটিতে নেই, কখনো শোনে বাড়ির ঠিকানা কেউ জানে না।

ফিরে ফিরে আসে।

তারপর একদিন দেখা হলো।

বললো, 'আমায় দেখে বোধ হয় অবাক হলেন?'

নার্স একটু গম্ভীর হাসি হেসে বললো, 'মোটেই না। বরং এতোদিন পর্যন্ত না দেখে অবাক হচ্ছিলাম। যদিও কথা তা ছিল না।'

'জানি। কোনোদিন খোঁজ করবো না যা শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন। তবু এলাম বেহায়ার মতো। অনেক খুঁজেছি। সেই ঘটনার পরই বুঝি ছেড়ে চলে এলেন?'

'অনেকটা তাই। অবিরতই কেমন একটা অস্বস্তি হতো।'

'এবার বলুন?'

'কী বলবো?'

'যা জানতে এসেছি।'

নার্স গম্ভীর ভাবে বললো, 'কিন্তু আমি আপনাকে কী জানাবো? আমি তো নিজেই জানি না।'

'আপনি নিশ্চয় জানেন।'

'বলছি জানি না। কেমন করে জানবো বলুন?'

সুজাতা বললো, 'একটু বসতেও বলবেন না?'

'আমাকে তো এক্ষুনি বেরোতে হবে।'

'হোক! আমার জন্যে একটু সময় দিন, দোহাই আপনার। একবার শুধু ঠিকানাটা বলুন।'

'আমি কি সেই ঠিকানা তুলে রেখেছি?'

'তুলে রাখেন নি?'

সুজাতা যেন নার্সের দুর্ব্যবহারে বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে। 'ঠিকানাটা রাখেন নি।'

নার্স কঠিন গলায় বলে, 'কেন রাখবো বলুন?'

'বাঃ কেন কী!' সুজাতা অসহায় চোখে তাকিয়ে বলেছিল, 'না, মানে এমনি।'

'এমনি কোনো কাজ করবার আমাদের সময় কোথায়?'

'সিস্টার! আপনি নিশ্চয় জানেন।'

'আশ্চর্য, এ রকম অদ্ভুত কথা বলছেন কেন? আমার কী প্রয়োজন থাকতে পারে? সেটা ভেবে দেখেছেন?'

সুজাতা একেবারে নিভে যায়।

সেই নেভা গলায় বলে, 'তা তো ঠিক। তবে ভাবছিলাম যদি আপনার পুরনো কোনো ডায়েরি কি নোটবুকে কিছু 'টোকা' থাকে—'

'না তেমন কিছু নেই।'

নার্সকে সত্যিই সেই বিখ্যাত নার্সিং হোমটির চাকরী ছাড়তে হয়েছিল সুজাতার জন্যেই।

কেউ ওকে কিছু বলেনি সত্যি, কিন্তু বেশ কয়েকজন তো সাক্ষী ছিল। অথচ তাদের কোনো দায়িত্ব ছিল না। জানাজানি হয়ে গেলে সম্পূর্ণ দায়িত্বটা নার্সের ওপরই পড়তো।

যদি সুজাতার কল্পনা মতো সেই রাত্রেই কোনো প্রসূতির পক্ষে কোনো দুর্ঘটনা ঘটতো, কেউ মৃত সন্তান প্রসব করতো, তাহলে হয়তো ব্যাপারটা খানিকটা হালকা হয়ে যেতো। কিন্তু এ যে একের সন্তান অপরকে বিক্রী করা। এবং বেশ মোটা টাকার বিনিময়ে।

এর বড়ো অপরাধ আর কী আছে!

কে বিশ্বাস করবে ওর মা নিজেই বিলিয়ে দিয়েছে। কে বলতে পারে তেমন ক্ষেত্রে শ্রীমতী সুজাতা দেবী সেই সত্য কথাটা অস্বীকার করে বসবেন কি না।

নার্স তাই অন্য ছুতোয় সে জায়গা ত্যাগ করেছিল।

কিন্তু তেমন মনের মতো কাজ আর পায় নি।

তাই সুজাতার প্রতি প্রসন্ন থাকা সম্ভব হচ্ছিল না তার।

সুজাতা কথা খুঁজছিলো, সেই অবকাশে নার্স বললো, 'আমায় এবার যেতে হবে।'

ব্যস্ততার প্রমাণ দেখাতে, হাতের কব্জি চোখের সামনে তুলে ঘড়িটা দেখে নিলো।

সুজাতা হঠাৎ বলে বসলো 'আমি যদি ওখানের অন্য নার্স-টার্সদের কাছ থেকে জোগাড় করে নিই?'

নার্স কড়া গলায় বললো, 'সে চেষ্টা করবেন না। বিপদে পড়বেন।'

'আপনি আমায় ভয় দেখাচ্ছেন?'

'ভয় দেখাবার কথা হচ্ছে না, যা সত্য তাই বলছি। কিন্তু এও বলি—এখন হঠাৎ আপনার মাতৃস্নেহ উথলে উঠলো যে!'

সুজাতা চমকে গেল। সুজাতা এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

সুজাতা বললো, 'সুযোগ পেয়ে অপমান করে নিচ্ছেন?'

'অপমান করে নেবার জন্যে নয়। তবে আশ্চর্য হচ্ছি বৈ কি।'

'মায়ের প্রাণ বোঝবার ক্ষমতা আপনার নেই সিস্টার!'

'অনেক মায়ের প্রাণ দেখলাম মিসেস মিত্র। দেখতে দেখতে পৃথিবীকে চিনে ফেলেছি। তবু সেদিন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আপনার আবদারে। ভাবতে পারি নি কোনো ভদ্র ঘরে, অবস্থাপন্ন ঘরে, কোনো মা ছেলে বিলিয়ে দিতে আগ্রহ করে।'

মাথা হেঁট করে চলে আসছিল। নার্স হঠাৎ আবার ডাকলো। বললো, 'বৃথা মন খারাপ করবেন না। আমার বিশ্বাস সে বেঁচে নেই। কারণ তার জীবনীশক্তি খুব কম ছিল।'

'কম থাকলে কেউ নেয়?'

'নেয়। না থাকলে যা পায় তাই নেয়। হয়তো ভেবেছিল সারিয়ে তুলবে।'

'সেটাও তো সত্যি হতে পারে।'

'হতে সবই পারে। তাহলে আপনার ছেলে পৃথিবীর কোনোখানে না কোনোখানে আছে।'

বলে গটগট করে চলে গিয়েছিল নার্স।

কিন্তু—

সুজাতা কি ভাববে তার জীবনীশক্তি কম ছিল? ভাববে পৃথিবীর কোথাও কোনোখানে অমলের মতো আর একটা ছেলে দেখতে পাওয়া যাবে না! সুজাতা যার নাম রেখেছে 'কমল'।

অরুণেশ বলতেন, 'তোমায় নিয়ে রাস্তায় বেরোনো তো দারুন বিপদ। সব সময় তুমি রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করিয়ে কী দেখো বল তো?'

'কী আবার দেখবো? হয়তো ফেরিওলা, কি ফুটপাতের দোকান-টোকান, কিম্বা কোথাও কোনো সুন্দর ছেলে-টেলে—'

'সুন্দর ছেলে!' হেসে উঠলেন অরুণেশ, 'তোমার ছেলের চাইতে সুন্দর আর কেউ আছে কি না, দেখে নিয়ে বুঝি ছেলেকে 'বিউটি কমপিটিশানে' পাঠাবে?'

'কমপিটিশানে পাঠাতে যাবো কোন দুঃখে?'

সুজাতা মুখে বলেছে, 'আমার ছেলের চাইতে সুন্দর ত্রিভুবনে আছে না কি?' আর মনে মনে বলেছে, খুঁজে বেড়াচ্ছি শুধু আমার ছেলের 'মতন।'

ওই 'মতন'টাই হলো ধ্যান জ্ঞান।

শয়নে স্বপনে, উঠতে বসতে।

অমলের বয়সী ছেলেদের যেন ভগবান ভাবে সুজাতা।

অমলের বয়েস বাড়ছে, সুজাতার বাড়ছে না। সুজাতা এখনো অমলের বয়সী ছেলেদের কোথায় কোথায় দেখা যেতে পারে তাই খুঁজে বেড়ায়।

বছরে বছরে দিকে দিকে বেড়াতে যায়, হোটেলের ঘরে ঘরে ঘুরে, ডেকে ডেকে ভাব করে, ঠিকুজি কুলুজি জানতে চেষ্টা করে।

বয়েস জিজ্ঞেস করে।

আর অমলের বন্ধুরা এলেই সব কাজ ত্যাগ করে দেখতে যায়।

সম্প্রতি অমল এম, এ, পড়া ধরার পর যে কটি নতুন বন্ধু জুটেছে, তার মধ্যে একটি ছেলে যেন অনেকটা অমলের মতো দেখতে! হাব ভাব, চলা ফেরা।

কিন্তু মুখ চোখ?

সেটা তো তেমন স্পষ্ট করে কিছুতেই দেখতে পাচ্ছে না সুজাতা। জানলার পাখি তুলে কি তেমন করে দেখা যায়?

হয়তো বা পিছন করেই বসে।

হয়তো বা ওকে আড়াল করে অন্য আর কেউ বসে!

তাছাড়া সবদিনই যে আসে তাও তো নয়।

সুজাতার তাই ওই এক কাজ হয়েছে।

যার জন্যে আজ অমলের কাছে অপমানিত হলো।

অমলের চোখে সত্যিকার বিরক্তি।

অমল অভিযোগ করলো, মা পাহারা দেয়।

অমল মনের গভীরে আরো কিছু ভাবছে কি না তাই বা কে জানে!

বয়েস হচ্ছে, কতো রকম নাটক নভেল পড়ছে, কতো রকম সিনেমা দেখছে।

কে বলতে পারে মার সম্পর্কে—

সুজাতা যেন মরমে মরে যায়।

সুজাতার মনে হয় এই বিছানা থেকে আর যেন না উঠতে হয় সুজাতাকে। যেন সুজাতার আজ থেকে কঠিন অসুখ করে; যেন মরে যায়।

এধরনের ইচ্ছে সুজাতার জীবনে নতুন নয়। অরুণেশের ব্যবহারে অভিমান হলেই সুজাতা ভাবতে বসতো যেন ও এসে দেখে আমি মরে গেছি।

আজ ছেলের নির্মম ব্যবহারে ভাবতে বসলো।

আর ভাবলো নির্মম তো হবেই। কেমন লোকের ছেলে!

'এ কী মা, এখন শুয়ে যে?'

'মা'!

অমলের এই 'মা' ডাকটা বড়ো সুন্দর। ও যেন ওই একটা অক্ষরকেই একাধিক অক্ষরের ভরাটি ভাবটা নিয়ে আসে। শব্দটার শেষে ড্যাস টেনে এগিয়ে নিয়ে যায় আনন্দের অনুভূতি লোকে।

এমন করে না ভাবুক সুজাতা, একথা ভাবে অমুর 'মা' ডাকটা যেন প্রাণের ভেতর গিয়ে পৌঁছয়।

তেমনি করেই তো ডাকলো অমু এখনও।

একটু আগে যে মাকে বকে গেছে, ধিক্কার দিয়ে গেছে,তা তো মনেও হচ্ছে না ওর গলার স্বরে।

তার মানে ভুলে গেছে।

তার মানে ওর গঙ্গাজলে ধোয়া মন কখন ঝরঝরে হয়ে গেছে।

আর সুজাতা?

ছি ছি!

সুজাতা এতোক্ষণ ধরে কী ভেবে মরছে!

সুজাতা লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বসলো। তাড়াতাড়ি বললো, 'মাথাটায় বড়ো যন্ত্রণা হচ্ছিল যে—'

তাকিয়ে দেখলো ছেলের মুখের দিকে।

সরল পবিত্র আলো জ্বলা আলো জ্বলা মুখ। যার জন্যে ছেলেবেলায় সবাই বলতো 'চাঁদের মতো ছেলে।'

এই ছেলের মনের মধ্যে কোনো খারাপ জিনিস থাকতে পারে নাকি!

সুজাতা তাই বললো, 'কেন যে হঠাৎ এ রকম—'

'হঠাৎ তো মোটেই নয় মা। নিশ্চয় তোমার সেই সম্প্রদায়ের কারো জন্যে সোয়েটার বুনছিলে সারাদিন, না ঘুমিয়ে-টুমিয়ে।'

কথাটা মিথ্যে নয়, সোয়েটার বোনা সুজাতার একটা বাতিক। আত্মীয়-স্বজনদের সবাই তো বটেই, পাড়া-পড়শীর ঘরের ছেলে মেয়েরাও সবাই সুজাতার হাতের সোয়েটার পরে মানুষ। এবং সুজাতার বামুনদির নাতি। সত্যর মার সত্য ও নিত্যানন্দ ও তস্য ভ্রাতা কেউই বাদ যায় নি তার পশমের প্রসাদ থেকে।

কিন্তু আজ তো তা নয়।

আজ সুজাতা যা বুনছিলো তা পশম দিয়ে নয়।

সুজাতা বললেন, 'কী যে বলিস! এখনো শীত পড়ে নি, পশম কোথায় দেখছিস? এমনি শুধু শুধু—'

'তবে বোধ হয় রাগ—'

অমল মার কাছে বসে পড়ে।

সুজাতা ম্লান হাসেন, 'কী যে বলিস! রাগ কিসের?'

মার মুখটা এতো ক্লান্ত মলিন কেন?

নিজের প্রতি বেজায় রাগ হয়ে যায় অমলের। নিশ্চয় সেই তখনকার ব্যাপারে। গোঁয়ারের মতো বলে বসলো একটা কথা। এমনও তো হতে পারে অমন বন্ধুদের নিয়ে মত্ত থাকলে, মা খুব নিঃসঙ্গতা বোধ করেন। সত্যি আগে আগে তো স্কুল থেকে এসে মার সঙ্গেই গল্প করতো কতোক্ষণ। এখন ঠিক তা হয় না। প্রায়ই বন্ধুরা সঙ্গে আসে।

অমল বলে ওঠে, 'আচ্ছা মা, ছোট মাসিরা আর আসে না কেন?'

সুজাতা ম্লান মুখে বলে, 'সকলেরই সংসার বাড়ছে, ঝামেলা বাড়ছে।'

সুজাতা বোঝে এ কথা অমলের নিজের প্রেরণা থেকে নয়। মার সঙ্গে গল্প করবো এই সংকল্প থেকে।

সুজাতার মায়া হয়। সুজাতা বিগলিত হয়।

সুজাতার ভয় ভাঙে।

বলে, 'একটা কথা তোকে বলবো বলবো ভাবছিলাম। তা তুই বলতেই দিলি না। পাহারা দেওয়া-টেওয়া যা সব বললি!'

অমল মার বিছানায় গা গড়িয়ে বলে, 'আমার কথা বাদ দাও। আমি তো তোমার পাগল ছাগল ছেলে। কী বলবে বলছিলে বল?'

'বলছি তোর ওখানে ওই যে ফর্সা মতন ছেলেটি বসেছিল, ওটি কে?'

প্রশ্নটা অবশ্য ঠিক হল না। সেটা বুঝলো সুজাতা। 'ওটি কে?' কথাটার অর্থ কী? অমল তো বলবেই 'ওটি আমার বন্ধু।'

তবু ওটাই বলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গেই জবাব এসে গেল, 'ফর্সা মত, ত্রিভুবনে আমি ছাড়া আর কোনো ছেলেকে তোমার ফর্সা বলে চোখে লাগে?'

সুজাতার বুকটা কেঁপে ওঠে।

সুজাতা সাবধানে বলে, 'তোর মত বলেই তো লেগেছে। তাই তো জিজ্ঞেস করছি। কী নাম ওর?'

'ওর নাম উজ্জ্বল বোস। সাংঘাতিক ভালো ছেলে।'

সুজাতা আস্তে আস্তে অগ্রসর হয়। 'তোর সঙ্গে বুঝি এই ইউনিভারসিটিতে এসে আলাপ?'

'হ্যাঁ। একদিনেই আলাপ করে নিলো।'

'দেখলেই বোঝা যায় ভাল ছেলে। আমি তো ওই একটুখানি দেখেছি। মনে হচ্ছে যেন মায়া পড়ে গেছে।'

'অতি উত্তম কথা। একদিন ডেকে আনি, খাইয়ে দাও।'

এটা কিন্তু অমলের রীতি-বিরুদ্ধ কথা।

সুজাতা তো চায় ছেলের বন্ধুদের খাওয়াতে, তাদের যত্ন করতে।

অমল তো তার বন্ধুদের বাড়ির মধ্যে ডেকে এনে মাথামাথি করতে ভালবাসে না। ওই বিষয়ে অমলের অহেতুক একটা লজ্জা।

মা যদি বলে, 'হ্যাঁ রে, অতোক্ষণ বসে গল্প করলো ছেলেগুলি, তা তাদের একটু খাওয়াতে টাওয়াতে হয় তো? আমি ভাবছিলাম—'

অমল হাঁ হাঁ করে ওঠে। 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। ও সব কিছু করতে হবে না।'

অমলের ধারণা ওই খাওয়ানো টাওয়ানো করতে গেলেই ওরা অপ্রতিভ হয়ে আর আসবে না। মাকেও তো জানে, মার হাত দরাজ, মন উদার, খরচ সম্পর্কে দিলদরিয়া। একটু চা দিতে বললেও নির্ঘাৎ ওর বন্ধুদের জামাই আদর করতে বসবেন।

তার থেকে কিছু না করাই ভালো।

অথচ আজ থপ্ করে বলে বসলো, 'একদিন ডেকে আনবো, খাইয়ে দিও।'

তার মানে মাকে করুণা করলো।

বকে-টকে লজ্জা হয়েছে তাই।

সুজাতা এটুকু বুঝতে পারলো, ও সুযোগটা ছাড়লো না। সুজাতা বললো, 'বেশ তো ডেকে নিয়ে আসিস। আমার তো ইচ্ছেই করে। সংসারে কতো জিনিস, তুই একটা মাত্র ছেলে—' হঠাৎ গলাটা ধরে যায় সুজাতার। একটু কেসে নিয়ে বলে, 'তাও তো তেমনি খাওয়ার ছিরি! ভালো ভালো জিনিস কেবলই ঝি চাকরে খাচ্ছে।'

'ওদের তো ভালো খাওয়ানো উচিত মা।' অমল সোৎসাহে বলে, 'ওরা ভালো জিনিস খেতে পেলে যতো খুশি হবে, তার দশভাগের একভাগ খুশিও কি আমরা কি হবো? অথচ তোমাদের রীতিই হচ্ছে তেলা মাথায় তেল ঢালা। এই তোমার নিজের বোনের বাড়িতেই তো কী অপূর্ব ব্যবস্থা! যে লোকটা চপ কাটলেট মাংস পোলাও রাঁধবে, খাবার সময় তার ভাগ্যে জুটবে খেঁসারির ডাল, আর তেলাপিয়া মাছ।'

'সে তোর মেসোর ব্যবস্থা, আমার বোনের নয়।'

অমল হেসে ওঠে।

বলে, 'এতোদিনেও মেসোকে নিজের ব্যবস্থায় আনতে পারলেন না। তবে তিনি কিসের মাসি?'

হাসি ওঠে ঘর ভরে।

তারপর কথা ওঠে, কবে খাওয়ানো হবে অমলের বন্ধুদের।

'ব্যস্ত কি! কোরো একদিন।'

'না রে, দেরী করে লাভ নেই। এরপর তোদের একজামিনের পড়া পড়বে।'

অতএব চটপট।

অতএব সামনের রবিবারেই।

বিপদে পড়লো অমল।

খাল কেটে কুমীর এনেছে। এখন কামড় খাওয়া ছাড়া গতি নেই। মা কি একদিনে ছাড়বে? একদিন বাঁধ ভাঙলেই নিত্য ডাকবে। আর সবাইকে ধরে ধরে তাদের ঠিকুজী কুলুজী জানতে বসবে। ওই ভয়েই আরো মাকে অন্দরের বাইরে আনতে চায় না অমল।

কার কি বয়েস, কোথায় জন্মেছে, সে তার মায়ের বড় ছেলে না ছোট ছেলে, এতো কথা জানবার দরকার কী?

অথচ মার দরকার আছে।

মার কৌতূহলের নেশা কাটবে না কোনোদিন।

'কিন্তু নেমন্তন্নর উপলক্ষটা কী?'

'উপলক্ষ আবার কি! এমনি! বলবি আমার মার ইচ্ছে।'

অমল হঠাৎ হেসে উঠে বলে, 'ডাকবো, তুমি আবার সেই তোমার কৌতূহল চরিতার্থ করতে বসবে না তো?'

'তার মানে?'

'মানে, তাদের নাম-ধাম, জাত-গোত্র-কুলশীল, বংশ-পরিবার, সব কিছুর খোঁজ নিতে বসা। তুমি বাবার বড় ছেলে কিনা, ছেলেবেলা থেকে কোলকাতায় আছো কিনা, ওঃ মাথায় এতো আসেও।'

'ঠিক আছে, বলবো না ওসব। বুড়োসুড়ো হয়ে গেছি বাপু। অন্য কথা-টথা সব ভুলে গেছি, ওইগুলোই মনে পড়ে।'

'এটি কিন্তু তোমার বানানো কথা মা। বুড়ো হবার অনেক আগে থেকেই তোমার এই প্রকৃতি। স্কুলে থাকতে যা লজ্জা করতো। ছেলেরা বলতো, 'তোর মা এতো সব জিজ্ঞেস করেন, যেতে ভয় করে।'

আশ্চর্য!

সবাইকে ধরে ধরে ওকথা জিজ্ঞেস করতো কেন সুজাতা?

সুজাতা কি পাগল?

হয়তো কিছুটা তাই।

তীব্র আকাঙ্খার এ এক বিকৃত প্রকাশ। ও না হোক, ওর জানা-টানা কেউ তো এমন থাকতে পারে যাকে না কি তার মা-বাপ অপর একজনের বদান্যতা থেকে পেয়েছে।

তাছাড়া আরও একটা অদ্ভুত কথা, সুজাতা না কি কবে কোন প্রবন্ধে পড়েছিল, যমজ হলেই যে একই রকম দেখতে হবেই, এমন কোন কথা নেই। সম্পূর্ণ বিপরীত চেহারার নজীরও থাকে।

সুজাতা যদি সেই নজীর স্থাপন করে থাকে।

হয়তো সবটাই এটা নয়।

হয়তো ওই কৌতূহলটা একটা নেশার মতো হয়ে গেছে।

কিন্তু ওদিকে যে পৃথিবীর রং বদলাচ্ছে। তা পৃথিবীই বলা যায়।

সুজাতার কাছে ওই অমল নামের ছেলেটাই তো 'পৃথিবী'।

তার রং বদলাচ্ছে।

সে বড় হচ্ছে!

সে প্রতিটি ব্যাপারে মাকে নিয়ে বিব্রতবোধ করছে।

অনেকদিন পরে ছোট ভগ্নিপতি এলো সুজাতার। অমলের ছোট মেসো যাকে নিয়ে অমলের বাবার অনেক তাস খেলার ইতিহাস আছে।

সুজাতা বলতো, 'তোমরা যে বাজি ধরে তাস খেলো, ওকেই তো জুয়া খেলা বলে।'

ভগ্নিপতি তখন বলতো, 'জুয়া কে না খেলছে? আপনি খেলেন না?'

'আমি! আমি জুয়া খেলি?'

'নিশ্চয়! জীবনটাই তো বিরাট একটা জুয়া খেলা। আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ্য, বয়েস, আনন্দ সবকিছু বাজি ধরে খেলতে বসি আমরা, চাই শুধু 'সাফল্য'। মানে সেই আধি ভৌতিক, আধি দৈবিক অজানিত বস্তুটি। বলুন তো কজনের হাতে এসে ধরা দেয় সত্যিকার সাফল্য? মানে সে যতটা আশা করে।'

সুজাতা বলতো, 'আশার তো শেষ নেই বাবা।'

'তার নামই জুয়া। এই তাস খেলা-টেলা হচ্ছে আমাদের জীবনের প্রতীক।'

'তোমার কথা আমি মানি না'—সুজাতা বলতো, 'সবাই কিছু আর সর্বস্ব বাজি ধরে জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে বসে না।'

'বসে, বসে, জানতে পারা যায় না।'

সুজাতার বোন সবিতা বলতো, 'কথা রেখে খেলো তো!'

সবিতার তাসের দারুণ নেশা।

অথচ সুজাতা বলতে গেলে তাস চেনেইনা।

পিঠোপিঠি দুই বোন, মাত্র বছর দেড়েক সময়ের ব্যবধানে পৃথিবীর আলো দেখেছে, অথচ দুজনের মনোপ্রকৃতিতে কী আকাশ পাতাল ব্যবধান!

সবিতার বাড়িতেই চাকর-টাকরদের জন্যে খেঁসারি ডাল আর তেলাপিয়া মাছের বরাদ্দ।

তাহলে দুই যমজ ভাইও একেবারে দু-রকম হতে পারে। প্রকৃতিতে তো বটেই, অপ্রকৃতিতেও পার্থক্য থাকা অসম্ভব নয়।

অতএব 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখিও তাই—'

তপন বললো, 'দূত হয়ে এলাম।'

সুজাতা হাসলো, 'তাসের আড্ডা ভেঙে গিয়ে পর্যন্ত দূত হয়ে ছাড়া নিজে থেকে আর আসো কই?'

'বড্ড খোঁটাটা দিলেন! অপরাধ স্বীকার করছি। ভরসা এই দূত অবধ্য। এখন শুনুন আপনার কনিষ্ঠার হঠাৎ খেয়াল হয়েছে. অনেক দিন দুই ভগিনীতে সিনেমা দেখা হয় নি, তাই বলে পাঠালেন. চারটে টিকিট কাটা হয়েছে, অনুগ্রহ করে সপুত্র চলে আসবেন। একসঙ্গে যাওয়া হবে।'

সুজাতার মনে পড়লো সত্যিই বটে অনেক দিনই এসব আমোদ আহ্লাদ বন্ধ হয়ে গেছে।

অরুণেশ মারা যাবার পর দিদির মন ভালো করবার জন্যে প্রায়ই চলে আসতো সবিতা, ধরে নিয়ে যেতোই সিনেমা থিয়েটারে।

তারপর থেকে ওটাই যেন নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। হয় ওরা এসে তুলে নিয়ে যেতো, নয় এরা গিয়ে তুলে নিয়ে যেতো ওদের।

এর মানে অবশ্যই সুজাতা আর তার পড়ুয়া ছেলেটা। কিন্তু সুজাতা গেলে তার আর যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। অরুণেশের মৃত্যুর পর যে দু-একটা মোটা খরচ বর্জন করেছিলেন সুজাতা, তার মধ্যে ড্রাইভার হচ্ছে একটি।

গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতো অমল।

নতুন লাইসেন্স পাওয়া অমলের তখন গাড়ির স্টিয়ারিঙের প্রতি তীব্র আকর্ষণ। অতএব উৎসাহ প্রবল।

আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে গেল সেই ধরনটা। সবিতাদের আর বেশীদিন অন্যকে সঙ্গ দেওয়ার জন্যে সময় ব্যয় করাটা চালানো সম্ভব হলো না। অমলের পক্ষেও ক্রমশ আর সম্ভব হলো না। সব সময় মাকে বয়ে বেড়ানো।

ওর পড়া বাড়লো, বন্ধু বাড়লো, আকর্ষণের জিনিস বাড়লো।

দুই বোনেব মধ্যে আসা যাওয়ার সমারোহের রং ধূসর হয়ে এলো।

অনেক দিন পবে আজ তপন এলো সেই আগেকার মতো, ভালো লাগলো খুব সুজাতার। বললো, 'আমি ভেবে রেখেছি তুমি এখন পুরো 'বেনে' বনে গেছো, দোকান ছাড়া আর সব কিছু বিসর্জন দিয়েছো।'

'খুব ভুল ভাবেন নি। তবে নেহাৎ নাকি আপনার বোনটি স্কন্ধে চেপে আছেন, তাই মাঝে মাঝে ভূত ছাড়িয়ে ছাড়েন।'

সাধারণ কথা, মোটা রসিকতা, তবু যেন খানিকটা প্রাণের জোয়ার বয়ে আনলো তপন। সুজাতা উৎসাহ দেখালো। বললো, 'ছবিটা কী?'

'তা জানি না। এইটুকু শুধু শুনেছি--আপনাদের পরম আদরের কোন এক কুমার আছেন, এবং একটি দ্বৈত ভূমিকায় আছেন।'

'কী ভূমিকায়?'

'দ্বৈত। মানে আর কি, দু'জনের ভূমিকায়। যমজ দুই ভাইয়ের 'রোল' একাই করছে। এই পর্যন্ত আমার শোনা।'

যমজ দুই ভাইয়ের।

সুজাতার হঠাৎ মনে হলো এ বোধ হয় বিধাতার আর একটা পরিহাস।

সুজাতা যখন অমলের এক নতুন বন্ধুকে দেখে দুরন্ত এক সন্দেহে বিচলিত হচ্ছে, ঠিক তখনই সবিতা একটা যমজ ছেলের কাহিনীর ছবি দেখাতে চেয়ে ডাক দিলো সুজাতাকে।

কেমন সেই কাহিনী, কী তার সমস্যা, কৌতুক গল্প না গম্ভীর গল্প, কিছুই জানা গেল না। তবু সুজাতার মন উতলা হলো।

'যমজ ছেলে,' এই শব্দটাই যেন কোথায় গিয়ে ধাক্কা মারে।

ছবিটা দেখে এসে ভয়ানক বিচলিত হয়ে উঠলো সুজাতা, সুজাতার মনে হলো এই দেখাটা বিধাতার নির্দেশিত। ছবির নায়কের মা সত্যিকার মা, তার বক্ষচ্যুত একটা

ছেলেকে জীবনে আর দেখতে পেলো না—মরেই গেল, এই মর্মান্তিক ঘটনাটার ছবি তার জন্যেই তৈরী হয়েছিল।

অমল বললো, 'তুমি যে ছবি দেখে অবশ হয়ে গেলে মা! এই সব অবাস্তব ছবি কেন যে করে লোকে? যতই যমজ হোক, সম্পূর্ণ পৃথক পরিবেশে মানুষ হলে, কখ্‌খনো সেই যমজের দু'জনের এমন সাদৃশ্য থাকতে পারে না যে, যারা সারাক্ষণ দেখছে, তারা গুলিয়ে ফেলবে। পরিবেশই মানুষকে গড়ে মা! ভিতরে তো বটেই, বাইরেও।'

'বাইরে কেন?'

সুজাতা উত্তেজিত হয়ে ওঠে, 'বাইরেটা পরিবেশের প্রভাবে বদলাবে কেন? নাক মুখ চোখ পরিবেশে বদলায়?'

'বদলায় মা! এই তোমার এমন্ তিলফুল নাসা, যাও তিব্বতে গিয়ে থাক গে কিছুদিন, থেবড়ে যাবে।'

'যাবে! বলেছে তোকে!'

'যায় মা! ভাব-ভঙ্গী ধরন-ধারন গলার স্বর এরাই তো মানুষকে চেনায়।'

'তার মানে তুই বলতে চাস, ওর মা ওকে দেখলে চিনতে পারতো না?'

'চট্ করে নয়।'

সুজাতা হঠাৎ তর্ক ত্যাগ করে উদাস গলায় বলে, 'মায়ের মন বোঝবার ক্ষমতা থাকলে তো!'

এমনিতেই সুজাতার মন চঞ্চল।

ছবিটা সুজাতাকে আর একটু চঞ্চল করে তুললো।

সুজাতার অবিরত মনে হতে লাগলো, কাহিনীকার ওর প্রতি অত্যন্ত অবিচার করেছেন, ওর মাকে একবার অন্ততঃ ছেলেকে দেখানো উচিত ছিল।

কেউ কি এমন অবোধ থাকে যে, বিশ পঁচিশ বছর পরে একটা আস্ত মানুষের ওপর হঠাৎ দাবি জানাবে!

দাবি-টাবি কিছুই নয়, শুধু একটা কৌতুহল। শুধু একবার দেখা বেঁচে আছে কিনা, ভালো আছে কি না।

আমি তো নাটকের নায়িকা নই, ভাবলো সুজাতা, তবে কী করে অমন একটা অদ্ভুত নাটুকেপনা করেছিলাম।......

আমি মা হয়ে আমার দুটো ছেলের একটাকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম। কেন? না নিজের স্বার্থের জন্যে, নিজের আরাম আয়েসের জন্যে, নিজের বন্ধন মুক্তির জন্যে, আমার ছেলে বিলিয়ে দিয়েছিলাম আমি।

আমি অবৈধ সন্তানের মায়ের মতো ব্যবহার করেছিলাম।

নার্স আমাকে ধিক্কার দিয়েছিল।

দেবেই তো! মুঠো করে ধুলো দেওয়া উচিত আমাকে।

উচিতই তো।

বুদ্ধির ভুলে যদিই বা লুকিয়ে ভয়ঙ্কর একটা অন্যায় করেই থাকি, পরে কেন স্বামীর কাছে স্বীকার করি নি? কেন কেঁদে পড়ে বলি নি, যেমন করে পারো তাকে নিয়ে এসো!

বলি নি।

আমি বকুনি খাবার ভয়ে চুপ থেকেছি। তবু আমি না কি মা!

দিন যতো এগোচ্ছে, সুজাতার ব্যাকুলতা ততো বাড়ছে। এ এক হৃদয়-রহস্য। এখন সুজাতার অহরহ মনে হচ্ছে বড়ো হওয়া ছেলে, তার তো সর্বত্রই ঘোরা উচিত।

কিন্তু সে যে এই কলকাতাতেই থাকবে, সুজাতার বোধগম্য ভাষায় কথা বলবে, সুজাতা যাতে দেখেই চিনতে পারে, তেমন পোষাক পরবে, এমন তো না হওয়াই সম্ভব।

কে বলতে পারে একজনের সেই হঠাৎ পাওয়া ছেলেটা বাংলা থেকে বহুদূরে পাঞ্জাবের কি মধ্যপ্রদেশের, উত্তর ভারতের কি দক্ষিণ ভারতের কোন পরিবারে লালিত হচ্ছে।

সুজাতা প্রাণপণে তাই ভাবতে থাকে এক এক সময় বৃথা খুঁজে বেড়াই তাকে। বৃথা আশায় 'মানুষ' সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করে মরি। সে আমার কাছ থেকে বহুদূরে চলে গেছে। আমি তাকে কোল থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি, আবার কি বিধাতা তাকে আমার কোলের কাছে এনে দেবেন?

প্রাণপণে ভাবতে থাকে এই কথা, আবার অমলের বন্ধুরা আসবে খাবে, ভেবে পুলকে স্পন্দিত হয়। আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়। তারপর দিশেহারা হয়। সেই দিশেহারাটা দৃষ্টিকটু।

অমলের চোখে ওই দিশেহারা ভাবটা বিষ লাগছিল। সেটা হচ্ছিল মাত্র এক জনকে নিয়ে। উজ্জ্বল বোস। উজ্জ্বল বোস ছাড়া আর যেন কেউ নেই সেখানে।

অমল অস্বস্তিবোধ করছিল, অমল লজ্জা পাচ্ছিল। অমল বারবার মাকে অন্যদের সম্পর্কে অবহিত করিয়ে দিতে চাইছিল, 'মা, এই যে শুভেন্দু, শুধু পড়াশুনোতেই নয়, খেলাধুলোতে ওস্তাদ ছেলে। ……এই অমিতাভ, এ হচ্ছে একজন উদীয়মান কবি। অবশ্য সে কবিতা তুমি আমি বুঝতে পারবো না। …মা, এই যে ছেলেটিকে দেখছো, বেশ ষষ্ঠির বাছা, ষষ্ঠির বাছা, লাগছে না? একে একটু দেখে শুনে খাইও, বুঝলে?'

সুজাতা ছেলের এই 'বন্ধু পরিচিতি' পর্বের মাঝখানে হেসে উঠছে ঠিকই, কথাও বলছে, 'ষাট ষাট ও কথা কেন রে? তোর মতো অনাহারি থাকাই বুঝি ভালো? ……কেন রে, 'আধুনিক কবিতা' আমি পড়ি না বুঝি? বুঝি কি না জানিনা, পড়তে তো বেশ ভালই লাগে।……খেলাধুলো কর? তা' ভালো, তবে বাপু হাত-পা-গুলো আস্ত রেখো,…কিন্তু পরক্ষণেই সুজাতা পুরো আগ্রহটা উজ্জ্বল বোসের কাছে নিয়ে গিয়ে ফেলছে।……

'তুমিই বড় ছেলে?……বড় ছোট কিছু না, মাত্র একটিই ছেলে?…বাবা রিটায়ার করেছেন? কেন? বাবার তো তেমন বয়েস হবার কথা নয়, তুমি যখন এই একটিই ছেলে!'……

উজ্জ্বল হেসে হেসে বলছে, আমি মা বাবার বুড়ো বয়সের পুত্তুর। বটগাছে পাথর-টাথর বেঁধে তেত্রিশ কোটি দেবতার চরণে মাথা ঠুকে—'

অমলও অবশ্য তখন হেসেছে, 'উজ্জ্বল তো ওর ডাক নাম, পোশাকী একটি নাম আছে বেশ ভক্তিভাব মিশ্রিত, তবে এই পাকাপক্কার বালকটি স্কুলের খাতায় জোর করে ডাক নাম দিয়ে দিয়েছিল।'

সুজাতা বিহ্বল চোখে ওই ডাক নামে সার্থক ছেলেটার উজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পোশাকী নামটি কী?'

'প্রভুদান।' উজ্জ্বল হেসে বলে, 'প্রভুদান বোস,' কেমন কেমন লাগেনা শুনতে? ওই পোশাকী নামটি তাই মায়ের আলমারিতে তুলে রেখে দিয়েছি।'

'বেশ তো, হলো তো কথা।' সবাই হাসলো।

কিন্তু আবারও যদি সুজাতা ওকে নিয়েই পড়ে থাকে, যদি জিজ্ঞেস করে বসে চিরকাল, কলকাতায় মানুষ না অন্য জায়গায়? মা বাবাও তোমার মতই সুন্দর নিশ্চয়?… ঠাকুর দেবতার মানত করে এই একটিই হলো তাহলে? আর হয় নি? বোন-টোন? তার মানে সবেধন নীলমণি?

তা হলে অমলের পক্ষে সহ্য করা শক্ত হয় বৈকি।

অমলের বিরক্তি গোপনও থাকে না।

'বাবাঃ! মা, তুমি যে বেচারীকে নিয়ে পুলিশী জেরা শুরু করেছো। হঠাৎ ও কি অপরাধ করলো? আমিও তো তোমার সবেধন নীলমণি, আমারও তো বোন-টোন নেই, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?'

সুজাতা যেন ঘোরে আছে।

সুজাতা ছেলের ওই স্বরের তারতম্য বুঝতে পারে না। সুজাতা তাই বলে, 'সেই জন্যেই অবাক হচ্ছি রে! সব ঠিক তোর মতো। চেহারাও দেখ—'

সুজাতা অন্য ছেলেগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'আচ্ছা, অমলের সঙ্গে উজ্জ্বলের চেহারার অনেকটা আদল আছে না?'

ওরা বলে, 'হ্যাঁ দুজনেই এন্তার ফর্সা তো!'

'শুধু ফর্সা বলে নয়, মুখ-চোখ গড়ন-টড়ন?'

ওরা কী বলতো কে জানে, অমল তাড়াতাড়ি বাধা দিলো। বললো, 'এবার ওরা তোমায় স্রেফ পাগল বলবে।…উজ্জ্বল আমার থেকে অনেক সুন্দর।…এখন বাজে কথা রেখে খেতে-টেতে দাও দিকি। দেখি তো গিয়ে আজ তোমার রান্নাঘরের মেনু কী?'

প্রায় ঠেলতে ঠেলতেই নিয়ে গিয়েছিল মাকে। আর রান্না ঘরে এসে চাপা গলায় বলেছিল, 'আচ্ছা অতো সব বোকার মত কথা বলছো কেন বলতো? আমার মাকে ওরা পাগল ভাবুক এটাই কি তুমি চাও?'

সুজাতা শুকনো মুখে বলে, 'কেন রে, দোষের কী বলেছি? ছেলেটা তোর ধরনের দেখতে বলেই—।'

'তোমার চশমা বদলানো দরকার হয়েছে। আর ওরকম বাজে বাজে কথা বোলো না। খেতে-টেতে দাও। সবাইকে একভাবে যত্ন কোরো।'

সুজাতা একটু হয়তো সামলে যায়।

সুজাতা সকলের সঙ্গে কথা কয়, 'আরো দিই, একি এক্ষুনি 'না' কি?' এসব বলে, কিন্তু ওদের সবাইয়ের নাম মনে আনতে পারে না।

তাছাড়া চোখ?

চোখ যে অজ্ঞাতসারে বিশ্বাসঘাতকতা করে চলে। সেটা তো অন্যের চোখ এড়ায় না।

সুজাতা নিজে বুঝতে পারে না, কারণ, সুজাতার মন যে তখন অনবরত কথা বলে চলেছে, কী অদ্ভুত যোগাযোগ, নাম উজ্জ্বল। অমল বলল এটা অবশ্য মিল, কিন্তু চিরকেলে মিল, অমল—উজ্জ্বল, অপূর্ব মিল! এ মিলটা বিধাতার ইচ্ছেয় ঘটেছে।……সন্দেহ করবার আর কী আছে! পোশাকী নামটির অর্থটুকু বুঝতে পারলেই তো সব সরল হয়ে যায়… প্রভুদান!

এ ধরণের নাম ক'জন রাখে?

ঠাকুর দেবতার খো'র ধরে ছেলে হলে লোকে সেই ঠাকুরের নাম রাখে। হরিদাস, কালীচরণ, দুর্গাপদ, রামকিঙ্কর এমনি কিছু। কিন্তু ওই 'প্রভুদান' নামটি অন্য ধরনের।…… প্রভু দান করেছেন। 'দান' কথাটার অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় দেওয়া। চেয়ে পাওয়া নয়।….. প্রভু নিজে থেকে দিয়েছেন।……

আমি ওর জন্মের তারিখ জিজ্ঞেস করবো একদিন।……ও হয়তো কিছুই জানে না, ওর সেই পালক মা বাপকেই মা-বাপ বলেই জানে, কাজে কাজেই একটা কোনো তারিখ ধার্য করে রেখেছে ওর জন্ম তারিখ বলে।

সেই তারিখটা কী?

নিশ্চয় সেই পাওয়ার তারিখটাই। তার মানে অমলের জন্ম তারিখের তিন-চার দিন পরে। এইটা জানতে পালেই শেষ সমস্যা ঘটে।……অমলের কপালে একটা তিল আছে, ওরও গলায় একটা তিল আছে। অমলের……

'মা!' 'মা' এরা চলে যাচ্ছে।'

চমকে ওঠে সুজাতা।

তাড়াতাড়ি বলে, 'ওমা এখুনি চলে যাচ্ছে! কেন গল্প-টল্প করলি না?'

'অনেক করা হয়েছে।' শুভেন্দু বলে, 'যা ভীষণ খাওয়া হয়েছে আর বসা যাচ্ছে না, শুতে হবে গিয়ে।'

সবাই সমস্বরে ওই ধরনের বলে হৈ-চৈ করতে করতে বেরিয়ে পড়ে, অমলও। কারণ অমল পৌঁছে দেবে গাড়িতে।

'এতোটার কী দরকার ছিল ভাই?'

বললো উজ্জ্বল।

'ভাই' শব্দটায় কৌতুক মিশিয়ে।

সুজাতার মনে হলো, কী মধুর, কী মধুর! আর মনে হলো এও বিধাতার খেলা। কই আর তো কেউ অমন করে 'ভাই' ডাক ডাকলো না।

সুজাতা দরজা পর্যন্ত এলো না, তাড়াতাড়ি দোতলায় উঠে গেল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখবে বলে।

অমল যখন ফিরে এলো, তখন তার অন্য চেহারা, মুখ থমথমে, কপালে ঘাম।

ভুরু কোঁচকানো।

কারণ আছে বৈ কি।

অমলের মায়ের ওই উজ্জ্বলকে নিয়ে বড়ো বাড়াবাড়িটা তো কারো চোখ এড়ায় নি। তাই খুব হাসাহাসি করছে সবাই।

'এই অমল, তোর তো কোন বোন-টোন নেই জানি, তা বিয়ে হওয়া তুতো বোন-টোন আছে বুঝি? মায়ের ভাইঝি বোনঝি গোছের? তোর মা যে ভাবে উজ্জ্বলকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।'

অমল বলেছিল, 'থাকতেও পারে, আমার জানা নেই। আর মার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যও জানা নেই। তবে ওরা বোস আর আমরা চ্যাটার্জি এই যা।'

আরে দূর, ওতে কিছু না। আজকাল আবার ওই সব কেউ মানে নাকি? এমন সোনার কান্তি ছেলেটিকে দেখে মার বোধ হয় জামাই করে ফেলতে দারুণ ইচ্ছে করছে।'

'তাহলে আমার হিল্লেটা হয়েই গেল।'

বলেছিল উজ্জ্বল।

ওরা হৈ চৈ করে হেসে উঠেছিল। 'সে আর বলতে? এখনই যা জামাই আদরের ঘটা। আমরা যেন বাবা কালতু। রাবিশ মাল! গ্রাম কুড়োনো বরযাত্রী! উজ্জ্বল হচ্ছে সেই 'কালপ্রিট'। থুড়ি, সেই মধ্যমণি! তোর ঠিকুজী কুষ্ঠি সবই বোধ হয় জানা হয়ে গেছে ওঁর?'

তার মানে মায়ের ব্যবহারের তারতম্য ওরা লক্ষ্য করেছে। এবং ঠাট্টার ছলে সেটি শুনিয়েও দিয়েছে।

অমলের মাথা থেকে পা অবধি যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বইতে থাকে।

মায়ের ওই বিহ্বল দৃষ্টি, ওই দিশেহারা ভাব, এগুলো তো ঠিক স্বাভাবিক নয়। যেন

আচ্ছন্ন মনের বিকৃতি। ...কাউকে জামাই করবার ইচ্ছে হলে অমন অসুস্থ দৃষ্টিতে তাকায় না কেউ?

'মা'—।

অমলের সেই দীর্ঘ বিলম্বিতলয়ের ডাকটা এখন আর শুনতে পাওয়া গেল না। সুজাতার মনে হলো অমল যেন একটা হাতুড়ি মারলো!

সুজাতার বুকের মধ্যেটা কেঁপে উঠলো!

অমল ভর্ৎসনা করতে আসছে! অমল রেগে গেছে।

তখন থেকেই বুঝতে পেরেছে সুজাতা। কিন্তু কেন?

সুজাতা কী এমন বলেছে!

ছেলের একটা বন্ধু যদি অনেকটা ছেলের মতো দেখতে হয়, মানুষের কৌতূহল হতে পারে না?

সুজাতা যুক্তি এবং তর্ক শক্তিতে শান্ দেবার চেষ্টা করতে বসলো।

অমল কড়া গলায় বললো, 'তোমার আজ কী হয়েছিল বল তো?'

সুজাতা সহজ গলায় চেষ্টা করে বললো, 'কেন? কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে সেটা তোমাকেই জিজ্ঞেস করছি। কী বিশ্রী রকম বোকামি করলে আজ তুমি? প্রত্যেককেই নেমন্তন্ন করে আনা হয়েছে। হঠাৎ একজনকে নিয়েই এতো গল্প জুড়ে দিলে—কোন কিছুতে ব্যালেন্স রাখতে পারো না বলেই আমার এসব ইচ্ছে করে না। কোনো দরকার ছিল না ওদের ডাকবার। ওরা জেনে গেল অমলের মা একটি পাগল। ওই উজ্জ্বলকে নিয়ে পড়বার কারণটা কী তাও তো বুঝলাম না।...দেখতে ভালো বলে।'

সুজাতা মনের জোর খুঁজে নেন।

সুজাতা স্থির গলায় বলেন, 'দেখতে ভালো বলে নয় অমু, দেখতে ঠিক তোর মতো বলে।'

'এই আবার একটা উড়ো পাগলামি মাথায় ঢুকেছে। আমার মতন মানে?'

'মানে কি তা আমি জানি না—'সুজাতা আবার যেন তেমনি ঘরের মধ্যে চলে যায়, 'তবে আমি দেখতে পাচ্ছি অবিকল এক চেহারা দু'জনের। আশ্চর্য, কারুর যেন চোখে পড়ে নি—।'

'পড়ে নি কারণ আর কারো মাথা খারাপ হয়ে যায় নি। হতে পারে ওর চেহারার ধরনটা অনেকটা আমার ধরনের, তাতে কী হলো? হয় না এমন। তুমিই তো বলতে আমাদের যে বড় পিসেমশাই আর আমাদের বুধন গোয়ালার চেহারার ছাঁচের কোনো তফাৎ নেই। দেখলে যমজ ভাই মনে হয়। বলতে না?'

সুজাতা দমে না। সুজাতা জোরালো গলায় বলে, 'সে আমি ঠাট্টা করে বলতাম।'

'ঠাট্টা হতে পারে, তবে প্রায় একই রকম, এটা সকলে পিসিমার আড়ালে স্বীকারও

করতো। তবে? এ রকম সাধারণ ঘটনাকে নিয়ে অতো বিভোর হবার কী আছে?'

সুজাতা হঠাৎ বলে বসে, 'যদি ওটা শুধু একটা সাধারণ ঘটনা না হয়? যদি ভয়ঙ্কর একটা অসাধারণ ঘটনা হয়?'

'সমস্তটা ধাঁধা।'

অমল রুক্ষ রূঢ় স্বরে বলে, 'আমার বন্ধুদের আর ডাকা-টাকা চলবে না—'

'চলবে না? তোর বন্ধুদের আর ডাকা চলবে না?'

'না! আমার এসব বোকামি ন্যাকামি ভাল লাগে না।'

'বোকামি! ন্যাকামি!'

সুজাতা পাথরের মতো গলায় বলে, 'কী বললি তুই আমায়?'

'তুমি যা করছো তাই বলছি। আমার এসব ভাল লাগে না।'

'তোমার ভাল লাগা নিয়েই বিশ্বসংসার চলবে?'

অমল চমকে ওঠে।

অমল মায়ের গলায় এমন স্বর কখনো শোনে নি।

ব্যাপারটা তাহলে কি?

ট্রয়েডি?

ছি ছি!

চকিতের জন্যে মনে আসা কথাটাকে তাড়িয়ে পিটিয়ে ঠেলে দিয়ে অমল ভাবে, তা'হলে কি সত্যিই মাথায় কিছু দোষ ঘটেছে? কিছুদিন ধরেই যেন কেমন উল্টো-পাল্টা দেখছি মাকে। ওই উজ্জ্বল হতভাগাটাকে দেখে পর্যন্ত।

শনি-টনি, রাহু-টাহু যা সব গ্রহের কথা শুনতে পাই, তারা তা হলে আছেই বলতে হবে।

ব্যাপারটা কী তুচ্ছ, অথচ মা সেটাকে কী অপরিসীম গুরুত্ব দিচ্ছেন!

হতে পারে আমার চেহারার সঙ্গে ওর চেহারার সাদৃশ্য আছে, আমি রোগা-লম্বা-ফর্সা, উজ্জ্বলটাও রোগা-লম্বা-ফর্সা, ওর ও কালো ফ্রেমের চশমা, আমারও তাই, এই জন্যেই একরম লাগে। অথবা হয়তো আরো কিছু আছে, থাকতে পারে, কিন্তু সেটা এতই সূক্ষ্ম যে এযাবৎ আর কারো চোখে পড়ে নি।

কিন্তু যদিই থাকে সাদৃশ্য, তাতে এতো বিচলিত হবার কী আছে?

অমল হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়।

অমল তার বাবার বড়ো ফটোখানার দিকে তাকায়। অমল মার উত্তেজিত মুখটা মনে আনে।......

মা কি ওর চেহারার সাদৃশ্যের সূত্র ধরে অতীতের কোনো ভয়ঙ্কর অপরাধের ঘটনাকে আবিষ্কার করতে চাইছেন?

নচেৎ এতো বিচলিত হবার কী আছে ?

ছি ছি, কী আশ্চর্য !

ওর বাড়ি দেখেছি, কী পবিত্র পরিষ্কার ! বাবা মা কতো বুড়ো-টুড়ো, পুজো-টুজো নিয়েই থাকেন, উজ্জ্বল তো অনেক বুড়ো বয়সের ছেলে !

মা একটা নিদারুণ সন্দেহের বিষে থাক্ হচ্ছেন।

তাই মা অতো করে জেরা করছিলেন।

তাই মানে যদি কোনো দিক থেকে কোনো যোগসূত্র আবিষ্কার করতে পারেন।

অমলের দুঃখ হলো।

অমল আর একবার বাবার ফটোটার দিকে তাকালো। মা কোনোদিন বাবাকে বোঝবার চেষ্টা করেন নি। মা চিরদিনই বাবাকে নিজের থেকে নিচু শ্রেণীর জীব মনে করেছেন। হ্যাঁ সেটা অনুভব করেছে, অমল।

কিন্তু অমল জানে মার ধারণা ভুল।

বাবা বেপরোয়া ধরনের ছিলেন কিন্তু নিচু ধরনের ছিলেন না। বাবার পক্ষে কোনো কুৎসিত আচরণ করা সম্ভব ছিল না।

অথচ মা সেই সন্দেহেই জর্জর হচ্ছেন।

অমলের পক্ষে তার মার ওই অস্বাভাবিক আচরণের এই ধরনের ব্যাখ্যাই সম্ভব। আর কি মাথায় আসতে পারে তার ?

অমলের দুঃখ হয়।

মার জন্যে বাবার জন্যে।

অমলের মানুষের দুর্মতির জন্যেও দুঃখ হয়। কেন যে মানুষ আপন দুঃখ আপনি ডেকে আনে! কী দরকার ছিল মার আমার বন্ধুদের দেখতে যাবার, ডেকে খাওয়াতে যাবার, এবং শেষ অবধি ক্ষেপে যাবার !

অমল তাই মার প্রশ্নে স্তব্ধ হয়ে গিয়ে একটু চুপ করে থেকে বলে, 'আমার ভালো লাগা না লাগা নিয়ে বিশ্ব সংসার চলবে না ঠিকই, কিন্তু তোমার খেয়ালের বশেও চলবে না।'

চলে যায় নিজের ঘরে।

ভেবে পায় না, মার বুদ্ধিতে সুস্থতা ফিরিয়ে আনবার উপায় কি ?

একটাই মাত্র আপাতত চোখে পড়ে, উজ্জ্বলকে আসতে বারণ করা।

কিন্তু সেটা কি সম্ভব ?

অমল তাই ভেবেছিল, সেটা কি সম্ভব ?

অথচ অমলের মা ওর থেকেও কতো অসম্ভব কাণ্ড করে বসতে পারে।

একথাটার খবর পেলো কলেজে গিয়ে।

উজ্জ্বলকে নিয়ে হাসাহাসির ধুম পড়ে গেছে। গতকাল অমল যখন বাড়ি ছিল না, উজ্জ্বলকে নাকি খোঁজ করতে গিয়েছিল অমলের মা, উজ্জ্বলের একটা ফটো চেয়েছিল।

'আর সন্দেহ নেই।'

হো হো করছে ওরা—'ফটোসহ আবেদন করুন। কিন্তু এটা যেন কেমন বেসুরো লাগছে রে উজ্জ্বল, পাত্র পক্ষই তো আগে পাত্রীর ফটো চায়।'···

'এই যে অমল এসে গেছে, কী রে তলে তলে উজ্জ্বলের হিল্লে করছিস? আমাদের সকলেরই এক একটা হিল্লে করে দেনা ভাই? তার সঙ্গে শ্বশুরের দেওয়া একটা করে মোটা মাইনের চাকরী। মাত্র এইটুকু। ব্যস, আর. কিছু চাইনা।'

'উজ্জ্বল এনেছিস তো ফটো? এনে থাকিস তো দিয়ে দে তোর ভাবী 'ভুতো শালার' হাতে।

আজও অমল বাড়ি ঢুকলো, মুখ কালো, চোখ লাল।

'মা! তুমি উজ্জ্বলের কাছে ওর ফটো চেয়েছো?'

সুজাতা বোধকরি প্রস্তুত হয়েই ছিল, তাই সুজাতা হাতের বইটা মুড়ে আস্তে বললো, 'হ্যাঁ চেয়েছি।'

আগে সুজাতা অমল কলেজ থেকে আসবার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকতো, অমলের আসাটি দেখবার জন্যে, কিছুদিন থেকে তার ব্যতিক্রম ঘটছে। সুজাতা যেন হঠাৎ তার ছেলেকে তার প্রতিপক্ষ ভাবছে। অথবা তার বিচারক। তাই, সুজাতা নির্লিপ্ত থাকতে চেষ্টা করছে।

তাই ঘরে বসে আছে।

অমল এটাও দেখছে বৈকি।

অমল মার ওই স্পষ্ট উত্তরে একটু থতমত খায়। তারপর ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'হঠাৎ ওর ছবিতে তোমার কী দরকার পড়লো?'

সুজাতা শান্তভাবে বলে, 'ছবিটা পেলে যেমন পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যায়, মানুষকে তো তেমনি পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখা যায় না!'

অমলও হঠাৎ তেমনি মার ভঙ্গী নকল করে।

অমলও তেমনি শান্ত গলায় বলে, 'কিন্তু সেই দেখার দরকারটাই তো বুঝলাম না। বিয়ের সম্বন্ধ-টম্বন্ধ করছো? না কি?'

'সব কিছুই ঠাট্টা করে ওড়াবার নয় অমল! আমি আমার একদার একটা শোচনীয় ভুল শোধরাতে চাই।'

ভুল শোধরাতে চাই! মা নিজে!

এ তো অমলের ব্যাখ্যার সঙ্গে মিলছে না। তবে তো কোথাও কোনো গোলমাল ঘটেছে দেখা দরকার।

অথবা দেখানো দরকার ডাক্তারকে।

হ্যাঁ নিশ্চয়ই উচিত কোনো মনোবিজ্ঞানীকে ডেকে মাকে দেখানো।

অমল ভাবতে চেষ্টা করে কবে থেকে মা এতো বেশী এলোমেলো হয়ে গেছে। ·· পিছোতে থাকে, অনেকটা পিছোতে থাকে। সেই পিছনে তাকিয়ে দেখে। তা'হলে—উজ্জ্বলকে দেখে পর্যন্ত এমন হয়ে উঠেছে বলা যায় কী করে?

কাশ্মীরে গিয়ে, হোটেলে একটা কাশ্মীরী ছেলেকে দেখে মা তাকে কী অতিরিক্ত ভালবাসতে শুরু করেছিল সেটাও তো মনে পড়ছে। অমলের বয়েসেরই ছেলে, বলতে গেলে রাজপুত্রের মত চেহারা। মা তাকে দেখতো আর বলতো, 'ঠিক তোর মতন দেখতে।'

অমল হেসে ফেলে বলতো, 'ওর মা এ-কথাটা শুনলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন না।'

'কেন, তুই কি ওর থেকে মন্দ দেখতে?'

'তুলনা করলে আকাশ পাতাল।'

মা হঠাৎ কেমন উত্তেজিত হয়ে বলেছিল, 'তুইও যদি ছেলেবেলা থেকে কাশ্মীরে থাকতিস, ওই রকমই হতিস।'

'ভুল করছো মা, ও ছেলেবেলা থেকে এখানে থাকে না। থাকলে হোটেলে উঠতে আসবে কোন দুঃখে? ও-তো অমৃতসরে থাকে। বেড়াতে এসেছে।'

'তা'হোক আসলে তো কাশ্মীরীর ঘরে মানুষ হয়েছে।'

মার এই কথা শুনে হেসেই অস্থির হয়েছিল অমল।

'কাশ্মীরীর ঘরে মানুষ মানে? ও কি ওর মা বাপের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে?'

সুজাতা সেদিন বলে উঠেছিল, 'যদি তাই হয়? এমন কি হয় না জগতে?'

অমল সেদিন শেষ পর্যন্ত অবাকই হয়েছিল। একটা মন গড়া কথা নিয়ে এমন উত্তেজিত হবার কী আছে?

তারপর ভেবেছিল, মার তর্ক করার ধাতটা এখানে এসে নেহাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে রয়েছে তাই মার এই হাওয়ায় তাল ঠুকে লড়াই।

... ...

অমল সেই পিছোনো দিনগুলো থেকে এদিকে চলে আসে। অমলের বয়সের সুন্দর ছেলে দেখলেই মা কেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। যেন হঠাৎ একটা হারানো জিনিস খুঁজে পেয়েছে।

এর মানে কী?

মায়ের কী অমলের আগে অথবা পরে কোনো ছেলে টেলে হারিয়ে গিয়েছিল? সেকথা অমলের কাছে প্রকাশ করা হয় নি?

না কি, সম্পূর্ণ একটা ব্যাধিই চিরদিন ভুগিয়ে এখন গ্রাস করে বসছে মাকে?

অমল ডাক্তারের ব্যাপারে মনঃস্থির করে ফেললেও, এখন নিজেই একটু মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকা নেয়।

আস্তে বলে, 'আচ্ছা মা, তোমার কি ভুল সেটাই বল আমায়।'

সুজাতা উঠে বসে।

বলে, 'আলোটা নিভিয়ে দে খোকা! সে কথা আলোয় বলবার কথা নয়।'
হঠাৎ কেঁপে ওঠে অমল।

আলো নিভিয়ে অন্ধকারের পটভূমিকায় কোন অন্ধকারের কাহিনী শোনাতে বসবে মা?

কার কোন কলঙ্ক কাহিনী?

মায়ের নিজের? না বাবার?

অমলের ভয় হয়।

অমল শিউরে উঠে বলে, 'থাক মা! যে কথা আলোয় বসে বলা যায় না, সেকথা আমি শুনতে চাই না।'

'ভয় পাচ্ছিস্?' সুজাতা কেমন এক রকম হেসে বলে, 'শোনার সূচনাতেই ভয় পাচ্ছিস্? অথচ এই তোর মা। সারাজীবন সেই ভয়ঙ্কর কথাটা বুকের মধ্যে বয়ে বেড়াচ্ছে।...বুক ফেটে যেতে চাইছে, তবু বইতে হচ্ছে। কিন্তু আর বইবো না, এবার ঠিক করেছি তোকে বলবো।'

অমল সত্যিই ভয় পাচ্ছে।

কোন অবৈধ প্রেমের কাহিনী শুনতে হবে তাকে কে জানে!

অমল তাই তাড়াতাড়ি বলে, 'কী দরকার মা? যা বলতে কষ্ট হচ্ছে, তা' বলতে যাবে কেন?'

সুজাতাকে আর তেমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখায় না। সুজাতা স্থির হয়ে বসে বলে, 'না বলে আরো অনেক বেশী কষ্ট হচ্ছে বাবা! কষ্ট হচ্ছে তোর জন্যেও। তুই তোর মাকে আর শ্রদ্ধা করতে পারছিস না, ভালবাসতে পারছিস না, মনে মনে ঘৃণা করছিস, এ কী তোরই কম কষ্ট!'

অমল মায়ের এই সরাসরি আক্রমণে লজ্জিত হয়, বিপন্ন হয়।

তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'এসব কথা বলছো কেন মা?'

'ঠিকই বলছি অমু! আমি মা, আমি টের পাচ্ছি না, তুই আর আমায় শ্রদ্ধা করতে পারছিস না! অবিশ্বাস করছিস।'

অমল পরিস্থিতিটা লঘু করে ফেলার চেষ্টায় বলে, 'তা' সেটা ভুল বলনি। অবিশ্বাস বাপু করছি। কখন যে কি করে বসবে তুমি বিশ্বাস নেই। এই যে তুমি উজ্জ্বলদের বাড়ি গিয়ে ওর জন্মতারিখ চেয়ে বসলে, ফটো চেয়ে আনলে, এটা কি বেশ সুস্থ মাথার কাজ হলো? ওর মা বাবা কী ভাবলেন বলতো?'

সুজাতা দৃঢ় গলায় বলে 'কে কী ভাবে আমি জানি না অমু! আমি শুধু ভাবি একটু জিগ্যেস করায়, একটু খোঁজ নেওয়ায় কার কী ক্ষতি?'

'তোমারই বা ওতে লাভ কী তা' বল।'

'আমার কথা থাক্ অমু, কী লাভ সেটা না হয় পরেই জানবি, ওতে লোকের কী ক্ষতি হয় তাই বল? এই যে গেলাম তোর উজ্জ্বলের বাড়ি, কী ক্ষতি হলো ওদের?'

'অকারণ একটা বিস্ময়, তোমার ওপর একটা সন্দেহ, সেটাও ক্ষতিকর।'

সুজাতা উত্তেজিত হয়ে বলে, 'সন্দেহ মানে? কিসের সন্দেহ?'

'তোমার কী অভিসন্ধি, এই নিয়েই সন্দেহ। আর সকলে যেটা করে না, হঠাৎ সেটা করলে, লোকের ঠিক ভাল লাগেনা।'

'উজ্জ্বলের মা বাপ আমার সঙ্গে মোটেই অপছন্দের ব্যবহার করেন নি। বসিয়েছেন, ভাল ভাবে কথা বলেছেন—'

'তুমি যা চেয়েছিলে, তা' ভাল মনেই দিয়েছেন?'

'কেন দেবেন না? তোর মতন সবাই নয়। তবে আমার স্থির বিশ্বাস ওঁরা কিছু চেপেছেন। এ ছেলে ওঁদের নিজের নয়।'

অমলের বুকের মধ্যেটা হঠাৎ ভয়ানক একটা শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে। আর সন্দেহের কিছু নেই। মা তার প্রকৃতিস্থ নেই।

এই ভেবে আরো হাহাকার করে ওঠে, মার এই অবস্থাটা বুঝতে না পেরে কত কী-ই ভেবেছে অমল। ভেবেছে, রাগ করেছে, কুটিল সন্দেহ পোষণ করেছে।

অমল এখন কী করবে? হতাশ নিঃশ্বাস ফেলা ছাড়া? অমল সেই হতাশ গলায় বলে, 'হঠাৎ এমন অদ্ভুত সন্দেহ কেন হলো তোমার?'

'হলো!'

সুজাতা আবার নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলো। বললো, 'কেন হলো বলছি—যখন জন্ম-তারিখটা চাইলাম, তখন কেমন যেন চমকে গেলেন ভদ্রমহিলা। দু'জনে মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। তারপর বললেন, 'কী দরকার বলুন তো?'

অমল বললো, 'খুবই স্বাভাবিক! ওনার ছেলের জন্মতারিখ, খামোকা তুমি চেয়ে বসলে—'

'আরে বাবা, আমি কি আর আট ঘাট না বেঁধেই বলেছি? এমন ভাব দেখালাম—যেন বিয়ে টিয়ের ব্যাপারে ইণ্টারেষ্টেড্।'

'সেতো বুঝতেই পারছি—' অমল একবার মার চোখের দিকে তাকায়। কিন্তু প্রকৃতিস্থ নয়, এমনও তো মনে হচ্ছেনা।

গভীর শান্ত চোখে তাকিয়ে বলে, 'কিন্তু আসলে তুমি চাইলে কেন সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। কেন বলতো?'

সুজাতা কি একবার কেঁপে উঠলো? সুজাতার মুখটা কি গরম রক্তোচ্ছ্বাসে লাল হয়ে উঠলো?

অমলের মনে হলো, উত্তরটা দেবার জন্যে মা যেন শক্তি সঞ্চয় করছেন। এই এক্ষুনি অমল নিজেই বলেছে, 'থাক মা যে কথা বলতে অন্ধকারের দরকার হয়, সেকথা শুনতে চাইনা।' অথচ আবার কথার পিঠে কথা বলতে নিজেই বলে উঠলো, 'কেন. সেটা বলতো ?'

সুজাতা কেমন একরকম গলায় বলে, 'বলবো বলেই তো আলোটা নিভিয়ে দিতে বললাম অমু! আলোয় বসে, তোর চোখের দিকে তাকিয়ে সে কথা মুখে আনতে পারবো না।'

অমল আস্তে উঠে আলোটা নিভিয়ে দেয়।

সুজাতা স্থির গলায় বলে, 'শুনে চমকে যাসনে অমল, কিম্বা ভাবিসনি মার মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে। যদিও খারাপ হওয়াটা আশ্চর্য ছিল না। মাঝে মাঝে নিজেই আমি অবাক হয়ে যাই, মাথাটা ঠিক আছে কী করে ?'

এখন ঘর অন্ধকার, এখন অমল তার মায়ের মুখ দেখতে পাচ্ছে না, শুধু গলাটাই শুনতে পাচ্ছে। বুঝতে পাচ্ছে, যে স্বরটা 'স্থির' করে কথা শুরু হয়েছিল, সেটা আর স্থির থাকছে না, কেঁপে যাচ্ছে, ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে।

'আমার নিশ্চিত বিশ্বাস উজ্জ্বল ওঁদের কুড়োনো ছেলে। ও আমার সন্তান, তোর ভাই, সহোদর ভাই। ও আমার এক গভীর কলঙ্কের ইতিহাস—'

'মা!'

অমল একটা আর্তনাদ করে ওঠে।

সুজাতা বলে, 'চমকে উঠতে বারণ করেছি অমল, আমায় বলতে দে। না, পৃথিবীর চিরাচরিত ইতিহাসে যে সব কলঙ্কের কাহিনী আছে, সে কলঙ্কের ছাপ তোর মার গায়ে পড়েনি অমল, ও তোর বাবারই সন্তান, সম্পূর্ণ বৈধ পবিত্র। তবু আমি সেই ছেলেকে বিলিয়ে দিয়েছিলাম, ফেলে দিয়েছিলাম। জগতের আসনে তার কোনো পরিচয়, কোনো চিহ্ন রাখিনি।'

অমল দুহাতে মাথাটা চেপে ধরে বলে, 'আমার সব কিছুই ধাঁধাঁ লাগছে মা!'

সুজাতা বলে, 'তা লাগতে পারে, আর বেশীক্ষণ ধাঁধাঁয় রাখব না তোকে। গুছিয়ে বলতে পারছি না বলেই, কিন্তু আজ আর তোর কাছে কোনো কথাই লুকোবো না। তোর বাবাকে তুই জানতিস, বেপরোয়া খামখেয়ালী, সংসার জীবন সম্পর্কে তোয়াক্কাহীন। তিনি কোনদিনই সন্তানের বন্ধন চাননি। বলতেন 'মুক্ত জীবন নিয়ে দু'জনে পৃথিবীটাকে দেখে বেড়াবো, তাকে উপভোগ করবো, যখন যা খুশী করবো। বাচ্চা কাচ্চা এর অন্তরায়।'

কিন্তু আমি তাঁর সেই বেপরোয়া মনের সঙ্গে তাল দিতে পারতাম না, আমার সুখ স্বপ্ন যা কিছু একটি সুন্দর সংসার ঘিরে। যেখানে স্বামী আছেন, সন্তান আছে।...

আমার এই আকুলতায় এক সময় তাঁর মন কিছু ঘুরলো, কিন্তু এই শর্তে একটির বেশী নয়। মনে ভাবলাম তাই ভালো, আমার একটিই একশো হবে।...

কিন্তু এমনি ভাগ্যচক্র, তুই যখন গর্ভে এলি, ঠিক সেই সময় ওঁর অফিস থেকে ওঁকে জাপানে পাঠাবার ব্যবস্থা করলো। সস্ত্রীক যাবার খরচা দেবে, রাজার হালে রাখবে। আশাতীত সুযোগ। আবার বলছি অমু, চমকে উঠিসনি, বানিয়ে বলছিনা, তিনি বললেন, এই ভয়ঙ্কর সুযোগকে লুফে নিতে হবে। কারণ এমন সুযোগ সর্বদা আসে না, অতএব যে এখনো পৃথিবীর আলো দেখেনি, তাকে আর সেটা দেখতে দেবার দরকার নেই। ঘুরে-টুরে এসে আবার দেখা যাবে।

অমল কাতর গলায় বলে, 'মা চুপ করো আমার শুনতে কষ্ট হচ্ছে।'

'বুঝতে পারছি অমু, তবু তোকে শুনতেই হবে। তোকে বুঝতে হবে জানতে হবে, কী কষ্ট আমি সারাজীবন ধরে একা ভোগ করেছি। ওঁর প্রস্তাবে আমি কিছুতেই রাজী হতে পারলাম না। আমি বললাম, তুমি ঘুরে এসো, আমি যাবো না। মত করাতে পারলাম না। শেষ পর্যন্ত সময় হিসেব করে স্থির হলো, দু'মাসের বাচ্চাকে বলতে গেলে সদ্যোজাতই, আমার মায়ের কাছে রেখে আমরা যাবো। আয়া টায়ার ব্যবস্থা অবশ্য হবেই। জানিস তো হাসি-খুশীর মধ্যেও কেমন জবরদস্ত মানুষ ছিলেন, ভয়ে ভয়ে তাতেই রাজী হলাম।······কিন্তু আমার অদৃষ্ট যে তখন অলক্ষ্যে কোথায় বসে হাসছে, তা জানতাম না। যখন তোর জন্মকাল এলো, তোর বাবা তখন দিল্লীতে। নার্সিং হোমের ব্যবস্থা করে দিয়ে গেছেন—মন নিশ্চিন্ত।······তাঁর নিশ্চিন্ততায় কোনো ব্যাঘাত ঘটলো না। আমি দিব্যি সুস্থ রইলাম, বাচ্চা জন্মালো 'যমজ'!'

'যমজ!'

অমল যেন অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

সুজাতা তেমনি আচ্ছন্ন গলায় বলে চলে, 'আমার সেই দুর্বল শরীরে মনে এ খবর যেন একটা হাতুড়ির মত এসে লাগলো। ভয়ে আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অনবরত মাথার মধ্যে ঘুরতে লাগলো—একটির বেশী নয়। তা'হলে? তাহলে কী বলবেন তিনি আমায়? জোচ্চোর! কৌশলী! ওঁকে জব্দে ফেলবার জন্যেই আমি এই চালাকি খেলেছি—'

'কী আশ্চর্য!'

অমল বলে 'এটা কি ইচ্ছাকৃত?'

'জানি বাবা, তবু ভয়ে আমার ওইরকমই মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল দু দুটো বাচ্চাকে আমার মায়ের ঘাড়ে চাপিয়ে রেখে যাবোই বা কোন মুখে? হয়তো যাওয়া হবে না, আর সেই রাগে তোর বাবা হয়তো জীবনে আর আমার মুখ দেখবেন না। ভয়ে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারালাম, হিতাহিত জ্ঞান হারালাম, ভবিষ্যতের চিন্তা হারালাম, নার্সের হাত ধরে বললাম—ওর মধ্যে একটাকে তুমি বেচে দাও, বিলিয়ে দাও, যা খুশী কর।'

অমল হঠাৎ প্রায় ধিক্কারের গলায় বিস্ময় প্রশ্ন করে, 'বললে তুমি এই কথা?'

সুজাতা ক্লান্ত স্বরে বলে, 'বললাম বাবা! এখন ভাবি, পরে অনেক ভেবেছি কি করে বলেছিলাম! কিন্তু তখন আমার সমস্ত মন জুড়ে শুধু ভয়।'

অমল তেমনি গলায় বলে, 'কীসের ভয় মা? সমাজের ভয় নয়, লোকলজ্জার ভয় নয়, শুধু বাবার একটু অপছন্দের ভয়! সে অপছন্দ আর ক'দিন থাকতো? শুধু সেই ভয়ে তুমি অনায়াসে তোমার ছেলেকে বিলিয়ে দিতে বললে? ওঃ! সেই হতভাগ্যটা আমিও হতে পারতাম। তুমি আমাকেও বিলিয়ে দিতে পারতে মা!'

'ষাট্! ষাট্! অমু! ওকথা বলিস না!' হঠাৎ একথা বলে উঠেই সুজাতা বলে, 'না, বারণ করার মুখ আমার নেই। বল! বল! যত পারিস ধিক্কার দে! ওটাই আমার পাওনা। তবু আমার দিকে একটা কথা আছে অমু! নার্স বলেছিল—দুটো শিশুর একটা হয়তো বাঁচবে না, জীবনীশক্তি ক্ষীণ। দুজনের দেহ গড়ে উঠেছে যেন দশআনা ছ'আনা ভাগে।' ......ভাবলাম, ওই দশআনাই আমার ষোলো আনা হয়ে উঠবে, যে হয়তো টিকবেই না, তাকে ত্যাগ করায় আর কতটুকু ক্ষতি? বুঝতে পারিনি সেই সামান্যই চিরদিন এমন করে তিলে তিলে দগ্ধাবে! সেই ক্ষতিটাই ক্রমশঃ মস্ত পাওয়াটার থেকেও বড় হয়ে উঠবে।'......

অমল হঠাৎ অস্বাভাবিক ভাবে একটু হেসে উঠে বলে, 'তার মানে তুমি মনে মনে এই দশআনাটার থেকে সেই ফেলে দেওয়া ছ'আনাটাকেই বেশী ভালবেসে এসেছো! তাই না?'

সুজাতা আস্তে বলে, 'মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়তো এই ভাবেই করতে হয় অমু!'

অমল এখন ঈষৎ করুণার গলায় বলে, 'কিন্তু এমনও তো হতে পারে, সে সত্যিই বাঁচেনি।' 'টুইনের একটা তো এমন মরে টরেও যায়—'

বলতে বলতে সুজাতার অস্ফুট কণ্ঠের 'ষাট্' শব্দটা শুনতে পায়।

মৃদু হেসে বলে, 'এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের আসল অপরাধী তো অনেক আগেই মানুষের আদালতের হাত এড়িয়ে পলাতক, থাকলে হয়তো কিছু বলার ছিল। তবু এও এখন না বলে পারছি না মা, 'মাতৃস্নেহ' বস্তুটাকে যতই স্বর্গীয় বলে বর্ণনা করা হোক, আর তার যতই প্রশস্তি গাওয়া হোক, আসলে সবই ফাঁকা! লোক লজ্জায় ছেলেকে ফেলে দেওয়া যায়, সমাজের নির্যাতনেও যায়, এমন কি একটু বকুনি খাবার ভয়েও ফেলে দেওয়া যায়, বিলিয়ে দেওয়া যায়।'......

সুজাতা রুদ্ধ গলায় বলে, 'তুই শুধু ওইটাই দেখলি অমু? আর এই যে আমার সারা জীবনের যন্ত্রণা? এটা দেখতে পেলি না?'

অমল নীরস গলায় বলে, 'ওটা মাতৃস্নেহ-প্রসূত নয় মা, অপরাধ বোধের গ্লানি থেকে।'

'শুধু এই?'

অমলের মুখটা লাল দেখাচ্ছে, কপালের শিরাটা ফুলো ফুলো। অমল বলে, 'তাছাড়া আর তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না মা? এখন নিজের ওপর করুণা আসছে, মনে হচ্ছে

আমি ভাগ্যিস সেই ছ আনাটা হইনি। তাহলে আমার গতিও ওই হতো হয়তো। সত্যি বলছি মা, ভেবে এতো খারাপ লাগছে, তুমি শুধু বকুনি খাবার ভয়ে—তাও সে ভয় মনগড়া। কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক মানুষ এমন ঘটনার ওপর নির্ভর করে বেচারী যমজ ছেলের মাকে অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বকে? আমি বলছি তোমাব ভয় অমূলক ছিলো। বাবাকে তুমি যত ভয়ঙ্কর ভাবতে বাবা তা ছিলেন না।'

'অমু, তুই আমার পায়ের তলার মাটি কেড়ে নিস না বাবা! আমায় একটু সহানুভূতিব চোখে ছাখ!'

'হয়তো দেখবো মা। কিন্তু এখন পারছি না। এখন আমার সামনে যেন শুধু একটা রোদ্দুরের মাঠ ধূ ধূ করছে। তবে বলে দিচ্ছি তোমায় মা, আর উজ্জ্বলকে নিয়ে টানাটানি করতে যেও না।'

'টানাটানি কি খোকা! আমি কি ওকে ওঁদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছি?'

'নিতে চাইলেও পাবে না।'

'চাইছি না অমু। আমি শুধু একবার নিশ্চিত হতে চাই, ও আমার সেই হারানো ছেলে কিনা।'

'হারানো নয়', অমল ভুল সংশোধন করে দেয়, বলে 'হারানো নয়, বলো বিলোনা ছেলে। ফেলে দেওয়া ছেলে।'

'তাই বল। জগতে যত নিষ্ঠুর কথা আছে, যত ধিক্কারের কথা আছে, সব বল তুই মাকে।'

অমল উঠে পড়ে, শান্ত গলায় বলে, 'নাঃ! বলার কিছু নেই। শুধু এই কথাই বলি, উজ্জ্বল সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ যদি সত্যিই হয়, জেনে তোমার লাভ আছে কিছু?'

সুজাতা এতোক্ষণ ধরে নিজেকে সামলাচ্ছিল, আর পারলো না, কেঁদে ফেলে বলে উঠলো, 'শুধু লাভের হিসেবটাই একমাত্র সত্য অমু? আর কিছু না?'

'আমি তো কিছু দেখছি না মা? এক সময় তুমিও দেখনি। সংসারের আদর যত্ন হারানোর ভয়ে একটা ছেলেকে হারানোও ক্ষতি মনে হয়নি তখন তোমার। ওই ছেলেটাকে তখন তোমার 'সামান্য' মনে হয়েছিল। কিন্তু তোমার অপরাধ বোধ তোমায় চিরকাল তাড়া করে বেড়িয়েছে মা, মাতৃস্নেহ নয়।'

সুজাতা রুদ্ধকণ্ঠে বলে, 'বেশ তাই! অপরাধ বোধই, আর কিছু নয়। তাহলে সেই অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত করবো। আমি ওই ছেলের কাছে সব খুলে বলে ক্ষমা চাইবো।'

অমল তীব্র গলায় বলে, 'আমি তোমায় বারণ করছি মা, এ কাজ তুমি করতে যেও না।'

সুজাতা সহসা উদ্ধত কণ্ঠে বলে, 'তুই কি আমার গার্জেন যে তোর কথা আমায় শুনতে হবে? আমি যদি যাই?'

'তার আগে আমি ওদের বলে আসবো তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

সুজাতা উগ্রগলায় বলে 'কেন? কেন? তুইও তাহলে তোর বাপের মত আমায়

শাসনের জাঁতার তলায় রাখতে চাস ? আমার কোনো স্বাধীনতা থাকবে না ?'

'যাতে অন্যের অনিষ্ট হয়, তেমন স্বাধীনতা না থাকাই উচিত মা !'

'অনিষ্ট !'

সুজাতা যেন নিভে যায়।

'অনিষ্ট মানে ? কার কি অনিষ্ট হচ্ছে এতে ?'

অমল বলে 'কিছুই কি হচ্ছে না ? ভেবে দেখো। যদিও আমার নিশ্চিত বিশ্বাস উজ্জ্বল সম্পর্কে তোমার যা ধারণা, সেটা সম্পূর্ণ তোমার মন গড়া, কিন্তু যদিই সত্যিই তা হয়, তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে ? এই দাঁড়াচ্ছে—সে বেচারী দিব্যি সুখে শান্তিতে কাটাচ্ছিল, হঠাৎ তুমি তার সেই সুখ শান্তি কেড়ে নিলে। বাকি জীবনটা তার কী ভাবে কাটবে ভাবো ? হঠাৎ সে এসে তোমার ছেলে হয়ে তোমার কোলে এসে বসতে পারবে না, অথচ এতোদিন যাদের মা বাবা বলে জেনে এসেছে, তাদেরও আর সত্যি আপন ভাবতে পারবে না। তার মানে তুমি তার পায়ের তলার মাটি আর মাথার ওপরকার আকাশ দুই কেড়ে নেবে।'

'অমল !'

সুজাতা কেঁদে ফেলে, 'তবে আমি কী করবো ?'……অসহায় একটা কান্না।

অমল চলে যাচ্ছিল, ঘুরে দাঁড়ায়।

ওই কান্নাটা তাকে প্রবল একটা ধাক্কা দেয়।

আবার সরে এসে কাছে বসে পড়ে বলে, 'আর কিছু করবার নেই মা ! শুধু ওই অতীত ইতিহাসটাকে ভুলতে চেষ্টা করো।'

'ভুলতে যে পারছি না অমল !'

অমল আবার উঠে পড়ে।

একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, 'তাই দেখছি। এযাবৎকাল প্রাণে বড় আনন্দ ছিল আমিই তোমার সর্বেসর্বা, তোমার সবেধন নীলমণি। সে সুখটুকু ঘুচে গেল। এখন থেকে তোমার আমার মধ্যে একটা 'ছআনা অংশ' রইলো আড়াল করে।'

চলে গেল ঘর থেকে।

আর সুজাতার মনে হলো প্রবল একটা ভূমিকম্পে সে যেন তোলপাড় হচ্ছে।

সুজাতা শুধু নিজের দিকটাই ভেবেছে, তার ছেলের দিকটা ভাবেনি।…অমলের ক্ষতিটাই কি সামান্য ?

অমল আর কোনোদিন মাতৃস্নেহ বস্তুটাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না, অমল আর কোনো দিন সহজ ভালবাসায় মায়ের 'একান্ত কাছে' এসে মুক্তির সুখ পাবে না। অমলকেও হারিয়ে ফেললো সুজাতা আপন বুদ্ধির দোষে।…এই ক্ষতির বোঝা বইবে কী করে সুজাতা ?